REGISTERED NO. C—675

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়।

অষ্টাদশ বর্ষ। { ১৮৫১ শক, সন ১৩৩৬ সাল, পৌষ। } চতুর্থ সংখ্যা।

নিখিল ভারত সনাতন ধর্ম্মসম্মিলন।

মান্দ্রাজ।

সভাপতির অভিভাষণ।

সভাপতি—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সে যাহাই হউক, এই ক্ষেত্রে আমি এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি, পৃথিবী অতি সাংঘাতিক সংস্কার সাধন করিয়া শাশ্বত সত্তাকে অবজ্ঞা করিয়াছে; কেবল মাত্র ঘনান্ধকারের সৃষ্টি করিয়া জগতকে মোহজাল জড়িত করিয়া উহাকেই উন্নতি বলিতেছে। যুগযুগান্তরে অপরিসীম পরিবর্ত্তন হওয়া ভগবানের অভিপ্রেত নহে। যে সকল ধর্ম্মবিশ্বাসী হিন্দু ও সংস্কারক মনে করেন যে, কলি যুগে সকল বিষয়ই শাস্ত্রীয় শাসনের বহির্ভূত ও উচ্ছৃঙ্খল হইবে, প্রত্যেকে স্ব স্ব প্রধান হইবে, তাঁহারা হিন্দুশাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য ভুলিয়া যান। শঙ্করাচার্য্য বেদান্তভাষ্যে একথা অতি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে, ঋতু পরিবর্ত্তনে কালের যে প্রকার পরিবর্ত্তন হয়, যুগ বিবর্ত্তনে সেই ভাবের পরিবর্ত্তনই হয় মাত্র। যুগান্তরে জাগতিক মূল প্রকৃতি বাহ্য অভিব্যক্তির তদপেক্ষা রূপান্তর হয় না। ফল পুষ্প শস্য সম্ভার সহ ঠিক ঋতু রাজেরই আগমনের মত বর্ষে বর্ষে বর্ষাগমে পথ ঘাট কর্দ্দমাক্ত ও দুর্গম হয় বলিয়া আমরা

অভিযোগ করি কি? কার্য্যাবলি ও ঘটনাবলীর অবিকল পুনরাবির্ভাবের ন্যায় এবং সনাতন পদ্ধতি ও নীতিকে অগ্রাহ্য করাই কি নবতর উন্নতি কি? তাহাই যদি হয়, তবে মানুষ জীবনের সার্থকতার জন্য যে অকৃত্রিম বন্ধুত্ব ও ভালবাসা চায়, যে কর্মক্ষেত্র অবলম্বনে দণ্ডায়মান হয়, এবং যে চেষ্টা ও কার্য্যকলাপের ফলে নিজের ব্যক্তিত্বকে বুঝিয়া থাকে সে সমুদায়েও তাহার বিশ্বাস স্থাপনের উপায় থাকে না, যে সকল সত্য পূর্ব্বাপর একরূপ নহে। শাশ্বত সত্যকে অগ্রাহ্য করিয়া উন্নতি সাধন করা একান্তই অসম্ভব। শাশ্বত সত্য অনন্ত সৌন্দর্য্যের আধার উহা আমাদের উৎসরূপে চির বিরাজমান। নূতনত্বের জন্য উৎকট পিপাসা ও নিত্য নূতন চমৎকারিত্বস্পৃহের লালসা স্বাস্থ্যের লক্ষণ নহে, উহা ব্যাধি বিশেষ। বেদে এই শ্রেণীর অভিনবত্বের স্থান নাই, পক্ষান্তরে ইহার ঠিক বিপরীত ভাবেরই বেদ উপদেশ করিয়াছে। "অসংযত, অশান্ত, অসন্তুষ্ট ও অলস ব্যক্তি কোন মন্ত্র বুদ্ধি বা বচনের দ্বারা ভগবানকে লাভ করিতে পারে না"।—ইহা যে কেবল পুরাতন ব্যাধি তাহা নহে, সত্যভাবে ও বহির্ভূত যে দোষ পৃথিবীকে শাসন করিতে হইয়াছে। যে ওয়াল্ট হোয়াইটম্যান সম্বন্ধে তাঁহার শত্রুও অজ্ঞতা, আভিজাত্য অবিবেকতা প্রভৃতি একগুঁয়েমির জন্য দোষারোপ করিবে না সেই ওয়াল্ট হোয়াইটম্যান গভীর চিন্তার সময় অনুভব করিতেন যে, মানবত্বের উৎকৃষ্টাংশ পরিপূরণের নিমিত্ত কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তি ব্যতিরিক্ত এমন অদ্ভুত কিছু আছে যাহার তর্ক যুক্তি ব্যতীত একমাত্র ভগবদ্বিশ্বাসদ্বারা পূর্ত্তি সাধন হয়। সে ভাব দেশকালে সীমাবদ্ধ বিচিত্র বিশ্বের ও নির্ব্বোধ নাস্তিকগণের চিন্তার অতীত এবং এই অস্থির জগতের বহির্ভূত। অতএব জাগতিক অস্থিরতা নাস্তিকতা ও নির্বুদ্ধিতা বর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত কি বেদোপাসকের অবশ্য প্রাপ্য নিগূঢ় অপার্থিব বিষয় হইতে আমাদের স্বেচ্ছায় ও সোৎসাহে দূরে প্রস্থান সঙ্গত? প্রাচীন শাশ্বত সত্যের ত্যাগ বশতঃ বর্ত্তমান মানবের অধঃপতনের বিদ্রোহ, অবিশ্বাস ও অস্থিরতারূপ যে বিচিত্র উপাদান তাহা মানবকে যে কোথায় লইয়া যাইবে তাহা কেহই বলিতে সমর্থ নহে। অসন্তুষ্ট, বিচ্ছিন্ন, ত্রস্ত, উপদ্রুত ও নির্য্যাতীত সমগ্র মানব সমাজকে আশ্রয় দান করিবার নিমিত্ত নব উদ্দীপনা লইয়া সনাতন ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের কাল উপস্থিত। একমাত্র সনাতন ধর্ম্মই যথার্থতঃ তাহাদের সকলকে সমভাবে বলিতে সক্ষম; হে! পাপিতাপি এস আমার ক্রোড়ে বিশ্রাম লও। একমাত্র সনাতন ধর্ম্মই ত্রিকালজ্ঞ এবং অবিশ্বাস ও অস্থির বাসনা জগতকে সাধারণতঃ যে পতনের দিকে আকর্ষণ করে তাহার বিরুদ্ধে একমাত্র সনাতন ধর্ম্মই সতর্ক বাণী প্রচার করে। সনাতন ধর্ম্ম ভূতগণের অদ্রোহে বা স্বল্পদ্রোহে উপজীব্যমান ব্রাহ্মণের হস্তে মানবের কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থা অর্পণ করে। ভারতের তথা সমগ্র জগতের মুক্তি এই প্রাচীন ব্রহ্ম শাসনের পুনরভ্যুত্থানের উপর নির্ভর করে। কারণ উহাতে কিঞ্চিৎ নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক শুদ্ধ ও শ্রেয়ঃ বস্তু আছে। এই মহোপকারী বস্তুকে যদি পুনরায় তোমাদের কর্ম্মে নিযুক্ত কর তবে দেখিবে যে, উহা সমাজের প্রত্যেক স্তরকে সুস্থ সবল ও পবিত্র করিয়া তুলিবে। বর্ত্তমান জগত কেবল মাত্র বোঝে বলযোগে সাফল্য

বিজয় ও ফল লাভ। বর্ত্তমান সভ্যতা নিজেকে এই বিশ্বাসে প্ররোচিত করে যে, প্রার্থনা মাত্রই সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা লাভ হয় এবং স্বকপোল কল্পিত নূতন নিয়ম প্রণালী দ্বারা প্রাচীন বিধিনিষেধের স্থান অধিকার করিলেই উহা লাভ হইয়া থাকে। এই দুরাকাঙ্খা প্রায় সার্ব্বজনীন; ইহার ফল বৈদিক সত্যকে উন্মূলিত করা, এবং আপাত মধুর ফল লাভই ইহার চরিতার্থতা। কিন্তু বিদ্যুৎ চমক পার্শ্ববর্ত্তী অন্ধকারকে ঘনীভূত করে মাত্র। অতএব মনুর এই অমৃতময়ী বাণী সকল যুগের পক্ষেই উপযোগী:—

অধর্ম্মেনৈধতে তাবত্ততো ভদ্রাণি পশ্যতি
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।

অধর্ম্ম কি? উহার সর্ব্বাংশই বেদে বর্ণিত হইয়াছে। বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বোচ্চ চাঞ্চল্যের মূলীভূত কারণ শ্রমতন্ত্র। বিজ্ঞান জাত এই পাপ সম্বন্ধে অসংখ্য গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে। বাষ্পীয় যন্ত্র শিল্প জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে এবং মানবের সুখের মাত্রা ও কল্পনা বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছে বলিয়া যখন ঘোষিত হইল তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ইহারও সূচনা হইল। কিন্তু কাঞ্চন কৌলিন্য, যুদ্ধ ও সার্ব্বজনীন অসন্তোষ ইহার সোদরক্রমে উৎপন্ন হইল। কিন্তু জগত যদি সনাতন বৈদিক সত্যের অনুগত থাকিত তবে ইহা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিত কি? মহর্ষি মনু, মহাযন্ত্র প্রবর্ত্তনকে (মেশিনের ব্যবহার) মানব সমাজ ও মানবত্বের বিরুদ্ধে জঘন্য অপরাধ বলিয়া বর্ণনা করিয়া ইহাকে নিম্নশ্রেণীর পাপের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দণ্ডার্হ করিয়াছেন। মনুপ্রোক্ত রাজস্ব বিধি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করিলে দুর্ভিক্ষ সর্ব্বতোভাবে বিদূরিত না হইলেও যে প্রবল পরিমাণে হ্রাস হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মনু জাতির প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও আহার্য্য বস্তুর রপ্তানি একেবারে নিষেধ করিয়াছেন। প্রকৃতিপুঞ্জের রক্ষণ ও পালনার্থ নিযুক্ত রাজপুরুষগণ দুশ্চরিত্র ও অসাধু হইলে সেই দুষ্কর্ম্মাদিগকে আদর্শ শাস্তি প্রদানের জন্য মনু কঠোর ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। এই শ্রেণীর অপরাধীদিগের যথাসর্ব্বস্ব বাজেয়াপ্ত করিয়া উহাদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। মনু হইতে বহু বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, তিনি বিষয়াশক্তি ও জড়বাদ হইতে জাত সকল অনিষ্টপাতের আশঙ্কা করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তিনি অন্যান্য অবতার বা নররূপী নারায়ণেরই মত ভবিষ্যদর্শী ছিলেন সুতরাং তাঁহার অনুশাসন ও উপদেশ সকল পুরাতন ও একালের অনুপযোগী, অতএব মনুষ্য প্রণীত বিধিদ্বারা উহা পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত এইরূপ মনেকরা অপেক্ষা হস্তীমূর্খতা আর কিছুই হইতে পারে না। বিবাহ সম্বন্ধে তিনি যে সার্ব্বভৌম ও সর্ব্বোত্তম আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন তাহা যে কোন মানব সমাজের পক্ষে প্রভূত কল্যাণকর ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। গ্রীস এবং রোম এই উভয় দেশই উক্ত আদর্শে অতিমাত্র উপকৃত হইয়াছে। এ বিষয়ে তাঁহার মূলনীতি এই যে, গুরুকুল বাস ও অগ্নি পরিচর্য্যা দ্বারা ব্রহ্মচারীর যে কার্য্য সাধিত হয়; বিবাহ দ্বারা বালিকার সেই কার্য্য সাধিত হয়।

বালক বালিকার হৃদয়ে স্বার্থবুদ্ধি অনুপ্রবিষ্ট হইবার বহু পূর্ব্বে ত্যাগ, এবং সেবা ব্রতে দীক্ষিত হওয়াই উপনয়ন ও বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য। এই আদিম কার্য্যকে সমর্থন করিয়া ব্রহ্ম-পুরাণ এতদূর অগ্রসর হইয়াছে—তাহাতে এই বিধান করা হইয়াছে—

যাবল্লজ্জা ন জানাতি যাবৎ ক্রীড়তি পাংশুভিঃ
তাবৎ কন্যা প্রদাতব্যা নোচেৎ পিত্রো রধোগতিঃ।

দেহ সংস্কার ও পাশববৃত্তিকে দমন করতঃ বালকবালিকাকে পুণ্যপথে অগ্রসর করাও ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। ইহা পূর্ব্বোল্লিখিত এই ঔপনিষদিক সত্যের অনুকূল যে, ভগবদ্দর্শনার্থীকে নিষ্পাপ, শান্ত ও আত্মসন্তুষ্ট হইতে হইবে। এবং প্রেম—কামে পরিণত না হয় সে জন্য কতদূর সাবধানতার প্রয়োজন তাহা সকলেই অবগত আছেন। হিন্দুধর্ম্মশিক্ষা শব্দে এই বোঝে বহির্ম্মুখীন প্রকৃতি নিচয়কে অন্তর্ম্মুখীন করিয়া দেওয়া; এই মহদভিপ্রায় সাধনার্থ বালিকাদের পক্ষে বাল্যবিবাহ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

নাস্তিবুদ্ধিরযুক্তস্য নচাযুক্তস্য ভাবনা
নচাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃসুখম্।

ইন্দ্রিয় দমনে অগ্নি পরিক্রিয়ার অমোঘ প্রভাব সুপ্রমাণিত। এইজন্য নিম্নলিখিত বিবাহ মন্ত্রে অগ্নির স্তুতি ও কাম প্রবৃত্তির নিন্দাবাদ দেখিতে পাই।

কাম বেদতে নাম মদো নামাসি সমানয়া মুংসুরাতে
অভবৎ পরম যন্মাগ্নে তপসো নির্ম্মিতোঽসি স্বাহা।

এই প্রসঙ্গে—আমি ইহা ইচ্ছাকরি যে, সোৎসুক অনুসন্ধিৎসুগণ "সোম অদং—" এই অগ্নি স্তুতির ঐরূপ তাত্ত্বিক তাৎপর্য্য লক্ষ্য করিবেন। মনুপ্রোক্ত বিবাহ বিধিতে যখন বালিকার বিবাহ যোগ্য বয়স নির্দ্দিষ্টই আছে তখন বিবাহের বয়স নিয়া তর্ক করা বৃথা। কিন্তু মনু যে ঋতুরোধ সম্বন্ধে সাবধান করিয়াছেন অর্থাৎ ঈপ্সিত ফলাভিসন্ধিতে ঋতুরক্ষার্থ অনুপযুক্ত পাত্রেও কন্যা অর্পণ করিবে এ বিষয়ে কোন বিতর্ক নাই। এ বিষয়ে তিনি এতই গুরুত্ব স্থাপন করিয়াছেন যে, উপযুক্ত পাত্র মিলিলে কন্যার পিতা কন্যার বয়স সম্বন্ধে কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া উহাকে পাত্রস্থ করিবে। এসম্বন্ধে বিভিন্ন শাস্ত্রধৃত প্রমাণ বাহুল্য দ্বারা বুদ্ধি ভ্রান্তি উৎপাদন করা নিষ্প্রয়োজন। এই পর্য্যন্ত বলাই যথেষ্ট যে, সকল প্রামাণিক শাস্ত্রই ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বে কন্যাদান সম্বন্ধে দৃঢ়তা প্রকাশ করিয়াছেন। পুরাণসমূহের মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ প্রাচীনতম এবং অক্ষরে অক্ষরে বেদকে অনুসরণ করিয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে—যে পুত্র গৌরীবধূর পাণিগ্রহণ করে ও নীলবৃষ উৎসর্গ করে এমন পুত্রের পিতা বস্তুতই ভাগ্যবান। বাল্যবিবাহের প্রতিকূলে যে ধরা বাঁধা যুক্তি প্রদান করা হয় তাহা এই যে—সাবিত্রী, দ্রৌপদী, পার্ব্বতী এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ নন্দিনীগণের বাল্য বিবাহ হয় নাই। উক্ত সকল ক্ষেত্রেই রজোদর্শনের পর বিবাহ হইয়াছে কিনা তাহা তর্কের বিষয় কিন্তু উহা স্বীকার করিয়া লইলেও বলিতে হইবে যে, ঐ সকল অলোক-

সামান্যা কন্যাগণের যোগ্যবর লাভ একান্তই দুঃসাধ্য হওয়ায় উহাদের বিলম্বিত বিবাহ হেতু তৎপিতৃগণের উদ্বেগের-কারণ থাকিলেও তাহা অপরিহার্য্য হইয়াছিল। এক দিবস প্রভাতে জনকরাজ যখন দেখিলেন যে, তাহার যজ্ঞশালা মার্জ্জনকালে সীতা হরধনুকে দূরে রাখিয়া গৃহ মার্জ্জনানন্তর পুনরায় উহা যথাস্থানে স্থাপন করিলেন—তখন জনকের মাথা ঘুরিয়া গেল। ধনুর্ভঙ্গপণ ও সেই পণে যে বর লাভ হইয়াছিল সে বৃত্তান্ত সকলেরই সুবিদিত। অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন বিদুষীগণের যথাকালে যোগ্যবর লাভ না হওয়ায় উহাদের বিলম্বিত বিবাহের দরুণ উহাদের জনকদিগের পক্ষে কালিদাস একটি সুযুক্তিপূর্ণ মৃদুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। পার্ব্বতীর পিতাকে নারদ পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন যে, পার্ব্বতী মহাদেবকে বরমালা প্রদান করিবে। সুতরাং কালপূর্ণ হইবার পূর্ব্বে পার্ব্বতী-পিতা এ বিষয়ে উদ্বিগ্ন হয়েন নাই। এ বিষয়ে কালিদাসের উক্তি এই—

গুরুঃপ্রগল্‌ভেঽপি বয়স্যতোঽস্যাঃ
তস্থৌ নিবৃত্তান্যবরাভিলাষঃ
ঋতে কৃশানো র্নহি মন্ত্রপূতম্
অর্হন্তি তেজাংস্যপরাণি হব্যম্।

রেতোৎ সেকের বাধা জন্মাইয়া জরায়ুর বন্ধ্যত্ব বিধানে কাহারও অধিকার আছে কি? ইহা কি ভ্রূণ হত্যার তুল্য নহে? প্রাচীনতম বাঙ্গালী ধর্ম্মকবি ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন পশুত্বের সংস্কার দ্বারা বানরকে কেহই বেদজ্ঞ করিতে পারে না—পক্ষান্তরে কার্য্যকলাপ দৃ মনে হয় ভগবানের বিধান ও প্রকৃতির প্রয়োজন ও অভিপ্রায়ক ভৎসাধিত করা যেন বিজ্ঞতা ও মহত্বের পরিচায়ক। সিমলাতে আমরা শ্রবণ করিয়াছি বিবাহ বিষয়ে কোন নির্দ্দিষ্ট মত পোষণ করা অন্যায়। আমরা এ বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট সংস্কারের বশবর্ত্তী দেখিয়া এসেম্ব্লির সভ্যগণ যেন কৌতূহল অনুভব করিতে ছিলেন। যাহারা ইন্দ্রিয় ব্যাপার ব্যতীত অ র কোন অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেও লজ্জা বোধ করে এবং মর্কট মনোবৃত্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত ও অতিমাত্র প্রভাবান্বিত হইয়াছে তাহারা মানবে চিত্ত কোন [illegible] সংস্কারের ও অতিপ্রিয় জ্ঞানের অস্তিত্ব কল্পনা করিতে ডার্ব্বিনের ন্যায় অক্ষম। ডার্ব্বিন সরল বিশ্বাসী সত্যানুসন্ধিৎসু ছিল। তাহার সরলতা চির প্রসিদ্ধ এবং প্রশংসনীয়। জীবনের নিগূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উপস্থিত হইলে এবং সে সত্য স্বীকার ও বিশ্বাস করিতে তাহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি লক্ষিত হইলেই ডার্ব্বিন যেন স্বীয় জালে জড়িত না হইয়া থাকিতে পারিত না। এবং তারস্বরে বলিত—"মানবের মনোরাজ্য যখন ইতর প্রাণীর মনেরই ক্রম বিকাশ মাত্র তখন মানবের জ্ঞান ও সংস্কারের কোন মূল্য আছে ও উহা বিশ্বাস যোগ্য কিনা এ বিষয়ে সর্ব্বদাই আমার ঘোর সংশয় উপস্থিত হয়। যদি বানরী মনোবৃত্তির বিশ্বাস্য কিছু থাকে তবে মানব সেই সংস্কারে বিশ্বাস স্থাপন করিবে কি? "ঘোর সংশয়" কথাটা লক্ষ্য করিবেন। ভগবান গীতাতে এই অবস্থা অনুমান করিয়াই বলিয়াছেন—

"অজ্ঞশ্চা শ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি। বিস্ময় হইতেও বিস্ময়তর! বর্ত্তমান সভ্য মানব সমাজের দুরবস্থা ও অকৃতজ্ঞতা লক্ষ্য করুন। রাত্রিযোগে যখন শ্রান্ত ইন্দ্রিয় গ্রা ও মন অবশ ও নিষ্ক্রিয় হইয়া স্বপ্ন শূন্য গভীর সুষুপ্তির ক্রোড়ে বিরাম লয় তখন নব শক্তি ও নবোদ্যম লাভের নিমিত্ত সেই শক্তির উৎসের প্রতি এগাইয়া পড়ে; নিশাপগমে সেই সর্ব্ব শক্তির মূলাধারকেই সে অস্বীকার করিয়া বসে। ইহাই বর্ত্তমান সভ্য মানবের স্বরূপ। তাহার আত্মানুভূতি; আত্মপ্রত্যয় ও আত্মসম্মান লাভের নিমিত্ত তাঁহাকে বেদ বিধি ও বৈদিক সংস্কারের ভিতর দিয়া আনিতেই হইবে অন্যথা তাহাকে সক্রেটিসের মত উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। পাশ্চাত্য শিক্ষিত ভারতীয়গণের মুখপাত্র হেমলেটের সমাধি খাত খননকারী মনস্তত্ত্ব ও যুক্তি মূলে সর্দ্দা আইন সমর্থন করিয়াছে "একপক্ষে পাত্রী অন্য পক্ষে পাত্র; ভাল কথা। পাত্র যদি পাত্রীর পিতার কথায় গিয়া তাহার পাণি গ্রহণ করে তবেই সর্ব্বনাশ! তাহাহইলে নিশ্চয়ই বালিকা বধূ মৃত্যু, শিশুমৃত্যু, বাল বৈধব্য উপস্থিত হয় এবং স্বরাজকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া উক্ত পাত্র নিজেকে; যাহারা এবম্বিধ বিবাহের সংস্রবে থাকেন তাহাদের সকলকে কঠোর দণ্ডার্হ করিয়া তোলেন। ইহা লক্ষ্য করিবেন, আর যদি পাত্রী স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া পাত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার সহিত স্বেচ্ছা বিহারাদির পর তাহাকে পতিত্বে গ্রহণ করে ও পিতার ধর্ম্মবুদ্ধি ও নৈতিক সংস্কারে কুঠারাঘাত করিয়া পিতাকে হতবুদ্ধি করিয়া তোলে তাহাহইলে সেই পতিব্রতা অমনি দেশ উদ্ধার করে, পরম সাধু বীর পুত্র প্রসব করে, সুশিক্ষা ও সুরুচির পরিচয় প্রদান করে এবং বিদূরিত স্বরাজকে গলায় দড়ি দিয়া পুনরায় দেশে টানিয়া আনে। একই বালিকা পিতাকর্তৃক প্রদত্তা হইলে সে সকল দোষে অপরাধিনী হয়; স্বেচ্ছাচার জীবনে সে সকল দোষ তাহাকে স্পর্শ করে না। তখন আর সে মৃত বা অল্পায়ু হয় না কিম্বা তাহার সন্তান সন্ততি ও অল্পায়ু হয় না। এই ভাবে সে সমাধি খাত খননের বৃহৎ কোদালি দ্বারা হিন্দু সমাজের ভিত্তিকে খনন করিতেছে যেন সে একলম্ফে স্বাধীন ও সভ্য জাতির গানিক ধন তন্ত্রে উপনীত হইতে পারে। তাহার নিষ্ফল অসার প্রলাপোক্তির উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিয়াছেন চারুচন্দ্র মিত্র। তিনি তাহার সাক্ষ্যের একাংশ স্বরূপ যে বিভীষিকাময়ী ক্ষুদ্র পুস্তিকা সম্মতি আইনের অনুসন্ধান সমিতির হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন তাহা গোপন করিয়া গোপনকার্য্যে সিদ্ধ হস্ত স্বরাজ ধ্বজীগণ এবিষয়ে বৈদেশিক আমলাতন্ত্রকেও পরাস্ত করিয়া এক অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই সংস্কারকের দলের কোন ব্যক্তি এই জটিল সমস্যা সম্বন্ধে কোন গবেষণা বা চিন্তা করিয়াছে বলিয়া জানি না। সুতরাং তাহার স্বীয় বুদ্ধিকেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার নিদান মনে করিয়া শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র, পণ্ডিত কৃষ্ণ মাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ শেঠ ও অন্যান্য কর্তৃক প্রকাশিত ধারাবাহিক প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে একবারে নির্ব্বাক রহিয়াছেন।

এখন ইহার প্রতিকার কি? আমি বৈদিক সত্যের পুনরাবিষ্কারক ও পুনঃ প্রবর্ত্তক ব্রাহ্মণ ও সনাতন বৈদিক সত্যের উপরই বিশ্বাস স্থাপন করিতেছি। সর্দ্দা আইনের উদার

ও উৎসাহী পাণ্ডা শিমলা ব্যবস্থা-পরিষদ-গৃহের সোপানে দাঁড়াইয়া স্বভাবসিদ্ধ তিরস্কারের ভাষায় আমাকে এই বলিয়া নির্যাতন করিয়াছিল যে; ব্রাহ্মণ তোমরা সুদীর্ঘকাল অত্যাচার করিয়াছ অতএব এস, হয় আমাদের এ কার্য্যে নেতৃত্ব কর অথবা পথ ছাড়িয়া দাও। ইদানীং অহরহ; যে সকল দুর্ব্বাক্য আমাদের কর্ণকে উৎপীড়িত করে আমি তাহার উপযুক্ত প্রত্যুত্তরের উপযুক্ত কাল ও যুক্তির সুযোগ গ্রহণ করিলাম।

সনাতন ধর্ম্মের বিরুদ্ধে এই যে যুদ্ধ ঘোষণা করা হইয়াছে; তাহার উপযোগী বলশালী কার্য্যকরী উত্তর হইবে একমাত্র ব্রাহ্মণ্যের পুনঃ সংস্কার ও পুনর্গঠন। আমার সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, আমি বিমর্ষ ও বন্ধুহীন হইয়া সুদূরপন্থা অতিক্রম করতঃ শঙ্কর ও রামানুজের দেশ, অদ্যাপি নৈষ্ঠিকতার কেন্দ্রভূমি মান্দ্রাজে উপনীত হইয়াছি, দাক্ষিণাত্য বাসিদিগকে এ কথাই জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি—বস্তুতই আমরা কি নেতৃত্ব করিব না পথ ছাড়িয়া দিব? আমি জানি আমার প্রতি এই উত্তর নিক্ষিপ্ত হইবে যে, বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণ অত্যন্ত অধঃপতিত কিন্তু এই অধঃপতিত ব্রাহ্মণ্যেরই কি শেষ অভ্যুত্থান পুনরায় হইতে পারে না? বৈদিক বাত প্রয়োগে কি এই সব অঙ্গার পুনঃ প্রজ্বলিত হইতে পারে না? শাস্ত্রে আমার গভীর বিশ্বাস আছে। আমি মহাভারতের বনপর্ব্বে যখন মার্কণ্ডেয়ের ন্যায় মহর্ষির নিম্নোক্ত উক্তি পাঠ করিয়াছিলাম, তখন আমার মনে হইয়াছিল যেন আমার দেহে দুইটি পক্ষ সংযোজিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

দুর্ব্বেদাবা সুবেদা বা প্রাকৃতাঃ সংস্কৃতা স্তথা
ব্রাহ্মণা নাব মন্তব্যা ভস্মাচ্ছন্না ইবাগ্নয়ঃ।
যথা শ্মশানে দিপ্তৌজাঃ পাবকো নৈবদুষ্যতি
এবং বিদ্বানবিদ্বান্ বা ব্রাহ্মণো দৈবতং মহৎ।

আমি ইতিহাস পাঠও মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছি যে, যদিচ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম অদ্যাপি অধিকাংশ দেশবাসির ধর্ম্ম বটে তত্রাচ উক্ত ধর্ম্ম বহুবার পবন আক্রমণে গতিরোধ করায় ইহার প্রকৃত জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইয়াছে। এই ধর্ম্ম বহু ধর্ম্মমতের যে ঐক্য ও সাম্য দৃষ্ট হয় তাহা যথার্থতঃ এক ধর্ম্ম নহে পরন্তু বিভিন্ন ধর্ম্ম মতের মধ্যে এক শিথিল সন্ধি মাত্র এবং সেই সাম্য নীতিই ইহাকে দুর্ব্বল করিয়াছে এবং সেই জন্য হিন্দু ধর্ম্মের ও হিন্দু সমাজের নামে সর্দ্দা আইনের মত আইন উত্থাপিত ও পরিগৃহীত হওয়া সম্ভব হয়। অতএব অবশ্য ইহাকে পূর্ব্ববৎ শুদ্ধ সবল ও অবিমিশ্র করিতে হইবে। বর্ত্তমানে রাজনৈতিক দাসত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া প্লীহা যকৃৎ যক্ষা প্রভৃতি শিশুরোগ স্ত্রীরোগ, মান্দ্রাজের মন্দির সংঘর্ষ, বঙ্গের উপকূল সংস্কার কল্পনা, বাঙ্গালার কংগ্রেসী সমর প্রভৃতি ভারতের যত কিছু দুর্দ্দৈব সে সকলের জন্যই এ বেচারী ধর্ম্মকে দায়ী করা হয়। বেচারী দাদা ভাই নৌরজীর প্রসিদ্ধ মতবাদ ছিল যে, ভারতের সম্পদ পয়ঃ প্রণালীর জল নিকাশের মত দ্রুত গতিতে বাহিরে চলিয়া যাই-তেছে কিন্তু সনাতন ধর্ম্ম ও রীতি নীতির ফলে ভারতীয় নারীদের দ্রুত নিকাশের যে পয়ঃ প্রণালী বিগত কংগ্রেস সভাপতির ইতিহাস প্রসিদ্ধ অভিভাষণে নবাবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা

নৌরজীর পরঃপ্রণালীকে অতিক্রম করিয়াছে। উক্ত মহানুভব আবিষ্কর্ত্তা সনাতন ধর্ম্ম সমাজ ও রীতি নীতিকে "অসৎ ঘৃণ্য ও পৈশাচিক" প্রভৃতি বিশেষণে আপ্যায়িত করিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্য বাদের পরিপোষক মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। সনাতন ধর্ম্ম ও সমাজ যেন বেওয়ারিশী মাল; কি আগন্তুক কি দেশবাসী এতদুভয়ই ইহার উপর নিঃসংকোচে অপমানের পর অপমানের বোঝা চাপাইতেছে। আমি ইহাতে কিছুমাত্র দুঃখ করি না, কারণ "অসম্মানাৎ তপোবৃদ্ধি" এই অপমানই আমাদিগকে বিশাল কর্ত্তব্যে ও বিরাট স্বার্থত্যাগে প্রণোদিত করিবে। আমাতে আধুনিকত্ব নাই সুতরাং আমার পক্ষে রাজনীতি ক্ষেত্রে যাওয়া ময়ূরপুচ্ছাবৃত কাকের মত হইয়াছিল। পরন্তু যাহাদের গায় অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের ছাপ আছে তাহাদের প্রতি আমার মোটেই সহানুভূতি নাই; যতই উচ্চ স্থানারূঢ় প্রতিষ্ঠান হউক পার্লিয়ামেণ্ট ভারত সচিব বা তদ্রূপ কোন স্থানে প্রতিনিধি প্রেরণের সার্থকতা আমি আদৌ উপলব্ধি করি না। উহা করিতে যাওয়া ও সনাতন ধর্ম্মকে কারারুদ্ধ করা একই কথা। এ বিষয়ে আমাদের সমগ্র শাস্ত্রই তেজস্বিতা প্রকাশ করিয়াছে। আমি মাত্র বুঝি—জাতি, স্বার্থ ও সম্মান রক্ষা আমাদিগের আরাধিত দেবতা ও মুনি ঋষিগণের নিকট আবেদন নিবেদন করা এবং তাহাদের বরলাভের যোগ্যতা অর্জ্জন করা। উপসংহারে আসুন আমরা সত্য প্রতিষ্ঠ হই এবং বেদ বা সত্যোক্তির নিকট এই প্রার্থনা করি যে, আমাদিগকে যেন ব্রাহ্মণোচিত সামর্থ প্রদান করে। চরম পত্রদান ও আতঙ্ক সৃষ্ট সৌহার্দ্দ সূচক ভাবভঙ্গিতে অনুসৃত হওয়া একালের উপযোগী ও অত্যাবশ্যকীয় হইতে পারে বটে, কিন্তু আমি আতমাত্র প্রাচীন পন্থী সুতরাং এ ব্যাপারে ও একজন অপেক্ষাকৃত আধুনিক কর্ত্তৃক প্রাচীন নীতির অনুসরণে লিখিত কবিতারই অনুসরণ প্রয়াসী—

রঘুকুল রীত চির চলি আয়ি
প্রাণযায়ি বড়ু বচন ন যায়ি

সনাতন ধর্ম্ম অর্থ ভোট গড়া সনন্দ প্রাপ্ত স্বাধীনতা নহে; উহা শাশ্বত সত্যে প্রতিষ্ঠিত ও স্বতই স্বাধীন। এই সম্মেলনাতে ইহাই প্রধান প্রশ্ন। ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা—শিষ্যস্তেহহং সাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্। আমি অত্যন্ত সরলভাবে বলছি, আমার মনে হয় পুরাকালে এইরূপ সঙ্কট সময়ে অজ্ঞানান্ধকার দূরকরিবার জন্য নৈমিষারণ্যে জ্ঞানালোক প্রজ্বলিত করণার্থ যে সকল সভা সমিতি হইত এই সম্মিলনী তাহারই অনুরূপ। আমরা সকলেই অল্পাধিক সন্তপ্ত চিত্তে গৃহ হইতে আগমন করিয়াছি এবং আমাদের হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে এই চির প্রসিদ্ধ মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ উত্থিত হইয়াছে—

অস্মাকম্ নষ্ট বুদ্ধিনাম পরিত্রাণ কথম্ ভবেৎ?

কুরুক্ষেত্র ও ইন্দ্রপ্রস্থ।

(লেখক—শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম, এ।

বিগত কার্ত্তিক মাসে দীপান্বিতার পাক্কালে কোনও কার্য্যোপলক্ষে দিল্লী গিয়াছিলাম। সেখানে মাত্র ৩।৪ দিন ছিলাম—কার্য্যাবকাশে সহর ও তৎসমীপস্থ দর্শনীয় স্থানগুলি কিছু কিছু দেখিয়াছিলাম। আবার দিল্লী হইতে কুরুক্ষেত্র তীর্থ দর্শনে গিয়াও কয়েক ঘণ্টা সেখানে কাটাইয়া আসিয়াছি। এই প্রবন্ধে আমার পর্য্যটনবৃত্তান্ত যথাস্মৃতি লিপিবদ্ধ করা হইল।

যদিও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রারম্ভেই ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে বলিয়া কুরুক্ষেত্রের পুণ্যাবহত্ব সূচিত হইয়াছে, এবং হিন্দুর স্নানদান প্রভৃতি প্রায় সমস্ত ক্রিয়াকলাপেই কুরুক্ষেত্রের নাম সর্ব্বাদৌ কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, * তথাপি "কুরুক্ষেত্র" নামটি এখন যুদ্ধক্ষেত্ররূপেই স্মৃত হইয়া থাকে।

কুরুক্ষেত্র যে কেবল কলির প্রারম্ভেই কৌরব পাণ্ডবের যুদ্ধক্ষেত্ররূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিল, এমন নহে—এইক্ষেত্রে—তরৌরি থানেশ্বর ও পাণিপথে বহুবার যুদ্ধ হইয়াছে—তাহাতে হিন্দু পাঠান মোগল মারাঠা অনেক রাজ্যেরই পতন ও পতনের সূত্রপাত হইয়া গিয়াছে।

কুরুক্ষেত্রের পরিমাণ দ্বাদশযোজন—৪৮ ক্রোশ প্রায় ১১০ মাইল। যে স্থানটিকে কুরুক্ষেত্র তীর্থ বলা হয়—তথা হইতে পাণিপথ ৪৫ মাইল আন্দাজ, তরৌরি ১৪ মাইল, এবং থানেশ্বর ১ মাইল—অতএব ঐগুলি কুরুক্ষেত্রের সীমার মধ্যেই অবস্থিত।

দিল্লী জংসন ষ্টেশন হইতে আমি ৬.৪০ মিনিটের সময়ে রওনা হই—১১টায় কুরুক্ষেত্র জংশন ষ্টেসনে পৌঁছি; ঐদিনই সায়ং ৭.২১ মিনিটে চলিয়া দিল্লীতে মধ্যরাত্রিতে ফিরিয়াছিলাম। মাত্র কয়েক ঘণ্টা কুরুক্ষেত্র তীর্থে ছিলাম একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।*

দিল্লী ও কুরুক্ষেত্রের প্রায় মধ্যস্থলে পাণিপথ জংশন ষ্টেশন। ইহারই আশেপাশে তিনবার মহাযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে—১মবার বাবর কর্ত্তৃক ১৫২৬ অব্দে পাঠান-রাজত্ব বিধ্বংস ও মোগল সাম্রাজ্যের পত্তন হয়। দ্বিতীয়বারে ১৫৫৬ অব্দে আকবর কর্ত্তৃক মোগল-সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করা হয়। তৃতীয়বারে ১৭৬১ অব্দে পারস্যরাজ আহমদ শাহ কর্ত্তৃক মহারাষ্ট্র-শক্তির মূলোচ্ছেদ হয়—ইহাতেই হিন্দু-সাম্রাজ্য পুনঃ স্থাপনের সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয়—এবং উদীয়মান ব্রিটিশদের ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের পথ পরিষ্কৃত হয়। এই ষ্টেশন

* কুরুক্ষেত্র গয়া গঙ্গা প্রভাস পুষ্করাণি চ।
তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি স্নান (বা দান) কালে ভবন্তিহ॥

দিল্লী হইতে কুরুক্ষেত্র ৯৮ মাইল আন্দাজ—ভাড়া তৃতীয় শ্রেণী ১৷৷০ হইবে।

হইতে ৪ মাইল উত্তরে—বাবরপুর একটি ক্ষুদ্র ষ্টেশন—ইহাতে প্রথম মোগলরাজ বাবরের স্মৃতি জাগরূক রহিয়াছে। আরও ২৬ মাইল গিয়া তরৌরি * ষ্টেশন পাওয়া গেল—ইহার আধ মাইল আন্দাজ উত্তরপশ্চিমে একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়—তবে প্রাচীর তেমন পুরাতন বোধ হইল না—সম্ভবতঃ ইদানীন্তনকালে প্রাচীরের সংস্কার হইয়া থাকিবে। এই তরৌরিতেই পৃথ্বীরাজ ঘোরের মহম্মদকে ১১৯১ ইংরাজীতে পরাস্ত করিয়াছিলেন। তরৌরি হইতে কুরুক্ষেত্র জংশন ১৩ মাইল—এবং ষ্টেশনের মাইল দেড়েক দূরেই থানেশ্বর সহর। ঘোরের মহম্মদের সহিত পৃথ্বীরাজের দ্বিতীয়বার ১১৯৩ ইং অব্দে যে যুদ্ধ হয়—তাহা থানেশ্বরের যুদ্ধ বলিয়াই ইতিহাসে পড়িয়াছি—তবে যুদ্ধটা সম্ভবতঃ তরৌরি ও থানেশ্বরের মাঝামাঝি স্থানেই হইয়াছিল—কেননা কেহ কেহ ইহাকে 'তিরাওরি' 'তিরৌরি যুদ্ধ' বলিয়াই সংজ্ঞিত করিয়াছেন। সে যাহা হউক—এই তরৌরি বা থানেশ্বরেই মোসলমান রাজত্বের পত্তন হইয়াছিল—এবং হিন্দুস্থানে হিন্দুর স্বাধীনতা লোপের সূত্রপাত হয়।

কুরুক্ষেত্র জংশন ষ্টেশনে অবতরণ পূর্ব্বক ষ্টেশনের বাহিরে যাইবামাত্রই এক কুরুক্ষেত্র ব্যাপার আরম্ভ হয়—পাণ্ডারা আসিয়া আক্রমণ করেন—এবং নাম, ধাম ইত্যাদি ভূয়োভূয়ঃ জিজ্ঞাসা করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলেন। এই আক্রমণের একমাত্র প্রতিষেধক ব্রহ্মাস্ত্র—একজন পাণ্ডার নাম বলিয়া ফেলা—অথবা উপস্থিত পাণ্ডাদের একজনকে সত্বর স্বীকার করিয়া উহার শরণ গ্রহণ করা। প্রথমটি পুরাতন যাত্রীরাই করে—তবে আমি নূতন হইলেও দিল্লী হইতেই "ঠাকুরপ্রসাদ কৃপারাম" নামটি শিখিয়া আসিয়াছিলাম—তাই বেশী ব্যতিব্যস্ত হই নাই। কিন্তু একটু অসুবিধাও ভোগ করিতে হইয়াছিল; দুর্ভাগ্যবশতঃ ঠাকুরপ্রসাদ বা তাঁহার কেহ ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন না—তাই আমাকে অসহায় অবস্থায় তীর্থস্থান খুঁজিয়া বাহির করিতে হইয়াছিল।

মাইল খানিক গিয়াই একটি প্রকাণ্ড জলাশয় পাওয়া যায়—ইহাকে পাণ্ডারা সমন্তপঞ্চক ও দ্বৈপায়ন হ্রদ বলিয়া থাকেন। যাত্রিগণ প্রথমতঃ সেইখানেই স্নান তর্পণ এবং তীর্থপ্রাপ্তি নিমিত্ত পারণ—অর্থাৎ তদনুরূপ দানাদি করিয়া থাকে। এই জলাশয়ের তীরে উত্তরপশ্চিমভাগে দুই একটি সামান্য দেবমন্দির আছে—তবে সন্নিকটেই একটি ক্ষুদ্র টিলার উপরে একটি সুন্দর দেবালয় রহিয়াছে—দৃশ্য বেশ মনোরম।

এই সরোবরের কোণে একটি স্মৃতিস্তম্ভ রহিয়াছে—পাঞ্জাবের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর ম্যাক্‌ লাগেন সাহেব এই তীর্থ দর্শনে আসিয়া ব্রাহ্মণদিগকে কিঞ্চিৎ অর্থদান করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাই স্তম্ভের গাত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের উদ্‌যোগে এই স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছে। বলা আবশ্যক যে, মহামণ্ডল কুরুক্ষেত্র তীর্থ সংস্কারে হস্তার্পণ করিয়াছেন—এ বিষয়ে কিছু কিছু কাজও হইয়াছে বলিয়া জানিয়াছি।

* আমরা ইতিহাসে ইহা "তিরোওরি" পড়িয়াছি। স্থানীয় লোকে তরৌরিই বলিয়া থাকে। ষ্টেশনের নামও তরৌরিই লিখিত হইয়াছে।

এস্থান হইতে পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে অল্পদূর গিয়াই একটি বৃহত্তর জলাশয় পাওয়া যায়—খুব প্রকাণ্ডই বটে। পাণ্ডারা ইহার নাম বলেন "কুরুক্ষেত্র"। যাত্রিগণ এখানে আসিয়া কুরুক্ষেত্র স্নান করিয়া থাকে—এবং ইহার উত্তর তীরে—এবং গর্ভেস্থিত নানা দেবমন্দির দর্শন করিয়া থাকে। উত্তর তীর হইতে একটি পাকা সেতু দিয়া জলাশয়ের গর্ভস্থিত মন্দিরে যাইতে হয়। তন্মধ্যে যুধিষ্ঠিরাদি মহাভারতের নায়কগণের মূর্ত্তি রহিয়াছে—অবশ্য এগুলি অধুনাতন কালে নির্ম্মিত হইয়াছে। তীরে সেই গবর্ণরের পরিদর্শন স্মৃতির আর একটি স্তম্ভ দেখিলাম—ঐ একই কথা। এখানে সরোবরের এই উত্তর তীরে একটি গীতা-ভবন লাইব্রেরী সহ নির্ম্মিত হইয়াছে * তাহাতে এক প্রকোষ্ঠে নারায়ণের মূর্ত্তিসহ একজন আধুনিক ভূপতির দণ্ডায়মান মূর্ত্তি রহিয়াছে—বোধহয় ইনিই এ ব্যাপারের খরচ পত্র দিয়াছেন। লাইব্রেরী এখনও বড় হয় নাই। একজন কর্ম্মচারী এখানে থাকেন। পার্শ্বে সুন্দর ফুল বাগান করা হইয়াছে—তাহাতে স্থানটির সৌষ্ঠব বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই প্রকাণ্ড হ্রদের পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে দৃষদ্বতী নদীর খাত আছে বলিয়া পাণ্ডা নির্দ্দেশ করিলেন তবে ইহা এখন শুষ্ক—বর্ষায় কিছুটা জল হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রথমে দৃষ্ট জলাশয়টীকে পাণ্ডারা দ্বৈপায়ন হ্রদও বলেন সমন্ত পঞ্চকও বলেন। কিন্তু দ্বৈপায়ন হ্রদ ও সমন্ত পঞ্চক একই জিনিস নহে। সমন্ত পঞ্চক পাঁচটি সরোবরের সমষ্টি—ঐ গুলি একই স্থানে ছিল—কি কুরুক্ষেত্রের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে (সীমান্তলে) ছিল তাহা ঠিক বলা যায় না। * তবে এই গুলি যে পরশুরাম কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল—যাহাতে নিহত ক্ষত্রিয়দের সঞ্চিত শোণিত দ্বারা তিনি পিতৃলোকের তর্পণ করিয়াছিলেন—ইহা পুরাণে বর্ণিত রহিয়াছে। *

---

* কোথায় যেন দেখিয়াছি যে শ্রীভগবান্ যেখানে অর্জুনকে গীতার উপদেশ দিয়াছিলেন সেই স্থানেই গীতাভবন নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা নিতান্ত ভুল; "সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে" একটা বৃহৎ জলাশয় ছিল এটা হইতেই পারে না। যুদ্ধক্ষেত্র ইহার পশ্চিমদিকে ছিল—কুরুক্ষেত্রের পশ্চার্দ্ধে কুরুসৈন্য পশ্চিমাভিমুখে ছিল—তৎসম্মুখে অর্থাৎ আরও পশ্চিমে পাণ্ডব সৈন্য অবস্থিত ছিল। অতএব এই জলাশয়ের পশ্চিমে যুদ্ধক্ষেত্র ছিল—এবং "সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে" জায়গাটা সুবহু দূরে—(ঐ) পশ্চিমদিকে ছিল। ধার্ত্তরাষ্ট্রাবহাবলা কুরুক্ষেত্রস্য পশ্চার্দ্ধে ব্যবতিষ্ঠন্ত দংশিতাঃ (উদ্যোগ পর্ব্ব ১৯৭ অধ্যায়) ততস্তীর্থা কুরুক্ষেত্রং পাণ্ডবাঃ সহ সোমকাঃ কৌরবান্ সমবর্ত্তন্ত, অভিগ্রচ দুর্দ্ধর্ষাং ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য বাহিনীং প্রাঙ্মুখাঃ পশ্চিমে ভাগে ন্যবিশন্ত সসৈনিকাঃ। ইত্যাদি (ভীষ্মপর্ব্ব ১ম অধ্যায়)।

* সমন্তপঞ্চকের এক ব্যুৎপত্তি এই—সম্ সমক্ অর্থাৎ সমবেতানাং ক্ষত্রিয়ানাং অন্তঃ বিনাশঃ যত্র সমন্তাঃ হ্রদাঃ তেষাং পঞ্চ যস্মিন্। আর ব্যুৎপত্তিঃ সমন্তাঃ সীমানঃ তত্র পঞ্চকং রুধিরকৃত হ্রদ পঞ্চকং যত্র।

* ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ পৃথিবীং কৃত্বা নিঃক্ষত্রিয়াং প্রভুঃ।

সে যাহা হউক, সমন্তপঞ্চক ও দ্বৈপায়ন হ্রদ যে এক ও অভিন্ন নহে, তাহার প্রমাণ মহাভারতে রহিয়াছে। প্রারম্ভেই অনুক্রমণিকা পর্ব্বাধ্যায়ে আছে—সৌতি বলিতেছেন—

"সমন্ত পঞ্চকং নাম পুণ্যং দ্বিজ নিষেবিতম্।
গতবানস্মি তং দেশং যুদ্ধং যত্রা ভবৎ পুরা।
কুরূণাং পাণ্ডবানাঞ্চ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্॥

ঐ যুদ্ধস্থল হইতে দুর্য্যোধন পূর্ব্বাভিমুখে গিয়া দ্বৈপায়ন হ্রদে প্রবেশ করিয়াছিলেন—

"হতং স্বজন মুৎসৃজ্য প্রাঙ্মুখঃ প্রাদ্রবদ্রণাৎ
একাদশচমূভর্ত্তা পুত্রো দুর্য্যোধনস্তব।
গদামাদায় তেজস্বী পদাতিঃ প্রস্থিতো হ্রদম্।

(শল্যপর্ব্ব হ্রদপ্রবেশপর্ব্ব—২৯ অধ্যায়)

এই হ্রদই যে দ্বৈপায়ন হ্রদ, তাহা পরবর্ত্তী অধ্যায় হইতেই অবগত হওয়া যায়,

"দ্বৈপায়নং হ্রদং খ্যাতং তত্র দুর্য্যোধনোঽভবৎ।"

আর দ্বৈপায়ন হ্রদ যে সমন্তপঞ্চক নহে তদ্বিষয়ে আরো স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। গদা-যুদ্ধের প্রাক্‌কালে দ্বৈপায়ন হ্রদতীরে সমাগত বলরাম যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন, (শল্যপর্ব্ব ৫৫ অধ্যায়)—

ততো যুধিষ্ঠিরং রামো বাক্য মেতদুবাচ হ।
... ...
কুরুক্ষেত্রং পরং পুণ্যং পাবনং স্বর্গ্যমেবচ।
... ...
তত্র বৈ যোৎস্যমানা যে দেহং ত্যজন্তি মানবাঃ।
তেষাং স্বর্গে ধ্রুবো বাসঃ শক্রেণ সহ মারিষ॥
তস্মাৎ সমন্ত পঞ্চকমিতো যাম দ্রুতং নৃপ।
... ...
তথেত্যুক্ত্বা মহারাজ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
সমন্ত পঞ্চকং বীরঃ প্রায়াদভি মুখঃ প্রভুঃ॥
... ...
ততস্তেতু কুরুক্ষেত্রং প্রাপ্তা নরবরোত্তমাঃ।
প্রতীচ্যাভিমুখং দেশং যথোদ্দিষ্টং সুতেন তে॥
গত্বাতু তৈঃ পরিক্ষিপ্তঃ সমন্তাৎ সর্ব্বতো দিশঃ॥

সমন্ত পঞ্চকে পঞ্চ কৃতবান্ রুধিরৈ হ্রদান্।
স তেষু তর্পয়ামাস পিতৃন্ ভৃগুকুলোদ্বহঃ॥

শব্দকল্পদ্রুম ধৃত পদ্মপুরাণ ভূমিখণ্ড ১২৪ অধ্যায়।

দক্ষিণেন সরস্বত্যাঃ স্বয়নং তীর্থমুত্তমম্ ॥
তস্মিন্ দেশে ত্বনিরিণে তে তু যুদ্ধ মরোচয়ন্॥
[স্বয়নং সুগতিদম্, অনিরিণে অনুষরে]

অতএব দেখা গেল—দ্বৈপায়ন হ্রদ ও সমন্তপঞ্চক এক নহে; অপিতু কুরুক্ষেত্র ও সমন্তপঞ্চক যেন একই স্থান বলিয়া প্রতীত হয়। সমন্তপঞ্চককে পূর্ব্বোক্ত মহাভারতের শ্লোকে "দেশ" বলা হইয়াছে—এবং সেখানে 'কুরুক্ষেত্র' শব্দের পৃথক্ উল্লেখ না থাকায় ইহাই অনুমিত হয়—সমন্তপঞ্চকই কুরুক্ষেত্র।

আবার কুরুক্ষেত্রের বিস্তৃতি দ্বাদশ যোজন—তন্মধ্যে পাণিপথও অবস্থিত একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই উভয়ের সঙ্গতির নিমিত্ত এই বলা যাইতে পারে যে, আসল কুরুক্ষেত্র 'সমন্তপঞ্চক যেখানে, তাহাই আর তাহা হইতে দ্বাদশ যোজন উহার এলাকা; যেমন 'কামরূপ'—কামাখ্যাধ্যুষিত স্থানটিই বটে, তবে

"করতোয়াং সমারভ্য যাবদ্দিকরবাসিনী।
দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রস্য লাক্ষায়াঃ সঙ্গমাবধি ॥"

ইহা কামরূপের এলাকা—আধ্যাত্মিক সীমা। সেইরূপ বৃন্দাবন আসলটি যমুনার তীরবর্ত্তী স্থল হইলেও উহার পরিভ্রমণে চতুরশীতি ক্রোশ ঘুরিয়া আসিতে হয়।

আমার মনে হয় যে প্রকাণ্ড জলাশয়টীকে 'কুরুক্ষেত্র' বলা হয়—ইহাকে সমন্ত পঞ্চক' বলিয়া খ্যাপিত করিলেই ঠিক্ হইত; সমন্তপঞ্চক হ্রদও বটে - হ্রদবিশিষ্ট দেশও বটে; দেশার্থে কুরুক্ষেত্র ও সমন্তপঞ্চক একার্থ বলিয়াই সম্ভবতঃ হ্রদেও কুরুক্ষেত্র নাম প্রযোজিত হইয়া পড়িয়াছে—আর কালক্রমে 'সমন্তপঞ্চক' নামটী ভ্রমবশতঃ "দ্বৈপায়নে" প্রযুক্ত হইয়া গিয়াছে।

কুরুক্ষেত্র দর্শনের পর যাত্রিগণ থানেশ্বর সহর হইয়া উত্তর দিকে সরস্বতী নদী, এবং স্থানীয় পীঠাধিষ্ঠাতা মহাদেব ও দেবী দর্শন করিয়া থাকেন। থানেশ্বরের সংস্কৃত নাম স্থাণ্বীশ্বর স্থাণু ঈশ্বর। তন্ত্র চূড়ামণি মতে—

"কুরুক্ষেত্রে চ গুল্ফতঃ স্থাণুর্নামাচ সাবিত্রী দেবতা -

অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রে দেবীর 'গুল্ফ' হইতে পীঠ হইয়াছে—ভৈরব স্থাণু এবং দেবী সাবিত্রী। পাণ্ডারা দেবীর নাম "ব্রজে কাত্যায়নী" বলিয়া থাকেন; কাত্যায়নী অর্থাৎ কালীমাতার একটি মূর্ত্তিও প্রতিষ্ঠিতা আছেন। তবে ভৈরবের নাম স্থানের নামের সঙ্গে অনুস্যূত বলিয়া স্থাণুই বলেন। এই ভৈরব ভৈরবীর অন্য নামও আছে। যথা অন্নদামঙ্গলে—

কুরুক্ষেত্রে ডানি পার গুল্ফ অনুভব।
বিমলা তাহাতে দেবী সম্বর্ত্ত ভৈরব ॥

নামান্তরের নজীর বহু আছে—কামাখ্যার উমানন্দের নামান্তর রাবানন্দ; জয়ন্তী দেবীর ভৈরব 'ক্রমদীশ্বর'—'রূপনাথ' নামে পরিচিত। শ্রীহট্টের পীঠাধিষ্ঠাতা সর্ব্বানন্দ ও সম্বরানন্দ

নামে কচিৎ অভিহিত। তবে দেবীর নামাস্তরা বড় দেখা যায় না—কিন্তু এই দেবীর আরও এক নাম আছে "সবরী"। দেব ও দেবী ঠিকই আছেন—তবে একই শিবশক্তি যেমন ভিন্ন ভিন্ন পীঠে ভিন্ন ভিন্ন নামে সংজ্ঞিত হইয়াছেন—আবার একই স্থানে দেবদেবী ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হইবেন আশ্চর্য্য কি? এঁরা বহুরূপীর জাত এঁদের লীলারও অন্ত নাই—নামেরও অন্ত নাই।

সরস্বতী এখানে একটি খালের আকার ধারণ করিয়াছেন—বর্ষাকালে জল থাকে কিন্তু এখন শুষ্কপ্রায়—একটি স্থানে কর্দ্দমাক্ত জল পাইয়া শিরোধার্য্য করিয়া কৃতার্থ হইলাম। সরস্বতীর দক্ষিণে কুরুক্ষেত্র, পূর্ব্বেই (শল্য পর্ব্ব হইতে উদ্ধৃতাংশে) বলা হইয়াছে। আর হর্ষ-চরিতেও আছে, হর্ষবর্দ্ধনের মাতা স্বামীর অন্তিম সময় উপস্থিত দেখিয়া বৈধব্য পরিহারার্থ সরস্বতী তীরে অগ্নি প্রবেশ করেন। থানেশ্বর হর্ষের পৈতৃক রাজধানী * অতএব নানা কারণে ইনি যে প্রকৃতই সরস্বতী নদী ইহাতে সংশয়ের অবসর নাই। তবে পাণ্ডারা যে 'কুরুক্ষেত্র' সরোবরের পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে দৃষদ্বতীর খাত নির্দ্দেশ করেন—এ বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহের কারণ রহিয়াছে।

মহাভারত বনপর্ব্ব-তীর্থযাত্রা পর্ব্বে (৮৩ অধ্যায়) কুরুক্ষেত্রের সংস্থান নির্দ্দেশ আছে

"দক্ষিণেন সরস্বত্যা উত্তরেণ দৃষদ্বতীম্।"

উত্তরে সরস্বতী দেখান হইল—দক্ষিণে দৃষদ্বতীও তাই দেখান চাই—তাই বোধ হয় ঐরূপ নির্দ্দেশ করা হয়। ফলতঃ যে কুরুক্ষেত্রে অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী যুদ্ধার্থ সমবেত হইয়াছিল † তাহার দক্ষিণ সীমা—উত্তরপ্রান্তের এত নিকটে সরস্বতী হইতে ৩।৪ মাইল মাত্র দক্ষিণে হইবে—বিশ্বাস হয় না। আবার

* হর্ষ কান্যকুব্জে রাজধানী পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। কান্যকুব্জ তাঁহার ভগিনীপতির রাজধানী ছিল—তিনি শত্রু কর্ত্তৃক নিহত হইলে, বোধ হয় ভগিনীর অনুরোধেই হর্ষ পৈতৃক রাজধানী ছাড়িয়া কান্যকুব্জে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। হর্ষ-চরিতে আছে পতির নিধনান্তে হর্ষ ভগিনী রাজ্যশ্রী কারারুদ্ধা হন—কথমপি মুক্ত হইয়া অরণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক পতির অনুমৃতা হইবার নিমিত্ত চিতা সজ্জা করিলে একজন বৌদ্ধযতির মুখে হর্ষ ভগিনীর সন্ধান লাভ করিয়া তাঁহাকে আত্মবিনাশ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করেন। রাজ্যশ্রী বৌদ্ধ-ধর্ম্মানুরাগিণী হইয়া পড়েন; স্নেহশীল ভ্রাতা হর্ষবর্দ্ধনও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। স্থান্বীশ্বর মহাদেব (বা কুরুক্ষেত্রের পুণ্যতীর্থ) তাঁহার নিকট তেমন আকর্ষণের বিষয় রহিলেন না; বিশেষতঃ মাতাপিতার যুগপদ্ বিয়োগের পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধনও শত্রুহস্তে বিনষ্ট হইলেন—তাই পৈত্রিক রাজধানীতেও তাঁহার বিরাগ জন্মিল। এসব কারণ সমস্তায়েই তিনি ইহা পরিত্যাগ করিয়া থাকিবেন, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

† একপক্ষের—দুর্য্যোধনের—"পঞ্চযোজন মুৎসৃজ্য মণ্ডলং ভরতর্ষভ—সেনানিবেশাঃ" ইত্যাদি। (উদ্যোগ পর্ব্ব ১৯৭ অধ্যায়) নীলকণ্ঠ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—উৎসৃজ্য উৎকর্ষেণ সৃষ্ট্বা পঞ্চযোজনং বর্ত্তুলং পরিধিং কৃত্বেত্যর্থঃ সেনানিবেশাঃ শিবিরাঃ ইত্যাদি। ৫ যোজন অর্থাৎ প্রায় ৪৫ মাইল ছিল বৃত্তাকার সেনাবাসের পরিধি—ব্যাস ও সুতরাং ১৪ মাইল অন্ততঃ ছিল।

সরস্বতী দৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোরনন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে ॥
মনু ২।১৭ ॥

ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশটাও কি প্রস্থে মাত্র ৩৪ মাইল? কুরুক্ষেত্রের পাণ্ডাগণ থানেশ্বরে থাকেন ইতিহাসবিশ্রুত এই সহরের অবস্থা এখন অতীব শোচনীয়—যাহা পূর্ব্বে পরাক্রান্ত ভূপতিগণের হর্ম্ম্যাদি শোভিত রাজধানী ছিল—তাহা এখন প্রাসাদাদির ভগ্নাবশেষের শোকাবহ স্মৃতি বহন করিয়া কথমপি দাঁড়াইয়া আছে—তাহাও বোধহয় প্রধানতঃ কুরুক্ষেত্রের যাত্রিগণের কল্যাণে। পাণ্ডারা যাত্রীদের প্রতি সদ্ব্যবহারই করিয়া থাকেন এবং যৎসামান্য দান দক্ষিণায়ই পরিতুষ্ট। এখানকার টাঙ্গাও বেশ সস্তা—টাকা পাঁচসিকা দিলেই সমস্ত স্থান পরিভ্রমণ করিতে পারা যায়।

এখন ইন্দ্রপ্রস্থের কথা। 'ইন্দ্রপ্রস্থ' শব্দে প্রাচীন নূতন—দিল্লুরাজের, পৃথ্বীরাজের কুতুব-উদ্দীনের, শাহজাহানের ইদানীং লর্ড হার্ডিঞ্জের—পত্তন এই সমগ্র দিল্লী নগরকেই বুঝায়। অর্থাৎ ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির যে স্থানে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন—তিন হাজার বৎসর পরে—সেই স্থানেরই এক ভাগে রাজা দিল্লু—নগর স্থাপনপূর্ব্বক দিল্লী নাম প্রদান করেন। পৃথ্বীরাজের ও কুতুবউদ্দীনের প্রাসাদাদি যে স্থানে ভগ্নশেষ অবস্থায় দেখা যায়—তাহা আধুনিক দিল্লীসহর হইতে ১১ মাইল দূরে হইলেও, ইন্দ্রপ্রস্থেরই একাংশ—শাহজাহান যেস্থানে সুরম্য হর্ম্ম্যাদি নির্ম্মাণ করিয়া "শাহজাহানাবাদ" প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন—যমুনার তীরবর্ত্তী সেই স্থানও ইন্দ্রপ্রস্থ নগরীর উপকণ্ঠবর্ত্তী—এবং ইংরেজরাজ যে স্থানে নোয়া দিল্লী নির্ম্মাণ করিতেছেন—তাহা ইন্দ্রপ্রস্থেরই মধ্যবর্ত্তী। ইহাই সুচিরপ্রচলিত জনবাদ—এবং নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ।*

কেহ কেহ মনে করেন—এই দিল্লীতেই প্রাচীন হস্তিনাপুর রাজধানী ছিল—অন্ততঃ দুইজন ঐতিহাসিকম্মন্য কর্ত্তৃক লিখিত একখান স্কুলপাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিবৃত্তে ইহাই লিখিত হইয়াছে। ইহা কতটা বিচারসহ, দেখা যাউক। মহাভারত আদিপর্ব্বে ১২৮ অধ্যায়ে আছে, দুর্য্যোধন অমিতবলশালী ভীমসেনকে সংহার করিবার জন্য তাঁহাকে বিষপানে অচেতন করাইয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দিতে সংকল্প করিয়া পাণ্ডবদিগকে আমন্ত্রণ করিতেছেন—

"গঙ্গায়াঞ্চ বামুষাস্যাম উদ্যানবন শোভিতম্।
সহিতা ভ্রাতরঃ সর্ব্বে জলক্রীড়া মবাপ্নুমঃ॥

অতএব দেখা যাইতেছে যে হস্তিনাপুরের সন্নিকটেই গঙ্গানদী—যাহার তীরে কুরুরাজগণের 'উদ্যানবন' যেখানে গিয়া তাঁহারা জলক্রীড়া করিতেন। যদি বর্ত্তমান দিল্লীতে বা তৎসন্নিকটে 'হস্তিনাপুর' ছিল, এরূপ কল্পনা করা যায়—তবে কুরুরাজকুমারগণ 'গঙ্গায়'

* 'নোয়া দিল্লী' নির্ম্মাণ আরম্ভ হইবার প্রায় সমকালেই দিল্লী হইতে একখানি ইংরেজি সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয় নাম ছিল "ইন্দ্রপ্রস্থ"। অধুনা বিলুপ্ত হইয়াছে।

না গিয়া যমুনায় যাইতেন। ফলতঃ হস্তিনাপুর গঙ্গার সন্নিকট ছিল—এবং প্রবাদ এই যে ইহা কালক্রমে গঙ্গাপ্রবাহে বিলীন হইয়া গিয়াছে—ধ্বংসাবশেষও আর দেখা যায় না।

বিবাহান্তে যখন পাণ্ডবগণ হস্তিনাপুরে ফিরিয়া আসিলেন—তখন ধৃতরাষ্ট্র—ভবিষ্যতে যাহাতে দুর্য্যোধনাদির সহিত বিবাদ-বিসম্বাদ না হয় সেজন্য—যুধিষ্ঠিরকে অর্দ্ধরাজ্য দিয়া বলিলেন—তোমরা খাণ্ডবপ্রস্থে যাও—"অর্দ্ধং রাজ্যস্য সংপ্রাপ্য খাণ্ডবপ্রস্থ মাবিশঃ।" আদিপর্ব্ব ২০৭ অধ্যায়। যুধিষ্ঠির তাহাতে সম্মত হইয়া শ্রীকৃষ্ণসমাভিব্যাহারে অরণ্যময় সেই খাণ্ডবপ্রস্থে চলিয়া গেলেন।

"প্রতস্থিরে ততো ঘোরং বনং তন্মনুজর্ষভাঃ

... ...

মণ্ডয়াঞ্চ ক্রিয়ে তদ্বৈ পরং স্বর্গবদচ্যুতাঃ।"

ইহা যে যমুনার নিকটবর্ত্তী স্থান ছিল—তাহার প্রমাণও পাইতেছি।

একদা উন্দ্রপ্রস্থে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন—অর্জ্জুন বলিতেছেন—

"উষ্ণানিকৃষ্ণ বর্ত্তন্তে গচ্ছাবো যমুনাং প্রতি, সুহৃজ্জন বৃতৌ তত্র বিহৃত্য মধুসূদন, সায়াহ্নে পুনরেষ্যাবো রোচতাং তে জনার্দ্দন॥

(আদি পর্ব—খাণ্ডবদাহ পর্ব্ব—২২২ অধ্যায়

অতএব দেখা যাইতেছে যে যমুনা ইন্দ্রপ্রস্থের নিকটেই ছিল—কেননা সঙ্গে দ্রৌপদী সুভদ্রাদিও গিয়াছিলেন এবং তদ্দিনেই সায়াহ্নে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন অথচ ঐ স্থানে গিয়া পানাহারাদিও প্রচুর করিয়াছিলেন। গৃহাদির কথা ও অবস্থা ইহাতে বোধ হয় যমুনাতীরে পাণ্ডবদের আরাম বাটিকা ছিল সুতরাং রাজধানীর উপকণ্ঠেই তাহা থাকিবার কথা।

ইন্দ্রপ্রস্থ যে দিল্লী, তাহার আমরা প্রমাণ পাই সভাপর্বে বর্ণিত দিগ্বিজয় ব্যাপারে। ভীমসেন পূর্ব্বদিকে চলিয়া 'পাঞ্চাল' জয় করিল * এই পাঞ্চালই পরে কান্যকুব্জরাজ্যে পরিণত হয়। সহদেব দক্ষিণদিকে গিয়াই প্রথমতঃ 'শূরসেন দেশবাসীদের জয় করেন + এক্ষণে যে স্থানে মথুরা—তাহাই প্রাচীন 'শূরসেন'। নকুল পশ্চিমদেশ বিজয়ে বাহির হইয়াই 'রোহিতক' আক্রমণ করেন আজও রোহটক' দিল্লীর অনতিদূরে পশ্চিমদিকে বর্ত্তমান * *

* এতস্মিন্নেব কালেতু ভীমসেনোপি বীর্য্যবান্
ধর্ম্মরাজ মনুজ্ঞাপ্য যযৌ প্রাচীং দিশং প্রতি। ১
মহতা বলচক্রেণ পররাষ্ট্রাবমার্দ্দিনা।
হস্ত্যশ্ব রথপূর্ণেন দংশিতেন প্রতাপবান্॥ ২
বৃতো ভরতশার্দ্দূলো দ্বিষচ্ছোক বিবর্দ্ধনঃ।
স গত্বা নরশার্দ্দূলঃ পাঞ্চালানাং পুরং মহৎ॥ ৩

সভাপর্ব্ব ২৯ অধ্যায়।

* * উত্তরদিগ্‌বিজয়ী অর্জ্জুনের পথ একটু বাঁকিয়া গিয়াছিল। সংলগ্ন উত্তরে দুর্য্যোধনদের রাজ্য ছিল—তাহা এড়াইয়া অর্জ্জুন উত্তরপূর্ব্ব পথে চলিয়া কলিন্দাদি নানা পার্ব্বত্য জাতীয়দের দেশজয় করিতে করিতে হিমালয়ের পাদদেশ দিয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষে উপস্থিত হন—তথা হইতে হিমালয়ের ভিতরের ও বাহিরের সমস্ত দেশ জয় করিয়া উত্তরকুরু পর্য্যন্ত গিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন। সভা—২৬ ২৮ অধ্যায়।

ইন্দ্রপ্রস্থের আয়তন কত বৃহৎ ছিল -তাহাও অনুমানতঃ বুঝিতে হইবে। কেননা ইন্দ্রপ্রস্থে-"রম্যাশ্চ বিবিধা স্তত্র পুষ্করিণ্যো বনাবৃতাঃ। তড়াগানি চ রম্যাণি বৃহন্তি সুবহূনি চ॥" আদি—২০৭ অঃ

তা ছাড়া -"উদ্যানানি চ রম্যাণি নগরস্য সমন্ততঃ" থাকায় ইহা যে বহু বিস্তৃত ছিল, তাহাই সূচিত হইতেছে।

নগরের বিশালত্বসূচক আরো দুইটি কথা বলা যাইতে পারে। ময়দানব-নির্ম্মিত সভাটির পরিসর ছিল দশ হাজার কিষ্কু।প্রত্যেক দিকে—* অর্থাৎ ১০,০০০ ০০০ দশ কোটি বর্গহস্ত প্রায় ৮ বর্গ মাইল। যে ইন্দ্রপ্রস্থ মধ্যে এত বড় একটার সমাবেশ ছিল—তাহা কত বড়। অপিচ রাজসূয়ে তদানীন্তন ভারতবর্ষের রাজগণের সকলেরই শুভাগমন হইয়াছিল—এবং প্রত্যেককেই "দীর্ঘিকা বৃক্ষশোভিতান্ আবাসাগ্র্যান্ (সভা—৩৪ অঃ) প্রদান করা হইয়াছিল।

তখন দিল্লীর বিস্তৃতি নূতন পুরাণ সব নিয়া—কুতুব হইতে যমুনা পর্য্যন্ত ধরিয়া—৫০

---

† ততৈব সহদেবোপি ধর্ম্মরাজেন পূজিতঃ।
মহত্যা সেনয়া রাজন প্রযযৌ দক্ষিণাং দিশম্॥ ১
স শূরসেনান্ কার্ৎস্নোন পূর্ব্বমেবাজয়ৎ প্রভুঃ।
... ... ॥ ২

সভা—৩১ অধ্যায়।

নকুলস্য তুবক্ষ্যামি কর্ম্মাণি বিজয়ং তথা।
বাসুদেবজিতা মাশাং যথাসাবজয়ৎ প্রভুঃ॥ ১
নির্য্যায় খাণ্ডবপ্রস্থাৎ প্রতীচী মভিতো দিশম্।
উদ্দিশ্য মতিমান্ প্রায়ান্মহত্যা সেনয়া সহ॥ ২
সিংহনাদেন মহতা যোধানাং গর্জ্জিতেন চ।
রথনেমি নিনাদৈশ্চ কম্পয়ন বসুধামিমাম্॥ ৩
ততো বহুধনং রম্যং গবাঢ্যং ধনধান্যবৎ।
কার্ত্তিকেয়স্য দয়িতং রোহীতক মুপাদ্রবৎ॥ ৪

সভা—৩২ অধ্যায়

দশকিষ্কু সহস্রাং তাং মাপয়ামাস সর্ব্বতঃ (সভা—১ অঃ)
কিষ্কুঃ হস্তঃ সর্ব্বতঃ চতুর্দ্দিক্ষু (নীলকণ্ঠ)

বর্গ মাইল আন্দাজ হইবে—ইহার সমগ্রটা যুড়িয়াই উপবনাদি সহ ইন্দ্রপ্রস্থ নগর অবস্থিত ছিল—এরূপ অনুমান অসঙ্গত হইবে না।

সেই ইন্দ্রপ্রস্থের যুধিষ্ঠিরের রাজধানীর আজ কোনও চিহ্নই নাই। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বিজয় লাভের পর পাণ্ডবেরা হস্তিনাপুরেই গিয়া বাস করিয়াছিলেন * তাই ইন্দ্রপ্রস্থ সেই সময় হইতেই ক্রমশঃ হতগৌরব ও লুপ্তশ্রী হইয়া পড়িতেছিল—৫০০০ বৎসর পরে তার চিহ্ন খুজিয়া পাওয়া সুতরাং অপ্রত্যাশিত।

তথাপি 'ইন্দ্রপ্রস্থ' বলিয়া নির্দ্দেশিত স্থানটি দেখিতে গিয়াছিলাম। একটু ঘুরিয়া ইংরেজকৃত 'নোয়া দিল্লী' দেখিয়া গেলাম। সে এক বিরাট ব্যাপার। পাহাড় কাটিয়া সমভূমি করিয়া সেই উষরক্ষেত্রে কলের জল সেচন দ্বারা দূর্ব্বা ও গাছ গাছাদি লাগাইয়া ইহার সৌষ্ঠব সাধিত হইতেছে। রাজ প্রতিনিধির প্যালেস্, এসেম্ব্লি হল, বড় বড় আফিস্ ও অফিসারগণের বাসভবন, সুপ্রশস্ত রাজপথ, স্কোয়ার ইত্যাদি দেখিবার জিনিস তবে দরিদ্র রোগজীর্ণ ভারতবাসীর কোটি কোটি টাকায় এই বহু ব্যয়সাধ্য ব্যাপার সম্পাদিত হইতেছে—এবং ইহার তেমন দরকারই ছিল না—এই যা কিছু আপত্তির বিষয়। এই নব-নির্ম্মিত নগরাংশের অতি নিকটেই তথাকথিত ইন্দ্রপ্রস্থ দেখিলেই মনে হয়—এই ক্ষুদ্র জায়গাটি ইন্দ্রপ্রস্থের একটা সামান্য অংশ মাত্র হইতে পারে। একটি পাঁচ কোঠরীর সামান্য দালান—তাহাও অতি আধুনিক—পঞ্চপাণ্ডবের বৈঠকখানা বলিয়া নির্দ্দেশিত হয়, এক এক কোঠায় নাকি এক এক জন বসিতেন। নিকটে দেবস্থান আছে—তাহাতে কুন্তীশ্বর মহাদেব † প্রদর্শিত হন—সেখানে গান্ধারী পূজিত শিবও আছেন। এমন কি বিঘাত প্রমাণ এক একটি অর্দ্ধমূর্ত্তি—বাষ্ট কুন্তী ও গান্ধারীর বলিয়া দেখান হয়।

রাজসূয়ের সময়ে ধৃতরাষ্ট্র ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়াছিলেন বটে পরন্তু গান্ধারী আসিয়াছিলেন এমন কোনও কথা মহাভারতে পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

এই জায়গাটাতে বৃহৎ পরিখা দেখিয়া মনে হইল, ইহাতে কোনও সময়ে একটা দুর্গ ছিল, তবে খুব বেশীদিনের হইবে না।

এখান হইতে ফিরিয়া গিয়া যমুনার তীরবর্ত্তী কেল্লার ভিতরে মোগলদের কীর্ত্তিকলাপ

---

* ইন্দ্রপ্রস্থেও তাঁহারা দখল করিয়াছিলেন। মহাপ্রস্থান সময়ে যুধিষ্ঠির উহা যদুবংশের ধ্বংসাবশিষ্ট বজ্রকে প্রদান পূর্ব্বক সুভদ্রাকে বলিতেছেন—

"এষ পুত্রস্য পুত্রস্তে কুরুরাজো ভবিষ্যতি।
যদূনাং পরিশেষশ্চ বজ্রোরাজা কৃতশ্চ হ॥
পরীক্ষিদ্ধাস্তিনপুরে শক্রপ্রস্থেচ যাদবঃ।
বজ্রোরাজা ত্বয়া রক্ষ্যো মা চাধর্ম্মে মনঃ কৃথাঃ॥"

মহাপ্রস্থানিক পর্ব্ব ১ম অধ্যায়।

† যমুনার তীরেও আর এক 'কুন্তীশ্বরের' মন্দির দেখিয়াছি।

দেখিতে গেলাম —৵০ দক্ষিণা দিয়া ভিতরে ঢুকিতে হয়। পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আগরা গিয়া তাজমহল মাত্র দেখিয়াছিলাম —তত্রত্য দুর্গাভ্যন্তরে ঢুকিয়া মোগল রাজভবন দেখিতে পারি নাই —এবার আগ্রহসহকারে এখানকার দেওয়ানি খাস দেওয়ানি আম মতিমসজিদ প্রভৃতি দেখিয়া কৌতূহল চরিতার্থ করিলাম। পর্য্যটকেরা বলেন দেওয়ানি খাস পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা রমণীয় ভবন। বাস্তবিক, ইহার এবং অন্যান্য গুলিরও সৌন্দর্য্য বর্ণনাতীত। কি সূক্ষ্ম সুকুমার কারুকার্য্য! লতাপাতা ফুল প্রভৃতি নানাবর্ণের মূল্যবান প্রস্তরেরদ্বারা বিরচিত হইয়াছিল —ঐ সব খুঁটিয়া খুঁটিয়া লুণ্ঠনকারীরা তুলিয়া নিয়া গিয়া সৌন্দর্য্যের হানি করিয়াছে। সুখের বিষয় অধুনা বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এই সকলের সম্যক রক্ষণার্থ ব্যবস্থা করিয়াছেন। দুর্গের মধ্যে দুইটি মিউজিয়ম সংস্থাপিত হইয়াছে—একটিতে মোগল বাদসাহ গণের সাজ পোষাক চিত্র ইত্যাদি রহিয়াছে, অপরটিতে যুদ্ধ সংক্রান্ত অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি এবং সেনানীগণের ছবি ইত্যাদি সংরক্ষিত হইয়াছে।

দেখিলাম, একদল গৌরাঙ্গ ফটো (বা সিনেমার) যন্ত্রপাতি নিয়া আসিয়াছেন —এবং কতকগুলি এদেশীয় লোককে রং মাখাইয়া এবং মোগল রাজা ও রাণীদের সাজপোষাক পরাইয়া নানা পরিজনের ছবি উঠাইতেছেন —খুব সম্ভব ইঁহারাও স্বদেশে গিয়া মোগল-দরবারের এবং অন্তঃপুরেরও ছায়াচিত্র দেখাইবেন। মিউজিয়ামের এভাবে সদ্ব্যবহার হইতেছে।

অন্যদিন কুতুব দেখিতে গিয়াছিলাম। উহা দিল্লী হইতে ১১ মাইল দূরে —মোটরবাস্ যথেষ্ট পাওয়া যায় -তিন চারি আনা টিকিট ভাড়া। যাতায়াতে ইহার দ্বিগুণ লাগে। সেখানে পৌঁছিয়াই শড়কের ডান দিকে যোগমায়ার মন্দির দর্শন করিলাম। এখানে দেববাহুল্য নাই —অপর দেবতা মধ্যে গণেশ ও মহাদেব আছেন মাত্র। বর্ত্তমান মন্দির ১৮৭৭ ইং সনে নির্ম্মিত। তবে যোগমায়া নাকি দিল্লীর অধিষ্ঠাত্রীদেবী -অনেক প্রাচীনা।

শড়কের অপর পার্শ্বে কুতুবের কীর্ত্তি -মিনার ও মস্‌জিদ্ এবং আরও ধ্বংসাবশিষ্ট এমারত রহিয়াছে। মসজিদের থামগুলি দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে এই সব কোনও হিন্দুরাজপ্রাসাদ বা মন্দিরের অঙ্গীভূত ছিল; কেননা এইগুলিতে হিন্দু স্থাপত্যের নিদর্শনই পরিলক্ষিত হয়। প্রবাদ এই যে পৃথ্বীরাজের রাজধানী এখানেই ছিল —তদীয় প্রাসাদ ও মন্দিরাদির কিছুটার এভাবে সদ্ব্যবহার হইয়াছে -বাকী ভগ্নাবশিষ্টের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

মিনার দেখিয়া কলিকাতা গড়ের মাঠের অক্টারলোনি মনুমেণ্টের কথা মনে পড়িল একবার উপরে উঠিবার অভিপ্রায়ে ঐ মনুমেণ্টের পাদদেশে গিয়াছিলাম—প্রবেশ দ্বার বদ্ধ ছিল; আর যাই নাই। তাই এই মিনারের উপর উঠিবার জন্য আগ্রহসহকারে সংকল্প করিলাম। উচ্চতা দেখিয়া একটু ভয়ও হইয়াছিল; কিন্তু সাহস করিয়া উঠিতে আরম্ভ করিলাম। মধ্যে মধ্যে বিশ্রামের স্থান আছে—শিখরে পৌঁছিতে বিশেষ কষ্ট হইল না। সেখানে বায়ুবেগ একটু অধিক বোধ হয়—এবং নীচের দিকে তাকাইলে মাথা ঘুরে।

চতুর্দ্দিকের দৃশ্য বেশ চিত্তাকর্ষক। প্রবাদ এই যে, ইহাও পৃথ্বীরাজ মহিষীদের যমুনা দর্শনার্থ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন—কুতুব ইহার কিঞ্চিৎ সংস্কার করিয়া নিজস্ব করিয়াছেন।

এত উচ্চ স্তম্ভ নাকি পৃথিবীতে আর নাই। মিনারের নীচের বেড় ৪৭ ফিট্। শিখরের বেড় ৯ ফিট্ উচ্চতা ২৩৮ ফিট্। এই স্থানের প্রায় কেন্দ্র স্থলে একটি লৌহস্তম্ভ দাঁড়াইয়া আছে—তাহা মিনারের তুলনায় খুবই ছোট। ইহার গাত্রে একটি প্রাচীন লিপি আছে—নিকটেই চারিটি প্রস্তরফলকে ঐ লিপির (সংস্কৃত) পাঠ এবং ইংরেজী, উর্দ্দু ও হিন্দি ভাষায় ইহার অনুবাদ রহিয়াছে। বুঝাগেল চন্দ্র নামক ভূপতি এই স্মৃতি স্তম্ভ নির্ম্মিত করিয়াছিলেন। এই 'চন্দ্র'—চন্দ্রবর্ম্মা বিখ্যাত গুপ্ত সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের পূর্ব্বে ৪র্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গ হইতে বাহ্লীক পর্য্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন—

সে যাহা হউক এই স্তম্ভটি অন্ততঃ ১৬ শত বৎসর কাল বর্ষাতপ মাথায় বহিয়া দণ্ডায়মান আছে, পরন্তু ইহার স্বাভাবিক চাকচিক্য বজায় রহিয়াছে। ইহাতে নাকি অধুনাতন রাসায়নিক পণ্ডিতগণ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া থাকেন। স্তম্ভটির উপর মোসলমানের হস্তাবলেপের চিহ্ন—আরবী লেখাও রহিয়াছে।

প্রত্যাবর্ত্তনের সময় একজন মোসলমান বোধহয় 'গাইড'—অল্প একটু আগাইয়া গিয়া 'হস্তিনাপুর' দেখিয়া যাইতে বলিল। ইহারা এভাবেই লোককে এক্‌কে আর বলিয়া ঠকাইয়া থাকে।

যাতয়াতের সময়ে ডাইনে বায়ে মস্‌জিদের আকারে সুবহু সমাধি স্মৃতিসৌধ দেখিয়া মনে হইল, দিল্লীকে যে কেহ কেহ মহাশ্মশান বলিয়া থাকেন তাহা নিতান্ত নিরর্থক নহে।

কুরুক্ষেত্র ও ইন্দ্রপ্রস্থ পরিভ্রমণ করিলে স্বতঃই মনে পড়ে—

যদুপতেঃ কগতা মথুরা পুরী।
রঘুপতেঃ কগতোত্তর কোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুস্ব মনঃ স্থিরং
ন সদিদং জগদিত্যব ধারয় ॥

ইতি শম্।

শিক্ষার কুফল নিবৃত্তির উপায়।

শিক্ষা সম্বন্ধে যে সকল বিচার বিতর্ক পূর্ব্বে করিয়াছি তাহাতে দেখাইয়াছি ইংরেজী শিক্ষা ভারতে বিশেষতঃ হিন্দুসমাজে কুফলই প্রসব করিয়াছে। কত প্রকারে কুফল প্রসব করিয়াছে তাহাও যথাসাধ্য প্রদর্শন করিয়াছি। কিন্তু কার্য্যের কুফল মাত্র প্রদর্শন করিলেই সুফল লাভ করা যায় না; সুফল লাভ করিতে হইলে কুফলপ্রসু কার্য্যের নিবর্ত্তন ও সুফল প্রসুকার্য্যের প্রবর্ত্তন প্রয়োজন হয়, তাহার উপায় চিন্তাই প্রকৃত পক্ষে কার্য্যকরী চিন্তা। হিন্দুসমাজের এই বিপদ্‌কালে অভিজ্ঞ সামাজিকগণের মধ্যে যাঁহারা ইংরেজী শিক্ষার কুফল অনুভব করিতেছেন তাঁহাদের এখন কুফল নিবৃত্তির উপায় চিন্তা কর্ত্তব্য।

বিশেষ চিন্তা না করিয়াও একটা উপায় সকলেই নির্দ্দেশ করিতে পারেন—কুফলপ্রসু শিক্ষা বর্জ্জন করা। ভাবিতে হইবে এউপায় অবলম্বন সম্ভব কি না? বর্ত্তমানে যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে বুঝাযাইতেছে এউপায় সম্ভব নহে। ভারতের সমস্ত ব্যবহার কার্য্য ইংরেজী ভাষায় ও ইয়ুরোপীয় প্রণালীতে পরিচালিত হইয়া থাকে; ইহার পরিবর্ত্তন ঘটান আপাতত ভারতবাসীর শক্তির অতীত বলিয়া মনে হয়। বিশেষতঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ-রূপে ভারতবাসীর হস্তচ্যুত হইয়াছে। যে সকল ভারতবাসী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক মণ্ডলীতে প্রবিষ্ট হয়েন তাঁহারা উচ্চ ইংরেজী শিক্ষিত ও ইউরোপীয় ভাবে ভাবিত, তাঁহারা ইংরেজী শিক্ষার কুফল, সুফল আমরা যেভাবে অনুভব করি সে ভাবে অনুভব করিতে পারেন না, ইউরোপের শিক্ষার সহিত তুলনা করিয়া সুফল কুফল চিন্তা করিয়া থাকেন। তাহার ফল আরও মারাত্মক হয়, অর্থাৎ ইউরোপীয় আদর্শের অনুসরণে পূর্ণতা লাভের পক্ষে শিক্ষা যতটুকু বাধা প্রদান করিতেছে তাহাকেই তাঁহারা শিক্ষার কুফলরূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এ অবস্থায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালক ভারতীয়গণ যে শিক্ষায় প্রকৃত কুফল বুঝিবেন ও যতদূর সম্ভব কুফল হ্রাসের চেষ্টা করিবেন এমন আশা করা যায় না।

জাতীয়শিক্ষার নামে বহুবিধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কিছুদিন হইতে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে প্রতিষ্ঠাতৃ-গণের রুচি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শিক্ষাপ্রণালীও অবলম্বিত হইতেছে। অভিজ্ঞ পাঠকগণ বুঝিবেন শিক্ষার আলোচনা-প্রসঙ্গে যে সকল কুফলের উল্লেখ করিয়াছি সে সকল কুফলের প্রতিকার ঐ প্রকার শিক্ষার দ্বারা হইতে পারে না। ঐ সকল শিক্ষাপ্রণালী নামে "জাতীয়" হইলেও উহা বিজাতীয় বিপরীতমুখী চিন্তাধারার মধ্য দিয়া প্রাপ্ত, বাহিরে জাতীয়তার একটা অস্বাভাবিক ভাবমাত্র রক্ষা করিতে চেষ্টা হইয়া থাকে।

এক প্রকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায় যাহার বহিরাবরণ ভেদ করিয়া অভ্যন্তরের বিজাতীয়ভাব দর্শন একটু দুঃসাধ্য হয়। যেমন নবীন স্বামীজীগণের প্রবর্ত্তিত কিয়ৎসংখ্যক ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম প্রভৃতি। ইহাতে অশন বসন উপাসনা আরাধনা, অনেক স্থানে—অধ্যয়ন

অধ্যাপনা ও জাতীয়তার স্থূল আবরণে আবৃত; অনেকের দৃষ্টির এত তীক্ষ্ণতা নাই যে, ঐ স্থূল আবরণ ভেদ করিয়া অভ্যন্তর ভাগ দর্শন করিতে পারেন কাজেই অনেক আস্তিক ব্যক্তিও ঐ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পুষ্টিসাধনে সহায়তা করিয়া থাকেন।

প্রথমে দেখিতে হইবে ঐ প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যাঁহারা গঠন করেন তাঁহারা সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করেন ও সন্ন্যাসীর নামের অনুকরণে নামও গ্রহণ করিয়া থাকেন কিন্তু সন্ন্যাসীর চিরন্তন নিয়ম কেহ পালন করেন না। সন্ন্যাসীর শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ পালন যে চিরপ্রচলিত সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসীগণের মধ্যে সকলে করিয়া থাকেন তাহা নহে তবে না করা যে সন্ন্যাসধর্ম্মের ব্যভিচার তাহা ঐ সকল সম্প্রদায়ের বিশিষ্টব্যক্তিগণ স্বীকার করিয়া থাকেন; হয়ত বর্ত্তমানকালে অনেক নিয়ম পালন অসম্ভব বলিয়া অনেকে ইচ্ছা থাকিলেও করিতে পারেন না। অভিনব আশ্রমপ্রতিষ্ঠাতা নবীন স্বামীদিগের অবস্থা তেমন নহে; তাঁহারা যে নিয়ম প্রণয়ন করেন তাহা অশক্তি বা অজ্ঞতা মূলক বলিয়া তাঁহারা স্বীকার করেন না তাঁহারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন তাঁহাদের রচিত ও আচরিত নিয়মপদ্ধতিই শাস্ত্রীয় ও সন্ন্যাসীর অবলম্বনীয়। অর্থাৎ তাঁহারা প্রমাণ করিতে চাহেন—চিরন্তন যে সকল নিয়ম পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে তাহা অজ্ঞতামূলক, অভিজ্ঞতামূলক নিয়মপদ্ধতি তাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছেন। এ ব্যবস্থা ইংরেজীশিক্ষা প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে ভারতে কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই ইংরেজী শিক্ষায় বঞ্চিত কোনব্যক্তিকে নবীন স্বামী হইতেও দেখা যায় না, অতএব ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে ইংরেজীশিক্ষাই নবীন স্বামীদের স্রষ্টা, যদি তাহাই হয় তাহা হইলে মানিয়া লইতে হইবে চিরন্তন ধার্ম্মিক ও সামাজিক পদ্ধতির বিরুদ্ধে যেমন রাজনৈতিকনেতা প্রভৃতির আবির্ভাব ইংরেজীশিক্ষারফলে ঘটিয়াছে তেমনি এই স্বামীদের আবির্ভাবও ইংরেজীশিক্ষার ফলেই ঘটিয়াছে, সুতরাং চিরন্তন ধর্ম্ম ও সমাজের বিরুদ্ধতায় ইহাঁদের মধ্যে সাম্য রহিয়াছে; ইহাদের প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপ্রণালী ইংরেজীশিক্ষার কুফলবৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস করিতে পারে না। অবস্থাও ঠিক তাহাই হইতেছে, হিন্দুসমাজে বিপ্লব সৃষ্টির পক্ষে নবীন স্বামীদলই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছেন, ইহা সম্ভব হইয়াছে, ইহাদের জাতীয়তার বহিরাবরণ সকলে ভেদ করিতে পারে না বলিয়া।

চতুষ্পাঠীর শিক্ষা রক্ষা করিতে পারিলে কিয়ংসংখ্যক ব্যক্তিকে ইংরেজীশিক্ষার কুফলমুক্ত রাখা সম্ভব হইতে পারিত, তাহা করাও কোন ব্যয়সাধ্য বা আয়াসসাধ্য ছিল না কারণ সমাজে যেভাবে ব্রাহ্মণপণ্ডিতের জীবিকা ও মান পূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহাতে নূতন কিছু করা প্রয়োজন ছিল না—চিরাভ্যস্ত প্রকৃতিবশেই সমাজ তাহা করিত। ইংরেজীশিক্ষা তাহাতেও বাধা উপস্থিত করিয়াছে। ইংরেজী শিক্ষিতসম্প্রদায় সমাজের যে সকল চিরন্তন পদ্ধতির বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়াছেন তাহার মধ্যে চতুষ্পাঠীর শিক্ষা এবং ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মান পূজা সর্ব্বপ্রধান বলা যাইতে পারে। কারণ এই প্রকার শিক্ষাই হিন্দুসমাজে তাঁহাদের মতবিরোধী সকল মানুষ সৃষ্টি করিয়া থাকে।

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নামে অভিহিত কংগ্রেস প্রভৃতির সাহায্যে যাঁহারা ভারতের

স্বাধীনতা কামনা করেন তাঁহাদের অনেকের সহিত আমি ইংরেজীশিক্ষার কুফল সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি, তাঁহারা প্রথমে ইংরেজীশিক্ষার সুফল প্রমাণ করিতে প্রয়াস করিয়া থাকেন, যখন অকৃতকার্য্য হ'ন তখন বলেন—আচ্ছা মানিয়া লইলাম ইংরেজীশিক্ষার কুফলই ফলিয়াছে এখন তাহার প্রতিকারের উপায় কি? আমরা বলিতেছি স্বাধীনতা লাভই ইহার একমাত্র প্রতিকার, কংগ্রেস প্রভৃতি সেই স্বাধীনতা লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছে আপনারা তাহার সহায়তা না করিয়া তাহাতে বাধা উপস্থিত করেন কেন?

ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে—স্বাধীনতা লাভ ইংরেজীশিক্ষার কুফল নাশের প্রকৃষ্ট উপায় হইতে পারে কিন্তু ইংরেজীশিক্ষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুফল যে কংগ্রেস তাহার দ্বারা স্বাধীনতা সম্ভব নহে।

পরাধীনতাজনিত অনিষ্টজ্ঞান স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা উৎপাদন করে, পরাধীনতাজনিত অনিষ্ট জ্ঞান যাহার যত তীব্র হইবে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাও তাহার অন্তরে তত তীব্রভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। ধর্ম্ম ও সমাজবিষয়ে বিরুদ্ধপ্রকৃতি জাতির শাসনকালে বিজিত জাতি যে স্বীয়ধর্ম্ম ও সমাজরক্ষায় বিব্রত হয় তাহার হেতু আর কিছু নহে সে অবস্থায় সমগ্র জাতির অন্তরে পরাধীনতাজনিত অনিষ্টবোধ জাগরিত হইয়া উঠে। জাতির প্রতিব্যক্তি স্বভাবতঃই বুঝে—শাসকজাতির ধর্ম্ম ও সমাজপদ্ধতি যখন আমার ধর্ম্ম ও সমাজপদ্ধতির বিরুদ্ধ তখন আমার ধর্ম্ম ও সমাজের প্রতি শাসকজাতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবে না, ধর্ম্ম সমাজ রক্ষার জন্য শাসকজাতির সাহায্যলাভও সম্ভব হইবে না, পরন্তু বিপরীত অবস্থাই উপস্থিত হইবে। এ সময়ে ধর্ম্ম ও সমাজরক্ষার জন্য আমার বিশেষ দৃঢ়তা প্রয়োজন, এই বুদ্ধিতে বিজিতজাতির প্রতিব্যক্তি স্বীয় ধর্ম্মসমাজ রক্ষার জন্য বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়ে। বিজিত জাতির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার ইহাই সর্ব্বসাধারণ বীজ। ক্রমে এই বীজ হইতে দেশ কাল পাত্র ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার তারতম্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা অঙ্কুরিত পল্লবিত ও ফল পুষ্প সমন্বিত হইয়া প্রকাশ পাইতে থাকে। অন্ততঃ ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে এ নিয়মের ব্যতিক্রম কখনও হয় নাই।

কংগ্রেসের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার বীজ কি? কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতৃবর্গ ও পরিচালকগণ কি বিজাতীয় শাসনের ঐপ্রকার অনিষ্টকরতা বুঝিয়াছেন? তাঁহারা বুঝিয়াছেন বিপরীত। স্বজাতীয় ধর্ম্ম ও সমাজের উপর বিপৎপাতকে তাঁহারা সৌভাগ্য লব্ধ বলিয়া বুঝিয়াছেন এবং এ সৌভাগ্য যে ভারতের পরাধীনতা ভিন্ন লাভ করিতে পারিতেন না ইহাও তাঁহারা বুঝিয়াছেন পরন্তু স্বজাতির উষর হৃদয়ক্ষেত্রে স্বাধীনতার এমন বীজবপন যে বিদেশীয়গণের কর্ষণযন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত সম্ভব নহে এ ধারণাও বদ্ধমূল হওয়া গিয়াছে, তাহাদের অনুগ্রহে যে স্বজাতির শাসন দণ্ডপানিও লাভ করা যাইতে পারে এ বিশ্বাস কিঞ্চিৎ শিথিল হইলেও অপগত হয় নাই। ইহা অপেক্ষা শিক্ষার মারাত্মক কুফল যে কি হইতে পারে তাহা আমি কল্পনাও করিতে পারি না।

আজ পূর্ব্ববর্ত্তীগণের ভ্রান্তি অনেক কংগ্রেসসেবক বুঝিয়াছেন, অনুগ্রহ ভিক্ষায় শক্তিক্ষয় করিয়া যে কোন লাভ হয় নাই—হইতেও পারে না ইহা উচ্চরবে বিঘোষিত করিয়া অনেকে অভিজ্ঞতার করতালিও অর্জ্জন করিতেছেন, কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বুঝিবেন অভিজ্ঞতার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক ইহার সহিত নাই; কারণ প্রত্যাখ্যাত হইবার পূর্ব্বে ইহা কেহ বুঝেন নাই প্রত্যাখ্যাত হইয়াও অনেকে বুঝিতেছেন না। যাঁহারা বুঝিয়াছেন বলিয়া অভিমান করিতেছেন তাঁহারাও তাহা বুঝেন নাই; ভীতিপ্রদর্শনের দ্বারা অনুগ্রাহকের অনুকূলতা লাভের চেষ্টা করিতেছেন মাত্র। পূর্ব্ববর্ত্তী কংগ্রেসসেবকগণের আকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম্মপদ্ধতির একটা সামঞ্জস্য ছিল, তাঁহারা পরের আশ্বাসে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়াছিলেন—যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারিলে, ও প্রণালীবদ্ধ আন্দোলন চালাইতে পারিলে যে অভিলষিত ফল পাওয়া যাইবে এ ধারণা তাঁহাদের দৃঢ় হইয়াছিল, সুতরাং আশ্বাস দাতৃগণ যে যে কর্ম্মের দ্বারা যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে বলিয়াছে ও যে প্রণালীতে আন্দোলন চালাইতে উপদেশ দিয়াছে তাঁহারা অবিচলিতচিত্তে তাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহারা ধর্ম্মের ধার ধারেন নাই সমাজের মুখাপেক্ষা করেন নাই- পিতৃপুরুষের অবমাননায় কুণ্ঠিত হয়েন নাই। ইহাকে আকাঙ্ক্ষার ও বিশ্বাসের অনুরূপ কর্ম্মপদ্ধতি বলা যাইতে পারে। কারণ যে আকাঙ্ক্ষার পরিপূরণ তাঁহারা কামনা করিয়াছেন এবং পরপ্রদত্ত যে আশ্বাসে তাঁহারা বিশ্বাস করিয়াছেন তাহাতে পরের অনুগ্রহের দান গ্রহণ করিতে হইলে পরের কাছে ঐপ্রকার যোগ্যতা প্রদর্শন প্রয়োজন।

বর্ত্তমানে স্বাধীনতা লাভের উপায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, অথচ স্বাধীনতাকামীগণের প্রকৃতি ও বুদ্ধি পরিবর্ত্তিত হয় নাই। অধিকন্তু পূর্ব্বে আকাঙ্ক্ষায় ও উপায়ে যতটুকু সামঞ্জস্য ছিল বর্ত্তমানে তাহাও বিনষ্ট হইয়াছে। পরপ্রদত্ত আশ্বাসে বিশ্বাস নষ্ট হইয়াছে, সুতরাং পূর্ব্ব প্রণালীতে যোগ্যতা অর্জ্জনের আশাও প্রতিহত হইয়াছে। সমাজের অশিক্ষিত কৃষক শ্রমজীবির সহায়তা ব্যতীত আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণ যে সম্ভব নহে ইহা এখন অনেকে বুঝিয়াছেন কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তীগণ পরের দান গ্রহণের যোগ্যতা দেখাইবার জন্য স্বজাতির বিরাগ ভাজন হইয়া যে আত্মপ্রকৃতি গঠন করিয়াছিলেন বর্ত্তমানের স্বাধীনতাকামীগণের প্রকৃতিও তাহারই অনুরূপ, অথচ পূর্ব্ববর্ত্তীগণ প্রার্থনা করিয়াছেন পরের অনুগ্রহ ইহাঁরা প্রার্থনা করিতেছেন স্বজাতির অনুরাগ ইহা কি কখনও সম্ভব? অসম্ভব সম্ভব করিতে যাইয়া ফল এই হইতেছে যে, ইহাঁরা আত্মপ্রকৃতি স্থির রাখিয়া হিন্দু সাধারণের অনুরাগ আকর্ষণের জন্য অনুচিত পন্থার আশ্রয় লইতেছেন অর্থাৎ যে ধর্ম্মবিশ্বাস ও সমাজপদ্ধতি পরিত্যাগ করায় ইহাঁরা স্বজাতির বিরাগ-ভাজন হইয়াছেন সেই ধর্ম্মবিশ্বাস ও সমাজ পদ্ধতির উপর স্বজাতির বিরাগ উৎপাদনের চেষ্টা করিতেছেন, ইহা যদি সম্ভব হয় তাহাহইলে স্বজাতি তাঁহাদের অনুরাগী হইতে পারে। ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস, কোনচিন্তাশীলব্যক্তি এমন বিশ্বাস করিতে পারেন যে, যাঁহাদের অন্তরে পরাধীনতার যাতনা অনুভূতি আছে বা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে তাঁহারা একটা ধর্ম্মপরায়ণ

সমাজবদ্ধ বিরাট জাতির ধর্ম্মবিশ্বাস ও সমাজ বন্ধন বিনষ্ট করিয়া তাঁহাদের অনুরক্ত করিয়া লইয়া তবে স্বাধীনতা লাভ করিবে এমন কল্পনাও করিতে পারে; অথচ বর্ত্তমানের স্বাধীনতা-কামী হিন্দুগণ তাহাই অনায়াসসাধ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় যাহাকে অধিকারচ্যুত করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিবেন তাহারই দণ্ডবিধির দ্বারা স্বাধীনতা লাভের উপায় সুসম্পন্ন করিয়া লইতে চাহিতেছেন। যে কংগ্রেস্ প্রভৃতি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের এই প্রকার অবস্থা—যাহা ইংরেজী শিক্ষার সর্ব্বনাশকর চরম কুফলরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে; সেই সকল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে স্বাধীনতা লাভ করিয়া ইংরেজী শিক্ষার কুফলের হাতে ভারত পরিত্রাণ পাইবে এ আশা উন্মাদের অন্তরেও স্থান পায় না।

এখন উপায় কি?

আস্তিক হিন্দুর পক্ষে এ প্রশ্নের উত্তর ভাবিতে হয় না, সরল চিত্তে উত্তর দিতে পারেন উপায় ভগবান্। মানুষী শক্তি যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থানে বাধা প্রদানে অকৃতকার্য্য হয় তখন ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া সে কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। এ উত্তর শাস্ত্রের দ্বারা অবগত হওয়া যায় এবং ইহা যে সত্য তাহাতে সন্দেহের লেশও থাকিতে পারে না, কিন্তু এ উত্তরে মানুষের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণীত হয় না—কর্ত্তব্য সম্পাদনে মানুষের অন্তরে বল সঞ্চয় হইতে পারে। কারণ এই শাস্ত্রবাক্য কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণায়ক বিধিনিষেধ নহে, ইহা অবশ্যম্ভাবী ভাবজ্ঞাপক। সুতরাং মানুষের বৈধকর্ম্মে যখন বাধা উপস্থিত হয় তখন বৈধকর্ম্মের বাধা অপসারণে উপায় চিন্তা করিতেই হইবে, যে হেতু শাস্ত্রে এমন কথা নাই যে বাধা প্রাপ্ত হইলে বৈধকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মানুষ জীবন যাপন করিতে পারিবে বা অবশ্যম্ভাবী ভাবের প্রাপ্তিকাল অর্থাৎ ভগবদবতরণাদির কাল পর্য্যন্ত বৈধকর্ম্ম না করিলে সে প্রত্যবায়ভাগী হইবে না, কাজেই আমাদের কর্ত্তব্য করিতে হইবে, কর্ত্তব্য করিতে হইলেই কর্ত্তব্যের বাধা অপসারণের উপায় চিন্তাও প্রয়োজন হইবে। এই উপায় চিন্তায় আমরা বিমুখ হইয়াছি বলিয়াই বিপদ্ অধিক ঘনীভূত হইয়া আমাদের আক্রমণ করিয়াছে। অবস্থা এমন হইয়াছে যে, আমরা ক্রমে নিরুপায় হইয়া কর্ত্তব্য বিমুখ হইতেছি, ইহকাল পরকাল ভুলিতে বসিয়াছি।

অন্তরের দুর্ব্বলতাই আমাদের নিরুপায় করিয়াছে। যে দুর্ব্বলতা আমাদের নিরুপায় করিয়াছে সে দুর্ব্বলতাটুকু অনুভব করিতে না পারিলে তাহার প্রতিকারে যত্ন আসিবে না এবং প্রতিকারের জন্য যদি কেহ কটু তিক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করে তাহাহইলে তাহা ঔষধ বলিয়া গ্রহণ করিতেও প্রবৃত্তি হইবে না। সুতরাং প্রথমে দুর্ব্বলতাটুকু বুঝা প্রয়োজন হইবে।

আমাদের ঐহিক পারত্রিক কল্যাণের যাহা কিছু নিদান তাহা আমরা একমাত্র শাস্ত্রের সাহায্যেই বুঝিতে পারি; কাল দেশ পাত্র বিচার পূর্ব্বক শাস্ত্রের নির্দ্দেশ পালনের উপায় উদ্ভাবন মাত্র আমাদের স্বীয় জ্ঞানের দ্বারা করা প্রয়োজন হয়।

শাস্ত্রে আমার নিজের জন্য; স্ত্রীপুত্রের জন্য; প্রতিবেশী, গ্রামবাসী, দেশবাসী, জগৎবাসী সমস্ত জীবের জন্য যাহা কর্ত্তব্য তাহা নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। মোটামুটি বুঝিতে হইবে শাস্ত্রে যাহা কিছু আছে সে সমস্তই ভেষজ হিতকর, অথবা দোষঘ্ন ঔষধ। শাস্ত্রের কোন্ বিধান কিভাবে হিতকর হয় তাহা বুঝিয়া উঠা দায়—পারলৌকিক ফলের দিক দিয়া অসম্ভব। সুতরাং বিশ্বাস করিতে হইবে এবং নির্ব্বিচারে বিধি পালন করিতে হইবে। যতটুকু কল্যাণ বুঝিতে পারা যায় তাহা সৌভাগ্য; অনুভব না করিতে পারিলেও অবশ্যম্ভাবিতা নিশ্চিত। আমরা আত্মকল্যাণের জন্য নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করি, আহার বিহারাদির সুব্যবস্থা করিয়া থাকি, স্ত্রীপুত্রাদির কল্যাণের জন্য তাহাদের লালনপালন করি; শিক্ষিত করি—যাহাতে তাহারা ধার্ম্মিক সংযত কর্ম্মঠ হয় তাহার জন্য যত্ন করিয়া থাকি। প্রতিবাসী স্বজন বন্ধুবান্ধবের প্রতিও আমাদের কর্ত্তব্য শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে; অতিথিসেবা, বলি বৈশ্বদেব আমাদের দৈনন্দিন নৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ অর্থাৎ মানবের জন্য ও অন্য প্রাণিজাতের জন্য আমাদের প্রতিদিন ঐ নৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ করিতে হয়; সমাজের জন্য ও জগতের কল্যাণের জন্য আমাদের কর্ত্তব্য বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সংরক্ষণ। ইহা ছাড়া আমাদের শাস্ত্রের আদেশ—

একৈব গতিরর্থস্যদানমন্যা বিপত্তয়ঃ।

ধনবানের ধনের একমাত্র সদ্‌গতি দান। অন্নদান জলদান বস্ত্রদান প্রভৃতির দ্বারা অর্থের সদ্‌গতি সাধিত হইয়া থাকে। শাস্ত্রের এই সকল বিধি পালনে যে ঐহিক কল্যাণ ও সাধিত হয় তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই সকল বিধি পালনে ক্লেশ আছে কিন্তু কোন কঠোরতা নাই। শাস্ত্রে আর এক প্রকার বিধি আছে, তাহা পালন করিতে কোন ক্লেশ নাই, অর্থ ব্যয়ও নাই কিন্তু কঠোরতা আছে। যেমন মনু বলিয়াছেন অতিথি সর্ব্বদেবময় তাহাকে দেবতার ন্যায় পূজাপূর্ব্বক অন্নাদিদান করিবে; অতিথি অভ্যাগত দাসদাসী প্রভৃতির আহারের পরে গৃহস্থ দম্পতী আহার করিবে, আবার সেই মনুই বলিয়াছেন—যাহারা বিড়াল তপস্বী বা বকধার্ম্মিক তাহাদিগকে জলবিন্দুও দান করিবে না, যাহারা মহাপাতকী ও পতিত তাহাদের সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিবে, তাহাদের সহিত ভোজন শয়ন সম্ভাষণাদিও করিবে না। বিধি লঙ্ঘন করিলেই পাপ হয় সুতরাং বিহিত সন্ধ্যাবন্দনাদিরকরণে যেমন পাপ হয় ঐ সকল বিধি পালন না করিলেও তেমনি পাপ হয়; অবশ্য পাপের তারতম্য আছে। এই প্রকার বিধির কঠোরতার দিকে লক্ষ্য করিলে অনেকের অন্তর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; পিপাসার্ত্ত হইয়া যে জলপ্রার্থী হইয়াছে তাহাকে জলদান করিবার উপায় নাই, তাহাকে জলদান করিতে শাস্ত্র নিষেধ করিতেছেন সুতরাং যদি জলদান করা যায় তাহাহইলে নিষেধ অতিক্রম জনিত পাপভাগী হইতে হইবে।

এই প্রকার কঠোরতার মধ্যে যে কল্যাণের বীজ নিহিত রহিয়াছে তাহা স্থূলদৃষ্টিতে অনেকে দেখিতে পায় না, পারলৌকিক কল্যাণের বীজ দৃষ্টির অতীত তাহাতে বিশ্বাস করিতে হইবে—বিধি লঙ্ঘনে পাপ হয়। ঐহিক কল্যাণের বীজ দৃষ্টির অতীত নহে—তবে একটু সূক্ষ্মদৃষ্টিগম্য।

আপাত দৃষ্টিতে নিজের ও পরিবারবর্গের কিঞ্চিৎ অকল্যাণের আশঙ্কা হয়; কারণ স্বাভাবিক দয়াবৃত্তি মানুষমাত্রকেই বিপন্নের বিপৎপ্রতিকারে উন্মুখ করিয়া থাকে, পিপাসার্ত্তকে জলদান না করা বা পাপীকে বহিষ্কার করা স্বাভাবিক দয়াবৃত্তির প্রতিকূল সুতরাং মনে হইবে ইহা নিজের পক্ষে ও পরিবারবর্গের পক্ষে অকল্যাণকর। কিন্তু যদি একটু উদার দৃষ্টিতে শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের দিকে লক্ষ্য করা যায় তাহাহইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ শুধু আমার কল্যাণের জন্য নহে—সমাজের ও জগতের কল্যাণের জন্য। যেস্থানে আমার দয়াবৃত্তি চরিতার্থ করিতে গেলে সমাজের বা জগতের অকল্যাণ হয় সে স্থানে আমার দয়াবৃত্তিতে বাধাদান কর্ত্তব্য। প্রকৃতপক্ষে আমার দয়াবৃত্তিতে ইহাতে বাধাপ্রদানও করা হয় না, আমার সংকীর্ণ দয়াবৃত্তিকে উদার করিয়া দেওয়া হয়।

একজন বকধার্ম্মিক বা বিড়ালতপস্বী যদি তাহার প্রবঞ্চনাময় জীবন যাপনে সমাজের সহায়তা লাভ করে তাহাহইলে সে সহস্র লোককে ধর্ম্মভ্রষ্ট ও প্রবঞ্চক করিয়া তুলিবে; ক্রমে ঐ প্রকৃতির মানব বৃদ্ধি হইতে থাকিলে সমাজ হইতে ধর্ম্ম ও সত্য বিলুপ্ত হইতে পারে এ অবস্থায় এক ব্যক্তির প্রতি কঠোরতা ব্যতীত যদি সহস্র সহস্র ব্যক্তির কল্যাণ সম্পাদন অসম্ভব হয় তাহাহইলে একব্যক্তির প্রতি যে কঠোরতা তাহাই দয়ার উদারতা। যাহারা ধর্ম্মের বশে চালিত না হইয়া নীতির বশে চালিত হয়, দয়া ক্ষমা প্রভৃতির উপযোগিতা তাহারাও ঐ প্রণালীতেই বুঝিয়া থাকে। দস্যু তস্করাদির কঠোর দণ্ড, হত্যাকারীর প্রাণদণ্ড প্রভৃতি ঐ যুক্তিতেই সমর্থিত হইয়া থাকে, যুদ্ধে যে সহস্র সহস্র লোককে হত্যা করা হয়, তাহার সমর্থনেও ঐ প্রকার যুক্তির অনুসরণ করা হইয়া থাকে।

কলির প্রভাবে আমরা শাস্ত্রীয় বিধিপালনে ক্রমে অধিক অসমর্থ হইয়া পড়িতেছি সন্দেহ নাই, তাহাহইলেও শতবর্ষ পূর্ব্বপর্য্যন্ত শাস্ত্রীয় বিধি পালনে ঔচিত্যবোধ হিন্দুসমাজের প্রতি ব্যক্তির ছিল; ঔচিত্যবোধ থাকিলেই মানুষ অক্ষমতা জনিত কর্ত্তব্য ভ্রংশে অনুতপ্ত হয় অক্ষমতা দূর করিতে যত্ন করিয়া থাকে। তাহাতে বিধিপালন বিষয়ে হৃদয়ে দুর্ব্বলতা স্থান পায় না সুতরাং তৎকাল পর্য্যন্ত শাস্ত্রের কঠোর বিধি পালনে হিন্দুসমাজ দুর্ব্বল হয় নাই নির্ব্বিকল্পচিত্তে বিড়ালতপস্বী বকধার্ম্মিক ও পতিত প্রভৃতিকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে ইহা বিদ্বেষবশে করে নাই শাস্ত্রের বিধি পালন অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে করিয়াছে। ইংরেজী শিক্ষা সমাজের এই বৈধব্যবস্থাকে বিপরীত মুখী করিয়াছে। যাহারা সমাজ পরিত্যাগ করিয়াছে তাঁহাদের কথা বলিতেছি না—যাঁহারা সমাজে বাস করেন ও ধর্ম্ম সমাজ রক্ষা করিতে চাহেন তাহারাও ঐ কঠোর বিধি পালনে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন; এমন কি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রেণীর মধ্যেও অধিক সংখ্যকের ঐ অবস্থা আসিয়াছে।

যাহারা স্বেচ্ছায়, অর্থলোভে, বা মিথ্যা বিশ্বাস বশে, নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিয়া পতিত হইয়াছে, বা ধর্ম্মের ভান করিয়া অধর্ম্মের প্রসার ঘটাইতেছে তাহাদের প্রতি শাস্ত্রানুমোদিত ব্যবহার করিতে অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিত সঙ্কোচ বোধ করিয়া থাকেন। অথচ এই প্রকৃতির ব্যক্তিরাই ধর্ম্ম ও

সমাজরক্ষার জন্য সভাসমিতি করেন ও বক্তৃতা দিয়া থাকেন। আমি বুঝিতে পারি না এই প্রকার কার্য্য সমর্থনের পক্ষে কি যুক্তি থাকিতে পারে। যাহাদের শাস্ত্রে জলদান পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের আগমনে যদি গৃহ পবিত্র হইল বলিয়া কেহ শ্লাঘা অনুভব করেন—তাহাদের প্রদত্তসম্মানে যদি কাহারও গৌরব বোধ হয়, তাহাহইলে তিনি ঐ প্রকৃতির ব্যক্তিগণের অন্নজল গ্রহণ করুন বা না করুন অবৈধ কর্ম্ম যে তিনি করিতেছেন তাহা কি অস্বীকার করিতে পারেন? যিনি দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত স্বয়ং শাস্ত্রের মর্য্যাদা ভঙ্গ করেন তিনি সমাজকে শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষায় সবল করিয়া তুলিবেন ইহা কি সম্ভব? সম্ভব নহে বলিয়াই তাহা হয় না।

অনেকে বলেন বর্ত্তমান কালে অতটা সম্ভব নহে। কেন সম্ভব নহে? সমাজের অকল্যাণ হয় বলিয়া? তাহা নহে—সমাজের কল্যাণই হয়; নিজেরও পারত্রিক কল্যাণ হয় কেবল হয় না নিজের খ্যাতি প্রতিপত্তি। যদি তাহাই হয় তাহাহইলে শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা ও সমাজের কল্যাণ সাধনের নামে তাহা করা যাইতে পারে না।

আমার ধারণা এই যে, অকপটে নির্ভীক ভাবে যদি কিয়ৎ সংখ্যক ব্যক্তিও শাস্ত্রের ঐ কঠোর বিধি যথাযথ পালনে চেষ্টা করেন এবং ধর্ম্ম ও সমাজ রক্ষার জন্য ঐ প্রকার বিধি পালনই একমাত্র উপায় ইহা প্রচার করিতে পারেন তাহাহইলে সাধারণ হিন্দুর সহায়তা লাভ অসম্ভব হয় না। ইহাতে ইংরেজী শিক্ষার কুফল কিঞ্চিৎ হ্রাস হইতে পারে।

দৃঢ়চিত্তে সরল সত্যপথে এই প্রকার আন্দোলন চালাইতে পারিলে বিকৃত বুদ্ধি শিক্ষিত সম্প্রদায় ও ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইতে পারেন, কারণ তাঁহারা যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন তাহার সফলতার জন্য সাধারণ হিন্দুর সহায়তা কামনা করিয়া থাকেন; যখন বুঝিবেন বিকৃত ভাব লইয়া সাধারণ হিন্দুর মধ্যে প্রভাব বিস্তার অসম্ভব তখন অন্তরে বিকৃতভাব থাকিলেও বাহিরে তাহা প্রচার করিতে পারিবেন না, সাধারণের অনুরাগ আকর্ষণের জন্য অন্তরের বিকৃতভাব প্রচ্ছন্ন রাখিয়া বাহিরে সাধারণের অনুকূলভাব অবলম্বন করিবেন, তাহার ফল এই হইবে যে, যাহারা তাহাদের মত বিকৃতভাবে পূর্ণভাবিত না হইয়াছে তাহারা বিকৃতভাব পোষণে আগ্রহবান হইবেন না।

এই ভাবে ইংরেজী শিক্ষার কুফল হ্রাস করিতে পারিলে শাস্ত্র শিক্ষার দিকেও কিয়ৎ সংখ্যক লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইবে, এবং ইংরেজী শিক্ষিত বালক ও যুবকগণ যাহাতে বিরুদ্ধভাবে ভাবিত না হয় তাহার দিকেও অনেকের দৃষ্টি পড়িবে। আপাততঃ এই প্রণালীতে কার্য্য করা সমীচীন বলিয়া মনে হয়। প্রথমে এ কার্য্যে প্রচুর সহায় লাভ সম্ভব না হইতে পারে তবে ক্রমে সহায়ের সংখ্যা যে বৃদ্ধি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

বৃষোৎসর্গের গো, রক্ষা সমস্যা।

(লেখক—শ্রীঅমরকান্ত চক্রবর্ত্তী)

শাস্ত্র বিশ্বাসী হিন্দুর বিশ্বাস বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ না হইলে আত্মার মুক্তি হয় না। শ্রাদ্ধে বৎসতরী চতুষ্টয় সহিত বৃষ উৎসর্গের পর (বংশ বৃদ্ধির জন্য) যদৃচ্ছা বিচরণ করিতে ছাড়িয়া দেওয়াই বিধি। উৎসর্গীকৃত বৎসের দুগ্ধ দেবতা ব্রাহ্মণের ভোগে লাগে না। (ঐদুগ্ধ হিন্দুর অখাদ্য এই বোধ হয় শাস্ত্রের নির্দ্দেশ)। উৎসর্গীত বৎস ২।১ বৎসর পরই গাভীতে পরিণত হইয়া কেবল তাহাদের বৎসদেরই দুগ্ধ দিবে।

আমাদের বিশ্বাস ভারতে মুসলমান আগমনের পর শ্রাদ্ধের এই বৎস তরী ও বৃষ যদৃচ্ছ বিচরণ করিতে ছাড়িয়া দেওয়ার বিধি উঠিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে। এখন আমরা চিন্তা করিয়া দেখিতে পারি ভারতের মুসলমান আমলের পূর্ব্বযুগে পূর্ব্বোক্ত উৎসর্গীত যদৃচ্ছা বিচরণ কারী বৃষ ও গাভীকুল সমন্বিত ভারতের গোধন কিরূপ সমৃদ্ধ ছিল।

ভারতবাসীর দুর্ব্বলতা, রোগ প্রবনতা, বিশেষভাবে শিশুমৃত্যু কমাইবার চিন্তা করিতে করিতে আইনসভার (তথা কথিত) নেতৃমণ্ডলী আমাদের উপর সর্ব্বদা আইন চাপাইয়া দিয়াছেন।

দেশের ও ভিন্নদেশের পণ্ডিতগণ এবং কলিকাতার স্বাস্থ্য বিভাগীয় কর্ত্তা একাধিকবার বলিয়াছেন এদেশের খাদ্যাভাব দূর করা ছাড়া ঐ সমস্ত বিপদের অন্য ঔষধ নাই। বিশেষ শিশুমৃত্যুর যে প্রধানতম কারণ দুগ্ধাভাব ইহা একরূপ সর্ব্ববাদি সম্মত।

ভারতবাসীর (বিশেষতঃ হিন্দুর) প্রধান ও একমাত্র পুষ্টিকর খাদ্য দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত ঘৃত দধি প্রভৃতি।

দুগ্ধ যে এদেশ হইতে লোপ পাইতে বসিয়াছে তাহা সর্ব্বসাধারণের নিকট সুবিদিত। (কি বলিব দুঃখের কথা ভারতবর্ষের চেয়ে ইংলণ্ডে খাঁটি দুধ অনেক সস্তা)।

এ অঞ্চলে আমরা ছোটবেলায় দেখিয়াছি, কোন বাড়ীতে বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ হইলে, বাড়ীর গোয়ালা ঐ সব বাছুর লইয়া যাইত এবং হাটে অথবা যত্র তত্র হিন্দু, মুসলমান, কসাই, মুচি যে কেহর নিকট বিক্রয় করিত। শ্রাদ্ধের বাছুর বলিয়া একটুও বিচার বিবেচনা করিত না। ২।৩ বৎসর পর পর জেলা ঢাকা, মহকুমা মাণিকগঞ্জের নিকট শিবালয় গ্রামের বহুদিনের প্রতিষ্ঠিত ৺শিববাড়ীর পাইকপিয়াদা গোছ লোক আসিয়া গোয়ালাদের নিকট ঐ সব বাছুর বিক্রয়ের অর্থ দাবী করিত, কেহ কিঞ্চিৎ দিত কেহ কেহ বা 'এখন দিতে পারিনা, পর যাত্রায় দিব' ইত্যাদি বলিয়া কহিয়া বিদায় করিত। বলা বাহুল্য ঐ সব পাইকপিয়াদা অতি নিম্নস্তরের লোক দেখিয়াছি, তাহারাও আদায়ী অর্থ সমস্ত ৺শিব বাড়ীতে দিত কিনা তাহাও সন্দেহের বিষয়। এই শ্রাদ্ধের বাছুর বিক্রয়ের টাকা লইয়া ৺শিববাড়ীর কর্ম্মকর্ত্তা গণের সহিত গোয়ালাগণের একটি মামলাও হইয়াছিল।

যাহা হউক ক্রমে বৃষোৎসর্গের বাছুর গোয়ালাদের বৃত্তি হইয়াই পড়িয়াছিল।

প্রায় বৎসর দশেক হইতে ক্রমে ক্রমে এ অঞ্চলের বহুগ্রামে গোয়ালাদের ঐবৃত্তি উঠাইয়া দিয়া ৺কালীবৃত্তি করা হইয়াছে। এই প্রথা আরও মন্দ হইয়াছে। গোয়ালাগণ ইচ্ছা করিলে শ্রাদ্ধের বাছুর নিজ বাড়ীতে রাখিয়া বিচার-বিবেচনা করিয়া বিক্রয় করিতে পারিত কিন্তু গ্রাম্য বারোয়ারী ৺কালীপূজার কর্মকর্ত্তা প্রায়শঃ ১৮।২০ বৎসর বয়স্ক শ্রমবিমুখ অলস যুবক, তারা নগদমূল্য লইয়া নির্ব্বিচারে বিক্রয় করে, ফলে শত করা ৯৫টি বাছুর কসাইএর হাতে পতিত হয়। কসাইগণ অবশ্য শ্রাদ্ধের খোজ খবর করিয়া গ্রামে আসিয়া ঢোকে না কিন্তু অতি অল্প মূল্যে যাহারা শ্রাদ্ধের বাছুর খরিদ করে তাহারা নিকটবর্ত্তী হাটে কসাইর কাছে উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিয়া টাকায় ১১০, ১॥০ লাভ করিয়া থাকে। সাধারণতঃ গৃহস্থ যে মূল্যে গরু খরিদ করে, উহা অপেক্ষা বেশী মূল্য না দিলে কোন বিক্রেতা কসাইদের কাছে গরু বিক্রয় করে না। প্রায় প্রতি গ্রামেই এমন ২।১টি মুসলমান মাতব্বর আছে যারা শ্রাদ্ধের বাছুর প্রথম খরিদ করিয়া দেয় এবং কার্য্যান্তে নাম মাত্র মূল্য দিয়া খরিদ করিয়া যদৃচ্ছা বিক্রয় করে।

আমরা শ্রাদ্ধাধিকারী এবং বাছুর সংগ্রাহক ও তৎক্ষণাৎ খরিদ কারি উভয়ের নিকটই সম্যক্ অবস্থা বুঝাইয়া প্রতিকার প্রার্থনা করিয়াছি। কিঞ্চিৎ কখন প্রতিকার হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, অধিক ক্ষেত্রেই উপেক্ষিত হইয়াছি।

আমি খোঁজখবর করিয়া দেখিয়াছি এ জেলায় অনেক স্থানে এখনও ঐ সব বাছুর বৃত্তি বলিয়া গোয়ালাগণই লইয়া থাকে। মুখে অবশ্য বলে অমুক অমুক ৺শিববাড়ীতে রীতিমত বৃত্তি দিয়া থাকি। উহাও আমি যথাসম্ভব খোঁজ করিয়া দেখিয়াছি কেহ (গোয়ালাগণ) নিকটবর্ত্তী ৺শিববাড়ীতে শিবরাত্রির মেলায় গেলে দু'এক আনা হয়তঃ দিতে পারে কিন্তু ঐ শ্রাদ্ধের বাছুর বিক্রয়ের টাকার কোন অংশ ৺শিববাড়ীতে দেওয়ার প্রবৃত্তি কাহারও নাই, দেয়ও না।

আমার মনে হয় এই বঙ্গদেশেই প্রতি বৎসর হাজার হাজার শ্রাদ্ধের বাছুর কষাইর ছুরিতে হত্যা হয়। আমাদের এ অঞ্চলে এমন হিন্দুপ্রধান গ্রামও আছে যে গ্রামে প্রতি বৎসর ৪।৫টি বৃষোৎসর্গ হইয়া থাকে।

ইহার প্রতিকার কি ?

এখন আর শ্রাদ্ধের বাছুর যথাযথ যদৃচ্ছা বিচরণ করিতে ছাড়িয়া দিবার উপায় নাই। আমরা এ বিষয় বহু চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, আমাদের মনেহয় প্রতি মহকুমায় ১০ খাদা (১৬ বিঘায় ১ খাদা) পরিমিত একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট গোচারণ ভূমি ঠিক করিয়া এবং তাহা পরিচালনার বন্দোবস্ত করিয়া হিন্দুসাধারণের নিকট এবং বিশেষভাবে পুরোহিত-মণ্ডলীর নিকট সম্যক অবস্থা বুঝাইয়া আবেদন জানাইলে শ্রাদ্ধের বাছুরের উপরোক্ত গতি ক্রমে ক্রমে রোধ হইয়া যাইতে পারে। হয়ত প্রথম প্রথম কোন কোন ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ কালীবৃত্তি লাগিতে পারে। কে এমন মহৎ আছেন যিনি আমাদের এই জ্ঞানকৃত পাপ দূর করিতে অর্থ ও শক্তি নিয়োগ করিবেন ?

বঙ্গদেশে প্রায় সমস্তই হিন্দু জমিদার এবং প্রত্যেক জমিদারীতেই পাহাড় অঞ্চলে এবং বাসোপযোগী অঞ্চলেও এখনও বহু বহু অনাবাদি ভূভাগ পড়িয়া আছে ইহা আমরা ভালরূপেই জানিয়াছি। চেষ্টা করিলে এই উদ্দেশ্যে গোচারণ ভূমি সংগ্রহ করা কঠিন হইবে বলিয়া একেবারেই মনে হয় না। প্রথম প্রথম অল্প অল্প স্থান সংগ্রহ করিয়াই কার্য্য আরম্ভ করা যাইতে পারে।

এ দেশের ব্যবসায়ী ধনি মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের গোরক্ষণী সমিতি আছে, তাঁহাদের এবং দেশের জমিদার ও মহাজনগণের এবিষয়ে দৃষ্টিদিতে আমি সবিনয়ে প্রার্থনা করি।

এ সম্বন্ধে আমার নিকট কিছু জানিতে হইলে আমাকে লিখিলেই আমি সত্বর যথাসাধ্য উত্তর জানাইব। নিবেদন ইতি।

হিন্দুসভা ও ব্রাহ্মণপণ্ডিত

হিন্দুসমাজের কল্যাণসাধনের জন্য হিন্দুসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হিন্দুসমাজ শাস্ত্র-প্রমাণে পরিচালিত হয়, ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দাতা—সুতরাং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-গণের পরিপোষণ না পাইলে হিন্দুসভা সাধারণ হিন্দুসমাজে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ যাহাতে হিন্দুসভার মত পরিপোষণ করেন তাহার জন্য হিন্দু সভার কর্তৃপক্ষীয়গণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, চেষ্টা সফল হয় নাই, ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ হিন্দুসভায় যোগদান করিতে বা হিন্দুসভার মত পরিপোষণ করিতে সম্মত হয়েন নাই, সম্মত না হইবার হেতু—হিন্দুসভার কার্য্যতালিকায় এমন সকল বিষয় স্থান পাইয়াছে যাহা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় একাধিকবার হিন্দুসভার সভাপতিত্ব করিয়াছেন। মৈমনসিংহের হিন্দুসভায় তিনি প্রথম সভাপতিত্ব করেন, তর্কভূষণ মহাশয় সভাপতিত্ব স্বীকার করায় অনেকে আশা করিয়াছিলেন তিনি হিন্দুসভার অশাস্ত্রীয় নির্দ্ধারণের প্রতিবাদ করিবেন ও তাঁহার চেষ্টায় হিন্দুসভার কার্য্যতালিকার পরিবর্ত্তন ঘটিবে। অভিভাষণ বাহির হইলে দেখাগেল আশা ফলবতী হয় নাই, তিনি হিন্দুসভার অশাস্ত্রীয় নির্দ্ধারণ সমূহকে শাস্ত্রীয় প্রমাণ করিতে প্রয়াস করিয়াছেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ তাঁহার কার্য্যের যথোচিত প্রতিবাদ করিয়াছেন ও তাহার মতবাদ যে অশাস্ত্রীয় তাহাও অনেকে সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে শুভফল ফলে নাই। তর্কভূষণ মহাশয় স্বমত প্রচারে নিরস্ত হয়েন নাই।

সম্প্রতি "পাবনা জেলার হিন্দু সম্মিলনীর" সভাপতিরূপে তিনি যে অভিভাষণ পাঠ করিয়া-

ছেন তাহাতে তীব্রভাষায় প্রতিবাদী ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে আক্রমণ করা হইয়াছে। তর্কভূষণ মহাশয় বলিয়াছেন—"হিন্দু মহাসভা হিন্দুর সর্বতোমুখী জাতীয় উন্নতির জন্য প্রধানভাবে চারিটী কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, ইহা আপনাদের কাহারও বোধ হয় অবিদিত নাই; সেই চারিটি কার্য্য হইতেছে—শুদ্ধি, সংগঠন, অস্পৃশ্যতা পরিহার ও বাল বিধবার বিবাহ।

বর্ত্তমান সময়ে এই চারিটি কার্য্য না করিলে হিন্দুজাতির অস্তিত্ব যে অচির-কালের মধ্যেই বিলুপ্ত হইবে ইহাই হইল হিন্দুসভার দৃঢ় বিশ্বাস, হিন্দুর ধর্ম্ম শাস্ত্র এই কয়টি অত্যাবশ্যক কার্য্যের অনুমোদন করিয়া থাকে, ইহাই আমি মৈমনসিংহের অভিভাষণে জানাইয়াছি, আমার এই সিদ্ধান্তের কেহই এ পর্য্যন্ত খণ্ডন করিতে পারেন নাই; প্রত্যুত যে কয়জন প্রাচীনপন্থী খণ্ডন করিবার প্রয়াসে সংবাদপত্র বা সভাতে বাগ্জাল বিস্তার করিয়া নিজদেশের মধ্যে প্রসংশালাভে কৃতার্থম্মন্য হইয়াছেন, তাহাদিগের বক্তৃতার ও প্রবন্ধাবলীর অধিকাংশই শিষ্ট বিগর্হিত অকথ্য ভাষায় গালাগালিতে কলঙ্কিত; তাহাদিগের সকল যুক্তিই অন্তঃসার শূন্য, তাহাতে তাহাদের হিন্দুশাস্ত্র রহস্য বোধ—শোচনীয় অসামর্থ্যের পরিচয় প্রতিপদেই ফুটিয়া উঠিয়াছে, উপরোক্ত শাস্ত্রজ্ঞ ও ব্যবহারজ্ঞ মনীষী ব্যক্তিকে মধ্যস্থ রাখিয়া বিচার দ্বারা নিজ মন্তব্যের সমর্থন করিতে তাঁহারা পশ্চাৎপদ; প্রাচীনতা ও গতানু-গতিকতার দোহাই ছাড়া তাঁহাদের বক্তৃতা বা প্রবন্ধে আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না; তাঁহারা শাস্ত্রের দোহাই দিতে যেমন মজবুত শাস্ত্র বুঝিতে তেমনি অপারগ, সুনিয়ন্ত্রিত সভ্য মণ্ডিত বিচার সভায় উভয় পক্ষ সম্মানিত অন্ততঃ তিন জন মধ্যস্থের সাহায্যে তাঁহারা যদি নিজ মতের প্রামাণিকতা ব্যবস্থাপন করিতে সমর্থ হয়েন, তাহা হইলে হিন্দুসভা এই চারিটি কার্য্যের অবৈধতা মানিয়া লইবে।" দৈনিক বসুমতী ২৩।১১।

ভারতের অভিনব সামাজিক ব্যাধি সমূহের মধ্যে ইহা অন্যতম অসাধ্য ব্যাধি, ইহার প্রতিকার নাই, কাশীধামে যে ব্রাহ্মণমহাসম্মেলন হইয়াছিল তাহাতে ভারতের বিভিন্নসম্প্রদায়ের ধর্ম্মাচার্য্যগণ ও ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন, ঐ সকল বিষয়ে দ্বাদশ দিন বিচার হইয়াছিল; সিদ্ধান্ত হইয়াছিল হিন্দুসভা যে চারিটি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা অশাস্ত্রীয়। তর্ক-ভূষণ মহাশয়ের সহিত শাস্ত্রবিচারে ভারতের প্রখ্যাত সমস্ত ব্রাহ্মণপণ্ডিত পশ্চাৎপদ, ইহা যাহারা বিশ্বাস করিতে চাহেন তাঁহারা তাহা করিতে পারেন, তর্কভূষণ মহাশয়কে অশিষ্ট জনোচিত অকথ্য ভাষায় কাহারা গালাগালি করিয়াছেন আমরা জানি না, তবে আমাদের বিশ্বাস তর্কভূষণ মহাশয় ভারতের অতীত ও বর্ত্তমান শাস্ত্রজ্ঞ মনীষীবৃন্দকে ধিক্কার দিয়া যে দাম্ভিকতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, শিষ্টজনোচিত এই প্রকার দাম্ভিকতা যদি হিন্দুসমাজে সংক্রামিত, হয় তাহা হইলে হিন্দুসমাজের অতিশয় অকল্যাণ হইবে, তর্কভূষণ মহাশয় যে ব্রাহ্মণপণ্ডিত গণকে ধিক্কার দিয়া নিরস্ত হইয়াছেন তাহা নহে; সর্ব্বজনমান্য যে সকল নিবন্ধকারগণের মীমাংসিত শাস্ত্রার্থ প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া হিন্দুসমাজ পরিচালিত হইতেছে ঐ সকল নিবন্ধকারগণকেও ধিক্কার দিয়াছেন।

আমরা শাস্ত্ররহস্যজ্ঞতার অভিমান করি না; কিন্তু পূর্ব্বাচার্য্যগণের ও বর্ত্তমানবিদ্বৎ মণ্ডলীর অবমাননায় যাতনা অনুভব করি, এই জন্য পূর্ব্বাচার্য্যগণ মীমাংসিত ও শিষ্টসমাজ পরিগৃহীত শাস্ত্রার্থের বিপ্লব ঘটাইতে যাঁহারা প্রয়াস করেন তাঁহাদের কার্য্যের ও বাক্যের প্রতিবাদ কর্ত্তব্য বুঝি, এই প্রকার প্রতিবাদ স্বীয় কর্ত্তব্য পালন ও হিন্দু সমাজের কল্যাণ সাধন হয় ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

তর্কভূষণ মহাশয়ের অভিভাষণ পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়, তিনি তাঁহার অভিভাষণ সাধারণজনপ্রিয়—করিবার জন্য যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন তাহা শাস্ত্রানুযায়ী সরল প্রণালী নহে।

অভিভাষণের প্রথমাংশে "হিন্দুর জাগরণ" নাম দিয়া ভাবপ্রবণ ইংরেজী শিক্ষিতগণের অনুকরণে আবেগময় ভাষায় হিন্দুজাতির বর্ত্তমান দুর্দ্দশা কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন, ইহাতে সাধারণ শ্রোতার মনে উত্তেজনা আনয়ন করা হইয়াছে। পরে হিন্দুর অতীত গৌরবের কথা বলিয়াছেন; এমন ভাবে এ সকল বলা হইয়াছে যাহাতে সাধারণে বুঝে যে, হিন্দুজাতির বর্ত্তমান দুর্দ্দশা চিরাচরিত শাস্ত্রীয়-অনুষ্ঠান ও সমাজপদ্ধতির অনুসরণের ফল এবং তর্কভূষণ মহাশয় যাহা বলিতেছেন তাহাতে অতীতের গৌরব আবার ফিরিয়া পাওয়া যাইবে। এইভাবে শ্রোতৃবর্গের অন্তরে উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া প্রকৃত অভিভাষণ আরম্ভ করা হইয়াছে, তর্কভূষণ মহাশয় বলিয়াছেন "হিন্দুসমাজ সনাতন ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত এ বিষয়ে কি নব্যপন্থী বা প্রাচীন পন্থীর মধ্যে মতভেদ না থাকিলেও সনাতন ধর্ম্ম যে কি তাহা লইয়া কিন্তু দুইটি মত দাঁড়াইয়াছে, প্রাচীনপন্থীগণ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া তারস্বরে বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন বিজ্ঞানেশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য পর্য্যন্ত স্মৃতিনিবন্ধকারগণ নিজ নিজ নিবন্ধ গ্রন্থে শ্রুতি স্মৃতি ও পুরাণের তাৎপর্য্য বর্ণন দ্বারা যে সকল বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের স্বরূপ নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, তাহা সকল হিন্দুরই সনাতন ধর্ম্ম। সেই সনাতন ধর্ম্মের উপরেই হিন্দুসমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল, এখনও আছে এবং চিরকালই এইরূপ থাকিবে তাহার পরিবর্ত্তন হইতে পারে না; পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন জন্য যাহারা চেষ্টা করেন তাহারা ভ্রান্ত। তাঁহাদের মতানুসারে চলিলে হিন্দু সমাজ থাকিবে না; হিন্দুজাতির অস্তিত্ব লোপ পাইবে, বর্ত্তমান সময়েও সমাজ সংস্কারকগণ এই জাজ্বল্যমান অখণ্ডনীয় সত্যকে উপেক্ষা করিয়া দেশে কালাপাহাড়ী দল সৃষ্টি করিতেছে। এই কালাপাহাড়ীর দলকে ছাটিয়া হিন্দুসমাজ হইতে বাহির করিতে হইবে।" ইহার পরে সাধারণ জনগণের অন্তরে যাহাতে প্রাচীন পন্থীগণের উপরে বিদ্বেষ উপস্থিত হয় তাহার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন "ইহাদের ছায়া স্পর্শ করিলেও পাতিত্য হয় ইহাদিগকে—যে কোন উপায়ে হউক দমন করিতে হইবে, ইত্যাদি প্রকার বিদ্বেষ উৎপাদক বাক্‌জাল বিস্তার করিয়া প্রাচীন পন্থীগণের মতবাদের পরিসমাপ্তি করিয়াছেন।

নব্য পন্থীগণের মত বর্ণনায় বলিয়াছেন—"অন্যদিকে নব্যপন্থীগণ বলিতেছেন যে, প্রাচীন পন্থীগণের এইরূপ মত মানিয়া চলিলে হিন্দুর অস্তিত্ব অচিরেই বিলুপ্ত হইবে। প্রাচীন পন্থীর

মতে হাজার বৎসর চলিয়া হিন্দুসমাজ সর্ব্বনাশের পথে দাঁড়াইয়াছে। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম জাতিগত হওয়ায় সমাজের প্রত্যেক অঙ্গ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, ব্রাহ্মণের কোন গুণ না থাকিলেও ব্রাহ্মণের অধিকার মর্য্যাদা ও গৌরব ভোগ করিবার ফলে প্রকৃত ব্রাহ্মণ ভারত হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। রঘুনন্দনের মত যদি সত্য হয় তাহাহইলে—আমাদের দেশে একজনও ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য নাই; আছে কেবল কএকলক্ষ ব্রাহ্মণ আর কোটি কোটি শূদ্র অর্থাৎ হিন্দুর সমাজশরীরের মস্তক ও পাদ মাত্র বিদ্যমান সুতরাং বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বিরাট চীৎকারে দিক্‌মণ্ডল মুখরিত করিয়া তুলিয়াছেন তাঁহারা তাঁহাদেরই সিদ্ধান্ত অনুসারে সনাতন ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না।"

অভিজ্ঞ পাঠকগণ—প্রাচীন পন্থীর ও নবীনপন্থীর মত প্রকাশের ভাষণ ভঙ্গীর দিকে লক্ষ্য করিলেও বুঝিতে পারিবেন তর্কভূষণ মহাশয়ের বচনচাতুরী সাধারণ জনগণের অন্তরে প্রাচীন পন্থীর প্রতি বিদ্বেষ উৎপাদনে প্রয়াস করিয়াছে।

তর্কভূষণ মহাশয় কি প্রয়োজনে প্রাচীন পন্থীর ও নবীন পন্থীর মতদ্বয় বিবৃত করিয়াছেন তাহা নিজেই বলিয়াছেন "হিন্দু সমাজ সনাতন ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত এ বিষয়ে কি নবীন পন্থী বা প্রাচীন পন্থী কাহারও মধ্যে মতভেদ না থাকিলেও সনাতন ধর্ম্ম যে কি তাহা লইয়া দুইটী মত দাঁড়াইয়াছে।"

প্রাচীন পন্থীগণের মতে সনাতন ধর্ম্ম যে কি তাহা তর্কভূষণ মহাশয় কথঞ্চিৎ বলিয়াছেন কিন্তু নবীন পন্থীর মত বিবৃতি প্রসঙ্গে নবীন সনাতন ধর্ম্ম যে কি তাহা বলেন নাই, শুধু প্রাচীন পন্থীগণ যাহাকে সনাতন ধর্ম্ম বলেন তাহা যদি মানিয়া চলা যায় তাহাহইলে হিন্দু জাতির অস্তিত্ব যে অচির কালের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যায় এইটুকু সাধারণকে বুঝাইতে যে কৌশল প্রয়োজন নবীনপন্থীর মত বিবৃতিতে সেই কৌশলটুকু অবলম্বন করিয়াছেন। তর্কভূষণ মহাশয়, নবীনপন্থী নামে কাহাদের নির্দ্দেশ করিয়াছেন বুঝিতে পারা যায় না, অভিভাষণ যখন হিন্দুসভার সভাপতিরূপে করা হইয়াছে তখন বুঝিতে হয় হিন্দুসভার সভ্যগণই তর্কভূষণ মহাশয়ের অভিপ্রেত নবীন পন্থী। আমরা যতদূর জানি তাহাতে ব্রাহ্ম আর্য্যসমাজী বিলাতপ্রত্যাগত প্রভৃতির সমবায়ে হিন্দুসভা গঠিত। আর্য্যসমাজীও ব্রাহ্মেরা হিন্দুসভার নেতৃত্ব করিয়া থাকেন, হিন্দুসভার এই সকল নবীনপন্থীসভ্যগণ কি তর্কভূষণ মহাশয়ের বিবৃত মত পোষণ করিয়া থাকেন? ঐ প্রকৃতির নবীনপন্থীগণ সর্ব্বসম্মতিতে সনাতন ধর্ম্মের কি লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন এবং সেই সনাতন ধর্ম্মের উপর হিন্দুসমাজ কিভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন? জাতিগত চাতুর্ব্বর্ণ্য রহিত করিয়া শাস্ত্রোক্ত গুণানুসারে চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থাপনে কি হিন্দু সভার সভ্যগণ সকলেই আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন? তর্কভূষণ মহাশয়ের বুঝা উচিত ছিল এ সকল প্রশ্ন সাধারণ জনগণের অন্তরেও উপস্থিত হইতে পারে; এ সকল প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া তর্কভূষণ মহাশয়ের উচিত ছিল; তাহা না দেওয়ায় লোকে বুঝিবে তর্কভূষণ মহাশয়ের কল্পিত নবীন পন্থী হিন্দুসভায় নাই, সে নবীন পন্থী স্বয়ং তর্কভূষণ মহাশয়।

আমরাও তাহাই বুঝিয়াছি। যদি আমাদের ভ্রম হইয়া থাকে—সত্যই যদি ঐ প্রকৃতির নবীনপন্থীর দলই হিন্দু সভার সভ্য হয়েন; তাহাহইলেও ঐ নবীন পন্থী দলের প্রধান শাস্ত্রোপদেষ্টা যে তর্কভূষণ মহাশয় তাহাতে সন্দেহ নাই সুতরাং নবীনপন্থীগণের সনাতন ধর্ম্মের লক্ষণ তর্কভূষণ মহাশয়ের নিকট জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। আমরা জানি—

বিহিত ক্রিয়য়া সাধ্যো ধর্ম্মঃ পুংসো গুণো মতঃ।

বিহিতকর্ম্ম সাধ্য স্বর্গাদিসাধন অপূর্ব্ব বা অদৃষ্টবিশেষের নাম ধর্ম্ম, নবীনপন্থীগণ কি ইহা অস্বীকার করেন? যদি না করেন—তাহা হইলে সনাতনধর্ম্ম যে কি ইহা লইয়া মতভেদ সম্ভব হয় কি করিয়া? কোনটা বিহিত ক্রিয়া আর কোনটা অবিহিত ক্রিয়া ইহা লইয়া যদি মত ভেদ হয়, তাহা হইলে তর্কভূষণ মহাশয় যে সকল ক্রিয়া শাস্ত্রের দ্বারা বিহিত প্রমাণ করিতে না পারেন সেই সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠাতৃবর্গ তর্কভূষণ মহাশয়ের মতেও নবীনপন্থী হিন্দু নহে, হিন্দু সভার সভ্য তালিকা হইতে তাঁহাদের নাম কি উঠিয়া যাইবে? অথবা তর্কভূষণ মহাশয় শাস্ত্রোক্ত গুণ কর্ম্ম বিচার পূর্ব্বক তাঁহাদের মধ্যে চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থাপন করিয়া হিন্দুসমাজকে নবীন সনাতন ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত করিবেন?

হিন্দুসমাজ সনাতন ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত এবিষয়ে যখন মতভেদ নাই এবং বিরাট একটা হিন্দুসমাজ যখন আজও বর্ত্তমান রহিয়াছে তখন হিন্দুসমাজের ভিত্তি স্বরূপ সনাতন ধর্ম্ম বিষয়ে মতভেদ কেন হয় বুঝিতে পারা যায় না। সমাজের দিকে লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়; যে, যে বর্ণে বা যে জাতিতে জন্মিয়াছে সে সেই বর্ণের বা জাতির শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করে এবং কর্ত্তব্য বোধে তাহাই সে করিয়া থাকে; এইভাবে হিন্দু সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে সনাতন ধর্ম্ম ইহারই নাম, অর্থাৎ তত্তৎবর্ণের বা জাতির বিহিত কর্ম্মের নামই সনাতন ধর্ম্ম এবং ইহাই হিন্দুসমাজের ভিত্তি। এই ভিত্তি যে অনুপাতে শিথিল হইতেছে হিন্দুসমাজও সেই অনুপাতে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, যাঁহারা এই ভিত্তি সমূলে উৎপাটিত করিয়াছেন তাঁহারাই হিন্দুসভা গড়িতেছেন; তর্কভূষণ মহাশয় সেই হিন্দু সভার সভাপতিপদ অলঙ্কৃত করিয়া সনাতন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠ হিন্দুসমাজের অস্তিত্ব রক্ষায় ব্যগ্র হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের এই প্রকার অভিভাষণ বুঝিতে অনেক রহস্য বোধের প্রয়োজন হইতে পারে কিন্তু শাস্ত্ররহস্যবোধের যে বিন্দুমাত্র প্রয়োজন আছে এবিশ্বাস আমাদের নাই।

সর্ব্বজনমান্য স্মার্ত্তরঘুনন্দনভট্টাচার্য্য তথা ভারতের সমগ্র প্রাচীন ও নবীন পণ্ডিতগণকে তর্কভূষণ মহাশয় কিভাবে আক্রমণ করিয়াছেন এবং সেই আক্রমণের সহিত সাধারণ জনগণের মধ্যে উত্তেজনা আনয়নে কেমন প্রয়াস করিয়াছেন তাহা প্রণিধান যোগ্য॥

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কোন শাস্ত্র প্রণয়ন করেন নাই ঋষি প্রণীত শাস্ত্রের আপাতবিরুদ্ধ বচন সমূহের বিরোধ ভঞ্জন করিয়া প্রকৃত শাস্ত্রার্থনির্ণায়ক নিবন্ধ রচনা করিয়াছেন। শাস্ত্রে রহিয়াছে—কলিতে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুই বর্ণ আছে, স্মার্ত্তরঘুনন্দন তাঁহার নিবন্ধে সেই শাস্ত্র বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তর্কভূষণ মহাশয় স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যধৃত বচনের অপ্রামাণ্য প্রতিপাদনে

সাহস করেন নাই। আক্রমণ করিয়াছেন স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যকে ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীকে। সাধারণ জনগণের মধ্যে উত্তেজনা উৎপাদনের কেমন কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন দেখুন, তর্কভূষণ মহাশয় বলিয়াছেন—'ইহার উত্তরে যদি কোন প্রাচীনপন্থী বলেন—কাজ কি আমার ক্ষত্রিয়ে বা কাজ কি আমার বৈশ্যে। এই কলিযুগে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র অর্থাৎ সেব্য ও সেবক এই দুইটি বর্ণের সমাবেশ যদি থাকে, তাহা হইলেই সনাতন ধর্ম্ম রক্ষিত হইবে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের আমলে ইহা ছিল, তখন যদি হিন্দুর হিন্দুত্ব লোপ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে এখনই বা তাহার লোপ হইবে কেন। ইহার উত্তরে নবীন পন্থীগণ বলেন—বেশকথা, তাহাই যদি তোমার কলিযুগের সনাতনধর্ম্মের অভিলষণীয় হয় তবে তাহাই সংস্থাপিত করিবার জন্য প্রাণপণে লাগিয়া যাও না কেন? দেশে বাণিজ্য বন্ধ কারণ—বৈশ্য নাই, বাণিজ্য করিবার আর কাহার অধিকার থাকিতে পারে? বাণিজ্য চুলায় যাক, পীড়িত দুর্ব্বলকে অত্যাচারীর হস্ত হইতে নিরস্ত্র ক্ষত্র দ্বারা রক্ষা করিবার জন্য উদ্যত হইবার কোন আবশ্যকতা নাই, কারণ—ইহাত ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম; এ ভারতে যখন এ যুগে একজনও ক্ষত্রিয় নাই এবং ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের পালন যথা ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের পক্ষে বিধেয় নহে—ইত্যাদি"

তর্কভূষণ মহাশয় কি মনে করেন—ভারতের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের এতটা অধঃপতন ঘটিয়াছে যে, এইপ্রকার প্রলাপবাক্যের উত্তরদানের জন্য তাঁহারা শাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হইবেন? স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন—

শনকৈশ্চ ক্রিয়ালোপাৎ ইমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ ॥

ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার ও সন্ধ্যাবন্দনাদি ক্রিয়া লোপনিবন্ধন ক্ষত্রিয়গণ শূদ্রত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে, যুদ্ধবিগ্রহ বা আর্ত্তত্রাণ পরিত্যাগ করায় শূদ্রত্বপ্রাপ্ত হয় নাই, শূদ্রত্বপ্রাপ্তির তাহা হেতুও নহে, আর্ত্তত্রাণ, আত্মরক্ষা প্রভৃতির জন্য যাহা কর্ত্তব্য তাহাতে প্রতিব্যক্তির অধিকার আছে, স্বভাবতঃই সে অধিকার মানুষ পালন করিয়া থাকে; তর্কভূষণ মহাশয় নূতন চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্টি করিলেও ইহার অন্যথা হইবে না।

তর্কভূষণ মহাশয় বলিয়াছেন—তাঁহার শাস্ত্রব্যাখ্যার দোষ প্রদর্শনে আজ পর্য্যন্ত কোন পণ্ডিতই সমর্থ হয়েন নাই—শুধু অশিষ্টজনোচিত গালাগালি মাত্র করিয়াছেন। অজ্ঞ লোকের মধ্যে সম্মান রক্ষার জন্য এমন ঘোষণা প্রয়োজন হইতে পারে—যাঁহারা অভিজ্ঞ তাঁহাদের নিকট এমন কথা বলিয়া আত্মসম্মান রক্ষা করা যায় না।

"হিতবাদী"তে "ব্রাহ্মণের বিপ্রলিপ্সা" শিরোনাম দিয়া এক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে ঐ প্রবন্ধে তর্কভূষণ মহাশয়েরই শাস্ত্রব্যাখ্যার বিপ্রলিপ্সা প্রদর্শিত হইয়াছে। হিতবাদীর সম্পাদকও যে বিপ্রলিপ্সা অনায়াসে ধরিয়া দিতে পারেন তাহার জন্য অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিত কেন প্রয়োজন হইবে—আমরা বুঝিতে পারি না। আমরা তর্কভূষণ মহাশয়কে গালাগালি

কখনও করি নাই—তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সাধারণ-বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের মধ্যেও কিভাবে বিনষ্ট হইতেছে ও তাঁহার কর্ম্মদোষে সমাজের কত অনিষ্ট হইতেছে, তাহা চিন্তা করিলে অনুতপ্ত হইতে হয়—তাই তাঁহার অপকর্ম্মের দিকে লক্ষ্য করিয়া তিরস্কার করিয়াছি। আমাদের যতটুকু শাস্ত্রজ্ঞান আছে তাহাতে আমরা বুঝিয়াছি, ইহা অশিষ্টজনোচিত হয় নাই। তর্কভূষণ মহাশয় শিষ্টাচার ত একেবারেই মানিতে চাহেন নাই—শিষ্টপরিগৃহীত শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে যাইয়াও স্বমতের প্রতিকূল অংশটুকু বাদ দিয়া ব্যাখ্যাতৃগণের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিয়া শিষ্টতার চরম উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন। আর আমরা কি করিয়াছি?

আমরা তর্কভূষণ মহাশয়ের মৈমনসিংহের অভিভাষণ হইতে আজ পর্য্যন্ত যত অভিভাষণ পাঠ করিয়াছি তাহাতে বর্ত্তমানের ভ্রান্ত রাজনৈতিকগণের মত প্রথমে ম্লেচ্ছজাতীয়গণের সহিত বৈষম্য নিবন্ধন হিন্দুর যে পার্থিব অনিষ্ট ঘটিতেছে তাহা প্রদর্শন করা হইয়াছে; তাহার পরে ম্লেচ্ছজাতীয়গণের তুল্যতা প্রাপ্তির জন্য শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

জিজ্ঞাসা করি—শিষ্টপরম্পরা পরিগৃহীত শাস্ত্রার্থের বিপর্য্যয় ঘটাইবার পক্ষে ঐ প্রকার হেতু নির্দ্দেশ কি শিষ্টসম্মত না শাস্ত্রানুমোদিত? মনু বলিয়াছেন—

শ্রুতিস্তু বেদোবিজ্ঞেয়ো ধর্ম্মশাস্ত্রন্তু বৈ স্মৃতিঃ।
তে সর্ব্বার্থেষ্বমীমাংস্যে তাভ্যাং ধর্ম্মোহি নির্ব্বভৌ।
যো ব মন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্দ্বিজঃ।
স সাধুভির্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ॥

ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি নিষেধ, স্বর্গ নরক ফলক শুভাশুভ অদৃষ্টের হেতু; বিধিনিষেধের সহিত শুভাশুভ অদৃষ্টের কার্য্য কারণ ভাব, অনুমানাদি প্রমাণগম্য নহে সুতরাং হেতুশাস্ত্রের আশ্রয়ে ধর্ম্মাধর্ম্ম নিরূপিত হয় না, শিষ্টপরিগৃহীত শাস্ত্রার্থের অন্যথা করণের পক্ষে লৌকিকযুক্তি প্রযুক্ত হইতে পারে না এইজন্য মনু বলিয়াছেন—হেতুশাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যে শ্রুতি স্মৃতির অবমাননা করে তাহাকে সাধুরা বহিষ্কার করিবেন যে হেতু সে নাস্তিক ও বেদনিন্দক। যে পরলোকবিশ্বাস না করে তাহার নাম নাস্তিক, লৌকিক ইষ্টানিষ্টের দিকে লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্রের বিধিনিষেধ রচিত হইয়াছে ইহা যে প্রমাণ করিতে চাহে সে বিধিনিষেধের পারলৌকিক ফলে বিশ্বাস করে না সুতরাং সে নাস্তিক, নাস্তিক হইলে স্বভাবতঃই সে বেদনিন্দক হয় এই প্রকার ব্যক্তির বহিষ্কার বিধিপ্রাপ্ত, যাহা বিধিপ্রাপ্ত তাহা নাকরা শিষ্টজনোচিত না-করা শিষ্টজনোচিত? তর্কভূষণ মহাশয় শাস্ত্রপ্রমাণ ছাড়া কথা কহেন না, মনুর বিধিতে ত বুঝা যায় যাঁহারা সাধু তাঁহারাই "বহিষ্কার্য্য" বিধি পালনের অধিকারী; কেহ যদি সংবাদ পত্রে এই বিধি পালনে আস্তিক হিন্দু সম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ করে তাহা হইলে কি অশিষ্ট জনোচিত গালাগালি দেওয়া হয়? আমাদের যতটুকু জ্ঞান তাহাতে আমরা বুঝি সংবাদ পত্র সম্পাদনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া কোন আস্তিক ব্যক্তি যদি ইহা না করেন তাহাহইলে শুধু অশিষ্ট জনোচিত কাজ করা হয় না; প্রত্যবায় ভাগীও হইতে হয়।

নোয়াখালী ব্রাহ্মণ-সম্মিলনী।

গত ১৩ই ও ১৪ই পৌষ, শনি ও রবিবার খালিশপুরের শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পুকুরপাড়ে সুরঞ্জিত সামিয়ানার নীচে, স্বনামখ্যাত, পণ্ডিতকুলতিলক শ্রীযুক্ত সারদাচরণ বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সভাপতিত্বে নোয়াখালী ব্রাহ্মণ-সম্মিলনীর ১২ শ বার্ষিক মহাধিবেশন অতি সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। সভাতে অভূতপূর্ব্ব লোকসমাগম হইয়াছিল। উকিল, মোক্তার ডাক্তার, পণ্ডিত, মাষ্টার, ছাত্র প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণের ঐকান্তিক চেষ্টা ও যত্নে সভা সর্ব্ব বিষয়ে সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছিল।

১৩ই পৌষ শনিবার।

অপরাহ্ন ১ঘটিকার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ করা হয়। সভারম্ভে সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলী সমস্বরে সামগান দ্বারা মঙ্গলাচরণ করেন। শ্রীযুক্ত হরনাথ বাণীকণ্ঠ মহাশয় সুললিত ছন্দে সভার উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করেন। অভ্যর্থনাসভার সভাপতি মহাশয় স্থানীয় ইতিহাস মূলক অভিভাষণ পাঠ করিলে পর চিরাচরিত প্রথানুযায়ী সভাপতি নির্ব্বাচন ও মাল্যাদি প্রদান করা হয়। সভাপতি মহাশয় বাঙ্গালা কর্ত্তব্যমূলক দীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ করেন। সময়াভাবে সভাপতির অভিভাষণ ছাপান সম্ভব হয় নাই।

কার্য্যকরী-সমিতির সম্পাদক মহাশয় বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। "কার্য্য বিবরণীতে প্রকাশ—গত বৎসর ৬৮৵১ পাই সভার আয় ও ৫০৸০ ব্যয় হইয়াছে এবং সম্পাদকের হাতে ১৫৷৵৯ পাই অবশিষ্ট আছে। স্থায়ী তহবিলের ১১১৲ টাকা সেভিং ব্যাঙ্কে জমা আছে। একটি সমিতি পরিচালনের পক্ষে এই আয় ও ব্যয় অতি অকিঞ্চিৎকর। নানাবিষয়ে ২০টি ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। ১ম ও ২য় স্থানাধিকারী ছাত্রগণকে সামান্য সামান্য পুরস্কার দ্বারা পুরস্কৃত করা হইয়াছে। অর্থাভাবে কোনও কার্য্যই বিস্তৃতভাবে করা সম্ভব হয় নাই। বর্ত্তমান সময় বৈদিক সন্ধ্যা, নারায়ণপূজা, ক্রিয়াকাণ্ড, তন্ত্র ও বাংলা বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।" শ্রীযুক্ত রামচরণ কাব্যতীর্থ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ওজস্বিনী ভাষায় বিবাহ আইনের অপকারিতা সকলকে বুঝাইয়া দেন। সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় সায়ং সন্ধ্যা করার জন্য ২ ঘণ্টা সময় ও রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় "বিষয় নির্ব্বাচনী" সভাধিবেশনের কথা ঘোষণা করিয়া সভাপতি মহাশয় পরদিন পর্য্যন্ত সভা মুলতবী রাখেন।

১৪ই পৌষ রবিবার দ্বিতীয় দিবস।

এই দিনও অপরাহ্ন ১ ঘটিকার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ করা হয়। মাঙ্গলিক বেদমন্ত্র পাঠ ও প্রারম্ভ সঙ্গীতের পর শিক্ষাসমিতি হইতে গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১ম ও ২য় স্থানাধিকারী ছাত্রদিগকে পুরস্কৃত করা হয়। বিষয় নির্ব্বাচনী সভায় গৃহীত প্রস্তাব সমূহের আলোচনা, পুরস্কার বিষয়ক ঘোষণাও আগামী বৎসরের মহাধিবেশনের স্থান ঘোষিত হয়। সায়াহ্নে ৫ ঘটিকার সময় সায়ং সন্ধ্যা উপাসনার জন্য ১ ঘটিকা সভা স্থগিত রাখা হয়।

সন্ধ্যা ৬৷ ঘটিকায় পুনঃ সভার পুনঃ অধিবেশন হইলে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত কালীচর ভট্টাচার্য্য বি, এ মহাশয় ঘটিকাদ্বয় ব্যাপী সুচিন্তিত ও যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা সভ্য-মণ্ডলীকে আপ্যায়িত করেন। পৌষের দারুণ শীত ও শ্রোত্রীমণ্ডলীর শ্রবণ ব্যাঘাত জন্মায় নাই। প্রচারক মহাশয়ের অনুরোধে সভাপতি মহাশয় ৭ম ও ৮ম প্রস্তাব সভায় উত্থাপন করেন ও সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। রাত্রি ১০ টাতে সভাপতির আদেশে সভা ভঙ্গ করা হয়।

উল্লেখ যোগ্য গৃহীত প্রস্তাবাবলী।

১ম প্রস্তাব—আব্রহ্ম স্তম্বপর্য্যন্ত সকল জীবের মঙ্গল হউক।

৩য় প্রস্তাব—এই সভা সনাতন ধর্ম্মানুরাগী, দানবীর, স্বর্গীয় ৺ মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে। এবং তাঁহার সুযোগ্য পুত্রের দুঃখে সম বেদনা প্রকাশ করিতেছে।

৪র্থ প্রস্তাব—রায়সাহেব হরবিলাস সর্দ্দার ১৯২৯ ইং সনের বিবাহ আইন—বিপুল জনমত উপেক্ষা করিয়া গৃহীত হইয়াছে। এবং উক্ত আইন সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম; শাস্ত্র,নীতি ও মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা বিরুদ্ধ, এবং হিন্দুসমাজে বিষম গ্লানি ও বিপ্লব আনয়ন করিবে। অতএব এই মহাসভা উক্ত আইনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ এবং সমর্থন-কারী হিন্দুসদস্যগণ বিশেষতঃ এই বিভাগের নির্ব্বাচিত হিন্দু সদস্যের প্রতি তীব্র অনাস্থা জ্ঞাপন করিতেছে।

৫ম প্রস্তাব—ডাঃ হরিসিং গৌরের উপস্থাপিত সহবাস সম্মতি বিলের বিরুদ্ধে এই মহাসম্মি-লনী তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে।

৬ষ্ঠ প্রস্তাব—উক্ত প্রস্তাব দ্বয়ের অনুলিপি বড়লাট ও এই বিভাগের নির্ব্বাচিত সদস্যের নিকট প্রেরণ করা হউক।

৭ম প্রস্তাব—যে সকল সংবাদ পত্র নিরপেক্ষভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক সকল পক্ষের সংবাদ প্রকাশ না করেন, এই সভা সেই সকল সংবাদপত্র পরিচালক বর্গের কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা করিতেছে। এবং অদূর ভবিষ্যতে যদি ঐ সকল সংবাদ পত্র তাহাদের অবলম্বিত এই নিকৃষ্ট নীতি পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে এই সভা দেশবাসি-গণকে এই সকল সংবাদ পত্র বর্জ্জন করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছে।

৮ম প্রস্তাব—ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার আগামী নির্ব্বাচনে যাহাতে সমাজ বিপ্লবী ব্যক্তিগণ নির্ব্বাচিত না হয়েন, তদ্বিষয় সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার জন্য এই সভা হিন্দু ভোটদাতাগণকে সবিশেষ অনুরোধ করিতেছে।

বিবাহ আইনে হিন্দুর কর্ত্তব্য

হরবিলাস সর্দ্দার বিবাহ আইনের পাণ্ডুলিপি রচনার কাল হইতে হিন্দুসমাজ ভীত বিত্রস্ত হইয়া হাহাকার করিতেছে, কত আবেদন নিবেদন করা হইয়াছে, আস্তিক হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ লাট দরবারে উপস্থিত হইয়া কাতর কণ্ঠে সাশ্রুনেত্রে বিপৎ প্রতিকারের প্রার্থনা জানাইয়াছেন, সকলেই এতদিন আশা নৈরাশ্যের সংশয় বিক্ষিপ্তচিত্তে রাজপুরুষগণের মুখাপেক্ষী হইয়া কাল কাটাইতেছিলেন—অনেকের অন্তরে নৈরাশ্য অপেক্ষা আশাই বলবতী হইয়াছিল; অনেকে বুঝিয়াছিলেন কিয়ৎ সংখ্যক ধর্মভ্রষ্ট ও সমাজচ্যুত স্ত্রীপুরুষের সমর্থনকে বৃটিশ সরকার হিন্দুসমাজের সমর্থন বলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন; হিন্দুসমাজের প্রকৃত মনোভাব যখন বুঝিতে পারিবেন তখন নিশ্চয়ই ভ্রান্তি শোধন করিবেন। পাপভীত হিন্দুসমাজে যখন শিশুবিবাহের কোলাহল উত্থিত হইল, ভারতে যখন অভূতপূর্ব্ব ত্রাস বিহ্বলতা সর্ব্বত্র তুলারূপে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল; তখন অনেকে মনে করিয়াছিলেন, সর্দ্দা আইনের বিষময় মর্য্যাদার এই প্রতিবাদে বৃটিশ সরকার উপেক্ষা করিতে পারিবেন না, সর্দ্দা আইন রহিত করিয়া আতঙ্কগ্রস্ত ধর্মভীরু প্রজাকুলের আতঙ্ক দূর করিবেন ও পাপভীতি বিদূরিত করিয়া দিবেন। আশা ফলবতী হয় নাই—বৃটিশ সরকারের মনোভাবের পরিবর্ত্তনের কোন লক্ষণই দেখিতে পাওয়া যায় নাই, ১৮ই চৈত্র হইতে আইন বলবৎ হইবে অর্থাৎ ১৮ চৈত্রের পর হইতে যাহারা কন্যা পুত্রের বিবাহ দিবে তাহারা যদি আইনের নির্দ্দেশ পালন না করে তাহা হইলে জেল ও জরিমানা হইতে পারিবে। এখন হিন্দুসমাজের কর্ত্তব্য কি?

কর্ত্তব্য এখন সুস্পষ্ট সুনিরূপিত,—

> তাবৎ ভয়স্য ভেতব্যং যাবদ্ভয়মনাগতং।
>
> আগতন্তু ভয়ং বীক্ষ্য প্রতিকুর্য্যাৎ যথোচিতং।

ভয়ের ভাবনা ততকাল ভাবিতে হয়—যতকাল ভয় আসিয়া উপস্থিত না হয়, যখন শত সহস্র বাধা অতিক্রম করিয়া ভয় আসিয়া উপস্থিত হয় তখন বিহ্বলতা পরিত্যাগ করিয়া যথোচিত কর্ত্তব্য করিয়া যাইতে হয়। আমাদের অবস্থাও আজ তাহাই হইয়াছে, শত সহস্র বাধা অতিক্রম করিয়া ভয়াবহ সর্দ্দা আইন আমাদের ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে, এখন বিহ্বলতার ফল নাই, দৃঢ়চিত্তে আমাদের যথা কর্ত্তব্য করিয়া যাইতে হইবে।

ব্রাহ্মণপণ্ডিতশ্রেণী কখনও রাজনৈতিক আন্দোলন করেন নাই, করিবার মত যোগ্যতা, ও প্রয়োজন বোধও তাঁহাদের ছিলনা, ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনা ও ব্যবস্থাদান তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহাই তাঁহারা করিতেন, ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে একটা সাধারণ জ্ঞান তাঁহাদের ছিল—রাজবিধান অবশ্য প্রতিপাল্য, কারণ—প্রজাপালনই রাজার ধর্ম, রাজবিধান এই রাজধর্ম্মের অপরিহার্য্য অঙ্গ সুতরাং রাজবিধান প্রজার অকল্যাণকর হইতে পারে না। প্রজার অকল্যাণকর কোন

বিধানের নাম প্রকৃত রাজবিধান নহে, কারণ তাহা প্রজাপালনরূপ রাজধর্ম্মের প্রতিকূল। ধর্ম্মকার্য্য রাজবিধানের বিষয় নহে, তাহা ধর্ম্মশাস্ত্র বিধানের বিষয়; তবে প্রয়োজন হইলে ধর্ম্ম-শাস্ত্রজ্ঞপণ্ডিতগণের মতানুসারে ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি লঙ্ঘনকারীর দণ্ডবিধান রাজা করিতে পারেন।

প্রজার ধর্ম্মমতের সহিত রাজার ধর্ম্মমতের অসামঞ্জস্য থাকিলে প্রজার ধর্ম্মবিষয়ে রাজার উদাসীন থাকা কর্ত্তব্য, প্রজাগণ স্ব স্ব ধর্ম্মানুষ্ঠানে বাধা প্রাপ্ত না হয় এইটুকু মাত্র রাজশক্তির দেখা প্রয়োজন হয়। বৃটিশ সরকার এই নীতিই অবলম্বন করিয়াছিলেন। ভারত শাসনের প্রারম্ভকাল হইতে অনেকবার ঘোষণা করা হইয়াছে ধর্ম্ম ও সমাজ বিষয়ে ভারতবাসীর স্বাধীনতায় বৃটিশ সরকার হস্তক্ষেপ করিবেন না। এই প্রতিশ্রুতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতশ্রেণীকে অধিক আশ্বাস প্রদান করিয়াছিল সুতরাং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রেণী যে বৃটিশ সরকারের অকপট কল্যাণ কামী হইবেন ইহা স্বাভাবিক।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রেণী বৃটিশ সরকারের কল্যাণকামী হওয়ায় সাধারণ হিন্দুসমাজ ও বৃটিশ সরকারের ভক্ত ও অনুরক্ত ছিল। বৃটিশ সরকার সর্দ্দা আইন পাশ করায় আজ এক অভিনব সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। কত বিরোধ বিপ্লব এই ভারতে হইয়া গিয়াছে কিন্তু শাস্ত্র বিশ্বাসী হিন্দু তাহার বিশ্বাসের অনুরূপ ধর্ম্মকার্য্য করিতে পারিবে না এমন বিধি প্রণীত কখনও হয় নাই, যাহা কখনও সম্ভব হয় নাই সর্দ্দা আইন আজ তাহা সম্ভব করিতে উদ্যত হইয়াছে।

যদি সর্দ্দাআইন বলবৎ থাকে তাহাহইলে মুখ্যকালে কন্যা বিবাহ চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইবে অর্থাৎ অষ্টম বর্ষ হইতে দশম বর্ষ পর্য্যন্ত কন্যাবিবাহের মুখ্যকাল, এই মুখ্যকালে এখন হইতে ইচ্ছা করিলেও কেহ কন্যা বিবাহ দিতে পারিবে না, দ্বাদশবর্ষ অতিক্রম হইলে শাস্ত্রে পিত্রাদির পাপ শ্রুতি আছে, যাঁহারা পাপভাগী হইতে চাহেন না বাধ্য হইয়া তাঁহাদের পাপভাগী হইতে হইবে, ঋতুমতী কন্যা বিবাহে পিত্রাদির নরকপাত হয়, কন্যার ও বরের পাতিত্য হইয়া থাকে; আইনের নির্দ্দিষ্ট কাল পঞ্চদশ-বৎসর-প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে অধিক সংখ্যক কন্যাই ঋতুমতী হইয়া থাকে সুতরাং ঐ প্রকার পাপ ও পাতিত্য বাধ্য হইয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। এই সকল পাপাচরণে অসম্মত ব্যক্তিগণের গুরুতর রাজদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। ১৮ই চৈত্রের পর হইতে হিন্দুজাতির এই অবস্থা।

এ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য? আস্তিক হিন্দুসম্প্রদায় একবার নিরপেক্ষ বুদ্ধিতে চিন্তা করুন হিন্দু জাত কি করিবে? আইন মানিবে না শাস্ত্র মানিবে? রাজদণ্ড ভোগ করিবে, না নিজের বংশপরম্পরাকে নরকে ডুবাইবে? আইন পুস্তক কি আজ হিন্দুর শ্রুতি স্মৃতিকে অধিকারচ্যুত করিবে? এই সকল প্রশ্নের উত্তরে আস্তিক হিন্দুসম্প্রদায় বলিতে বাধ্য—

ন জাতু কামান্ন ভয়ান্ন লোভাৎ
ধর্ম্মং ত্যজেজ্জীবিতস্যাপি হেতোঃ।

অর্থাদি কামনায়, দণ্ডাদির ভয়ে, বা কোন প্রকার প্রলোভনের বশবর্ত্তিতায় এমন কি জীবনের মমতায়ও ধর্ম্ম ত্যাগ করা যাইতে পারে না। আস্তিক হিন্দুসম্প্রদায় ঐ সকল প্রশ্নের

ইহা ছাড়া কোন উত্তর দিতে পারেন না, সুতরাং সর্দ্দাআইন মানিয়া চলা হিন্দুসমাজের পক্ষে অসম্ভব।

এই আইন অমান্যের সহিত রাজনীতির সম্বন্ধ নাই। বিদ্বেষের সম্পর্ক নাই, এ আইন অমান্য—ধর্ম্মের অঙ্গ, শাস্ত্রের বিধি, ভগবানের আদেশ। গত্যন্তর নাই—বৃটিশ সরকারই আমাদের এই আইন অমান্যে বাধ্য করিতেছেন, ইহার জন্য আমরা অপরাধী নহি। এই বুদ্ধিতে—সরল ধর্ম্মবিশ্বাসে—পিতৃপুরুষের চরণ স্মরণ করিয়া, শাস্ত্রের বিধি পালন করিয়া যাও, শাস্ত্রোক্ত কালে কন্যা পুত্রের বিবাহ সংস্কার সম্পাদন কর, তাহাতে যদি আইন অমান্য করা হয় -ধর্ম্মানুষ্ঠান যদি অপরাধ হয়, কি করিবে? দুরদৃষ্টের ফল বলিয়া ভোগ কর; ইহাই আস্তিক সম্প্রদায়ের সম্প্রতি কর্ত্তব্য। এ কর্ত্তব্য পালনে ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ কাহারও বিসম্বাদ থাকা উচিত নহে। ইহার সহিত যখন রাজনীতির সম্পর্ক নাই এবং ধর্ম্মরক্ষার ইহা যখন অপরিহার্য্য অঙ্গ তখন ইহাতে হিন্দুমাত্রেরই অধিকার আছে।

বর্ত্তমানে হিন্দু সমাজের যে অবস্থা তাহাতে একমত হইয়া ধর্ম্মের বাধা অপসারণ ও সম্ভব হয় না, যদি তাহা সম্ভব হইত তাহাহইলে বৃটিশ সরকার কখনই সর্দ্দাআইন অনুমোদন করিতে পারিতেন না। যে হিন্দুজাতি এত কাল ঐকমত্যে তাহার ধর্ম্ম ও সমাজ রক্ষা করিয়া আসিতেছে, আজ সেই হিন্দু জাতির মধ্যে শত সহস্র পাষণ্ডের আবির্ভাব হইয়াছে, সেই পাষণ্ডের দলই ধর্ম্মবিরোধী আইনের উপস্থাপন সমর্থন ও অনুমোদন করিতেছে, বৃটিশ সরকার তাহাদের সন্তোষ বিধানের জন্যই এই প্রকার আইনে সম্মতি দান করিতেছেন। ঐ পাষণ্ডদল বৃটিশ শাসনকালেই আবির্ভূত হইয়াছে, ধর্ম্মদ্রোহ ও সমাজদ্রোহই ইহাদের ব্রত, স্বেচ্ছাচার ইহাদের পরম পুরুষার্থ, স্বজাতির গ্লানি কীর্ত্তন ইহাদের সভ্যতা, পিতৃপুরুষের অবমাননা ইহাদের আত্মসম্মান। ইহারা স্বীয় বিবেক বুদ্ধিতে পরিচালিত হয় না, পরিচালিত হয় পর প্ররোচনায়।

এই পাষণ্ডদলের সাহায্য না পাইলে হিন্দুর ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করিতে বৃটিশ সরকারের সাহস হইত না। ধর্ম্ম ও সমাজ রক্ষার জন্য যাহা করিতে যাইবে সর্ব্বাগ্রে তাহাতে বাধা প্রদান করিবে ঐ পাষণ্ড দল।

এই অভিনব দুর্ভাগ্যই হিন্দুকে অধিকতর বিপন্ন নিরাশ্রয় ও অবসন্ন করিয়াছে। এই পাষণ্ডদল ধর্ম্মের অবমাননায় আনন্দে উৎফুল্ল হয়, স্বজাতির মর্ম্মবিদারক যাতনায় ইহারা উপহাসের হাসি হাসে, শাস্ত্রজ্ঞের গ্লানি কীর্ত্তনে ইহারা শ্লাঘা অনুভব করিয়া থাকে; এই হীনতার বিনিময়ে ইহারা লাভ করে বিদেশীর করতালি, সেই করতালিই ইহাদের অপূর্ব্ব স্বদেশ সেবার পুরস্কার।

এই পাষণ্ডদলের হিতাহিত বোধ নাই, আত্মসম্মান জ্ঞান নাই, আত্মপর বিবেক নাই, কর্ম্মফলের অনুভূতি নাই। ইহারা হিন্দু নামে পরিচিত ম্লেচ্ছ। ইহাদের ধর্ম্ম নাই, সদাচার নাই, বিবাহাদি সংস্কার নাই, পতি পত্নী সম্বন্ধ নাই, এ সকল নাই বলিয়া অনুতাপও নাই।

প্রবঞ্চক কাপুরুষ, এই পাষণ্ডদল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছে, যে কোন প্রকারে হউক হিন্দুর সর্ব্বনাশ সাধন করিবেই। নিজেরা যেমন প্রভুর প্রসাদ লালসায় মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়া সারমেয় বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে উচ্ছিষ্ট অস্থি খণ্ডের লালসায় যেমন প্রভুর চরণ প্রান্তে লুটাইতেছে, প্রত্যাখ্যাত হইয়া যেমন কর্ণজ্বর বিকট চীৎকারে প্রভুর কর্ণজ্বর উৎপাদন করিতেছে; ইহারা চায় ভারতের প্রতি ব্যক্তি ইহাদের তুল্যতা প্রাপ্ত হউক। ভারতের অন্য কোন জাতির ত্রিসীমানায় ইহারা যাইতে পারে না, ইহাদের পিতৃপুরুষগণ হিন্দু ছিলেন এই দাবীতে ইহারা হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়।

সর্ব্ব জাতির পরিত্যাজ্য এই পাষণ্ডগণ যদি শুধু হিন্দু নামে আত্ম পরিচয় দিয়াই তৃপ্ত থাকিত তাহা হইলে বিশেষ অনিষ্টও হইত না, কুশিক্ষিত অপরিণামদর্শী কতগুলি যুবককে মুগ্ধ করিয়া ও খানকতক সংবাদ পত্র মুদ্রিত করিয়া ইহারা হিন্দু সমাজের নেতা সাজিয়াছে। সে নেতৃত্ব হিন্দু সমাজে চলে না, হিন্দু ইহাদের জল অন্ন স্পর্শ করে না, ইহাদিগকে স্বজাতি বলিয়াও স্বীকার করে না, তাই ইহারা নেতৃত্ব প্রকটন করে বৃটিশ সরকারের সাহায্যে আইন প্রণয়ন করিয়া। এই পাষণ্ডদলের সংস্পর্শে যাহাতে হিন্দু না যায় ইহা না করিতে পারিলে বিপদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে না, ইহা করা যে বিশেষ কঠিন তাহা নহে, সর্দ্দা আইনের সমর্থনে এই পাষণ্ডদল যে কৃতিত্ব ও বীরত্ব দেখাইয়াছে পল্লীতে পল্লীতে যদি তাহা ঘোষণা করা যায় তাহা হইলে হিন্দু মুসলমানের পল্লীতে ইহারা প্রবেশ করিতে পারে না ইহা সুনিশ্চিত। যে কোন প্রকারে হউক ইহা করিতে হইবে। বিদ্বেষবশে নহে—কাহারও অকল্যাণ কামনায় নহে; ধর্ম্মবুদ্ধিতে—সমাজের কল্যাণ কামনায়—শাস্ত্রীয় বিধি পালন অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে ইহা করিতে হইবে।

মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুর্ভাগ্য তখনই বুঝিতে পারা যায় যখন মানুষ কর্ম্মাকর্ম্ম বিবেক বুদ্ধিহীন হয়, মানুষ তখন এমন নিবীড় মোহাচ্ছন্ন হয় যে, ফলানুভূতি কালেও অপকর্ম্মকে অপকর্ম্ম বলিয়া বুঝে না, হিন্দু জাতিরও আজ সেই দশা হইয়াছে। জগতের কল্যাণকামী, ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সাদির অতীত ভগবান মনু বলিয়াছেন—

পাষণ্ডিনো বিকর্ম্মস্থান্ বৈড়ালব্রতিকান্ শঠান্।
হৈতুকান্ বকবৃত্তীংশ্চ বাঙ্মাত্রেনাপি নার্চ্চয়েৎ॥

যাহারা পাষণ্ড, যাহারা শাস্ত্রবিরুদ্ধকর্ম্মকারী, যাহারা বিড়ালতপস্বী, যাহারা প্রতারক, এবং যাহারা লৌকিক যুক্তিদ্বারা শাস্ত্রার্থবিচারপ্রয়াসী ও বকধার্ম্মিক এই সকল ব্যক্তিকে বাক্যের দ্বারাও অর্চ্চনা করিবে না। সর্ব্বভূতহিতাকাঙ্ক্ষী ভগবান্ মনুর এই আদেশের যাহারা বিপরীত আচরণ করিতেছে, তাহারা কি শুভফলের আশা করিতে পারে? মূঢ় মানবের এতবড় দম্ভ, এতবড় সাহস যে, সে ভগবানের বিধান উল্টাইয়া দিয়া কল্যাণ লাভ করিতে চাহে? যখন আমাদের অবস্থা চিন্তা করি তখন আত্মাপরাধই দেখিতে পাই; আমাদের পিতৃপুরুষগণও এতবড় আত্মাপরাধ, এতবড় পাপ, কখনও করেন নাই; শাস্ত্রের বিধি অনুসরণ করিতে তাঁহার

একটুও কুণ্ঠিত হন নাই—পাষণ্ড বিকর্ম্মস্থ, বিড়ালতপস্বী; বকধার্ম্মিক প্রভৃতির সহিত যেমন আচরণ শাস্ত্রবিহিত,—যাহার দ্বারা জগতের কল্যাণ হইতে পারে তাহা তাঁহারা অকুণ্ঠচিত্তে করিয়া গিয়াছেন। আজ তাঁহাদের সন্তানগণ সভ্যতা শিক্ষা করিয়াছেন—নিষিদ্ধকর্ম্ম না করিলে নাকি সভ্যসমাজে স্থান মিলে না তাই শত শত ব্রাহ্মণপণ্ডিত আজ সভ্য হইয়াছেন—পাষণ্ড-দলের প্রশংসাপত্র লালসায় তাহাদের সেবাকে জীবনের ব্রত করিয়া লইয়াছেন। এ পাপের হাতে কি হিন্দুজাতি নিষ্কৃতি পাইতে পারে? কল্যাণের আশা করিতে হইলে অপকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইতে হইবে।

ব্রাহ্মণ সমাজ—*

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন মিদং—

সার্দ্দা আইন উপেক্ষা করিয়া শাস্ত্র সম্মত বয়সে কন্যার বিবাহ দেওয়াই সদাচারী পণ্ডিতবর্গের সিদ্ধান্ত এ কথা পুনঃ পুনঃ ঘোষিত হইয়াছে। যে সকল ধর্ম্মপ্রাণ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি আগামী বৈশাখে শাস্ত্রসম্মত বয়সে পুত্র কন্যার বিবাহ দিতে ইচ্ছুক ও প্রস্তুত—তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্ব স্ব পরিচয় দিয়া অবিলম্বে বঙ্গীয় বর্ণাশ্রম স্বরাজ্য সংঘের সম্পাদকের নিকট পত্র দিলে বিশেষ উপকৃত হইব। ইতি

বিনীত নিবেদক—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক
বঙ্গীয় বর্ণাশ্রম-স্বরাজ্য-সঙ্ঘ
১০৪ আপার সারকুলার রোড কলিকাতা।

---

* বর্ণাশ্রম-স্বরাজ্যসঙ্ঘ হইতে প্রেরিত পত্র প্রকাশ করিলাম; ব্রাহ্মণ-সমাজের পাঠকগণের মধ্যে যাহারা বৈশাখ মাসে বিবাহের সংবাদ জানেন তাঁহারা উক্ত ঠিকানায় জানাইবেন।

ব্রাঃ সঃ সঃ—

REGISTERED No. C—673

ওঁ ব্রহ্মণ্যদেবায় ।

অষ্টাদশ বর্ষ । { ১৮৫১ শক, সন ১৩৩৬ সাল, মাঘ । } পঞ্চম সংখ্যা ।

সন্ধ্যা তাৎপর্য্য ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গায়ত্রীর উপাসনা শক্তি উপাসনা ।

(১)

লেখক—শ্রীশরৎকমল স্মৃতি ন্যায়তীর্থ ।

সন্ধ্যাসার মাতা গায়ত্রী যে সর্ব্বশক্তিরূপা তাহা তাঁহার আহ্বান মন্ত্রের আলোচনা দ্বারা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। উক্ত আহ্বান মন্ত্রে তাঁহাকে "মা" বলিয়াই ডাকা হইয়াছে, সেই মা আমার কেমন? ইহারই বর্ণনা করা হইয়াছে যে তিনি ১ 'বরদা', ২ তিনি 'দেবী', ৩ তিনি 'ত্র্যক্ষরা', ৪ তিনি 'ব্রহ্মবাদিনী', ৫ তিনি 'গায়ত্রী', ৬ তিনি 'ছন্দোমাতা'। যিনি সতত বরাভয় দায়িনী, যিনি সর্ব্বদীপ্তির মূলদীপ্তি বলিয়া জগৎ প্রকাশিকা, এবং যিনি ক্রীড়াময়ী বলিয়া জগল্লীলাময়ী, যিনি দানশীলা বলিয়া সর্ব্বার্থ সাধিকা; যিনি সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্রী, এবং পরমাক্ষর ওঙ্কার বর্ণ-নাদময়ী বলিয়া সর্ব্বস্বরূপা; যিনি তত্ত্বতঃ পরব্রহ্মরূপা হইয়াও লীলাতে ব্রহ্মবাদিনী, যিনি জগত্ত্রাণকর্ত্রী, এবং যিনি বেদ প্রসবিনী বাগদেবতা হইয়াও জগন্মাতা তিনি যে সর্ব্বশক্তিময়ী ইহাতে কি আর সন্দেহ আছে? "বর" অর্থ প্রার্থনার বস্তু, যে যাহা প্রার্থনা করে দয়াময়ী মাতা তাহাকে তাহাই দান করেন; প্রার্থনার বস্তু ত এক হইতে পারে

না, কর্ম্মানুসারে যাহার যেমন অধিকার, যেমন রুচি, যেমন ভাগ্য, সে তাহাই প্রার্থনা করে, সর্ব্বশক্তিময়ী ভিন্ন সকলের সকল প্রকারের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে কি অন্য কেহ সমর্থ হইতে পারে? তাহাই আমাকে বুঝিতে হইবে যে—মাতা গায়ত্রী সর্ব্বশক্তিময়ী বলিয়াই "বরদা"। তিনি সর্ব্বশক্তিময়ী না হইলে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড জীবের অনন্ত বাসনার ফলস্বরূপ বিচিত্র বরদান করিতে পারিতেন না।

(২)

মার্জ্জনরূপ উপাসনায় মায়ের "বরদা" মূর্ত্তির অনুভূতি এবং তাঁহার নিকটে কল্যাণ বর প্রার্থনা সর্ব্বশক্তিময়ী মায়ের এই "বরদা" মূর্ত্তি কোন উপাসনায় কিভাবে ভাবিতা হইয়াছেন এখন তাহাই বুঝিব। সাধক সন্ধ্যাকার্য্যের প্রথমেই আপোমার্জ্জনরূপ উপাসনা করিয়া থাকেন এখানে মায়ের "বরদা" মূর্ত্তির কিভাবে অনুভূতি হয়, এবং মায়ের নিকটে কি বর প্রার্থনা করা হয় তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি।

মা আমার স্বরূপতঃ "চিৎস্বরূপা" হইলেও সন্তানের স্নেহে গলিয়া ব্যাপক ও ব্যাপ্য-মূর্ত্তিতে সমুদ্র, কূপ, জলপ্রায়োদেশ এবং জলশূন্য মরুভূমি প্রভৃতি নানাস্থানে বিরাজিত রহিয়াছেন, আমি সেই সেই স্থানে মায়ের "জলদেবতা" মূর্ত্তিকে দর্শন করতঃ তাঁহার নিকটে কল্যাণবর প্রার্থনা করিতেছি—বলিতেছি "আমার মায়ের সন্তান স্নেহ দ্রবময়ী যে জলদেবতা মূর্ত্তি সমুদ্রাদি বৃহৎ জলাশয়ে ব্যাপকরূপে এবং কূপাদি ক্ষুদ্র জলাশয়ে ব্যাপ্যরূপে বিরাজিতা রহিয়াছেন, সেই সেই মূর্ত্তি আমার কল্যাণ করুণ" অর্থাৎ "আমাকে তাঁহার পরমাত্ম স্বরূপ দর্শন-রূপ যোগ্যতা বর প্রদান করুন"; অতএব মা আমার দ্রবময়ী মূর্ত্তিতে পরমাত্ম দর্শনরূপ বর দান করেন বলিয়াই আমি আজ তাঁহাকে মার্জ্জন প্রথম মন্ত্রে "বরদারূপে" অনুভব করিতেছি, সুতরাং মাতা গায়ত্রীই এখানে দ্রবময়ী হইয়া "বরদা" সাজিয়াছেন, তাই আমি তাঁহার নিকটে তাদৃশ পরম কল্যাণরূপ বর প্রার্থনা করিতেছি। ভগবতী শ্রুতি মায়ের দ্রবময়ী মূর্ত্তির এই বর্ণনা করিতেছেন—

> "যোঽপ্সু তিষ্ঠন, অদ্ভ্যোঽন্তরো, যমাপো ন বিদুঃ,
> যস্য আপঃ শরীরম্, যোঽপোঽন্তরো যময়তি;
> এষ ত আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃতঃ।"
>
> শুক্লযজুর্ব্বেদীয় বৃহদারণ্যক উপনিষৎ। ৩।৭।৪।

শ্রুতি বলিতেছেন—

"যিনি জলের মধ্যে থাকিয়াও জল হইতে পৃথক বস্তু, জল যাঁহাকে জানেন না, অথচ জল যাঁহার শরীর," যিনি জলকে তাহার স্বীয়কার্য্যে চালনা করিতেছেন, তিনি অন্তর্যামী অমৃত ব্রহ্ম পদার্থ, এবং এই তোমার আত্মাও তিনিই বটেন"। সুতরাং আত্মরূপি-ব্রহ্মপদার্থই জলদেবতা, মার্জ্জনরূপ উপাসনায় সেই জলদেবতার নিকটে সাধক পরম কল্যাণ বর প্রার্থনা

করিতেছেন বলিয়াই তিনি "বরদা" গায়ত্রী মাতা। স্মৃতিশাস্ত্রও এই জলদেবতা মায়ের কথায় বলিতেছেন যে—

"যোঽয়ং নিরঞ্জনো দেবঃ
চিৎস্বরূপো জনার্দ্দনঃ।
স এব দ্রবরূপেণ
গঙ্গাম্ভো নাত্র সংশয়ঃ॥"

স্মৃতি বলিতেছেন—

"যিনি এই নিখিল জনগণ পালয়িতা নিরঞ্জন চৈতন্যস্বরূপ দেবতা, তিনিই দ্রবরূপে গঙ্গাজল, ইহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই"; সুতরাং মার্জ্জন মন্ত্র দ্বারা আমি যাঁহার নিকটে পূর্ব্ব কথিত পরমেশ্বর দর্শনরূপ চরম কল্যাণ কামনা করিতেছি, তিনি পরমেশ্বর চৈতন্যশক্তি ইহাই শ্রুতি ও স্মৃতির সার কথা; তাই আমি আজ তাঁহাকে (জলদেবতাকে) পরমেশ্বর-প্রিয়নাম ওঁকার মন্ত্র সহযোগে, ঐ ওঁকার মন্ত্র প্রতিপাদ্য ব্রহ্মাবিষ্ণুশিব শক্তি সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কারিণী ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী রুদ্রাণীরূপে ভাবনা করতঃ তাঁহার নিকটে পূর্ব্বকথিত কল্যাণরূপ বর প্রার্থনা করিতেছি। গায়ত্রী উপাসনাতে যে ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী রুদ্রাণী আমার ধ্যানের বস্তু ও জপের দেবতা, তিনিই মার্জ্জন উপাসনাতে ভাবনীয়া। অতএব গায়ত্রী আহ্বান উপাসনায় যাঁহাকে "বরদা" বলিয়া ডাকিতেছি, গায়ত্রী ধ্যান উপাসনায় যাঁহাকে ভূরাদি সমগ্র বিশ্বরূপে ভাবনা পূর্ব্বক অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যাঁহার অমোঘ হস্ত ইঙ্গিত প্রত্যক্ষ করিতেছি, মার্জ্জন উপাসনাতেও তাঁহাকেই দেখিতে পাইয়া তাঁহার নিকটে কল্যাণবর প্রার্থনা করিতেছি, অতএব মার্জ্জন উপাসনার প্রথম মন্ত্রে জলদেবতায় মায়ের "বরদা" মূর্ত্তির অনুভূতি, এবং তাঁহার নিকটে পরমেশ্বর দর্শনরূপ চরম কল্যাণ বর প্রার্থনা করিতেছি ইহা বুঝিলাম, এবং ইহাও বুঝিলাম যে "তিনি সন্তান বৎসলা", তাই নিরঞ্জন পরম চৈতন্য শক্তি হইয়াও আজ সন্তান স্নেহে গলিয়া দ্রবময়ী সাজিয়াছেন, আমি ভোজনে স্নানে পানে অবগাহনে মায়ের এই স্নেহ ধারা দ্বারা আপ্যায়িত হইয়া জীবন ধারণ করিতেছি, আজ মা আমার তাঁহার এই "বরদা" জলদেবতা মূর্ত্তি যদি বিশ্ব হইতে উঠাইয়া লয়েন, তবে কি এই নিখিল বিশ্ব বাঁচিতে পারে? তাই বুঝিতেছি যে মা আমার 'বরদা' জলদেবতা মূর্ত্তিতে বিশ্ব পালিকা, তাই এই বিশ্ব-পালিকার নিকটে বলিতেছি যে "ওঁকার অভিন্না—ব্রহ্মাদ্যাদি পরমেশ্বর শক্তিরূপিণী এই মাতা জলদেবতা ব্যাপ্যব্যাপকে যত মূর্ত্তিতে এই বিশ্বে বিরাজিতা রহিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আমার সম্বন্ধে পরমাত্মা স্বরূপ দর্শনরূপ পরম কল্যাণবরদায়িকা হউন"; তাঁহাকে সর্ব্ব-শক্তিময়ী বলিয়া বুঝিয়াছি জন্যই তাঁহার নিকটে পূর্ব্ব কথিত বর প্রার্থনা করিতেছি। দয়াময়ী মাতা কাহারও প্রার্থনা অপূর্ণ রাখেন না, তাই পরমর্ষি ঘোষণা করিয়াছেন—

(১) "আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগ স্বর্গাপ বর্গদা"।

(২) "সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।"

(৩)

মার্জ্জন উপাসনার ২য় মন্ত্রে প্রণব অভিন্না-জলদেবতারূপিণী বরদামাতার পাপহারিণী মূর্ত্তির দর্শন, এবং তাঁহার নিকটে পাপমোচনরূপ বর প্রার্থনা।

গায়ত্রী আহ্বান উপাসনায় মাতাকে "ত্র্যক্ষরা" বলিয়া ডাকিয়াছি, এবং বুঝিয়াছি যে ঐ "ত্র্যক্ষরা" মাতাই পরাপর ব্রহ্মরূপা; অর্থাৎ নির্গুণা সচ্চিদানন্দরূপিণী, এবং সগুণা ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবশক্তি ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী রুদ্রাণী, এই ত্রিমূর্ত্তি মাতাকেই মার্জ্জন উপাসনায় ওঁকার শব্দ প্রয়োগে বুঝিতেছি, এবং ঐ ত্রিমূর্ত্তি মাতাকে গায়ত্রী উপাসনায় "বরদা" বলিয়া ডাকিয়াছি; মার্জ্জন উপাসনায় ২য় মন্ত্রে তাঁহাকেই জলদেবতারূপে দর্শন করতঃ তাঁহার নিকটে স্বকীয় পাপ মোচন বর প্রার্থনা করিতেছি; কারণ যিনি সর্ব্ববিধ বর দানে সমর্থা তিনি যে সর্ব্ব শক্তিময়ী এবিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব তিনি সাধকসন্তানের পাপ হারিণীও বটেন। তাই আমি বলিতেছি "হে ওঁকার অভিন্নে! পরাপর ব্রহ্মরূপিণি! নির্গুণে সচ্চিদানন্দরূপিণি! সগুণে ব্রহ্ম বিষ্ণু শিব শক্তি ব্রহ্মাণি! বৈষ্ণবি! রুদ্রাণি! জলদেবতে! তুমি আমাকে পাপ হইতে উদ্ধার করিয়া পবিত্র কর। প্রখর রবিকরতপ্তবর্ম্মাক্তকলেবর ব্যক্তি যেমন বৃক্ষের সুশীতল ছায়ার আশ্রয়ে শান্তি লাভ করে, আজ আমিও তেমনি অসহ্য ত্রিতাপ তাপদগ্ধ হইয়া মা তোমার ঐ অভয়পদচ্ছায়া আশ্রয় কামনা করিতেছি, ঐ স্নাতব্যক্তি যেমন অবগাহনপ্রক্ষালিত কলেবর হইয়া, দৈহিক মল হইতে মুক্ত হয়, হে জননি! জলদেবতে! আমিও তেমনি তোমার ঐ চরণ আশ্রয় করতঃ তোমার দর্শনে প্রতিবন্ধক অনাদিবিবিধসংস্কারসঞ্চিত মানসমল হইতে মুক্তি প্রার্থনা করিতেছি, ঐ অসংস্কৃত ঘৃত মন্ত্রপূত হইলে যেমন পবিত্র অগ্নিতে আহুতি দানের যোগ্যতা লাভ করে, মাগো! আমিও তেমনি তোমার করুণায় পাপমুক্ত হইয়া তোমার ঐ পবিত্র চরণে জীবন সমর্পণের যোগ্যতা লাভরূপ বর প্রার্থনা করিতেছি।"

এখানে ইহা প্রণিধান করা আবশ্যক যে, জড়প্রকৃতি জলে সাধকের পূর্ব্ব কথিত পাপমোচনরূপ বর প্রার্থনা আসিতেই পারে না, সুতরাং ঐ জলদেবতাতে বরদায়িনী সর্ব্ববিধ পাপহারিণী মূর্ত্তির অনুভূতি হয় জন্যই সাধকের মুখে তাদৃশ বর প্রার্থনাবাণী বহির্গত হয়, সেইজন্যই মন্ত্র জলদেবতাকে প্রণব—অভিন্না পরাপরব্রহ্মশক্তিরূপে ঘোষণা করিতেছেন। সাধক ভাবনায় ভাবিত হইয়া মাতাজলদেবতা পাপহারিণী বরদায়িনীরূপেই প্রকটিত হইতেছেন, সুতরাং কথিত সিদ্ধান্তে মাতা গায়ত্রীর "বরদা" মূর্ত্তিই এখানে পাপহারিণী শক্তিরূপে উপাসিতা। হইয়া সন্তানকে পাপমোচন বরদান করিতেছেন জন্যই ইহা ফলতঃ শক্তি উপাসনা, সে শক্তি ও গায়ত্রী হইতে অভিন্না, কারণ—মাতা ত্রিরূপা (ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী রুদ্রাণী) গায়ত্রীকেই এখানে প্রণবমন্ত্রসংযোগে জলদেবতায় একীকৃত করা হইয়াছে, সুতরাং গায়ত্রী উপাসনা যে শক্তি-উপাসনা ইহা মার্জ্জন মন্ত্রেও বুঝিতেছি।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনার সার কথা এই যে এখানে ত্রিরূপা গায়ত্রী মাতাই জলদেবতা, তিনি এখানে পাপ হারিণীরূপে প্রকটিত বলিয়া "বরদা" সর্ব্ববিধ পাপমুক্তিই এখানে সাধকের প্রার্থনীয় বরবস্তু।

মার্জ্জন উপাসনার ৩য় মন্ত্রে প্রণব প্রতিপাদ্য ব্রহ্মাণ্যাদি
দেবী হইতে অভিন্না জলদেবতাকে সুখদায়িনীরূপে
অনুভব করতঃ তাঁহার নিকটে অন্নবলাদি
এবং তত্ত্বজ্ঞানরূপ বর প্রার্থনা।

(৪)

মার্জ্জন উপাসনার পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রে জলদেবতাকে যেমন ওকার প্রতিপাদ্য ব্রহ্মাণ্যাদি দেবী হইতে অভিন্নারূপে বুঝিয়াছি, এখানেও সেই জলদেবতাকে তেমনি ব্রহ্মাণ্যাদিরূপে* দেখিতেছি। অধিকন্তু পূর্ব্বমন্ত্রে তাঁহাকে সর্ব্ববিধ পাপহারিণী বলিয়া বুঝিয়াছি জন্যই এখানে তাঁহাকে সুখদায়িনীরূপে দেখিতেছি, এবং বলিতেছি "হে ব্রহ্মাণ্যাদি দেবী হইতে অভিন্ন মূর্ত্তি মাতঃ! জলদেবতে! তুমি আমার সুখ দায়িনী হও; মা! তুমি স্বয়ং সুখ স্বরূপা বলিয়াই তোমার কাছেই সুখ চাহিতেছি, মাতা সন্তানকে দুঃখ দিতে পারেন না, তাই আমার ভরসা আছে, তুমি অবশ্যই আমাকে তোমার পরম সুখের স্বরূপ দর্শন করাইবে। আরও মা! আমি তোমার কাছে অন্ন প্রার্থনা করিতেছি, অন্ন দান মাতৃস্বভাব, ছেলেকে মা না খাওয়াইলে সে বাঁচিবে কেন! তাই আজ ক্ষুধার্ত্ত পুত্র মায়ের কাছে অন্ন চাহিতেছে। মা তুমি ক্ষুধার্ত্ত শিবকে, অন্ন দান করিয়া "অন্নদা" নাম গ্রহণ করিয়াছ আজ আমাকে অন্ন দান করিয়া সেই নামের সার্থকতা সম্পাদন কর। মা! আমাকে রমণীয় দর্শনের যোগ্য কর; পরমাত্মস্বরূপিণি! তুমিই সর্ব্বাপেক্ষা রমণীয় বস্তু তোমার পরম রমণীয়তার অংশ লইয়া জগৎ রমণীয় হইয়াছে; তাই পরম শিবসুন্দরি! মা! আমাকে সেই জ্ঞান দাও, যে তত্ত্বজ্ঞান বলে তোমার পরম সৌন্দর্য্যময়ী মূর্ত্তি দর্শন করিতে পারি।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনার সার কথা এই যে, ব্রহ্মাণ্যাদি দেবী অভিন্না গায়ত্রীই এখানে জলদেবতা, সাধক তাঁহাকে সুখদায়িনী অন্নদা ও পরমসৌন্দর্য্যময়ীরূপে দেখিয়া তাঁহারই নিকটে সুখ অন্নবলাদি, এবং তত্ত্বজ্ঞানরূপ বর প্রার্থনা করিতেছেন সুতরাং সাধক সাধনার মাতা গায়ত্রীই এখানে জলদেবতার তথাকথিতভাবে প্রতিভাত বলিয়া তিনি সর্ব্বশক্তিময়ী ইহাতে সন্দেহ নাই।

মার্জ্জন উপাসনার ৪র্থ মন্ত্রে প্রণব মন্ত্রপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মাণ্যাদি দেবীরূপা জলদেবতায় পরমেশ্বরের "শিবতমরস" মূর্ত্তির দর্শন এবং ঐ রসময়ী মূর্ত্তিতে মাতৃভাবের ভাবনা পূর্ব্বক তাঁহার নিকটে তাদৃশ রসপ্রাপ্তি রূপ-রস প্রার্থনা।

(৫)

এখানেও আমি জলদেবতাকে ওঁকার মন্ত্র ভাবনা সহযোগে পরাপর ব্রহ্মরূপিণীরূপেই দেখিতেছি এবং বলিতেছি যে—"হে ওঁকার প্রতিপাদ্য পরাপর ব্রহ্মরূপিণি! পূজনীয়ে! জননি! জলদেবতে! তুমি আমাকে তোমার শিবতমরসের ভাগী কর। মা! তোমার তিনটি রূপ—১ বিরাট্ রূপ, ২য় হিরণ্যগর্ভরূপ, ৩য় ঈশ্বররূপ; যখন তুমি সমগ্র স্থূলসৃষ্টির চালক চৈতন্যরূপিণী, তখন তুমি "বিরাট্" এই নামে পরিচিত হইয়া "শিব" মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হও, আবার যখন তুমি এই স্থূলসৃষ্টির অধিষ্ঠানভূত সূক্ষ্মসৃষ্টির চালক চৈতন্যরূপিণী হও' তখন তুমি "হিরণ্যগর্ভ" এই নামে পরিচিত হইয়া "শিবতর" মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হও, আবার যখন তুমি ঈশ্বরাত্মরূপে প্রতিভাত হও, তখন তুমি "শিবতমরস"রূপে দৃষ্ট হইয়া থাক। মাতঃ! স্নেহময়ি! জলদেবতে! তোমার মধুর শীতল রসরূপ প্রাণিগণেরই সতত অনুভূত, তাই মা! সর্ব্বরসময়ি! ভগবান্ বেদ তোমাকে "রসো বৈ সঃ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; স্তন্যদায়িনি! তাই আজ আমি পিপাসা-ক্ষামকণ্ঠে তোমার ঐ "শিবতম"রস দুগ্ধধারা পানের প্রার্থনা করিতেছি, এই অবোধ শিশুর করুণ ক্রন্দন কি তোমার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে না! জননি! তুমি যে "জগন্মাতা" তাহা ত প্রতিনিয়তই দেখিতেছি, তাই বেদমন্ত্র তোমাকে "উশতীরিব মাতর" বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, তাই আজ তুমি জগতের ঘরে ঘরে "মাতৃ-রূপেণ সংস্থিতা" হইয়া রহিয়াছ; পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া দেবতা দানব গন্ধর্ব্ব মানব প্রভৃতি সমস্ত জীব জগৎ তোমার ঐ অপার মাতৃরস ধারায় স্নাত ও আপ্যায়িত হইয়া ভাসিয়া যাইতেছে। তাই ত আজ দেখিতেছি জগতের ঘরে ঘরে ঐ যে জননী তাহার বড়ই সোহাগের ধন দরিত দুলাল সন্তানকে কোলে লইয়া তাঁহার দেহসার "শিবতমরস"রূপ স্তন্যপীযূষধারা দ্বারা তাহাকে (সন্তানকে) আপ্যায়িত করিতেছেন, সে রসপানে হৃষ্টপুষ্ট তুষ্ট বলিষ্ঠ সন্তান মায়ের কোলে পরম সুখে হাঁসিতেছে; মাতঃ! জলদেবতে! তুমিই ত জগতের মা সাজিয়া প্রতিনিয়ত এই খেলা খেলিতেছ; তাই ত আমি প্রার্থনা করিতেছি—তুমি এই মায়ের মত সদয়া হইয়া তোমার ঐ ঈশ্বরাত্মরূপ "শিবতমরসের" ভাগী কর, রসপানে আমিও ঐ শিশুর মত হৃষ্টপুষ্ট তুষ্ট বলিষ্ঠ হইয়া তোমার ঐ অমৃতকোলেই চিরদিন হাঁসিতে থাকিব।"

পূর্ব্বোক্ত আলোচনার সারকথা এই যে—জলদেবতাকে ওঁকার প্রতিপাদ্য পরাপর ব্রহ্মরূপিণী ভাবনাকরতঃ তাঁহাতেই ঐশ্বরীয় শিবতমরসঘনমূর্ত্তি দর্শন করিতেছি, এবং তাদৃশী মায়ের নিকটে তাদৃশ রসাস্বাদনরূপ বরপ্রার্থনা করিতেছি; সুতরাং সাধকের সাধনাকালে

পরাপর ব্রহ্মরূপিণী জননী গায়ত্রী এখানে "শিবতম রসঘন মূর্ত্তিতে "বরদা" সাজিয়াছেন সুতরাং গায়ত্রী উপাসনায় যাঁহাকে "বরদে"! বলিয়া ডাকিয়াছি, তাঁহাকেই এখানে শিবতম রসঘন মূর্ত্তিরূপে জলদেবতায় দর্শন করতঃ তাঁহার চরণে পূর্ব্বোক্ত রসাস্বাদন বর প্রার্থনা করিতেছি।

এখানে ইহাও বিশেষভাবে অনুসন্ধেয় যে, কেবল সন্ধ্যার আপোমার্জ্জন উপাসনাতেই পরমেশ্বর জলদেবতায় শিব-শিবতর শিবতম মূর্ত্তিতে আরাধিত হয়েন নাই, সনাতন-যজুর্ব্বেদ মন্ত্রও পরমেশ্বরকে তাদৃশরূপে দর্শন করতঃ তাঁহার অভয়প্রদ শ্রীচরণে পুনঃ পুনঃ প্রণাম পূর্ব্বক কতই না প্রার্থনা জানাইয়াছেন, সেই সব প্রণাম ও প্রার্থনার দুইটি মন্ত্র এখানে উদ্ধৃত হইতেছে—

১। "নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ"

যজুর্ব্বেদীয় রুদ্রাধ্যায় মন্ত্র ৮ম অনুবাক ১১ মন্ত্র।

২। "মীঢ়ুষ্টম! শিবতম শিবো ন সুমনা ভব।
পরমে বৃক্ষ আয়ুধং নিধায় কৃত্তিং বসান আচর পিণাকং
বিভ্রদা গহি"। রুদ্রাধ্যায় ১০,১০। যজুর্ব্বেদীয় রুদ্রাধ্যায়মন্ত্র।১০অনু।১০মন্ত্র।

বেদভাষ্যকার পূজ্যপাদ সায়ণাচার্য্য "শিব" শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন কল্যাণরূপ শিব-তর" শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"অতিশয় কল্যাণরূপ", এবং শিবতমশব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—অতিশয় শান্তস্বরূপ, সায়ণাচার্য্যের ভাষ্য পঙ্‌ক্তি এই—

"শিবঃ কল্যাণরূপঃ স্বয়ং নিষ্কলুষ ইত্যর্থঃ। অতিশয়েন শিবঃ শিবতরঃ॥ হে শিবতম! অতিশয়েন শান্তস্বরূপ"!

উদ্ধৃত মন্ত্রদ্বয়ের সায়ণ ভাষ্য।

যজুর্ব্বেদীয় সংহিতার অন্তর্গত রুদ্রাধ্যায় মন্ত্রের অন্যতম ভাষ্যকার পূজ্যপাদ ভট্টভাস্কর "শিব", 'শিবতর', এবং 'শিবতম'—শব্দের নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন—

শিবশব্দের ব্যাখ্যা—"সর্ব্বাত্মনা কল্যাণঃ শিবঃ সুপ্রসিদ্ধ তস্মৈ নমঃ।" ... ... তথা দেবঃ। শিবঙ্কর ত্বাৎ শিব ইতি, যথা অথর্ব্বশিখায়াং "শিব একোধ্যায়ঃ শিবঙ্করঃ সর্ব্বমন্যৎ পরিত্যজ্য" ইতি তথা মহাভারতে চ—"স মেধয়তি যান্নতাং সর্ব্বার্থান সর্ব্বকর্ম্মসু। 'শিবমিচ্ছন মনুষ্যাণাং তস্মাদেবঃ শিবঃ স্মৃতঃ॥' ইতি।

শিবতরশব্দের ব্যাখ্যা—"অতিশয়েন শিবঃ শিবঙ্করঃ 'শিবতর', অবিপর্য্যয়েণ বা শিবং করোতি স শিবঙ্করঃ 'শিবতরঃ' তস্মৈনমঃ॥

শিবতম শব্দের ব্যাখ্যা—"হে 'শিবতম'! অতিশয়েন শিবঙ্কর!"

উদ্ধৃত মন্ত্রদ্বয়ের, ভট্টভাস্কর কৃতভাষ্য।

সায়ণাচার্য্য কৃত ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য ।

পরমেশ্বরের কল্যাণরূপতা সুপ্রসিদ্ধ, তাই তাঁহাকে 'মঙ্গলময়' বলা হয়, তাই দেবতাগণ তাঁহাকে—'সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে ! শিবে !' (চণ্ডী নারায়ণী স্তব) বলিয়া মাতৃভাবে ডাকিয়াছেন তাই সায়ণাচার্য্যও 'শিব' শব্দের 'কল্যাণরূপ'ই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 'কল্যাণরূপ' বলিলে কল্যাণাতিরিক্ত কোন বস্তু তিনি নহেন, ইহাই বুঝা যায়, অর্থাৎ পরমেশ্বর 'কল্যাণ ঘনমূর্ত্তি', এই প্রকার ব্যাখ্যা উপনিষৎ শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে, যেমন ব্রহ্মকে 'সৈন্ধব ঘন' বলিয়া তাহার ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে, পিণ্ডাকৃতি সৈন্ধবই সৈন্ধব ঘন পদার্থ, তাদৃশ সৈন্ধবের প্রত্যেক অণু পরমাণুতে যেমন লবণরস ভিন্ন অন্য কোন রস নাই, তেমনি ব্রহ্মবস্তু 'চিদেকরস' অর্থাৎ পরব্রহ্ম চৈতন্যাতিরিক্ত কোন বস্তু নহেন, অতএব সায়ণাচার্য্য কথিত 'কল্যাণরূপ' শব্দের ইহাই ফলিতার্থ যে—পরমেশ্বর 'কল্যাণৈক রস'। বেদভাষ্যকার নিজেই কল্যাণরূপ শব্দের তাৎপর্য্য বলিতেছেন যে 'পরমেশ্বর' 'স্বয়ং নিষ্কলুষ' অর্থাৎ তিনি অপাপবিদ্ধ নিত্য শুদ্ধ বস্তু; পাপের পরিধি সংসারেই অবস্থিত, যিনি এই সংসারের পরপারে নিয়ত বিরাজিত, পাপ তাঁহার কি করিতে পারে ? তাই বেদ ঘোষণা করিতেছেন "অধ্বনঃ পারং … … তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্"।

সায়ণাচার্য্য পূর্ব্বোক্ত ভাব 'শিব' শব্দের ব্যাখ্যায় প্রকাশ করতঃ "শিবতর" শব্দের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন যে—'অতিশয় কল্যাণরূপ' পরমেশ্বরের এই কল্যাণগত আতিশয্য কি বস্তু এখন তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিব। পরমেশ্বরের কল্যাণরূপতা সকলে বুঝিতে পারে না, অভক্ত এবং অজ্ঞানের পক্ষে উহা অজ্ঞেয়, তাই বেদমন্ত্র সুদৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছেন 'শিবতরায় চ নমঃ'। সায়ণাচার্য্য ইহার ব্যাখ্যায় বলিতেছেন যে, তিনি যেমন 'কল্যাণরূপ', আবার তেমনি "অতিশয় কল্যাণরূপ"। অভিপ্রায় এই যে—'ভ্রান্ত জীব ! তুমি তোমার নিজ কর্ম্মফলে অকল্যাণ প্রাপ্ত হইয়া পরমেশ্বরের কল্যাণগত আতিশয্যে সংশয় করিও না, তাঁহার "সময় নিষ্ঠুরতা" দেখিয়া তাঁহার যে "চিত্তে কৃপা' আছে ইহা ভুলিও না, তিনি শস্ত্রপূত করিয়া তোমাকে কোলেই টানিতেছেন, তিনি 'রুদ্র' বটে, কিন্তু তাঁহার দক্ষিণ (সৌম্য) বদনও আছে, তাই তাঁহার কল্যাণাতিশয্য ভ্রান্ত না হইয়া প্রণাম কর 'শিবতরায়চ নমঃ' প্রার্থনা কর 'রুদ্র ! যৎ তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।" ঐ দেখ প্রচণ্ড দৈত্য হিরণ্যকশিপুর নিকটে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি নৃসিংহদেব ভক্ত প্রহ্লাদের নিকটে সৌম্যমূর্ত্তি হইয়া স্নেহবিগলিত ভাবে ভক্ত শিরশ্চুম্বন করিতেছেন। তুমি নিজ কর্ম্মফলে দুঃখ পাও বলিয়া পরমেশ্বর যে 'শিবতর' নহেন ইহা ভাবিতে নাই, তিনি যে 'অতিশয় কল্যাণরূপ' ইহা অবিশ্বাস করিতে নাই, তিনি নিজেই বলিয়াছেন—"যস্যাহ মনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ'। পরমেশ্বর বলিতেছেন 'আমি যাহার প্রতি অনুগ্রহ করি, তাহার সর্ব্বস্ব ধীরে ধীরে কাড়িয়া লই; নতুবা সে যে ঐহিক সর্ব্বস্বের মমতাতে ভুলিয়া

আমার কোলে আসিতে চায় না! আমি যে অকিঞ্চন ধন, কিছু থাকিলে জীব তাহার মমতাতে পড়িয়া থাকিবে, আমার কাছে আসিবে না, তাই তাহাকে মধ্যে মধ্যে রুদ্রমূর্ত্তি দেখাই, যে আমার ঐ রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়াও 'শিবতরায় চ নমঃ' করিয়া আমি 'অতিশয় কল্যাণ রূপ' ইহা ভাবিতে পারে আমি তাহাকে শীঘ্র দর্শন দেই, শীঘ্র দেখা দিবার জন্যই আমি রুদ্র হইয়া হুঙ্কার করি, সুতরাং আমি 'অতিশয়েন শিবঃ শিবতরঃ' ইহা সত্য কথা'।

পরমেশ্বরের এই অভিপ্রায় বেদভাষ্যকার পূর্ব্বোক্তভাবে প্রকাশ করিয়াছেন কি না তাহা সাধক সুধীবৃন্দ ভাবনা করিয়া দেখিবেন। 'তর' প্রত্যয় দুয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইয়া থাকে, 'শিব' অর্থাৎ 'কল্যাণরূপ' হইতে 'শিবতর' অর্থাৎ অতিশয় কল্যাণরূপের উৎকর্ষ কি ভাবে ভাবনা করিতে হইবে, এবং এই শিবতর অতিশয় কল্যাণরূপ অপেক্ষা আবার 'শিবতম' অর্থাৎ অতিশয় শান্তস্বরূপেরই কি ভাবে ভাবিতে হইবে ইহাই এখানে বুঝিবার বিষয়; পূর্ব্বোক্তভাবে ঈশ্বরাভিপ্রায় সহযোগে 'শিব' এবং 'শিবতর' শব্দের পরস্পর উৎকর্ষ ও অপকর্ষ বুঝা যায় কি না তাহাই সুধী সাধকবৃন্দকে বিচার করিতে বলিতেছি। ইহার পরেই 'শিবতম' শব্দের ব্যাখ্যা বুঝিবার সময়ে এই কথা আর একভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি। তাহা এই—পূজ্যপাদ বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য 'শিব' এবং 'শিবতর' শব্দের তাদৃশভাবে ব্যাখ্যা করিয়া 'শিবতম' শব্দের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন যে—"হে শিবতম! অতিশয়েন শান্তস্বরূপ"! অতিশয় শান্তভাবই পরমেশ্বরের স্বরূপ, -এ জন্যই বেদ তাঁহাকে "শান্তং শিবং সুন্দরম্ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। পরমেশ্বরের অতিশয় শান্তভাব কেমন এখন তাহাই বুঝাইতেছি—পরমেশ্বর যখন নির্গুণ নির্বিকার কূটস্থভাবে অবস্থিত তখনই তিনি অতিশয় শান্ত; কারণ এ অবস্থায় তিনি সর্ব্বথা নিষ্ক্রিয়কপদার্থ; এই অবস্থার পরে যখন তিনি "একোঽহং বহুস্যাম্" "এক আমি বহু হইব" নামরূপে বাক্যের বাণি" নামরূপ করিব এই ইচ্ছা লইয়া স্বশক্তিকে ঈক্ষণ দর্শন করেন, তখনই তিনি অশান্ত—হয়েন; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত নির্গুণ নির্ব্বিকার কূটস্থভাবই শিবতম অর্থাৎ অতিশয় শান্তস্বরূপ; তদপেক্ষা "আমি বহু হইব নামরূপ করিব" এতাদৃশ ইচ্ছাবিশিষ্ট ঈশ্বর "শিবতররূপ" কারণ এখানে তিনি পূর্ব্বোক্তভাবে সৃষ্টিবিষয়ে উন্মুখ বলিয়া অতিশয় শান্তস্বরূপ পরিহারকরত কিছু অশান্তরূপ; আবার যখন তিনিই "জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিষ্টঃ"—হইয়া বিরাড্‌বিশ্বরূপে প্রতিভাত; তখন তিনি পরম শান্ত নহেন, পরন্তু পূর্ব্বকথিত সৃষ্টি উন্মুখ কিছু অশান্তভাব হইতে আরও অশান্ত; অর্থাৎ অতএব বিরাড্‌ বিশ্বরূপা পরমেশ্বর "শিবতর" না হইয়া "শিব",। ফলতঃ একই ব্রহ্মবস্তু অবিদ্যা উপহিত জীবরূপে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া "অশিব" বিরাট অঙ্গরূপে "শিব" "হিরণ্যগর্ভরূপে "শিবতর" ঈশ্বরাত্মরূপে "শিবতম"। ইহাই ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য কথিত তর তম প্রত্যয়ার্থ কিনা তাহা সাধকসুধীবৃন্দ ভাবিয়া দেখিবেন।

সারকথা এই যে, পরমেশ্বর স্বরূপতঃ এক হইলেও সাধক হিতার্থে জীবস্বভাব বশতঃ

ব্রহ্মরূপ হয়েন ইহা বেদবর্ণিত ঋষিজ্ঞান প্রতিভাত সত্য, তাই বেদ স্বয়ংই বলিয়াছেন যিনি 'একং সৎ'—এক সৎ স্বরূপ পদার্থ, ঋষিগণ তাঁহাকেই ইন্দ্র মিত্র বরুণ অগ্নি যম প্রভৃতি নানারূপে বলিয়াছেন,' তাই বেদার্থদর্শী' মহর্ষি যাস্কও দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—

"দেবতায়া এক আত্মা বহুধা স্তুয়তে।"

অতএব অশিব শিব শিবতর শিবতম সবই ফলতঃ পরমেশ্বর, তাই যজুর্বেদ মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি তাঁহাকে 'রুদ্র'রূপে দর্শন করিয়াও 'শিবায়চ শিবতরায়চ' বলিয়া প্রণতি পূর্বক তাঁহাকেই আবার 'শিবতম'রূপে আহ্বান করতঃ বলিতেছেন 'তুমি আমার প্রতি 'সুমনা ভব' প্রসন্ন হও; এইরূপ সন্ধ্যায় সাধকও প্রার্থনা করিতেছেন—'হে জলদেবতে! এই অশিব জীবোপাধি বিশিষ্ট রসবিন্দুরূপী আমাকে তোমার ঐ পরমেশ্বরাত্মরূপ রসবিন্দুতে মিশাইয়া লও'।

সাধকের ভাষায় ইহা বুঝিতে হইলে ইহাই বলিতে হয় যে -

প্রসাদ বলে আমার মন
অমল কমল ছাঁচ।
তাতে ইচ্ছাময়ী! মনোময়ী
প্রাণময়ী হয়ে নাঁচ।"

এই ভাবেরই প্রতিধ্বনি, শাস্ত্র সুদৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন—

"ভক্ত চিত্তানুসারেণ জায়তে ভগবানজঃ"।

অধ্যাত্ম রামায়ণ।

অতএব 'হে জননি! জলদেবতে! তুমি যে আমার মনোরূপ অমল কমল ছাঁচে ইচ্ছা করিয়াই আজ শিবতমরসমূর্ত্তিতে নাচিতেছ ইহা কি অস্বীকার করা যায়? তাই ত মা! তোমাকে "উশতীরিব মাতরঃ"-রূপে দর্শন করিতেছি! জগন্মাতা তুমি, তোমারই অপার স্নেহরসকণা লইয়াই আজ জগতের মাতৃমণ্ডলী, সন্তান-স্নেহবিগলিত-হৃদয়া; তাই দেবতাগণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—

"স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।"

চণ্ডী।১১।৫।

আমি প্রার্থনা করিতেছি "পার্থিব মাতা যেমন সন্তানস্নেহবিগলিত-হৃদয়া হইয়া স্বীয় স্তন্য-পীযূষধারা দ্বারা সন্তানকে আপ্যায়িত করেন, অপার্থিব মাতৃরূপা তুমিও তেমনি তোমার ঐ শিবতমরসধারা দ্বারা আমাকে আপ্যায়িত কর"।

এই মন্ত্রে মাতৃভাব অতিশয় স্পষ্ট, সুতরাং ওঁকার অভিন্না মাতা গায়ত্রী যে এখানে জল দেবতার শক্তিরূপে উপাস্যা ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

(৬)

মার্জ্জন উপাসনায় ৩য় মন্ত্রে ওঁকার প্রতিপাদ্য পরাপর ব্রহ্মরূপিণী জলদেবতার তাদৃশ

শিবতমরসের প্রত্যক্ষপূর্ব্বক তাঁহার নিকটে গমন করতঃ অবিদ্যামার্জ্জনরূপ স্বসংশুদ্ধি প্রার্থনা; অথবা স্বীয় পুত্রপৌত্রাদিজননশক্তিরূপ বরলাভের কামনা।

সাধক ইহার পূর্ব্বমন্ত্রে মাতা গায়ত্রীকে জলদেবতারূপে আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহার শিবতম রসধারা প্রার্থনা করিয়াছেন, বর্ত্তমান মন্ত্রে তাঁহাকেই তিনি বলিতেছেন যে "হে ওঁকার প্রতিপাদ্য পরাপরব্রহ্মরূপিণি! জননি! জলদেবতে! আমি তোমার সেই বিশ্বহৃদয়-বিলাসিনী পরমেশ্বরস্বরূপিণী শিবতমরসমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাই আজ মহাসাগর উদ্দেশ্যে পাগলিনী ঐ তটিনীর মত আকুল হইয়া সেই শিবতম রসমূর্ত্তিপানে ছুটিয়াছি; মা গো তুমি আমাকে তেমনি করিয়া শোধন করিয়া লও, যাহাতে ঐ উদ্‌ঘাটিতদ্বারগৃহে সৌর-কিরণের প্রবেশেরমত আমার মধ্যে তোমার ঐ শিবতমরসমধুরিমা প্রবেশ করিতে পারে। অথবা হে ওঁকার অভিন্নে মাতঃ! জলদেবতে! তুমি আমাকে পুত্রপৌত্রাদি জননে প্রযুক্ত কর"। পরবর্ত্তী প্রার্থনার অভিপ্রায় এই যে—

"চাই মা! আমি বড় হ'তে।
এই ক্ষুদ্র খাঁচায় আর থাকা দায়
নীলাকাশ ঐ সম্মুখেতে।
যাহে নীলবরণি! নৃত্যকর
শশী সূর্য্য লয়ে হাতে॥
ক্ষুদ্র অহং আমার
বদ্ধ আছে কোন মতে
(মাগো!) তোমার আমি তুমি লয়ে
মিশিয়ে দেনা সর্ব্বভূতে।"

পূর্ব্বোক্ত আলোচনার সার সংক্ষেপ।

সন্ধ্যা কথিত আচমন মার্জ্জন প্রভৃতি কর্ম্মগুলি সবই উপাসনা বিশেষ। উপাসনা শব্দের বুৎপত্তিলভ্য অর্থ এই যে—"যে ক্রিয়া দ্বারা উপাস্য দেবতার সমীপে উপবেশন করা যায়, সেই ক্রিয়াই 'উপাসনা'।

'উপ'—ইষ্টদেবতায়াঃ সমীপে, 'আস্যতে' উপবিশ্যতে
যয়া ক্রিয়য়া সা ক্রিয়া উপাসনা।'

উপ+আস্+অনট্ (করণ বাচ্যে) প্রত্যয় যোগে পূর্ব্বোক্ত অর্থে উপাসনা পদ সিদ্ধ হইয়াছে। বেদান্তোপনিষদ্ ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য উপাসনা শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে—

'উপাসনঞ্চ নামরূপ গুণ কর্ম্মণা মন্ততম প্রকারক বস্তু চিন্তনাত্মকম্;
উপেত্য আসনম্ চিন্তনমিতি'।

শঙ্করাচার্য্যের মতে ভাবনারূপ জ্ঞানই উপাসনা, সেই ভাবনায় উপাস্যের নামরূপাদি থাকা

প্রয়োজন ইহাই ফলিত কথা; পক্ষান্তরে উপাস্যের নামরূপাদি ভাবনা-পূর্ব্বক আচমন মার্জ্জন প্রভৃতি কর্ম্মগুলিই উপাসনা ইহাও বলা যায়; গৃহ্য সূত্রকার মহর্ষি 'গোভিল ভাবনা যুক্ত ক র্মকেই উপাসনা বলিয়াছেন যথা—

'ধ্যানযুক্ত মাবর্ত্তয়ে দোম পূর্ব্বাং গায়ত্রীম্'।

গোভিল গৃহ্য সূত্র সন্ধ্যাপ্রকরণ ১২ সূত্র।

উক্ত সূত্রের ভাষ্যকার এই সূত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে—'ধ্যানযুক্তং যথা ভবতি তথা ওঁ পূর্ব্বাং গায়ত্রী মাবর্ত্তয়েৎ জপেৎ' (গোভিলভাষ্য)। 'জপ' ধ্যান যুক্ত হওয়া আবশ্যক, ইহাই উক্ত সূত্র এবং ভাষ্যকারের সার কথা। ঋষি সিদ্ধান্তে বহুস্থানেই ইহা দৃষ্ট হয়; মহর্ষি পতঞ্জলিও বলিয়াছেন যে—

'তজ্জপ, স্তদর্থভাবনম্।'

মন্ত্রার্থ ভাবনা পূর্ব্বক জপ করিতে হইবে, অথবা জপ ও মন্ত্রার্থ ভাবনা এককালে চলিবে, কিম্বা মন্ত্রজপ করিয়া পরে তাহার অর্থ চিন্তা করিতে হইবে—যাহাই বলা যাউক. ইষ্টদেবতার নাম জপ কার্য্য এবং তাহার অর্থ ভাবনা এই দুইই আবশ্যক—তাই শঙ্করাচার্য্য উপাসনাশব্দের পূর্ব্বোক্ত অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এখন মূলকথা এই যে—

'মার্জ্জন'ও একটি উপাসনা কার্য্য, শুদ্ধি অর্থক সৃজ ধাতু করণ বাচ্যে অনট্ প্রত্যয় যোগে মার্জ্জন পদ সিদ্ধ হইয়াছে। ফলিত কথা এই যে—যে কার্য্যদ্বারা সাধক শুদ্ধ হয়েন সেই কার্য্য মার্জ্জন, এখানে 'অপ্' অর্থাৎ জলের দ্বারা সেই কার্য্যসিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম "আপোমার্জ্জন"। জল যে দেহের মল পঙ্কাদি ধৌত করিয়া জীবকে বাহিরে শুদ্ধ করে, ইহা সর্ব্বজন প্রত্যক্ষ। শুদ্ধি দুই প্রকার—বাহিরের শুদ্ধি এবং ভিতরের অর্থাৎ অন্তঃকরণের শুদ্ধি বাহিরের ময়লা স্নানাদিদ্বারা সহজেই যায়, কিন্তু অন্তঃকরণের ময়লা সহজে যায় না। অতিশয় চঞ্চল প্রবৃত্তিপ্রবণ মনকে পরমেশ্বর ভক্তিরসে ভিজাইতে না পারিলে মনের ময়লা যাওয়া সর্ব্বথা অসম্ভব। তাই আপোমার্জ্জন রূপ উপাসনার ৫টি মন্ত্রে জলদেবতার পূর্ব ব্যাখ্যাত ভাবনা দ্বারা মনকে জগন্মাতৃরসে ভিজান হইতেছে—যে গায়ত্রী মাতা সৃষ্টি স্থিতি সংহার কারিণী ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী রুদ্রাণীরূপে. আমার ধ্যানরূপ উপাসনার বস্তু, ভূর্ভুবঃস্বঃ প্রভৃতি নিখিল বিশ্ব জগদ্রূপ উপাসনায় যে গায়ত্রীমাতার অঙ্গকান্তিরূপে প্রতিভাত, তিনিই এখানে জলদেবতা তাই তিনি ওঁকার অভিন্না, পরম স্নেহময়ী অপার করুণাময়ী মাতৃমূর্ত্তি, এবং পরমাত্ম স্বরূপ শিবতত্ত্বরস ঘনমূর্ত্তি আমি আজ সেই রসে আমার এই প্রবৃত্তি প্রবণ মনঃকে ডুবাইয়া, পাগলিনী তটিনীর মত আকুল হইয়া নিখিলপ্রেমসাগরোদ্দেশে ছুটিয়া চলিয়াছি—"তস্মা অরং গমাম"।

এখন সাধক একথা অবশ্যই বুঝিতেছেন যে, জলদেবতা যখন ওঁকার অভিন্না, তখন তিনি নিশ্চয়ই ত্রিমূর্ত্তি গায়ত্রীমাতা, কারণ ওঁকার শব্দ অকার উকার মকাররূপ অক্ষর প্রতিপাদ্য তটস্থলক্ষণলক্ষিত ব্রহ্মবিষ্ণু শিবশক্তি ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী রুদ্রাণীর বাচক, গায়ত্রী উপাসনায় যাঁহাকে "ত্র্যম্বকে"! বলিয়া ডাকিয়াছি এখানে তাঁহাকে ওঁকার অভিন্নরূপে

বুঝিয়াছি, সেখানে তাঁহাকে "বরদে" বলিয়া ডাকিয়াছি, এখানেও তাঁহাকে "বরদা"রূপেই বুঝিয়াছি তাইত আজ তাঁহার নিকটে কল্যাণপাপক্ষয়, সুখ, অন্নবলাদি এবং তত্ত্বজ্ঞান-প্রভৃতি বর প্রার্থনা করিতেছি, সুতরাং মা আমার সর্ব্বার্থসাধিকা বলিয়া সর্ব্বশক্তিময়ী; সুতরাং এই মার্জ্জন উপাসনায় গায়ত্রীই শক্তিরূপে উপাসিতা হইয়াছেন। সন্ধ্যার অন্যান্য মন্ত্র উপাসনায় এই মাতা কিভাবে ভাবিতা হইয়াছেন, তাহা পরে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

চিত্তশুদ্ধি।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

(লেখক শ্রীকালীচরণ কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ ভট্টাচার্য্য)

[৩]

চিত্তশুদ্ধি করিতে হইলে বাক্যসংযম অভ্যাস করাও একান্ত কর্ত্তব্য। বাক্যের সংযম বা সত্যবাদিতা না থাকিলে চিত্তশুদ্ধি হয় না। মনুসংহিতার ৫ম অধ্যায়ে দেখিয়াছি—

অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি, মনঃ সত্যেন শুধ্যতি।
বিদ্যা তপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধি—র্জ্ঞানেন শুধ্যতি ॥

অর্থাৎ জলদ্বারা সমুদয় শরীর শুদ্ধ হয়, সত্যদ্বারা মন (চিত্ত) শুদ্ধ হয়, বিদ্যা ও তপস্যা দ্বারা জীবাত্মা শুদ্ধ হয় এবং জ্ঞানবলে বুদ্ধি বিশুদ্ধ হয়। টীকাকার কুল্লুক ভট্ট মন ও বুদ্ধির এরূপ প্রভেদ করিয়াছেন যথা—"সংকল্প বিকল্পাত্মকং মনঃ নিশ্চয়াত্মিকা। বুদ্ধি রিতি মনোবুদ্ধ্যো র্ভেদঃ"। বহুভাষিতা অনেকেরই একটা মজ্জাগত দোষ। ইহা সর্ব্বতো-ভাবে পরিহার করা কর্ত্তব্য। কারণ, বহুভাষিতার মধ্যে সত্যানৃত থাকিবেই। অতএব ব্রাহ্মণদিগকে বিশেষ করিয়া শাস্ত্রকার উপদেশ দিয়াছেন,

স্বল্পবাক্—কর্ম্মভূয়িষ্ঠা ভবন্তি ব্রাহ্মণাঃ খলু;

ব্রাহ্মণেরা অল্পকথা বলিবেন, কিন্তু কাজে অধিক হইবেন। "কথায় না বড় হ'য়ে কাজে বড় হ'বে"। বাক্যবাগীশ হইলে চলিবে না প্রকৃতকর্ম্মী হওয়া চাই। কথায় বড় ভোজনে দড়" হওয়া সমাজের কল্যাণজনক নহে।

মহাভারতের বনপর্ব্বে অজগররূপী নহুষ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণঃ কো ভবেদ রাজন্!

মহারাজ! ব্রাহ্মণ কে?

তদুত্তরে যুধিষ্ঠির বলিলেন—

সত্যং দানং ক্ষমাশীল মানৃশংস্যং তপো দয়া।
দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র! স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥

ইহার মধ্যে সত্যকেই প্রথম নির্দেশ করা হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের চতু অধ্যায়ের ৪র্থ খণ্ডে একটি মনোহর উপাখ্যান বর্ণিত আছে,—

সত্যকাম নামে একটি বালক মহর্ষি গৌতমের নিকট গমন করিয়া বলিল যে, ভগবন্ আমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করতঃ, বেদ পাঠের অভিপ্রায়ে আপনার নিকট উপনীত হইয়াছি; আমাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করুন। এইকথা শুনিয়া মহর্ষি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

কিং গোত্রো নু সৌম্যাঽসীতি?

স হো বাচ নাহমেতদ্ বেদ যদ্ গোত্রোঽহমস্মি; অপৃচ্ছং মাতরং, সা মা প্রত্যব্রবীৎ, বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে, সাহমেতন্ন বেদ যদ্ গোত্র স্ত্বমসি জবালা তু নামা হমস্মি সত্যকামো নাম ত্বমসীতি।

অর্থাৎ হে সৌম্য! সুন্দর বালক! তোমার কোন্ গোত্র? সেই বালক উত্তর করিল, ভগবন্! আমার কোন্ গোত্র তাহা জানি না, মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি বলিলেন, আমি ....বহু অতিথি অভ্যাগতের সেবা-শুশ্রূষায় নিযুক্ত ছিলাম, সে সময় তোমাকে লাভ করিয়াছি। তাহার অল্প পরেই তোমারও পিতৃবিয়োগ হয়। সুতরাং কোন্ গোত্র তাহা জানিয়া রাখিতে পারি নাই। তবে এইমাত্র জানি যে, আমার নাম জবালা ও তোমার নাম রাখা হইয়াছে সত্যকাম।

তাহার পর গৌতম বলিলেন,—নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তু মর্হতি।

বৎস! সত্যকাম! আমি বুঝিতে পারিলাম যে, তুমি নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ। কারণ ব্রাহ্মণ ভিন্ন এরূপ অকপট সত্য কেহই বলিতে পারে না। তুমি যখন সত্যভ্রষ্ট হও নাই, তখন যজ্ঞকাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আন, আমি তোমার উপনয়নক্রিয়া সম্পাদন করিব। মহর্ষি গৌতম সত্যকামের অনাবিল সত্যনিষ্ঠা দ্বারাই তাহার ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। অতএব—

নহি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মো ন পাপ মনৃতাৎ পরম্।
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা মর্ত্ত্যঃ সত্যমেকং সমাশ্রয়েৎ॥

এইজন্যই মহারাজ দশরথ সত্যরক্ষার্থ প্রিয়তম পুত্র রামচন্দ্রকে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য নির্ব্বাসিত করিয়া তদীয় শোকে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। তথাপি সত্যধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া, স্বরূপনের কলঙ্কের মসীরেখা আপন শুভ্র সমুজ্জ্বল কপালদেশে অঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করেন নাই। সত্যরক্ষার জন্যই যুধিষ্ঠির ও হরিশ্চন্দ্র রাজ্য ধন বিসর্জন দিয়া বনবাসী হইয়াছিলেন, তথাপি সত্য ছাড়িতে পারেন নাই। এরূপ কত পুণ্যপ্রতিভামণ্ডিত সত্যের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সংসারক্ষেত্রে ২।১টা দৃষ্টান্ত দেখিলেও সত্যের অম্লান মহিমা বেশ বুঝিতে পারা যায়। সূচীভেদ্য অন্ধকারময়ী রজনীতে একটা রজ্জু দেখিলে হঠাৎ সর্প ভ্রম হয়, কিংবা পথে

ঘাটে সহসা একটা গাছ দেখিলেও সহসা বিচলিত ও ভীতি বিহ্বল হইয়া পড়িতে হয়। কিন্তু সূর্য্যোদয়ে বা আলোকের সাহায্যে সে মিথ্যা ভ্রম বিদূরিত হইলেই সত্যের অনির্ব্বচনীয় মহিমা বুঝিতে পারা যায়। মিথ্যার প্রহেলিকা দূর হইলেই উপলব্ধি হয় যে, "সত্যং শিবং সুন্দরম্"।

সত্য সুন্দর মঙ্গলময়। উহা স্বপ্রকাশ, জল মধ্যে তৈল নিক্ষেপ করিলে উহা যেমন উপরে ভাসিয়া উঠে, তেমনি সত্যও সর্ব্বদা দেদীপ্যমান থাকে। অথবা যেমন মেঘের আবরণ ভেদ করিয়া সূর্য্যদেব গগন মণ্ডলে উদ্‌ভাসিত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ মিথ্যার সমস্ত আবরণ দূরে রাখিয়া সত্য প্রকাশমান হইয়া থাকে। সুতরাং মুণ্ডকোপনিষদে বলা হইয়াছে—

সত্য মেব জয়তে নানৃতং,
সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ॥

অর্থাৎ সত্যই পরিণামে জয় যুক্ত হয়, মিথ্যার জয় হয় না। বিস্তৃত দেব যান পথ একমাত্র সত্য দ্বারাই লাভ করিতে পারা যায়।

সত্যবাদী হওয়ার ন্যায় মিষ্টভাষী হওয়াও মানবের কর্ত্তব্য। কর্কশভাষিতা বহু দোষের আকর। একটা গল্প আছে,—

শ্রীভগবান রামচন্দ্র যখন অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তখন হনুমানকে ভাণ্ডারীর পদ দিয়াছিলেন। আর তাহার উপরই সমুদয় দানের ভার ন্যস্ত ছিল। দান দক্ষিণা উপযুক্ত ভাবেই সম্পাদন করিত, তাহার ত্রুটি ছিল না। কিন্তু দীন, দুঃখী, অন্ধ, আতুর দেখিলে মাঝে মাঝে কাহাকেও দুই চারিটা ভ্যাংচি দিত, দাঁত কিড় মিড় দিয়া বিজলি দিত। ইহা বানরের স্বভাব দোষ, প্রকৃতি নৈব গচ্ছতি। স্বভাব যায় না। তাহাতে কেহ কেহ রামের নিকট অভিযোগ আনয়ন করিলে, তিনিও ভাবিলেন ইহার সমুচিত শিক্ষা দেওয়াই কর্ত্তব্য। নচেৎ স্বভাব দোষ ছাড়িবে না। এই ভাবিয়া প্রিয়ভক্ত হনুমানকে তৎক্ষণাৎ একটা কাজের ভার দিয়া "তোমাকে এখনই হিমালয়ের সেই স্থানে যাইতে হইবে" এই আদেশ প্রদান করিলেন। কপিবরও "যে আজ্ঞা" বলিয়া পবন গতিতে প্রস্থান করতঃ হিমালয়ের সেই স্থানে উপনীত হইয়া দেখিতে পাইল যে, একজন দিব্যকান্তি সুন্দর পুরুষ ধ্যানে বসিয়া আছেন। কিন্তু তাঁহার মুখ খানা শূকরের মুখের মত কদাকার। হনুমান্ বড়ই বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার মুখখানা এমন কেন"? ধ্যানস্থ পুরুষ উত্তর করিলেন,—

নানা দানং ময়া দত্তং, রত্নানি বিবিধানি চ।
ন দত্তং মধুরং বাক্যং, তেনাহং শূকরী মুখঃ।

অর্থাৎ আমি পূর্ব্ব জন্মে নানাবিধ ধন, রত্ন অনেকই দান করিয়াছি, কিন্তু হায়! মিষ্ট কথাটি দান করি নাই; সে কারণেই আমার মুখ শূকরীর মুখের মত। আমাদের মনে হয় তাহার ধন রত্নাদি দানের ফলই মুখ ভিন্ন সর্ব্বাঙ্গে প্রকটিত। বাক্য দান মুখের কার্য্য। বাক্য গত মাধুর্য্যের অভাবই মুখ শৌকর্য্যের হেতু। হনুমান্ ব্যাপারটা বেশ বুঝিতে পারিল

যে, আমার উপযুক্ত শিক্ষার জন্যই রামচন্দ্র এখানে আমাকে পাঠাইয়াছেন। যাহা হউক তথা হইতে রাম সমীপে যাইয়া হনুমান যুক্তকরে নিবেদন করিল, প্রভো! শিক্ষাত আমার যথেষ্ট হইয়াছে, কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি, "আপনি দয়ার সাগর, দয়া করিয়া তখন শ্রীমুখের দুইটি উপদেশ বাণী দিলেইত এদাসের জীবনের তরে যথেষ্ট শিক্ষা হইত; কিন্তু প্রভো! তাহা না করিয়া, এরূপ ভীষণ বনে, জঙ্গলে, পাহাড় পর্ব্বতে এ অধমকে পাঠাবার কি আবশ্যক ছিল? এই শ্রীমানত আর প্রভুদের জন্য নদ, নদী, পাহাড়, পর্ব্বত লঙ্ঘন করিতে কম করে নাই। বিশাল গন্ধমাদনের গন্ধ আজও মাথায় রহিয়াছে"। ইহা শুনিয়া শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র বলিলেন, দেখ হনুমান্! "উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত বড়"। এ উপদেশটি অত্যন্ত হিতকর।

চিরদিন মানুষের কখনও সমান যায় না। কথায় বলে, "মানুষের দশ দশা, কখন হাতী কখন মশা"। মানুষ কর্ম্মবিপাকে এমনি জড়িত যে, তাহা এড়াইবার সাধ্য নাই। সে জন্য যুধিষ্ঠির, হরিশ্চন্দ্র, শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতিকেও সময় সময় দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছে।

স্ব কর্ম্ম ফল ভুক্ পুমান্।

মানব স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে। বিষ্ণু পুরাণে লিখিত আছে—

সুখস্য দুঃখস্য ন কোঽপি দাতা,
পরঃ করোতীতি কু বুদ্ধি রেষা।
অহং করোমীতি বৃথা ভিমানঃ,
স্ব কর্ম্ম সূত্রে গ্রথিতাহি লোকাঃ॥

অর্থাৎ কেহই সুখ দুঃখ দেয় না, অপরে করিয়া থাকে ইহা কুবুদ্ধি মাত্র। আর আমি করি, ইহা একটা বৃথা অহঙ্কার। সমুদয় লোকই আপন আপন কর্ম্মসূত্রে গাঁথা রহিয়াছে। সুতরাং "হাতীরও পিছলে পাও, সুজনেরও ডুবে নাও"। এই প্রবচন মিথ্যা নহে। এস্থলে ধর্ম্মবুদ্ধি ও পাপবুদ্ধি নামক দুই বন্ধুর গল্প একটি বলিতেছি।

একদা এই দুইজন বন্ধু বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। কিছুদূর আসিয়া ধর্ম্মবুদ্ধি পাপবুদ্ধিকে বলিল, বন্ধো! ঐ শুন নিকটে শিবমন্দিরে হরিনাম কীর্ত্তন হইতেছে, চল ভাই! তথায় যাইয়া নামামৃত পানে বিভোর হইয়া আসি। ইহা শুনিয়া পাপবুদ্ধি বলিল, না ভাই! হরিনাম শুনিয়া কি হইবে? ঐ নিকটস্থ বাজারে চল, তথায় কলির সুধা সুরাপানে বিভোর হইয়া আসি। দেখিবে তোমার হরিনামের সুধা অপেক্ষা সেই কলির সুধা সুরা পানের মাদকতা কেমন? ধর্ম্মবুদ্ধি এ অভ্যর্থনায় সন্তুষ্ট হইল না, পাপবুদ্ধিও স্বীয় নামের সার্থকতা রাখিল। অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর উভয়েরই স্ব স্ব গন্তব্য পথে যাওয়া স্থির হইলে, পরস্পরের মধ্যে এই নির্দ্ধারণ রহিল যে, এখান হইতে বাড়ী যাইবার কালে উভয়কে একযোগে যাইতে হইবে। যেই আগে আসে তাহাকেই অপরের জন্য এই গাছতলায় বিশ্রাম নিতে হইবে। দুইজনেই প্রতিশ্রুতি দিয়া আপন আপন সুধাপানে বিভোর

হইবার জন্য স্ব স্ব গন্তব্য পথে অমৃতের সন্ধানে চলিল। ধর্ম্মবুদ্ধি শিবমন্দিরে প্রবেশ করিয়া "নামগানে সদা রুচিঃ" ইহার সার্থকতা করতঃ

চেতো দর্পণ মার্জ্জনং ভব-মহা-
দাবাগ্নি নির্ব্বাপণং,
শ্রেয়ঃ কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণং
বিদ্যাবধূ জীবনম্।
আনন্দাম্বুধি বর্দ্ধনং প্রতিপদং
পূর্ণামৃতাস্বাদনং।
সর্ব্বাত্ম-স্নপনং পরং বিজয়তে
শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনম্॥

অর্থাৎ শ্রীহরির নাম কীর্ত্তন করিলে চিত্তদর্পণটি মার্জ্জিত হয় অর্থাৎ মনের মলিনতা দূর হয়; সংসারের যে বিষয়বাসনা দাবানলের মত মানুষকে পুড়িয়া ভস্ম করিয়া দিতেছে সে আগুন নিবিয়া যায়; চন্দ্রের কিরণ পাইলে যেমন সরোবরে কুমুদ ফুটিয়া উঠে, তদ্রূপ আত্মার কল্যাণ সাধিত হয়; যে ব্রহ্মবিদ্যা বধূর ন্যায় নির্জ্জন অন্তঃকরণপ্রদেশে বর্ত্তমান রহিয়াছে, হরিনাম কীর্ত্তন তাহার প্রাণস্বরূপ; ইহাতে আনন্দসাগর উদ্বেলিত হইয়া উঠে; প্রতিক্ষণেই পূর্ণ অমৃতের আস্বাদ প্রদান করে; আর যে নামের অমৃতরসে স্নান করিয়া সকলেই তাহাতে ডুবিয়া পড়ে সেই শ্রীহরির নামকীর্ত্তন জয়যুক্ত হউক। ধর্ম্মবুদ্ধি এ হেন নামগান করিয়া চলিয়া আসিবার কালে মন্দির প্রাঙ্গণে বিল্বতলায় কণ্টকবিদ্ধ হইল। ইচ্ছাময়ের কি ইচ্ছা!! ক্ষুদ্র মানব তাহার কি বুঝিবে? এজন্যই জনৈক কবি একদিন বলিয়াছিলেন,—

যাতঃস্মা মখিলাং প্রদায় হরয়ে
পাতাল মূলং বলিঃ,
শক্তু প্রস্থ বিসর্জ্জনাৎ স চ মুনিঃ
স্বর্গং সমারোপিতঃ।
আবাল্যা দসতীসতী দসতীস্থর পুরীং
কুন্তী সমারোহৎ,
হা সীতা পতি দেবতা হগম দহো
ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ॥

অর্থাৎ বলিরাজা সমুদয় পৃথিবী শ্রীহরিকে দান করিয়াও পাতালে গিয়াছিল, আর একমুষ্টি শক্তু দান করিয়া সেই মুনি স্বর্গলোকে গমন করিয়াছিলেন। কুন্তীদেবী বাল্যাবধি পাঁচজন পতির সেবা করিয়া প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়াছেন, স্বর্গধামে গমন করিয়াছেন। আর হায়! সতীকুলললামভূতা সীতাদেবী একমাত্র পতির আরাধনা করিয়াও স্বর্গে স্থান

না পাইয়া পাতালে প্রবেশ করিয়াছিলেন। হায়! হায়!! ধর্মের কি সূক্ষ্মগতি! ধর্মবুদ্ধিও হরিনাম গান করিয়া আসিবার পথে বিবতলায় দৈবাৎ কণ্টকবিদ্ধ হইল। পরে একটি "প্রাণাধিকা যষ্টিকা" ভর করিয়া "পাদেন খঞ্জঃ" অবস্থায়—ধীরে ধীরে সেই নির্দ্ধারিত বৃক্ষতলে আসিতেছে। তৎপূর্ব্বেই অন্যতর বন্ধু পাপবুদ্ধি সুরালয় হইতে গণিকালয়ে প্রবেশ করতঃ ফিরিয়া আসিবার কালে একটি স্বর্ণমুদ্রা দ্বারদেশে পাইয়া নিজ পকেটে ভরিয়া, সানন্দচিত্তে গাছতলায় আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং সহসা দেখিতে পাইল যে, অনতিদূরে ধর্মবুদ্ধি বন্ধু মহাশয় এক লাঠি ভর করিয়া আসিতেছেন। কাছে আসিলে জিজ্ঞাসা করিল, বন্ধু মহাশয়! ব্যাপার কি? "প্রাণাধিকা যষ্টিকার' আশ্রয়, আবার "পাদেন খঞ্জঃ"। হরিনামের পরিণাম কি এই? ধর্মবুদ্ধি উত্তর করিল, কীর্ত্তনান্তে চলিয়া আসিবার পথে মন্দির-প্রাঙ্গণে বেলতলায় একটা কাঁটাতে পা বিদ্ধ হইয়াছে। তখন পাপবুদ্ধি বলিল, দেখ তোমার আমোদে ও আমার আমোদে কত প্রভেদ। তোমার ত এই দশা। আর আমার দেখ একটি বহুমূল্য স্বর্ণমুদ্রা লাভ। জানিও এ ঘোর কলি, "যে করে পুণ্য, সে হয় শূন্য; যে করে পাপ, সে হয় শতপুত্রের বাপ"। এসব কথায় ধর্মবুদ্ধির প্রাণে বড়ই খেদ জন্মিল। তথাপি তাহার ধর্মবুদ্ধি বিচলিত হইল না। কারণ সে জানে, "আগুণে খাদই পুড়িয়া যায়, সোণার কিছু হয় না"।

অতীত্য বিপদঃ সর্ব্বা ধর্ম্মো বিজয়তে তরাম্॥

তৎপর সে বলিল, ঐ আশ্রমে একজন যোগী বাস করিতেছেন, চল তাঁহাকে জীবন বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করি। ইহা বলিয়া উভয়েই তথায় গিয়া যথাবিধি অভিবাদনান্তে জিজ্ঞাসা করিলে, যোগীবর ধ্যানস্থ হইয়া, পরে উত্তর দিলেন, এই যে ধর্মবুদ্ধি তাহার বহু পূর্ব্বজন্মের এত দুষ্কৃতি ছিল যে, আজ তাহার ফলে শূলে বিদ্ধ হইত, কিন্তু ঐহিক সুকৃতি বলে সামান্য একটা কাঁটায় বিদ্ধ হইয়াছে। আর এই ব্যক্তির জন্মান্তরে এত সুকৃতি ছিল যে, তাহার ফলে আজ সে রাজাধিরাজ হইয়া লক্ষ লক্ষ প্রজার নিকট হইতে কোটি কোটি সুবর্ণ মুদ্রা উপহার পাইত। কিন্তু ইহার এমনি দুর্ভাগ্য যে, ঐহিক দুষ্কৃতির ফলে আজ তাহার একটি মাত্র স্বর্ণ মুদ্রা অস্থানেলাভ হইয়াছে। অতঃপর তাহারা চলিয়া গেল।

সংসারের অবস্থাই এই। চিত্তবৃত্তি কলুষিত হইয়া পড়িলে মানুষ কি না করিতে পারে?

"কি মকার্য্যং কদর্য্যানাম্"?

কদর্য্যের অকার্য্য কি আছে? দূষিত চিত্তই পাপের প্রিয়তম লীলা নিকেতন। সংসারে হিংসা, দ্বেষ, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা এসকল কলুষিত চিত্তবৃত্তির ফল। এই সমুদয় দূরে ছাড়িয়া শুদ্ধচিত্তের উপর ভগবানের শ্রীমন্দির গড়িয়া তোলাই মানুষের কাজ। যেমন আয়নাটা পরিষ্কার না করিলে তাহাতে আপন মুখ দেখা যায় না, আকাশ নির্ম্মল না হইলে তাহাতে চন্দ্র সূর্য্যের পূর্ণ ছবি প্রতিবিম্বিত হয় না, সেরূপ চিত্তশুদ্ধি না হইলে তাহাতেও শ্রীভগবানের পদ ছায়ার প্রতিবিম্ব পাত হয় না। ইহা ধ্রুব সত্য। আর অশুদ্ধ চিত্ত নিয়া কোনও

কাজ করিলেও তাহা শয়তানের মতই হইয়া থাকে? হিংসা দ্বেষে যে কত ভূত পূর্ব বড়বড় ক্রিয়াবীর অধঃপতন ঘটিতেছে, তাহা আমরা অনেক প্রত্যক্ষ করিতেছি। এনকল সৎবৃত্তি লাভের প্রবল অন্তরায়। এ স্থলে সর্প ও নারদের এক উপাখ্যান মনে পড়িল।

একদা দেবর্ষি নারদ বীণা যোগে হরিগুণ গাহিতে গাহিতে বৈকুণ্ঠধামে, চলিয়াছেন। পথিমধ্যে এক ভীষণতম সর্পের সহিত দেখা হইলে সে জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুর! প্রণাম করি, কোথায় যাইতেছেন? নারদ বলিলেন বৈকুণ্ঠ ধামে। সর্প পুনরায় বলিল, ঠাকুর! সংসারে মুক্তির উপায় কি? নারদ উপদেশ দিলেন, কাহাকেও হিংসা করিও না, তবেই মুক্তি পদ পাইবে। এই বলিয়া দেবর্ষি নারদ চলিয়া গেলেন। সর্পও তদবধি হিংসা বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া জড়বৎ পড়িয়া থাকিত। যে সর্পের গভীর গর্জ্জনে একক্রোশ দূর দিয়া লোকে যাতায়াত করিত, এখন তাহার উপরে রাখাল বালকেরাও ঢিল ছুড়িতে আরম্ভ করিল, এমন কি পদাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিল। তথাপি সর্প "গুরোর্ব্বাক্যং সত্যং" ভাবিয়া, সর্ব্বথা অহিংস বৃত্তি অবলম্বনে "মৃতবৎ ভূমৌ পপাত" মরার মত মাটীতে পড়িয়া থাকিত। এদিকে বহুদিন পর নারদ ভাবিলেন, আমার শিষ্যবর সর্পটা কি করে একবার দেখিয়া আসি। এই ভাবিয়া তথায় গমন করত দেখিলেন, সাপটা মরার মত পড়িয়া আছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন সর্প! কেমন আছ? উত্তর করিল ঠাকুর! আর কেমন আছি? দেখুন আমার দুর্দ্দশা। আপনার কথায় হিংসা বৃত্তি ছাড়িয়া আমার এই ফল হইয়াছে, রাখাল বালকের হাতে পর্যন্ত নির্য্যাতন। ঠাকুর! মুক্তি আর কত দূরে? নারদ বলিলেন—

মুক্তি স্তব করে স্থিতা। অবশ্যই মুক্তি তোমার হাতে রহিয়াছে। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমি তোমাকে হিংসা করিতেই নিষেধ করিয়াছি, ফোঁস ফোঁস করিতে ত নিষেধ করি নাই। তুমি তাহা কর নাই কেন? সেরূপ করিলে ত এ দুর্দ্দশা তোমার ঘটিত না। এ উপাখ্যানটি বড়ই হৃদয়গ্রাহী। বাস্তবিকই সংসারে আত্মরক্ষার জন্য সময় সময় ফোঁস্ ফোঁস্ করিতে হয়, কিন্তু হিংসা সর্বতোভাবে পরিবর্জ্জনীয়।

বাল্যকাল হইতেই অভ্যাস যোগের সাহায্যে বাক্য ও মন শুদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করা মানব জীবনের একান্ত কর্ত্তব্য। মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে,—

যস্য বাঙ্‌মনসী শুদ্ধে, সম্যগ্‌গুপ্তেচ সর্ব্বদা।
স বৈ সর্ব্ব মবাপ্নোতি, বেদান্তোপ গতং ফলম্॥

অর্থাৎ যাহার বাক্য ও মন (চিত্ত) শুদ্ধ, এবং যাহার এ দুইটি সর্ব্বদাই অসৎ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকে, সে বেদ বেদান্তে বর্ণিত সমুদয় ফল লাভ করিতে পারে। চিত্ত শুদ্ধির প্রতি সদাচার অন্যতম সহায়। সদাচার ব্যতীত কখনও চিত্ত শুদ্ধ হইতে পারে না। সদাচার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার রহিল। সদাচার প্রবন্ধে তাহা লিখিব।

চিত্তশুদ্ধি করিতে হইলে বিত্তশুদ্ধির প্রতিও লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। সংসারে যত কিছু কার্য্য সমুদয়ই অর্থ সাপেক্ষ। "অর্থ মনর্থং ভাবয় নিত্যং" একথা শঙ্করাচার্য্যের মত যাঁহারা

"কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ" তাঁহাদের পক্ষেই শোভা পায়। গৃহীর পক্ষে এ কথা না খাটিলেও অত্যধিক অর্থলালসা ভাল নহে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে। কারণ তাহাতে ঘোর মত্ততা জন্মে। তবে প্রয়োজন মত হইলেই যথেষ্ট।

বস্তু যাবৎ ন তেনৈব, শ্যেন তুষ্যতি বুদ্ধিমান্।

যাহার যাহা আছে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিজের তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকে।

"সন্তোষ মূলং হি সুখম্"

নীতি শাস্ত্রে কথিত আছে—

সন্তোষামৃত তৃপ্তানাং যৎ সুখং শান্ত চেতসাম্।
কুত স্তদ্ধন লুব্ধানা মিতশ্চেতশ্চ ধাবতাম্॥ ? ।

যাহারা শান্তচিত্ত, সন্তোষরূপ অমৃতে তুষ্ট তাহাদের যে সুখ, যাহারা ধনলুব্ধ হইয়া চারিদিকে দৌড়িয়া থাকে, তাহাদের অন্তরে সে সুখ কোথায়? যাহারা দুষ্পূরণীয় বাসনার অনলে ইন্ধন যোগাইবার জন্য সর্বদাই ব্যতিব্যস্ত, তাহারা ন্যায় অন্যায় বিচার না করিয়া, শুধু অর্থের সঞ্চয় করেন। অর্থের আশায় কতই না অকার্য্য কুকার্য্য করিয়া থাকে। এমন লোককে গীতার একটি ভগবদ্‌বাণী বলিতেছি,—

আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কাম ভোগার্থ মন্যায়েনার্থ সঞ্চয়ান্॥

অর্থাৎ কামক্রোধপরায়ণ লোক শত শত আশার পাশ বন্ধনে বদ্ধ হইয়া ইচ্ছামত ভোগ বিলাসের জন্য অন্যায়পূর্বক অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা করিয়া থাকে। তাহাদের পরিণাম ভগবান্ পরিশেষে বলিয়াছেন,—

পতন্তি নরকেহশুচৌ॥

ইহারা অপবিত্র নরকে যাইয়া পড়ে। কাজেই তেমন অর্থের আশা কখনও করিতে নাই। একটা সুন্দর শ্লোক আছে,—

আশা দাসী কৃতা যেন, তেন দাসায়িতং জগৎ॥

অর্থাৎ যে আশাকে দাসী করিতে পারিয়াছে, সে সমগ্র জগৎকেই দাস করিতে পারে। অতএব আশার দাস হওয়া ভাল নয়, আশাকে দাসী করাই ভাল।

অর্থ সর্ববিধ কার্য্য সার্থকতার সহায় হইলেও ন্যায়তঃ অর্থোপার্জনই কর্তব্য। তদ্ভিন্ন অর্থ অশুদ্ধ। তদ্দ্বারা কোনও কার্য্য করিলেও তাহা সুফলপ্রসূ হয় না। শাস্ত্রে আছে,—

ন্যায়োপার্জিত বিত্তেন, কর্ম্মকুর্য্যাদ্ বিচক্ষণঃ॥

মনুসংহিতার ৫ম অধ্যায়ে লিখিত আছে,

জ্ঞানং তপোহগ্নি, রাহারো মৃন্মনো—
বার্য্যুপাঞ্জনম্।
বায়ুঃ কর্ম্মা র্ককালৌ চ, শুদ্ধেঃ
কর্ত্তৃণি দেহিনাম্॥

অর্থাৎ জ্ঞান তপস্যা, অগ্নি, আহার, মৃত্তিকা, মন, জল, গোময়াদির লেপন বায়ু, কর্ম্ম, সূর্য্য, ও কাল এই সমস্ত মানুষের শুদ্ধির কারণ। ইহার দৃষ্টান্তগুলি কুল্লুক ভট্টের টীকায় দ্রষ্টব্য। বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত হইল না। ইহার পরই ভগবান মনু বলিয়াছেন,—

সর্ব্বেষা মেব শৌচানা মর্থ শৌচং পরং স্মৃতম্।
যোঽর্থে শুচি হি স শুচি র্ন মৃদ্বারি—
শুচিঃ শুচিঃ ॥

অর্থাৎ, শুদ্ধিজনক সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে অর্থশুদ্ধি প্রধান। অর্থোপার্জ্জনে যে ব্যক্তি শুচি সে প্রকৃত শুচি। অর্থশুদ্ধি না থাকিলে কোন মৃত্তিকা স্নান ও জলস্নান করিলেও শুদ্ধ হয় না। সাংসারিক বিশেষতঃ বিষয়ী লোকদিগকে মনুর এই কথা গুলি ভালরূপ তলাইয়া দেখিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করি।

আর একটি কথা বলিয়া "চিত্তশুদ্ধি" প্রবন্ধের উপসংহার করিব। সংসারে কূট বুদ্ধি বিষয়ী লোক বড় ভয়ঙ্কর জীব। যথাসম্ভব তাহাদের সংস্পর্শে না যাওয়া বা কম যাওয়াই মঙ্গল। যাহারা "বিষকুম্ভ পয়োমুখ"। অর্থাৎ অন্তরে কাল, মুখে ভাল, তাহাদের সহিত বাস করিতেই নাই।—আর একশ্রেণীর লোক আছে, তাহারা বড়ই হিসাব প্রিয়। তুচ্ছ বিষয় নিয়া হিসাব করে, মূল বিষয় নিয়া হিসাব করা তো ভালই কিন্তু খোসা নিয়া টানাটানি কেন ?

অবশ্য বেহিসাবী হইয়া সংসারে থাকিতে হইবে এমন কথা আমি বলি না। কিন্তু সেই বড় মহাজনের কাছেও সংসারের হিসাব নিকাশ একদিন দিতে হইবে। কারণ তিনি বড় অমূল্য ধন মানুষের কাছে আমানত রাখিয়াছেন। সে দিন যেন নিকাশের নামে শরীর শিহরিয়া না উঠে।

একটি বড় সুন্দর গল্প আছে; দুইজন বন্ধু এক আম বাগানে গিয়াছিল, বাগানের মালিকের হুকুম এই যে, নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত, যে কেহ যত ইচ্ছা আম পাড়িয়া খাইতে পারিবে। কিন্তু একটিও লইবার বা অতিরিক্ত সময় থাকিবার সাধ্য নাই। বন্ধুদ্বয় বাগানে প্রবেশ করিয়া একজন অমনি আম পাড়িয়া খাইতে লাগিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই পেট ভরিয়া গেল। সে জানে এর বেশী সময় বাগানে থাকিবার অধিকার তাহার নাই। আর দ্বিতীয় বন্ধু বড় হিসাব প্রিয়। সে বাগানে প্রবেশ করিয়াই, জায়গা কত, গাছ কয়টা, আম কতগুলি, ইত্যাদিরূপে জায়গার কালি ও গাছ গুলির হিসাব করিতে বসিলেন। এদিকে সময় অতীত হইলে, বাগানের রক্ষক আসিয়া বাহিরে যাইবার হুকুম করিল। যে আশা মিটাইয়া আম খাইয়াছে, সেত চলিয়া গেল। কিন্তু হিসাবকারী বন্ধুত আর যাইতে চায় না, কারণ জমি কালি ও হিসাবেই তাহার সময় গেল। বাগানে ঢুকিবার মূল উদ্দেশ্য আম খাওয়াত মোটেই হইল না। বহু বাদ বিবাদের পর রক্ষকের অর্দ্ধচন্দ্র খাইয়া তবে হিসাবপ্রিয় বাগানের বাহির হইল। যাহাদের ঐরূপ কেবল হিসাবকরণী লোকসানকারী বুদ্ধিই প্রবল

তাহাদের দশা এইরূপই ঘটিয়া থাকে। সংসারের হিসাব নিকাশ, জমা খরচ, তাগিদ পত্র লিখাই ব্যস্ত। এরূপ লোক বড় বুদ্ধিমান্ বলিয়া বড়াই করে, কতই বা লোক সমাজে আস্ফালন করে। ভাবিয়া দেখিলে তাহাদের মত নির্ব্বোধ আর নাই। এ জগতের নিম্ন আদালতের হিসাব একটু কম করিয়াও উর্দ্ধ আদালতের বিচারের জন্ম সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। শমনের আদালত হইতে সমনজারী হইলে তথায় গিয়া সন্তোষজনক জবাব দেওয়ার জন্য সকলকেই প্রস্তুত থাকা উচিত। ঐ যে অদূরেই যমের বাহন মহিষের গলস্থিত ঘণ্টা ধ্বনি শুনা যাইতেছে। শেষে যেন এই বলিয়া অনুতপ্ত হইতে না হয় যে—

"ইদানীং ভীতোঽহং মহিষ গলঘণ্টা ঘনরবাৎ,
নিরালম্বো লম্বোদরজননি! কং যামি শরণম্"?

শুদ্ধ চিত্তে সাদা প্রাণে ভগবান্‌কে ডাক। তবেই তাঁহার কৃপা লাভ করিবে। মুণ্ডকো-পনিষদে আছে—

যস্মিন্ বিশুদ্ধে বিভবত্যেষ আত্মা॥

যেই চিত্ত বিশুদ্ধ, তাহাতেই পরমাত্মা প্রকাশ পাইয়া থাকেন। চিত্ত শুদ্ধির ফল শ্রুতি মুণ্ডকোপনিষদ্ হইতে বিবৃত করিয়া এখানেই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

যং যং লোকং মনসা সং বিভাতি,
বিশুদ্ধ সত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্।
তং তং লোকং জয়তে তাংশ্চ কামান্,
তস্মা দাত্মজ্ঞং হ্যর্চ্চয়েদ্ ভূতি কামঃ॥

অর্থাৎ শুদ্ধ চিত্ত ব্যক্তি স্বর্গাদি যেই যেই লোক পাইবার সঙ্কল্প করেন, এবং যে সমুদয় ভোগ্য বস্তুর কামনা করেন, তিনি সেই সেই পবিত্র ধাম ও অভিলষিত বস্তু জয় করিয়া লাভ করেন। অতএব ঐশ্বর্য্য লাভেচ্ছুক ব্যক্তি আত্মবিৎ পুরুষের পূজা করিবেন।

স্বধর্ম্ম ও স্বারাজ্য

তাহার আদর্শ এবং সাধনোপায়।

(লেখক—শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়)

চিকিৎসাশাস্ত্র রোগ, রোগের নিদান, রোগনিবৃত্তি বা আরোগ্য, আর রোগনিবৃত্তির উপায়—এই চতুর্ব্যূহের কথা বলেন, মোক্ষশাস্ত্রও হেয়, হেয়হেতু, হান এবং হানোপায় এই চারিটার আলোচনা করেন। আমরা আজ জাতির মুক্তিকামী—জাতির যে সমস্ত ব্যাধি এবং যে সমস্ত দুঃখ দুর্দ্দশা, তার উচ্ছেদ করিতে উৎসুক; কাজেই আমাদের উদ্দেশ্য, আশা

আকাঙ্ক্ষার কথা পরিষ্কার করিয়া বলিতে গেলে ঐ চারিটা দিক্ দিয়াই বলিতে হয়। আমাদের হেয়ঃ—অশেষ দুর্গতি ও দুঃখের কারণ আমাদের বর্ত্তমান অবনতি বা অবস্থা। জীবনের সর্ব্বাবয়বে ও সকল ক্ষেত্রে আত্মবশ হওয়া এবং তজ্জন্য যে সর্ব্বাঙ্গীণ অভ্যুদয়, তাকে যদি স্বারাজ্য বলি, তবে সে স্বারাজ্য আমাদের নাই। "স্বরাজ" কথাটা বর্ত্তমানে প্রধানতঃ একটা রাজনৈতিক পরিভাষা হইয়া পড়িয়াছে। "স্বারাজ্য" কথার ব্যাপ্তি তার চাইতে বেশী। এই কথাটিই ব্যবহার করা উচিত। এখন, যাতে ঐরূপ সর্ব্বাঙ্গীণ অভ্যুদয় হয়, সেটাকে যদি "ধর্ম্ম" বলি তবে আমাদের যেটা হেয়, তার হেতুও পাইতেছি—হেয়হেতুঃ—ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান। ধর্ম্মের মূলে জীবের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিমূলক কর্ম্ম রহিয়াছে; ধর্ম্ম আর কর্ম্ম এক সূত্রে বাঁধা। সুতরাং, আমাদের দুষ্কৃতির নিমিত্তই ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়াছে, আর আমরা স্বারাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছি। বর্ত্তমান দুর্গতির নিমিত্ত দায়ী আমরা নিজেরাই। যে অবস্থায় রহিয়াছি, সেটা সম্পূর্ণরূপে আমাদেরই অর্জ্জিত; তার জন্য অপরকে নিমিত্তভাগী করা অনুচিত। "আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ" নিজেদের বাহিরে সত্যসত্যই আমাদের রিপু কেহই নাই। আত্মদোষই হেয়, আত্মদোষ-ক্ষালনই উপাদেয়। পরবিদ্বেষদ্বারা আত্মদোষক্ষালন হইবে না। মনে করিতে হইবে আমরা নিজেদের কর্ম্মার্জ্জিত যে লোক বা অবস্থা, ঠিক তাতেই রহিয়াছি—বর্ত্তমান পরাধীনতা দুঃখ-দারিদ্র্য, এ সমস্তই আমরা এখন যা, ঠিক তারই উপযুক্ত। আমাদের ধর্ম্মকর্ম্মের উৎকর্ষসাধন আর বর্ত্তমান অবস্থা অতিক্রম করিয়া যাওয়া একই কথা। কাজেই, বর্ত্তমান হেয় অবস্থার যেটি হান বা নিবৃত্তি, তাও পাইতেছি—

হানঃ—জীবনের সর্ব্বাবয়বে ও সর্ব্বক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও অভ্যুদয়। এইটাই আমাদের উদ্দেশ্য এবং জাতির শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ। "স্বাধীনতা" বলিতে পরের উপর আধিপত্য যেমন বুঝায় না, পরের প্রতি বিদ্বেষ এবং পরকে বর্জ্জনও তেমনি বুঝায় না। নিজের কর্ম্মদোষে পরাধীনতা আসে। অতএব কর্ম্মদোষই বর্জ্জনীয়, অধর্ম্মই হেয়। কর্ম্ম দোষমুক্ত হইলে পরের সঙ্গে প্রীতিমূলক সাহচর্য্য সম্বন্ধই স্বাভাবিক, এবং তাই হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলিয়া যেটার কাটতি হইতেছে, তাহাতে আসলের সঙ্গে ভেজালও অনেক মিশিয়াছে; হয়ত শাঁসের চাইতে ভূষির ভাগই তাতে বেশী।

হানোপায়ঃ—এক কথায় ধর্ম্মের সংস্থাপন বা প্রতিষ্ঠা। মানবসাধারণের দয়া, সরলতা সন্তোষ প্রভৃতি কতকগুলি সামান্য ধর্ম্ম আছে; সেগুলিই ভিত্তি স্বরূপ। সেই সাধারণ ভিত্তির উপরে জাতিবিশেষের, বর্ণবিশেষের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মও প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সামান্য এবং বিশেষ দুই প্রকারের ধর্ম্মই যুগশক্তির প্রভাবে হ্রাসবৃদ্ধি পাইতে চায় বটে, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে—যুগশক্তি জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মের সঙ্কোচ-বিকাশ ঘটাইবার একটা প্রবণতা (Tendency) মাত্র; কর্ম্মের দ্বারা সে প্রবণতা বা আবেগ, প্রতিকূল স্রোতের মত জয় করিতে যত্ন পাইতে হয়। অথবা অনুকূল হইলে সেটাকে ধর্ম্মকর্ম্মের উপকারক করিয়া

লইতে হয়। আবার মোটের উপর প্রতিকূল ধারার মধ্যেও, অপেক্ষাকৃত অনুকূল ভাবের এক একটা উল্টা স্রোতও সময় সময় দেখাযায়; যেমন নিতান্ত সজ্জনদিগেরও অমৃতযোগ, মাহেন্দ্রক্ষণ। সেই সময় সবিশেষ উদ্যোগের আবশ্যকতা। বর্ত্তমানে সাধারণ অবস্থা প্রতিকূলতার ভিতরেও অনেকের মনে একটা শুভজাগরণের-সাড়া, একটা স্বাধীনতার আকুতি দেখাযাইতেছে। সুতরাং এটা শুভক্ষণই মনে হয়। এ সময়ে ধর্ম্মসংস্থাপনের নিমিত্ত সম্মিলিত ও সোৎসাহ কর্ম্ম অবশ্যই অনুষ্ঠেয়। শুভমুহূর্ত্ত কাহারও জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকে না। নিতান্ত দুর্দ্দিন এবং অবস্থা যারপর নাই প্রতিকূল হইলেও, ক্লৈব্য এবং নৈষ্কর্ম্য অনার্য্যজুষ্ট। উদ্যোগী পুরুষের প্রতিকূলও অনুকূল। তা ছাড়া, পরমেশ্বরে ফল সমর্পণ করিয়া কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে কর্ম্মকরার প্রয়োজন সততই রহিয়াছে।

ধর্ম্ম জানিতে হইবে শাস্ত্র, যুক্তি এবং সাধুসজ্জনের আত্মপ্রত্যয় — এই তিনের দ্বারা। শ্রুতি, স্মৃতি পুরাণাদি এদেশের শাস্ত্র। সত্যার্থদ্রষ্টা যাঁরা, তাঁরা ঋষি। ঋষিরা আমাদের কল্যাণের নিমিত্ত যে সমস্ত বৈধ প্রবৃত্তি নিবৃত্তির পথ প্রকাশ করিয়াছেন, তাই ধর্ম্ম। তাঁরা নির্ম্মল অকুণ্ঠিত দৃষ্টিদ্বারা জানিয়াছিলেন, এবং নিজেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন বলিয়া তাঁদের নিরূপিত ধর্ম্মের আচরণে কল্যাণ আছে, এটা আমাদের বিশ্বাস করিতে বলিতেছেন। তাঁরা রাগদ্বেষ বর্জ্জিত পক্ষপাতশূন্য — আপ্ত; তাঁহাদের বাক্য প্রমাণ। আমরাও তাঁদের মতন রাগদ্বেষ বর্জ্জিত, এবং পক্ষপাতশূন্য হইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারি — তাঁদের প্রদর্শিত পথে সত্যই কল্যাণ আছে কি না। ইন্দ্রিয়গোচর বাহ্যে বিজ্ঞানের পরীক্ষাদিও এইরূপ নয় কি? যে চাও, ঠিক ঠিক পরীক্ষা করিয়া ফল মিলাইয়া লও। আয়ুর্ব্বেদ আর ফলিত জ্যোতিষের প্রামাণ্যতাকে এদেশে কেহ কেহ নমুনা দেখাইয়াছেন।

মূলে আপ্তদের পরীক্ষা রহিয়াছে বলিয়া, শাস্ত্রব্যবস্থাদির সংশোধন-পরিবর্ত্তনাদির ভার আপ্তমণ্ডলী ছাড়া আর কেহই লইতে পারে না। কেবল মাত্র যুক্তি দ্বারা, অথবা অধিকাংশের মতানুসারে, সে ব্যবস্থার সংশোধনাদি হয় না। যুগবিশেষে এবং অবস্থা বিশেষে ব্যবস্থার যেরূপ পরিবর্ত্তনাদি হওয়া আবশ্যক, তা, অনেকস্থলেই, শাস্ত্র স্বয়ং নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় আর্য্যসভ্যতা ও সাধনার মূলনীতি, ধর্ম্মের মূল তত্ত্বগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, ধর্ম্মবিষয়ে সংশয় ও সমস্যা হলে মীমাংসা করার একটা মহাজনজুষ্ট, শিষ্টাচারসম্মত পদ্ধতিও চলিয়া আসিতেছে, ধর্ম্ম-মীমাংসার সেই সম্প্রদায়গত ধারা অমান্য করা উচিত নহে। অধিকারভেদ সাধনশাস্ত্র মাত্রেরই গোড়ার কথা; ব্যবহারক্ষেত্রে অধিকারবৈষম্য উড়াইয়া দেওয়ার ফল বিষম। ইতিহাস তার সাক্ষ্য বার-বার দিয়াছে এবং দিতেছে। অধিকারভেদ স্মরণ রাখিলে নানা মুনির নানা মতের মধ্যে বিরোধাভাসই দেখিতে পাইব, সত্যকার বিরোধ দেখিতে পাইব না। তবে বর্ত্তমানে, যে সাধুসজ্জন ও ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের উপর শাস্ত্রের অভিপ্রায় প্রকাশ করার ভার রহিয়াছে, তাঁদের সত্যই সাধু ও পণ্ডিত হইতে হইবে— তাঁদের সত্যকার শ্রদ্ধেয় হইতে হইবে, সদাচার এবং স্বধর্ম দ্বারা তাঁদের সত্য সত্যই দেশে জনা

যুক্তি অর্জ্জন করিতে হইবে। অন্যথা তাঁহাদের ব্যবস্থার আস্থা রহিবে না। দেশব্যাপী বর্ত্তমান অনাস্থার মূলে ব্যবস্থাপকগণের শোচনীয় অবস্থা ত বটেই।

বর্ণাশ্রম শাস্ত্রশাসিত হিন্দুসমাজশরীরের মেরুদণ্ড। আমাদের কর্মদোষে এবং কালপ্রভাবে এই মেরুদণ্ড দুর্বল হইয়াছে। ভিতর ও বাহির সর্বত্রই সকল—বেতাল। অথচ, এই সমাজশরীর আমাদের জাতীয়ধর্মসাধন। এ শরীর সুস্থ ও অবিকল না রহিলে জাতীয় ধর্মসাধন হইবে না, এবং ধর্ম্মের দ্বারা যে সকল সর্বাঙ্গীণ স্বারাজ্য লাভ করা যায়, তা হইতেও আমরা বঞ্চিত রহিব। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্বর্গের মধ্যে ধর্ম্মের উপকারকভাবে অর্থ এবং কাম, এবং মোক্ষের উপকারকভাবে ধর্ম্মের সেবা করিতে হইবে। ধর্ম্মের শাসন উপেক্ষা করিয়া আমাদের বর্ত্তমানে দেশের অর্থ ও কাম এ দুয়ের অভাব পূরণেই চেষ্টা করিতে হইবে—রাজনীতি এবং অর্থনীতিক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা হউক আগে, তারপর ধর্ম্ম ও মোক্ষের চিন্তা আসিবে—আগে বাঁচি তারপর মানুষ হইব, আগে পেটে খাই তারপর সদাচারী হইতে হয় হইব—এই রকম একটা ভাব আমাদের অনেককে আচ্ছন্ন করিতেছে। এ ভাব ভারতের সাধনসংস্কৃত-বুদ্ধিভ্রংশের সূচনা করিতেছে—বুদ্ধি ভ্রংশাৎ প্রণশ্যতি—ইহা বর্জ্জনীয়। পূর্ণ জীবনের সকল দিক দিয়াই চেষ্টা করিতে হইবে। আগে পরে ভাবিলে চলিবে না। তাতে সামঞ্জস্য রক্ষিত হইবে না। আমাদের কোন একটা আবেগ বা প্রবৃত্তিকে অযথা অথবা নিরঙ্কুশ ভাবে প্রবল হইতে দিলে, সেটায় সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য-দেশে রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে এ সর্ব্বনাশের দৃষ্টান্ত মিলিবে। পাশ্চাত্য সভ্যতা সামঞ্জস্য হারাইয়া নানা বিশ্ববিধ্বংসী বিপ্লবের ভিতর দিয়া সেটা আবার পাইতে চেষ্টা করিতেছে। আমাদের হিন্দু সমাজ ও সভ্যতা, নানা বর্ত্তমান ব্যাধি এবং উপসর্গ সত্ত্বেও তার অস্থিমজ্জাগত মর্ম্মলোকে নিগূঢ়সঞ্চারী সামঞ্জস্যরূপ জীবনীশক্তিট হারায় নাই। পশ্চিমের অনুকরণে সেটা নষ্ট করিয়া, পশ্চিমের পিছু পিছু বহ্বায়াসে আবার সেটা ফিরিয়া পাবার উপায় খুঁজিয়া বেড়ান আজ শোভন ও সমীচীন হইবে না। নানা বিচিত্র অধিকারে ভাব, কর্ম্ম এবং জ্ঞানের এবং তাদের উপায় পদ্ধতি আর ফলের যে সামঞ্জস্য, তা বর্ণাশ্রম-সমাজ-শরীরেই সম্ভবপর হইতে পারে। হিন্দুসমাজের আত্মরক্ষা ও আত্মবিকাশ কেবল হিন্দুর নয়; বিশ্ব-মানব সমাজের নিমিত্তই আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এ মূল বিষয়ে অন্ধ অনুকরণ সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক পরাধীনতা। দেহ বিক্রয়ী দাসের মুক্তি হয়ত সহজে হইতে পারে। আত্মবিক্রয়ী যে, পরের মানস পুত্র যে, তার মুক্তি কবে কিরূপে হইবে?

অতএব বর্ণাশ্রম হিন্দু সমাজের স্বভাবে সংস্থাপনই হানোপায়। বলা বাহুল্য, এর একটা বিধির দিক্ যেমন আছে, তেমনি একটা নিষেধের দিক্‌ও আছে। উপযুক্ত বিদ্যা, সংস্কার ও কর্ম্ম সহিত বর্ণাশ্রমের রক্ষা ও প্রতিষ্ঠা হইল বিধির দিক্। আর যাতে যাতে তার প্রতিষ্ঠার বাধা প্রতিবন্ধক বা অন্তরায় হইয়াছে অথবা হইবে, সেই সমস্তের প্রতিরোধ করা এর নিষেধের দিক্।

যাঁহারা বর্ণাশ্রমের মেরুদণ্ডস্থানীয়তা এখনও উপলব্ধি করিতেছেন না, তাঁহাদের তা করা উচিত। তবে মোটামুটি যাঁরা হিন্দুর বিশিষ্ট সাধনার ধারাটিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তার পরিপূর্ণতর অভিব্যক্তি দেখিতে চান, তাঁরাও তাঁদের কর্ম্মপদ্ধতিতে একটা বিধি এবং নিষেধের দিক্ অবশ্যই দেখিতে পাইবেন। বর্ণাশ্রমীদের সঙ্গে মূল বিষয়ে তাদের অবিরোধই হইবে। হবারই কথা। বিরোধের চাইতে অবিরোধের দিক্‌টাতেই সকলের বর্ত্তমানে বেশী মনোযোগ দেওয়া উচিত। চিত্র আঁকিতে গেলে একটা আধারপট (background) তৈয়ারি হওয়া আবশ্যক; তার পর, সেই আধার পটে চিত্র ফুটাইয়া তুলিতে হয়। যাঁর মোটামুটি হিন্দু সভ্যতাটি ভাল লাগে, তিনি সেই আধার পটটাই না হয় তৈয়ারি করুন। বর্ণাশ্রমীর তুলিকাপাতে তাতে বরণীয় সমাজশরীরের আলেখ্য ফুটিয়া উঠিতে দিন।

আমরা আমাদের উদ্দেশ্যের এবং সিদ্ধির উপায়ের একটা দিগ্‌দর্শনমাত্র দিলাম। এই সংশয়ের দিনে নানা সংশয় ও প্রশ্ন আমাদের নিজেদেরও মনে জাগিবে, অপরের মনেও জাগিবে; তাতে দুঃখ নাই। চাপা দিতে গেলেই গোল। সংশয় নিরসনের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে এবং ধীর ও বীরভাবে গন্তব্য পথে চলার জন্যও তপস্যা ও মেধা আবশ্যক। যিনি যুগে যুগে ধর্ম্মসংস্থাপন করেন, তাঁতে প্রপত্তি বা শরণাগতিত' চাই-ই। পথের সমস্যার সমাধান পথ চলার সঙ্গে সঙ্গেই অনেকটা হইয়া যাইবে। জলে না নামিয়াইবা কে কবে সাঁতারের কৌশল শিখিয়াছে? ভয়ই বা কবে ভাঙ্গিয়াছে?

আমাদের অসংহতি বা বিচ্ছিন্নতা অশেষ দুর্ব্বলতার কারণ হইয়া রহিয়াছে। স্মন্তরে সংহতি এখনও আছে, নহিলে বিনা চেষ্টায়, বিনা আহ্বানে, নানা কষ্ট এবং বিপদ বরণ করিয়াও ৪৫ লক্ষ নরনারী আজিও কুম্ভে উপস্থিত হইত না। এমন আশ্চর্য্য সংহতি জগতে আর কোথাও নাই। কিন্তু ব্যবহারক্ষেত্রের নানাস্থলেই সংহতির অভাব দেখা যাইতেছে। এইজন্য—

আমাদের বর্ত্তমান অবনতির মুখ্য হানোপায় হইতেছে—সংঘবদ্ধভাবে লক্ষ্য এবং গন্তব্য পথ স্থির করিয়া কাজ করা। হানোপায় দুই রকমের—সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দৃষ্টফল, আর অদৃষ্টফল। দেশের এবং জাতির মুক্তিকল্পে তপস্যা (যেমন হয়ত কোন কোন মহাপুরুষ লোকচক্ষুর অন্তরালে করিতেছেন,) ঈশ্বরারাধনা, যজ্ঞ-হোমাদি মাঙ্গলিক কর্ম্ম ইত্যাদি—এসবেতে মহতী কল্যাণশক্তির উদ্বোধন হইয়া থাকে; অথচ কিরূপে হয় আমরা বুঝি না। না বুঝিলেও এসকলে সমাদর আমাদের করিতে হইবে। আমাদের মধ্যে যাঁরা অধিকারী, তাঁরা এই লোকায়ত দৃষ্টিতে অদৃষ্টফল অথচ লোকোত্তর শক্তিসমৃদ্ধ উপায়েই নিজেদের শক্তি নিয়োগ করিবেন। মনে রাখিতে হইবে, অদ্বৈত প্রভুর কাতর আহ্বানে মহাপ্রভুকে আসিতে হইয়াছিল। যাঁরা একাজে একান্তভাবে আত্মনিয়োগে অসমর্থ, তাঁরাও, যথাসম্ভব শক্তি ও সিদ্ধির নিমিত্ত নিখিলের মূল উৎস ভগবানে শরণাগত হইবেন। বিশেষতঃ অভিমানশূন্য হবার জন্য।

দৃষ্ট ফল বা সাধারণ উপায়গুলি আবার দুই রকমের:—সামান্য ও বিশেষ। সামান্য উপায় সার্ব্বজনীন; সকলকেই নির্ব্বিশেষে অবলম্বন করিতে হইবে। সদাচার বিশেষতঃ ব্রহ্মচর্য্য, সত্যনিষ্ঠা, আর্জ্জব, তেজস্বিতা বা নির্ভীকতা, ভগবন্নিষ্ঠা প্রভৃতি মৌলিক ধর্ম্মগুলি সকলকেই বিশেষভাবে সাধন করিতে হইবে। বর্ত্তমান অবনতির মূলে নৈতিক অবনতি—আমাদের অমানুষ হওয়া—রহিয়াছে। রাজনীতি অর্থনীতি অথবা অন্য কিছুর জন্য এই নিত্য সার্ব্বজনীন, ধর্ম্ম ক্ষুন্ন হইতে দিলে চলিবে না। ধর্ম্মের দাবীই সব চাইতে বড়। প্রকৃত ধর্ম্মে জয়ই হয়, দুর্গতি হয় না। অতএব আমাদের লক্ষ্যও যেমন বিশুদ্ধ উপায়ও সেইরূপ বিশুদ্ধ হওয়া চাই। বিশুদ্ধ উপায় ছাড়া পূর্ণ, সত্য স্বারাজ্য কখনও লাভ হয় না। স্বারাজ্য সিদ্ধি শ্রেষ্ঠ বর। জননী অভয়ের সঙ্গেই বর দিয়া থাকেন। আর যেখানে অনৃত, সেখানে অভয় নাই।

বিশেষ উপায়ের নিমিত্ত আমাদের সঙ্ঘে চারিটি বর্ণ এবং চারিটি আশ্রমের "অনুকল্প" ব্যবস্থা থাকা উচিত। অনুকল্পমাত্র, বর্ণ ও আশ্রম আমরা সৃষ্ট করিব না। মানুষের প্রবৃত্তি এবং সংস্কার ভেদে অধিকার ভেদ। বিভিন্ন অধিকারের মানুষকে বিভিন্ন ভাবে অথচ সংহতভাবে, কাজকরার সুযোগ দিয়া আমাদের সঙ্ঘশরীর গঠন করিতে হইবে। দেহে যেমন মস্তক, বাহু, মধ্যভাগ এবং পদ, বিভিন্ন অঙ্গ হইয়াও সমবেত ভাবে কাজ করে তেমনি। তাদের মধ্যে উচ্চাবচ ভাব নাই। কেহ পূজ্য, কেহ ঘৃণ্য নয়। প্রত্যেকেই একান্ত আবশ্যকীয় অঙ্গ। আমাদের সঙ্ঘের চারিটি ভাগকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বলিলে সমাজপ্রচলিত পরিভাষার সঙ্গে গোল হইতে পারে, কাজেই অন্য রকমে তাদের নামকরণ হওয়া উচিত।

প্রথম—যাঁরা মস্তকে থাকিয়া জ্ঞান ও সদ্‌ভাব, উপদেশ ও দৃষ্টান্তের দ্বারা সকলের মধ্যে সঞ্চারিত করিবেন। ইঁহারা গুণ ও কর্ম্মের দিক্‌দিয়া প্রকৃত সত্যনিষ্ঠ, তপোনিষ্ঠ ব্রাহ্মণস্বরূপ। এঁদের সম্পদ্ বিদ্যা, এঁদের শক্তি তপস্যা, এঁদের গৌরব ত্যাগ অথবা সার্ব্বজনীন হিতার্থে বিনিয়োগ। মঠ, আশ্রম, জাতীয়শিক্ষার উপযোগী বিদ্যালয় পরিচালন, শাস্ত্রব্যাখ্যা, গ্রন্থাদি রচনা—এ সব বিশেষভাবে এঁদেরই কাজ। শাস্ত্রের আক্ষরিক ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া যেন ইঁহারা শাস্ত্রের প্রাণবধ না করেন। তপস্যা ও মেধা থাকিলে তা করিবেন না। পাশ্চাত্যভাবের যেটা বিষ, সেটা পান করিয়া এঁদের মৃত্যুঞ্জয় হইতে হইবে; এবং আবশ্যক-স্থলে সেই বিষের দ্বারাই বিষের চিকিৎসা করিতে হইবে। এঁদের বিদ্যা বিজাতীয় বিদ্যা দ্বারা পরাভূত হইলে চলিবে না। ধর্ম্মের কল্যাণী শাশ্বতী মূর্ত্তি দেখাইয়া এঁদের বুঝাইতে হইবে যে—Religion is opium to the masses—"ধর্ম্ম অহিফেনের মত অনিষ্টকারী", এ সব কেমন ধারা আসুরী নীতি। এ নীতি ক্রমশঃ "অনন্ধাঃ" লোক সমূহেই লইয়া যায়।

দ্বিতীয়—যাঁরা সঙ্ঘের বাহুরূপে ধর্ম্মানুগত শাসন ও সংরক্ষণের ভার লইবেন। গুণ ও কর্ম্মে এঁরা প্রকৃত ক্ষত্রিয়। ধর্ম্মানুশাসনে রাজনীতি হইল এদের বিশেষ কর্ম্ম। ...

যে যে উপায়ে ধর্ম্মের সংস্থাপন হয়, তার বাধা ও অন্তরায়গুলি দূর হয়, সে সকলের প্রয়োগে এঁদের সবিশেষ চেষ্টিত হইতে হইবে। নানা স্থানে ধর্ম্মানুকূল আন্দোলনের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, দেবালয়-আশ্রম-তীর্থাদি রক্ষা, সংবাদপত্রাদি প্রচার, সর্ব্ববিধ অধর্ম্ম ব্যবস্থায় বাধা প্রদান—এঁদের কাজ। কংগ্রেসের উদ্দেশ্যের এবং উপায়ের সঙ্গে যে অংশে মিল, সেখানে নির্ভীক সহযোগ, যেখানে অমিল বা বিরোধ, সেখানে নির্ভীকভাবেই বাধা প্রদান করিবেন। কংগ্রেস উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু স্বধর্ম্মানুকূল স্বারাজ্যই বরণীয়। ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্বের হানিকর কোনও বিধি অমান্য করাই ধর্ম্ম সন্দেহ নাই, কিন্তু চক্ষুষ্মান ধর্ম্মের একটি পদ ঠিক করিতে যাইয়া অপর একটি পদ যেন না ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। সমাজসংস্কারকদলের সম্বন্ধেও এই কথা। উপায়ের ভ্রান্ততাসত্ত্বেও এ সকলের উদ্দেশ্যের সত্যতা ও সাধুতা থাকিলে, বিরোধস্থলেও তার প্রশংসা এঁরা করিবেন। সঙ্কীর্ণ বিদ্বেষদুষ্ট মনোভাব সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। ধর্ম্মহানিকর কোনও ব্যবস্থায় বাধা প্রদান স্থলবিশেষে এঁরা ব্যক্তিগতভাবে অথবা উপদল গঠন করিয়া করিতে পারিবেন। ধর্ম্মযুদ্ধ শাস্ত্রে বিহিত থাকিলেও জগতের এবং ভারতের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, এরা হিংসারহিত উপায়েই চলিবেন। অহিংসার আদর্শ উচ্চতর সন্দেহ নাই, এবং বর্ত্তমান হিংসাভারে প্রপীড়িত ধরিত্রীর ভারাপনোদনের জন্য সকল বিরোধ ভঞ্জনের নিমিত্ত সেই শান্তি এবং শক্তি—এই উভয়সমৃদ্ধ আদর্শের অনুসরণ করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

তৃতীয়—ভারতের দারিদ্র্য সমস্যার এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশব্যাপি রোগসমস্যার সমাধানে সযত্ন এঁরা হবেন। প্রকৃত বৈশ্যের যা কাজ। গো, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য—ধর্ম্মানুকূলভাবে রক্ষা ও উৎকর্ষের উপায় করিতে হইবে। অতিমাত্রায় জটিল "যান্ত্রিক" সভ্যতা ধর্ম্মানুকূল নয়। ধনিক ও শ্রমিকের বিরোধও ধর্ম্মানুকূল নয়। এখন সকলেই স্বাধিকারপ্রমত্ত, সুতরাং স্বাধিকার সংঘর্ষের দিন আসিয়াছে। নিজের প্রাপ্যটাই দেখিতেছি, দেয়টা দেখিতেছি না। নিজের দাবীই প্রবল, কর্ত্তব্যবুদ্ধি বা ধর্ম্মবুদ্ধি দুর্ব্বল। মূলে প্রীতি নাই, অভিমান আছে। ত্যাগ নাই, স্বার্থ আছে। এ রকম মানুষের সমাজ জোরের উপরই চলে। তাতে শৃঙ্খলা, শান্তি সহজ, স্বাভাবিক হয় না। হিন্দু সমাজেই পাশ্চাত্য অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি সরল ন্যায়সঙ্গত এবং সুস্থির সমাধান সম্ভবপর। সত্ত্বের অর্থাগমের উপায়ও এঁরা করিবেন। অবশ্য, সত্ত্ব সকলেই সাত্ত্বিক দানে পুষ্ট হইবেন।

চতুর্থ—স্বেচ্ছাসেবকসঙ্ঘ—যাঁরা পূর্ব্বোল্লিখিত তিনটি মহাব্রতের সর্ব্ববিধ সেবা করিয়া ধন্য হইবেন। এঁদের সেবকত্ব শূদ্রত্ব বা দাসত্ব নয়—দেবত্ব, মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা। এঁদের সেবকত্বই আভিজাত্য। এঁদের মধ্যে ধর্ম্মভাব, দেশহিতৈষণা, সেবানুরাগ, সংযম এবং নিয়মানুবর্ত্তিতা বিশেষভাবে থাকা আবশ্যক। তা ছাড়া, সাধারণভাবে, সকলেই এই বিভাগের মধ্যে আছেন।

বলা বাহুল্য, এই চারিটি অঙ্গই পরস্পরের উপকারক ও সহায় হইবেন। বিভাগ

কয়টাকে সম্পূর্ণরূপে অন্যোন্যব্যাবৃত (watertight compartment) মনে করা ঠিক নয়। কেহ হয়ত প্রথম বিভাগে রহিয়াও, সম্ভবমত, অন্যবিভাগের কাজ করিতে পারেন। কেহ আবার নিজের অধিকার (মানসিক এবং অন্যবিধ অবস্থা) অন্যরূপ হইয়াছে মনে করিলে, অন্যবিভাগের কর্ম্মে নিজেকে নিয়োগ করিতে পারিবেন। ফল কথা, ঠিক সামাজিক চাতুর্ব্বর্ণের মতন সংঘের এই বিভাগ চতুষ্টয় নয়। অধিকার বৈচিত্র্য (রুচি, সংস্কার, শিক্ষা দীক্ষা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা) অনুসারে সঙ্ঘের কর্ম্মবিভাগ (division of labour) মাত্র। একই কর্ম্মের চারিটি ভাগ।

চারিটি আশ্রমেরও "অনুকল্প" থাকিবে। সঙ্ঘের প্রত্যেক সদস্যই অন্ততঃ কিছু দিন ব্রহ্মচর্য্য এবং স্বাধ্যায় দ্বারা আত্মশুদ্ধি করিবেন। যে সরিষায় ভূত ছাড়াইব, সেই সরিষাই ভূতগ্রস্ত হইয়াছে ও হইতেছে দেখিতেছি। অন্য কিছু স্বাধ্যায় না হয়, অন্ততঃ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ সকলেই পড়িবেন। সঙ্গে সঙ্গে সংযম অভ্যাস করিবেন। এইটি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অনুকল্প। যিনি পারেন, তিনি উপযুক্ত গুরুগৃহে বা আশ্রমে যাইয়া কিছুদিন এই আশ্রমধর্ম্ম পালন করিবেন। নিজের সন্তানদিগকে পাঠাইবেন। বীজ হইতে আরম্ভ করিয়া শুদ্ধি চাই। তারপর কোন একটা বৃত্তিতে আবদ্ধ থাকিয়া, সঙ্ঘের উদ্দেশ্যসাধনরূপ যে পঞ্চযজ্ঞ—সর্ব্বভূতের, বিশেষভাবে জাতির ও দেশের হিতচেষ্টা—এটা হইল গার্হস্থ্যের অনুকল্প। ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চসূনা ও পঞ্চযজ্ঞের কথা আছে সেগুলিত চাইই, তা ছাড়া সেগুলি বর্ত্তমানে বিশেষ ভাবেও দেখিতে ও পালিতে হইবে। আমরা দেবদ্রোহী, শাস্ত্র-দ্রোহী, পিতৃদ্রোহী, জাতিদ্রোহী দেশদ্রোহী হইয়াছি। ইহাই আমাদের পঞ্চসূনা পঞ্চ মহা-পাতক, এসবের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। ঈশ্বরের নিকট কাতর প্রার্থনা—সঙ্ঘের দেবযজ্ঞ; শাস্ত্রের সারানুশীলন ঋষিযজ্ঞ; পুরুষপরম্পরাগত ভারতীয় সাধনার ধারা অবিচ্ছিন্ন রাখার চেষ্টা পিতৃযজ্ঞ; দেশবাসীর সেবায় আত্মনিয়োগ মনুষ্যযজ্ঞ; আর কায়মনোবাক্যে যথাসম্ভব হিংসাবিদ্বেষাদি ত্যাগই ভূতযজ্ঞ। অনলস কর্ম্মজীবন দ্বারা এই পঞ্চমহাযজ্ঞ অনুষ্ঠেয়। এই কাজের ভিতর হইতে যিনি কিছুদিন আত্মস্থ, স্থিতধী ও নিরভিমান্ হইবার জন্য, নির্জ্জন-বাসী হইবেন, তপশ্চরণ করিবেন, তাঁর তখন বানপ্রস্থ। এটারও আবশ্যকতা আছে। আর, ছিন্নসংশয় হইয়া, নির্ভীক, বিমৎসর হইয়া, তীর্থে তীর্থে, প্রদেশে প্রদেশে ধর্ম্মভাব এবং ধর্ম্মমূলক পূর্ণস্বারাজ্যের বাণী নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত উদাহৃত করিয়া যিনি প্রচার করিয়া বেড়াইবেন, তাঁর প্রব্রজ্যাশ্রম।

বর্ত্তমানে কাজ আরম্ভ করার জন্য উল্লিখিত উদ্দেশ্য লইয়া হিন্দুজাতির এবং সঙ্গে সঙ্গে অপরাপর জাতির সর্ব্ববিধ কল্যাণের যোগক্ষেম সাধনের জন্য একটি সঙ্ঘ গঠন করা আবশ্যক হইয়াছে। তাঁরা—

১। বর্ত্তমান জাতীয় উন্মেষের দিনে রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে কি পথ অবলম্বন করিবেন, তা স্থির করুন। সমর্থন এবং প্রতিরোধ, এ দুইদিকেরই চিন্তা করিতে হইবে।

২। সংবাদপত্র, সভাসমিতি দ্বারা নিজেদের আদর্শ ও ভাব প্রচার করুন। বিশেষভাবে বিরাট হিন্দুসমাজের মর্ম্মচৈতন্য উদ্বোধিত করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হউন।

৩। নানাস্থানে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া দলপুষ্ট করুন।

৪। ধর্ম্মমূলক জাতীয়তার পোষক লেখা (প্রবন্ধ, পুস্তিকা ইত্যাদি) বাহির করুন এবং বিতরণ করুন।

৫। কর্ম্মীদের শিক্ষা দীক্ষার নিমিত্ত উপযুক্ত আশ্রম বা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করুন।

৬। বিশিষ্ট কর্ম্মী সংগ্রহ করুন।

৭। সাত্ত্বিক উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করুন।

জন্মান্তর ও শ্রাদ্ধতত্ত্ব।

(লেখক—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী স্মৃতিতীর্থ শাস্ত্রী।)

জীবাত্মার পঞ্চভৌতিক স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া দেহান্তর আশ্রয় করার নামই জন্মান্তর। এই জন্মান্তর প্রত্যেক আস্তিকদর্শনকার ও স্মৃতিকার মনু প্রভৃতি সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। কুসুমাঞ্জলি প্রণেতা উদয়নাচার্য্যের "স্বেপণারভব-কর্ম্ম-জন্মনাং কোঽপি গোপতনয়ো নমস্ততে" এই প্রথম নমস্কার কারিকাদ্বারাই জন্মান্তরবাদ প্রমাণিত হয়।

আমরা মোটা কথায় বুঝি, প্রাণিসমূহ এই স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে যে দেবাদি ঊর্দ্ধযোনি বা পশ্বাদি অধোযোনি লাভ করে তাহারই নাম জন্মান্তর।

এই জন্মান্তর সম্বন্ধে পাতঞ্জলযোগদর্শন প্রভৃতিতে বহুকথা বলা আছে, আমি তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিলাম। যথা "সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্ব্বজাতিজ্ঞানম্", এই সূত্রের বৃত্তিকার শ্রীমদ্ যতি রামানন্দ সরস্বতী বলিয়াছেন "অনুভবক্লেশজা ইমে সংস্কারাঃ সন্তি চিত্তধর্ম্মাঃ পূর্ব্বজন্মপরম্পরাসঞ্চিতাস্তেষু শ্রুতানুমিতেষু চ সংযমেন সাক্ষাৎকৃতেষু তদ্ধেতুত্বেন পরকীয় পূর্ব্বজন্মপরম্পরায়াঃ সাক্ষাৎকারোভবতীত্যর্থঃ"। অনুভব জন্য সংস্কার ও অবিদ্যাদিজন্য সংস্কার এই উভয়বিধ সংস্কারের সংযমের দ্বারা সাক্ষাৎকার করিলে স্বীয় বা পরকীয় ব্যক্তির পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের জ্ঞান হইয়া থাকে। যদি জন্মান্তর নাই থাকে তবে জ্ঞান হইবে কাহার? এবং জাতমাত্র বালকের স্তন্যপানাদিতে প্রবৃত্তি দেখিয়া তাহা পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার বশতঃ হইয়া থাকে ইহা স্বীকার করিতে হইবে, অন্যথা তাহার প্রবৃত্তির কারণ অন্য কিছু দৃষ্ট বা অনুমিত হয় না।

কি কারণ বশতঃ জীবকে জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া সংসারে যাতায়াত করিতে হয়,

এবং কীদৃশ উপায় অবলম্বন করিলেইবা জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হয় না তাহা আমি উত্তরোত্তর আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন জীবের বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্যদশা যেমন ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে' মৃত্যুও সেইরূপ পরিবর্ত্তনমাত্র। তবে মৃত্যুর বিশেষত্ব এই যে তাহাতে স্থূলদেহের অর্থাৎ নকল আমিরই ধ্বংস হয়, সূক্ষ্ম অর্থাৎ আসল আমি জীবাত্মা ঠিকই থাকে। পঞ্চপ্রাণ, মন, বুদ্ধি, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় এই সপ্তদশ অবয়বের দ্বারা একটি সূক্ষ্মশরীর গঠিত হয়, তাহাকে আশ্রয় করিয়া জীব ভূলোকাদিতে গমন করেন। যথা "পঞ্চপ্রাণ মনোবুদ্ধি দশেন্দ্রিয় সমন্বিতং। শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মলিঙ্গমুচ্যতে তেনৈব চ ইহলোক পরলোকয়োঃ সংসরণং জায়ানামিতি" বেদান্তদর্শনে এইকথা বলা হইয়াছে। সাংখ্যদর্শনের মতে পঞ্চপ্রাণের স্থলে পঞ্চতন্মাত্র বলা হইয়াছে। পুণ্যাত্মাগণ এই সূক্ষ্মদেহের আশ্রয়ে সপ্তভূলোকাদির যে কোন সুখময় স্থানে অবস্থান করেন, এবং পাপিগণ কৃমিকীট সঙ্কুল স্থানে (নরকে) বাস করেন।

মৃত্যুকালে সাধকদিগের ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া এবং পুণ্যাত্মাদিগের মুখাদি উৰ্দ্ধদ্বারদ্বারা প্রাণবায়ু নির্গত হয় ও মুখেরভাব প্রসন্ন থাকে, পাপলোকের মুখ বিকটাকার দৃষ্ট হয় এবং গুহ্যাদি নিম্নদ্বার দ্বারা প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। উহার দ্বারা প্রাণীর সদ্গতি নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায়। লোকপ্রবাদ আছে কাশীমৃত ব্যক্তির দক্ষিণ কর্ণ উন্মুখ থাকে, এবং স্থান মাহাত্ম্য ও দ্রব্যশক্তি প্রযুক্ত এবং শ্রীশ্রীবিশ্বনাথের ইচ্ছায় সদ্গতি হইয়া থাকে।

যেরূপ জল বায়ু এবং স্থান ও কালের দোষ গুণে দেহ এবং মনের উন্নতি বা অবনতি হইয়া থাকে, সেইরূপ তীর্থাদি পুণ্যক্ষেত্র ও পুণ্যকালে কিম্বা কুস্থানে ও কুকালে মৃত্যু হইলেও জীবের সদসদ্গতি হইয়া থাকে, জীবনের পূর্ব্বস্বভাব ও বহুজন্মের কর্ম্মসংস্কারবশতঃ এবং প্রাণবিয়োগ সময়ের সদসদ্ভাব লইয়া প্রেতযোনি অথবা জন্মান্তরপ্রাপ্ত জীব, ইতর ভদ্র নানাশ্রেণীতে পরিণত এবং উদারপ্রকৃতি কিম্বা হিংসাদ্বেষ পরিপূর্ণ ক্রূরস্বভাব হইয়া থাকে। অর্থাৎ যে কোন প্রকার দেহাদি আলম্বন পাইলেই পূর্ব্বসংস্কারে সুষুপ্তা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি জাগিয়া উঠেন। যেমন রঙ্গমঞ্চে যবনিকার অন্তরাল হইতে একই লোক নানামূর্ত্তিতে আসিয়া নানাপ্রকার অভিনয় করিয়া প্রস্থান করে কর্ম্মসূত্রে জীবের যাওয়া আসাও ঠিক সেই প্রকার হইয়া থাকে।

দেহ বা আত্মীয়স্বজনাদির মমতাবশতঃ কোন কোন প্রেতাত্মা মৃতদেহের এবং বাটীর নিকটে থাকিয়াই দুঃখানুভব করে, এবং শোকমোহে অবসন্ন হইয়া আত্মীয়দিগের পরিত্যক্ত শোকাশ্রু পান করেন। এজন্য শীঘ্র দাহদ্বারা দেহকে অদৃশ্য করাই কর্ত্তব্য, এবং এই জন্যই আত্মীয়গণ শোক ত্যাগ করিয়া মৃতের পারলৌকিক কার্য্যে ব্যাপৃত হইবেন, এই কথা ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতে উপদেশ আছে।

মৃত্যুভয়ে ভীত অধিকাংশ জীবের পুনঃ পুনঃ মলমূত্র ত্যাগ হয়, এবং ঐ কারণে ক্ষুৎ-

পিপাসার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকায় মৃত্যুর পরেও কষ্টানুভব হয়, সেজন্য শ্মশানে যাইয়া চিতাগ্নি এবং নারকোল বাল ও ক্রমশঃ দশপিণ্ডাদি দ্বারা সূক্ষ্ম আতিবাহিকাদি দেহের তৃপ্তিসাধন করিবার ব্যবস্থা আছে। সংসারের সমস্ত বস্তু অপেক্ষা প্রিয় এই দেহের সুখের জন্যই মানবের সমস্ত যাহা কিছু কার্য্য, সেই প্রিয়তম এবং অতি যত্নসংবর্দ্ধিত দেহ অসদুপায়ে ধ্বংস করায় আত্মহত্যাকারিগণ অত্যন্ত পাপিষ্ঠ, তাহারা দীর্ঘকাল নরকভোগ করে, এবং অতিশয় দুঃখদায়ক নীচ পিশাচযোনি প্রভৃতিতে অবস্থান করে। তাহাদের উদ্ধারের জন্য তৎপুত্রাদির দাহ বা শ্রাদ্ধাদি কোন কার্য্যেই অধিকার নাই, সুতরাং তাহারা অতিশয় ঘৃণ্য ও বড়ই অসহায়। শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—"ব্যাপাদয়েদথাত্মানং স্বয়ং যোঽগ্নিবিষাদিভিঃ। বিহিতং তস্য নাশৌচং নাগ্নির্নাপ্যুদকাদিকং" ইতি। যদি জীবনে এ হেন বিরক্তি আসে তবে তাদৃশ ঘৃণ্য কার্য্য না করিয়া সংসার ত্যাগপূর্ব্বক উদাসীন হওয়াই কি মঙ্গল নয়?

মৃত ব্যক্তিকে প্রেত বা ভূতযোনি বলে, ইহারা অণিমাদি দৈবশক্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু রাক্ষসাদির ন্যায় তমোগুণাশ্রিত বলিয়া মৎস্য মাংসাদিতে বড়ই আসক্ত হয়। এই জন্যই পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে অশৌচান্ত দ্বিতীয়দিন রাত্রিতে প্রচুর মৎস্য মাংসাদি দ্বারা ভোজ্য প্রস্তুত করিয়া পুকুর পাড় প্রভৃতি গোময়োপলিপ্ত পবিত্র স্থানে প্রেতের উদ্দেশ্যে রাখিয়া আসার ব্যবহার আছে, স্থূলদেহ রহিত বিদেহ হইয়া শূন্যে অবস্থান বড়ই কষ্টকর অবস্থা এই জন্য ঐ অবস্থা (প্রেতত্ব) হইতে শীঘ্র মুক্ত করিয়া দেব বা পিতৃ কিম্বা নরদেহ প্রাপ্তির জন্যই মাসিক ও সপিণ্ডীকরণাদি শ্রাদ্ধের এবং অক্ষয় স্বর্গ কামনায় বৃষোৎসর্গ ও দানাদির ব্যবস্থা শাস্ত্রে বলা হইয়াছে।

যথা— "দ্বাদশ প্রতিমাস্যানি আদ্যং ষাণ্মাসিকে তথা।
সপিণ্ডীকরণঞ্চৈব ইত্যেতচ্ছ্রাদ্ধ ষোড়শং॥
যস্যৈতানি নদীয়ন্তে প্রেতশ্রাদ্ধানি ষোড়শ।
পিশাচত্বং ধ্রুবং তস্য দত্তৈঃ শ্রাদ্ধশতৈরপি॥

এবং "অশৌচান্ত্য দ্বিতীয়েহহ্নি যত্নেনোৎসৃজ্যতে বৃষঃ"।

ইত্যাদি বচনের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত শ্রাদ্ধ সমূহের অবশ্য কর্ত্তব্যতা বলা হইয়াছে। শ্রাদ্ধাদির বিঘ্ন ঘটিলে কিম্বা নিজকর্ম্মফলেও জীব ভূতযোনি প্রাপ্ত হইয়া বহুদিন থাকিতে পারে সুতরাং তাহার উদ্ধারের বা পিতৃলোকাদি প্রাপ্ত জীবের সদ্গতি ও উত্তম স্বর্গের জন্য গয়া শ্রাদ্ধাদি করাও বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া শাস্ত্রে বলা হইয়াছে। প্রেতযোনি প্রাপ্ত জীব কর্ম্মফলবদ্ধ সুতরাং কর্ম্মফল ব্যতীত তাহাদিগের উদ্ধার বা উন্নতি তাহারা নিজে করিতে পারে না। জাগতিক সমস্ত কর্ম্মই প্রায় পরস্পর সাপেক্ষ, সেই জন্য কর্ম্মভূমি এই পৃথিবীস্থিত পুত্রাদি কর্ত্তৃক প্রেতের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি এবং দানে প্রেতের সেই সেই দ্রব্যের ভোগ বাসনাবীজ নষ্ট হওয়ায় প্রেতাত্মা নিষ্কাম হইয়া শান্তিলাভ করে, এবং ঐ দানাদি শুভাদৃষ্ট জন্মাইয়া প্রেতের স্বর্গ গমনের পক্ষে পাথেয় স্বরূপ হয় ও স্বর্গবাস কালের বৃদ্ধি প্রাপ্তির কারণ হয়।

জীব, মনুষ্য বা পশু পক্ষী প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিলে কর্ম্মফলদাতা জগন্নিয়ন্তা পরমেশ্বরের কৃপায় এবং নিয়মে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য তাঁহার পরিতৃপ্তিকর উত্তম ভোগরূপে পরিণত হয়। এই বিষয়ে মৎস্য পুরাণের বচনও আছে যথা—

"দেবো যদি পিতা যাতঃ শুভ কর্ম্মানুযোগতঃ।
তস্যান্নমমৃতংভূত্বা দেবত্বেহপ্যনুগচ্ছতি।
দৈত্যত্বে ভোগরূপেণ পশুত্বেচ তৃণং ভবেৎ।
মনুষ্যত্বেহন্ন পানাদি নানাভোগরসং ভবে"। ইত্যাদি।

অর্থাৎ পিতা যদি শুভকর্ম্ম বশতঃ মৃত্যুর পর দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন তবে পুত্রাদি প্রদত্ত অন্ন পানাদি মন্ত্রশক্তি প্রভাবে দেবতার ভোগ্য অমৃততুল্য হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবে। যদি তিনি দৈত্য হন তবে দৈত্যের ভোগরূপে, যদি পশুযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন তবে তৃণরূপে, আর যদি মনুষ্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন তবে অন্ন পানাদি সামগ্রী স্বরূপ হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবে। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত স্বরূপ মহাভারতে স্যমন্তকো-পাখ্যান নামক কিংবদন্তীও আছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শত্রুঅপহৃত স্যমন্তক মণি উদ্ধারের নিমিত্ত শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে পাতালপুরে গমন করিলেন, যাইবার সময় তিনি সকলকে বলিয়া গেলেন „আমি নির্দ্দিষ্ট দিনের মধ্যে না আসিলে আমার মৃত্যু হইয়াছে জানিবে"। ক্রমে নির্দ্ধারিত দিন অতিক্রম হইয়া গেল, শ্রীকৃষ্ণ ফিরিলেন না দেখিয়া বন্ধু-বান্ধবেরা তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে স্থির করিয়া প্রেতাত্মার উদ্দেশ্যে পারলৌকিক কার্য্যাদি সম্পন্ন করিলেন। পাতালপুরে তিনি একাকী প্রবল শত্রুপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিয়া বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু আত্মীয় স্বজন প্রদত্ত অন্ন পানাদি দ্বারা তিনি পুনরায় দ্বিগুণ বলশালী হইয়া অক্লেশে শত্রুপক্ষকে পরাজিত করিয়া নিজের উদ্দেশ্য সাধন করতঃ দ্বারকায় ফিরিয়া আসিলেন। বন্ধুবান্ধবেরা তাঁহাকে অতি সমাদর করিয়া ঘরে লইয়া আসিলেন। সুতরাং ইহার দ্বারা প্রতীত হয় মান্ত্রিক শক্তিতে স্থানান্তরেদত্ত অন্নপানাদি পিতৃলোকের তৃপ্তি সাধন করে, যদি কেহ বলেন শ্রীকৃষ্ণত জীবিতই ছিলেন, সুতরাং আত্মীয় প্রদত্ত অন্নপানাদি দ্বারা তাঁহার তৃপ্তি হইতে পারে; কিন্তু মৃত পিত্রাদির তৃপ্তি হইবে কিরূপে? এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলিব তৃপ্তি হয় কার? আত্মার কি শরীরের? শরীরের তৃপ্তি হয় এ কথা বলা চলে না, কেননা চৈতন্য বিহীন মৃত শরীরের তৃপ্তি সম্ভব হয় না, সুতরাং আত্মারই তৃপ্তি হয় এই কথা বলিতে হইবে। তৃপ্তি অর্থাৎ সুখ আত্মারই ধর্ম্ম, তাহা যদি হয় তবে পিত্রাদির আত্মাও তখন বর্ত্তমান থাকে, কেননা আত্মা নিত্য পদার্থ, তাহার ধ্বংস নাই। এবং সেই আত্মা "তৎক্ষণাদেব গৃহ্ণাতি শরীর মাতিবাহিকং" মৃত্যুক্ষণের পরেই অতিবাহিক অর্থাৎ বায়বীয় শরীর আশ্রয় করে। পরে দশপিণ্ডাদিদ্বারা প্রেত দেহ প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া থাকে।

"প্রেতপিণ্ডৈস্ততো দত্তৈর্দেহমাপ্নোতি ভার্গব।
প্রেত দেহমিতি প্রোক্তং ক্রমাদেব নসংশয়ঃ॥
ততঃ সপিণ্ডীকরণে বান্ধবৈঃ স কৃতে নরঃ।
প্রেত দেহং পরিত্যজ্য ভোগদেহং প্রপদ্যতে"॥

ইত্যাদি বচন দ্বারা তাহা প্রতীত হয়। এই শরীরে পঞ্চভৌতিক স্থূল দেহের ন্যায় ক্ষুৎ-পিপাসা সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে পুত্রাদি প্রদত্ত অন্ন পানাদি দ্বারা মন্ত্রশক্তি প্রভাবে সেই আত্মার তৃপ্তি হইবে না কেন? মন্ত্রের শক্তি বলিয়া যে একটি পদার্থ আছে তাহার প্রমাণ জিজ্ঞাসায় আমি বলিব কেহ যদি রামকে অতি তুচ্ছতাচ্ছিল্য সহকারেও পিছন থেকে আহ্বান করে, রাম তখনই পেছন ফিরিয়া কে ডাকিল এই আকাঙ্ক্ষায় তাকাইয়া থাকে, তাহা হইলে র, আ, ম, অ, এই আনুপূর্ব্বী বিশিষ্ট রাম শব্দের একটা শক্তি আছে বুঝা গেল; তাহা না হইলে রাম পেছনে তাকাইবে কেন? অসংস্কৃত অশ্রদ্ধোচ্চারিত রাম শব্দের যদি একটা শক্তি আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারিলাম, তবে ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে উচ্চারিত বৈদিক মন্ত্রের যে একটা শক্তি নাই একথা কে বলিতে পারে? এবং সেই মন্ত্রাদি পাঠপূর্ব্বক শ্রদ্ধাসহকারে পিত্রাদির উদ্দেশ্যে দানাদি করিলে তাহার দ্বারা যে পিত্রাদির তৃপ্তিসাধন হয় না এইকথা বলা কি উন্মত্তের প্রলাপ বলিয়া মনে হয় না?

মন্ত্রশক্তিপ্রভাবে ক্রুরস্বভাব সর্পাদিও বশীভূত হয় ইহা আমরা প্রত্যক্ষই দেখিতে পাই।

প্রাচীনগ্রন্থ পাঠে একটা ঘটনা জানা যায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পিতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে দেশ বিদেশের বহুব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। শ্রাদ্ধদিন পূর্ব্বাহ্ণে নিমন্ত্রিত পণ্ডিতমণ্ডলী ও অন্যান্য বহুলোক সমাগত হইলেন। সভা তখন পরিপূর্ণ, সভায় হিন্দুর ক্রিয়াকলাপে অবিশ্বাসী পাশ্চাত্য শিক্ষিত একদল তরুণ যুবক উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা বলিয়া উঠিলেন পণ্ডিতমহাশয়গণ! বলুন দেখি শ্রাদ্ধাদি করিয়া কি কোন ফল আছে মরা গরু কি কখনও ঘাস খায়? এবং এখানে শ্রাদ্ধাদি করিলে সেই দেয় বস্তুর দ্বারা পিত্রাদির তৃপ্তিসাধন কি কখনও সম্ভব হয়? তাহা যদি হয় তবে বিদেশস্থ পুত্রাদির উদ্দেশ্যে নিত্য নিজবাটীতে বসিয়া থালায় অন্ন ব্যঞ্জন সজ্জিত করিয়া ওহে পুত্র! তোমার তৃপ্তির জন্য অন্ন ব্যঞ্জন দিতেছি, ইহাদ্বারা তোমার উদরপূর্ত্তি হউক! এই বলিলেই ত চুকিয়া যায়, প্রতি মাসে টাকা পাঠাইবার দরকার কি? ইহার উত্তরে পণ্ডিতগণ যথাযথ শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে তাঁহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রভাবে বিকৃতপ্রায়-মস্তিষ্ক তরুণদল কিছুতেই তাঁহাদের কথা মানিয়া লইতে চাহিলেন না। নানাবিধ কুতর্কজাল বিস্তার করিয়া সভায় একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিয়া তুলিলেন এমন সময়ে অন্য একজন ভদ্রলোক বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন "মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র পিতৃশ্রাদ্ধ বহু অর্থব্যয় করিয়া ভক্তিসহকারে করিতেছেন, এই শ্রাদ্ধ যিনি নিষ্ফল বলিবেন তাহার পিতৃপুরুষের মুখে আমি বিণ্মূত্র ত্যাগ করিতেছি ইত্যাদি। এইকথা যেমন বলা

অমনি তরুণদল ক্রোধান্ধ হইয়া হবিঃপ্রদীপ্ত বহ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন। এবং বলিলেন মহাশয়! আপনার এতবড় সাহস, যে আপনি নিঃসঙ্কোচে এ হেন পরুষবাক্য প্রয়োগ করিতে পারিলেন· আপনি সভায় আসিয়া অসভ্যতা প্রকাশ করিতেছেন কেন? রসনা সংযত করুন, না হয় আপনার বড়ই বিপদ আছে। তখন সেই ভদ্রলোক বলিলেন মহাশয়গণ! রাগ করিতেছেন কেন? এইমাত্র আপনারা বলিলেন শ্রাদ্ধ করিয়া কোন ফল নাই। তবে চটিতেছ কেন? বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক শ্রাদ্ধাদি করিলে তাহা যদি পিতৃপুরুষ না পাইয়া থাকেন; তবে অবজ্ঞা সূচক আমার মৌখিক সাধারণ কথায় আপনাদের পিতৃপুরুষ কি করিয়া বিশুদ্ধ পাইবেন? তখন তরুণদল তাঁহাদের ভ্রান্তি বুঝিতে পারিয়া অপমানে অবনতমস্তকে সভাস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ইহাদ্বারা আমরা বেশ বুঝিতে পারি বৈদিক মন্ত্রাদির একটা বিশিষ্ট শক্তি আছে এবং সেই শক্তি দিয়া ইলেক্‌ট্রিক পাশ করার ন্যায় শ্রাদ্ধীয়-অন্নপানাদি দেব মনুষ্যাদি শরীরপ্রাপ্ত পিতৃপুরুষের নিকট গিয়া উপস্থিত হয় ও তাঁহাদের তৃপ্তিসাধন করে। অন্ততঃ ইহা আমরা সকলেই একবাক্যে মানিয়া লইব যে মৃতাহ তিথিতে যে ব্যক্তি পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্য দানাদি করিয়া থাকেন, সেইদিন তত্তৎ শরীরপ্রাপ্ত পিতৃপুরুষ তাঁহার কোন স্থানে অন্য কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক আহুত হইয়া পরম সুভোগ্য অন্নপানাদি লাভ করিয়া থাকেন, তাহাদ্বারা তাঁহাদের পরম তৃপ্তিলাভ হইয়া থাকে। আমি বলি এই লাভটা শ্রাদ্ধীয়ান্ন বলেই হইয়া থাকে।

সাগরের জলের সহিত তরঙ্গ সকলের পরস্পর সংযোগের ন্যায় পরমাত্মার সহিত সমস্ত জীবাত্মার পরস্পর সংযোগ সূত্র থাকায়, মানবদিগকে আনন্দিত কিম্বা ভোজনে তৃপ্ত করাইলে যেমন আত্মান্তর্গীণ তৃপ্তিবশতঃ নিজের আনন্দানুভব হয়, এবং ক্ষুধা ও পিপাসার বেগ সংযত হয় সেইরূপ পরলোকগত জীবের উদ্দেশ্যে ভোজন করাইলেও সেই প্রেতাত্মার তৃপ্তি হয় তাই মৃততিথিতে "সম্বৎসরে সম্বৎসরে প্রেতায়ান্নং দদ্যাদ্ যস্মিন্নহনি প্রেতঃস্যাৎ" এবং "মৃতাহে ভূরিভোজনং" প্রভৃতি ব্যবস্থা শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন।

মৃতব্যক্তির বাঞ্ছিত প্রিয়বস্তু দান ও ভোজন করাইলে তাঁহার অধিক তৃপ্তি হইয়া থাকে, এবং তত্তদ্দ্রব্যের ভোগলিপ্সা ক্ষয় হয়, সেই জন্য শাস্ত্রে বলা আছে "যদ্‌যদিষ্টতমং লোকে তত্তৎপ্রেতায় দীয়তা"মিতি। যে যে বস্তু জীবিতাবস্থায় উহার প্রিয় ছিল সেই সেই অনিন্দিত বস্তু প্রেতের উদ্দেশ্যে দান করিবে।

বায়ুস্তরের কম্পনদ্বারা দূর হইতে সঙ্গীতাদি শ্রবণ, তারহীন টেলিগ্রামে সংবাদ সংগ্রহ প্রভৃতি জড় কার্য্যের এবং অপভাষায় রচিত মন্ত্রশক্তিদ্বারা সর্পবিষ নষ্ট ও বাণযুদ্ধাদির বিবরণ সকলেই জানেন, সেইরূপ আত্মময় জগতে দিব্যদৃষ্টি বিশিষ্ট পিতৃআত্মাকে "ওঁ আয়ান্তুনঃ পিতরঃ সোম্যাসো গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্ব্বিনেভিঃ" ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্রে আবাহনাদিদ্বারা শ্রাদ্ধস্থানে আনয়ন করা বা শ্রাদ্ধকার্য্য জ্ঞাপন করা কিছুই অসম্ভব নহে, আমাদের প্রাচীন গ্রন্থ মহাভারতাদি পাঠ করিলে এইরূপ দৃষ্টান্তেরও অভাব হয় না। ইদানীং পাশ্চাত্যদেশেও প্রেতাত্মা সম্বন্ধে বহু গবেষণা চলিতেছে।

ভাবগ্রাহী ভগবন্ ভক্তের ভাবই গ্রহণ করেন, নৈবেদ্যাদি বস্তু তুলিয়া লয়েন না। ভগবান্ গীতার নবমঅধ্যায়ে বলিয়াছেন—

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃত মশ্নামি প্রযতাত্মনঃ" ॥ ইতি

যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে আমাকে ফল, পুষ্প, পত্র জল প্রভৃতি দান করে, আমি তাহার শ্রদ্ধা প্রদত্ত সেই বস্তু ভক্ষণ করিয়া থাকি। এই ভগবদ্বাক্যে "অশ্নামি" পদটি "অশভোজনে" অশধাতু দ্বারা নিষ্পন্ন, ভোজন শব্দের অর্থ গলাধঃকরণ অর্থাৎ অভ্যন্তরে রাখা। ভক্তপ্রদত্ত পত্রপুষ্পাদি এই খানেই পড়িয়া থাকে আমরা দেখিতে পাই, কিন্তু ভগবান বলিতেছেন তাহা আমি ভোজন করি; তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তিনি ভক্তের অভ্যন্তরের নির্মল ভাবটুকুই গ্রহণ নিজের অভ্যন্তরে রাখেন, না হয় অশ্নামির স্থলে গৃহ্ণামি বলিলেই পারিতেন দান অশ্নামি দ্বারা ইহাই বিশেষভাবে প্রতীত হয় যে, ভগবান ভক্তের অভ্যন্তরীণ ভক্তিভাব অতি যত্নসহকারে অন্তরেই রাখেন, বাহিরে রাখেন না। এবং তাহার দ্বারা তিনি পরম প্রীতিলাভ করেন। পত্র পুষ্প বা নৈবেদ্যাদি দানে সেই ভক্তি শ্রদ্ধার ভাবই পরিস্ফুট হয়, যেমন স্ত্রীপুত্রাদি আধারে প্রেম ও স্নেহ ফুটিয়া উঠে, তেমন পিতৃলোকও শ্রাদ্ধ কর্তার প্রদত্ত পিণ্ডাদি ভক্ষণ না করিলেও তাঁহারা উপাদেয় শ্রাদ্ধদ্রব্য এবং পিণ্ডাদিতে অভিব্যক্ত, শ্রদ্ধার ভাবটুকুই হৃদয়স্থ করিয়া তৃপ্তি ও পুষ্টিলাভ করেন। লৌকিক কার্য্যেও আমরা ব্যক্তিবিশেষের বাক্যাদির ভাব লইয়াই তুষ্ট বা রুষ্ট হইয়া থাকি, ইহা প্রত্যক্ষই দেখা যায়।

ব্রহ্মভাবাপন্ন যোগী ব্রহ্মামৃত পানে এবং সতী পতিপ্রেম ধ্যানে দীর্ঘকাল জীবন ধারণে সক্ষম। ভাবই তাঁহাদিগের আহার্য্য বস্তু, কারণ জীবের অবস্থা ভেদে আহার্য্য বস্তুও পৃথক্ পৃথক্ দেখা যায়। এই ভাবই মনের প্রবৃত্তি বলিয়া কথিত হয়, এবং সেই ভাব স্থান বিশেষে উর্দ্ধগামী হইলে শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রেম এবং অধোগামী হইলে কাম, স্নেহ ও মমতাদি নামে অভিহিত হয়। শ্রদ্ধা ও চিত্তের ভাববিশেষ, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পিত্রাদির উদ্দেশ্যে শাস্ত্রবিধানে যে অন্নাদি দান করা হয় তাহার নাম শ্রাদ্ধ। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য শ্রাদ্ধতত্ত্বে বলিয়াছেন "শ্রদ্ধয়া অন্নাদের্দানং শ্রাদ্ধং বৈদিকপ্রয়োগাধীনং যৌগিকং" ইতি। শ্রাদ্ধবিবেককারও "সম্বোধন পদোপনীতান্ পিত্রাদীন্ চতুর্থ্যন্তপদেনোদ্দিশ্য হবিস্ত্যাগঃ শ্রাদ্ধং" এই কথা বলিয়াছেন,

টীকাকার শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার একটু বিস্তারিত ভাবে শ্রাদ্ধের ভাবার্থ লক্ষণ করিয়াছেন যথা—"অচেতননিষ্ঠ ত্যাগজন্য ফলভাগিত্ববহির্ভূত বিষয়তাপাদানাভিসন্ধানপূর্ব্বকত্বোপাধি প্রধানফলজনকত্বে সতি শ্রুতি প্রতিপাদ্যোদ্দেশ্যোপনিষ্ট দ্রব্যত্যাগঃ শ্রাদ্ধং" যাহা হউক সকল লক্ষণের দ্বারা উক্ত একভাবই অভিব্যক্ত হইতেছে। এই শ্রাদ্ধ নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য-ভেদে প্রধানতঃ তিনপ্রকার। বিবেককার "নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং সপিণ্ডনং" ইত্যাদি ভেদে শ্রাদ্ধ দ্বাদশপ্রকার বলিয়াছেন, শ্রাদ্ধকরণে নিতান্ত অসমর্থব্যক্তি পিত্রাদিকে স্মরণ করিয়া শ্রদ্ধাযুক্ত অন্তরে বনে বসিয়া রোদন করিলেও শ্রাদ্ধ সিদ্ধ হয়। আমরা কালশক্তির প্রভাবে

ক্রমশঃ ক্ষীণশক্তি হইয়া পড়িবে এই জন্যই ত্রিকালজ্ঞ প্রাচীনঋষিগণ আমাদের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া প্রায় সমস্ত কার্য্যেই এইপ্রকার অনুকল্প বিধান করিয়াছেন। দয়ালু ঋষি মুনিগণ সনাতন হিন্দুধর্মে কতই যে উচ্চতর ভাব রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা দেখিলে স্বতঃই তাঁহাদের রাতুল চরণে শিরনত হইয়া আসে। অপর যে যে জাতির মধ্যে পিতৃপুরুষের তৃপ্তিস্বরূপ শ্রদ্ধানুরূপকৃত্য বিদ্যমান আছে, তাহাদের কাহারও মধ্যে আমাদেরমত এই উচ্চতমভাবদৃষ্ট হয় না। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা বিশেষতঃ ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁহাদের পিতা, মাতা ভ্রাতা পত্নী, পতি এবং পুত্রকন্যাদির সমাধিস্থানে গিয়া পুষ্প বিক্ষেপ করেন এবং শোকপ্রকাশ করেন ও পরমেশ্বরের নিকট অথবা সাধুব্যক্তিদিগের নিকট মৃতব্যক্তিদের নিমিত্ত অক্ষয়স্বঃ কামনা করেন। কিন্তু এইকার্য্য পূর্ণমাত্রায় তাঁহাদের শাস্ত্রোপদিষ্ট নহে ইহা যাঁহারা করেন, তাঁহারা কিয়ৎপরিমাণে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই করিয়া থাকেন, মুসলমানদিগের মধ্যে মৃত ব্যক্তির সমাধিসমীপে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা এবং কোরাণ পাঠকরা অতি সৎকার্য্য বলিয়াই প্রশংসিত হয়, এবং তাহা মৃতব্যক্তিরও সদ্গতির পক্ষে সহায়স্বরূপ গণ্য হয়, ঐ ভাবের অবলম্বনেই মুসলমানদিগের জগদ্বিখ্যাত হর্ম্ম্য কীর্ত্তিসমূহ সংস্থাপিত হইয়া আছে।

ইতিহাস পাঠে জানা যায় বৌদ্ধদিগের মধ্যে (চীন, জাপান এবং ব্রহ্মাদিদেশে) শ্রাদ্ধকৃত্য অতি বাহুল্যরূপেই নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। উহাদিগের মধ্যে আদ্যশ্রাদ্ধ, নবমাসিক শ্রাদ্ধ এবং বার্ষিক শ্রাদ্ধ প্রভৃতি অনেক প্রকার শ্রাদ্ধ প্রচলিত আছে, এবং সেগুলিতে ভূরিদান, বাদন, নর্ত্তন, ক্রন্দন ও কীর্ত্তনাদি যথেষ্ট হইয়া থাকে। বৌদ্ধদেশে পিতৃপুরুষদিগের নামে সংস্থাপিত হর্ম্মকীর্ত্তির অভাব নাই। কিন্তু বৌদ্ধসম্প্রদায়ের লোকেরা কেহই মৃতব্যক্তির প্রতিভূ-স্বরূপ অন্য কাহাকেও কল্পনা করিয়া লয় না। তাহারা যে বস্ত্রভোজ্যাদি দান করে তাহা সাক্ষাৎ পিতৃপুরুষের জীবাত্মাকেই দান করিতেছে মনে করিয়া দান করে; যেন সেই মৃতব্যক্তি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হইয়াছেন এবং যেন কোন অনুজ্ঞা বা উপদেশ প্রদান করিবেন, শ্রাদ্ধকর্ত্তাকে নিজের মুখ ও চক্ষু প্রভৃতির ভাবভঙ্গী এইরূপ করিয়া অতি বিনম্র ও প্রযত হইয়া থাকিতে হয়। সম্প্রতি বঙ্গদেশের মধ্যে চট্টগ্রাম জেলায় কিছু বৌদ্ধসম্প্রদায় আছে দেখা যায়। আর্য্যজাতির শাস্ত্রং সকলদিকে.জ্ঞানসম্মত ইহাতেই "সর্ব্বং সর্ব্বাত্মকং" এই মহাবাক্যটি আছে। সুতরাং ইহাতেই প্রতিভূস্বীকারের পথ সুবিস্তৃত। ইহাই শ্রাদ্ধকৃত্যে পিতৃপুরুষগণের পরোক্ষ আশংসান প্রদান করিতে সক্ষম, ইহাই পিতৃগণকে দেবতারূপী করিয়া তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণশরীরে স্থাপনা করিতে পারে। শ্রাদ্ধকৃত্যের মন্ত্রগুলিতেও বহুত্বের সহিত একত্বের মিশ্রণ দেখা যায়, অথবা একত্বের উপরে বহুত্বের আবরণমাত্র, অন্তর্ভাগে একত্বের বীজ বিস্পষ্টই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

স্মৃতিতে পাওয়া যায় সাক্ষাৎ নির্ব্বাণপ্রাপ্ত ভীষ্মদেবের ঔর্দ্ধদেহিকাদি ক্রিয়া যুধিষ্ঠিরাদি করিয়াছিলেন, তথাচ স্মৃতিঃ—তস্যনির্হরণাদীনি সম্পরেতস্যভার্গব। যুধিষ্ঠিরঃ কারয়িত্বা-মুহূর্ত্তং চিন্তিতোঽভবৎ" ॥ অর্থাৎ পরলোকগত ভীষ্মদেবের ঔর্দ্ধদেহিকক্রিয়া সমাপন করিয়া

যুধিষ্ঠির অনন্তকালের জন্য চিহ্নিত হইয়াছিলেন। সুতরাং কাশ্যাদিমৃত পিত্রাদির বা যাঁহার গয়াশ্রাদ্ধ করা হইয়াছে কিম্বা যিনি যোগযুক্ত তাঁহার উদ্দেশ্যেও সর্ব্বপ্রকার শ্রাদ্ধতর্পণ বা দানাদিকার্য্য যথাশাস্ত্র করা নিতান্ত প্রয়োজন। কারণ শ্রাদ্ধফল উভয় পক্ষেরই তৃপ্তিকর ও উর্দ্ধগতির প্রাপক, —বিশেষতঃ পিত্রাদি ঋণ পরিশোধের জন্য দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন পুত্রাদির ইহা বড়ই কৃতজ্ঞতা প্রকাশক। শাস্ত্র বলিতেছেন—"শ্রাদ্ধেন প্রজয়াচৈব পিতৃণামনৃণোভবেৎ" শ্রাদ্ধ ও পুত্রোৎপাদনের দ্বারা পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইবে। এই শ্রাদ্ধতর্পণাদির ন্যায় বিশ্বজনীন প্রীতিকর সৎকার্য্যও বোধহয় দ্বিতীয় নাই।

বহুকাল হইতে দেশবিদেশের সংবাদে শ্রুত এবং অনেক স্থানে প্রত্যক্ষ প্রায় দেখা গিয়াছে যে, ভূতাবিষ্ট মানব নিজমুখ দিয়া বলিতেছে "আমি অমুক আমাকে পিণ্ডাদি দান করিয়া উদ্ধার কর", তাহার জন্য গয়ায় পিণ্ডাদি দানের পরে সেই উপসর্গ শান্তি হইয়াছে, ইহা শ্রুত ও প্রত্যক্ষ হইয়াছে। অতএব পরলোকগত জীব যখন শ্রাদ্ধাদির প্রয়োজন জানাইয়া প্রার্থনা করিতেছেন, তখন সংসারিলোক আমাদের তর্ক বা সন্দেহের অবসর কোথায়? জীবনের শেষে পরপারের যাত্রী হইয়া যাঁহারা ভবনদীর কূলে পৌছিয়াছেন তাঁহারা দৃষ্টি উন্নত করিলেই পরপার বা পরলোক দেখিতে পান; শুদ্ধচিত্তবিশিষ্ট জীব স্পষ্টই দেখেন।

ইহকালের আস্তিক্যবুদ্ধি পরলোকেও নষ্ট হয় না, এজন্য স্বধর্ম্মানুসারে প্রেতের সদ্গতির চেষ্টা আস্তিকজাতিমাত্রেরই করা উচিত। স্বধর্ম্মানুসারে ভক্তিপূর্ব্বক প্রেতের কার্য্য করিলে তাহা দ্বারা প্রেতের প্রীতি ও উপকার হইয়া থাকে। কারণ ঈশ্বরাস্তিত্ববাদী আস্তিকমাত্রেই কর্ম্মফল মানিতে বাধ্য। শ্রাদ্ধ তর্পণাদির দ্বারা পিতৃলোক পরিতৃপ্ত হইয়া আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন, তাহার দ্বারা আমাদের ঐহিক ও পারত্রিক সকল প্রকার মঙ্গলই লাভ হইয়া থাকে। তাঁহাদের স্নেহবিগলিত আশীর্ব্বাদ অব্যর্থ, এবং ঐ পিতৃকার্য্যের দ্বারা দেবতারাও পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন।

পিতা স্বর্গঃ পিতাধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ" ॥

এই বচনের দ্বারা তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। দেবকার্য্য অপেক্ষায়ও পিতৃকার্য্যের প্রাধান্য আছে, পিতৃকার্য্য বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি ব্যতীত দৈবকার্য্য বা তীর্থযাত্রাদি সিদ্ধ হয় না। পিতৃকার্য্যে আরও একটু বিশেষত্ব এই দেবতার উপাসনায় নিজেরই অভিলষিত উপকার হইয়া থাকে, দেবতার তেমন বেশী কিছু একটা হয় না। ইহার বিচার বুদ্ধিপূর্ব্বক দেখিলে অনুভব করিতে পারা যায়। কিন্তু পিতৃকার্য্যে উভয়পক্ষেরই বিশেষ উপকার হয়। পিণ্ড দাতা মৃত্যুর পরে ঐ নিজপ্রদত্ত শ্রাদ্ধাদির ফল এবং অন্যান্য সপিণ্ড বা জ্ঞাতিপ্রদত্ত শ্রাদ্ধাদির ফল, সপিণ্ড এবং পূর্ব্বতন পিতৃগণের সহিত একত্র হইয়া ভোগ করিয়া থাকেন।

"যো যস্য পিণ্ডদাতা স সুতঃ সন্ তেন সহ তৎপিণ্ডভোক্তা" এবং দায়ভাগ ধৃত সন্দর্ভের দ্বারা তাহাই প্রতীত হয়।

এবং "রতিশক্তিঃ স্ত্রিয়ঃ কান্তা ভোজ্যং ভোজন শক্তিতা।
দানশক্তিঃ সবিভবা রূপমারোগ্য সম্পদঃ।
শ্রাদ্ধপুষ্পমিদং প্রোক্তং ফলং ব্রহ্মসমাগমঃ"॥

ইত্যাদি বচনেও শ্রাদ্ধের নানাবিধ ফল দেখা যায়। এই ফল শ্রাদ্ধকর্তারই হইয়া থাকে পিত্রাদির ফল সম্বন্ধে পূর্ব্বে অনেক কথা বলিয়াছি। শ্রাদ্ধের দ্বারা উভয়পক্ষের কি প্রকার ফল হয় তাহা দেখাইলাম।

উপকার পাইলে প্রত্যুপকার করিবার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক সকলেরই হইয়া থাকে, এবং কর্ম্মচক্রের গতি ও বিনিময় ভাবাপন্ন, সুতরাং প্রেতের কার্য্য না করিয়া তাহার ধন উপভোগ করা কিছুতেই উচিত নহে। উহা একপ্রকার প্রবঞ্চনা বা চৌর্য্য, তাদৃশ-ব্যক্তিরা শাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইয়া থাকেন। তাই শঙ্খ্যচনে বলা হইয়াছে "অকৃত্বা প্রেতকার্য্যানি প্রেতস্য ধনহারকঃ বর্ণানাং যদ্বধে প্রোক্তং তদ্ব্রতং নিয়মশ্চরেৎ॥ প্রেতের উদ্দেশে পিণ্ডাদি দান না করিয়া যে ব্যক্তি তাহার ধন ভোগ করিবে সে তদ্বর্ণবধোক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

আমাদের ভারতগভর্ণমেণ্ট ও "পিণ্ডং দত্ত্বা ধনং হরেৎ" এই মতটি মানিয়া লইয়াছেন। এবং সেই মতেই আমাদের স্বত্বাধিকার নির্বাচিত হইয়া থাকে।

যে স্নেহময় জনক ও স্নেহময়ী জননী আমাদিগকে কত যত্নে ও নিঃস্বার্থ স্নেহে লালন-পালন করিয়া আমাদের ভোগ ও সুখোন্নতির জন্য আজীবন কত সদসৎ কার্য্য এবং কত কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, আমাদিগকে হৃষ্ট দেখিলেই যাঁহারা আনন্দিত হইতেন, আমরা ইহপরলোকে সেই প্রত্যক্ষদেবতার সেবা ও শ্রাদ্ধতর্পণাদি না করিলে অকৃতজ্ঞ আমাদের আমাদের মঙ্গলের আশা কোথায়? পিতৃলোকের শ্রাদ্ধাদিতে বিমুখ কিম্বা অবাধ্য পুত্রাদির প্রয়োজনই বা কি? এইজন্য শাস্ত্রকার বলিয়াছেন "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ড প্রয়োজনং" ইত।

হিন্দুজাতির সমস্ত বৈদিক ক্রিয়াকলাপাদি কেন করিতে হয়, এবং করিয়াই বা কি ফল হয় ও না করিলেই বা কি ক্ষতি হয়, এই বিষয়ের প্রমাণ ও যুক্তি তর্কের অভাব নাই। বেশ বিবেকবুদ্ধি পরিচালনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় প্রাচীন ঋষিগণ আমাদের মঙ্গলের জন্য, দেশের হিতের জন্য ও ভগবানের সহিত আমাদের নৈকট্য সম্বন্ধ সর্ব্বদা বজায় থাকিবার জন্যই এত শাস্ত্রবচন ও যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে তাঁহাদের কোনও ক্ষতি বা বৃদ্ধি হইতেছে না। সুতরাং নিঃস্বার্থপর আমাদের পুরাতন ঋষিবাক্যে অবিশ্বাস স্থাপন করা কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে। মরা গরু কি ঘাস খায়? এইকথা বলিয়া পিতৃপিতামহকে গোভাবাঞ্ছনের দলে ভর্ত্তি করা এবং নিজকে

এতাদৃশ অরিষ্টজনকতা নিবৃত্তিকল্পে বাবং কর্ম কি শিক্ষিত সমাজের উচিত কার্য্য? শিক্ষিতসমাজ যদি শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা না করেন, তবে অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর লোক করিবে কেন? গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে"॥ ইতি

শ্রেষ্ঠের কার্য্যের অনুসরণ করিয়া নিম্নশ্রেণীর মানবে এবং পিত্রাদির দৃষ্টান্তে পুত্রাদি চলিয়া থাকে।

অতএব হে মোহান্ধ মানব! তুমি পিতৃকার্য্য না করিলে তোমার সন্তানেরাও তোমায় জলপিণ্ড দিবে না, তোমার আস্তিকতা এবং পিতৃমাতৃ ভক্তি দেখিলে তোমার সন্তানও সেই প্রকার করিবে। তুমি ফাঁকি দিয়াই ফাঁকিতে পড়িতেছ; পূর্ব্বকালে লোকের ধর্ম্মজ্ঞান এবং কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রখর ছিল বলিয়াই তাঁহারা সুখী ছিলেন। অতএব ভাইগণ! এখনও সময় আছে, এখনও ফিরিয়া পূর্ব্বপুরুষের কর্ম্মপন্থা অনুসরণ কর, আলস্য ও বিলাসীতা ছাড়িয়া এই কর্ম্মক্ষেত্র ভারতের সুশীতল শস্যশ্যামলা পল্লীমাতার ক্রোড়ে স্বাবলম্বী হইয়া বসিয়া, অযত্নসুলভ ধূপ, পুষ্প, ফল ও তণ্ডুল দ্বারা শুদ্ধচিত্তে ভক্তিসহকারে দেব ও পিতৃকার্য্য কর। অবোধ নিঃস্ব সোদরবোধে রোগজীর্ণ পল্লীবাসীর সেবা কর; বিশ্বাত্মা বিশ্বনাথের আশীর্ব্বাদে ও নিয়মে দেশের দুর্ভাগ্য ঘুচিয়া যাইবে। রাহুগ্রস্ত নিশাকর যেমন কিছুক্ষণ পরেই শান্ত সুশীতল কিরণ দানে সমর্থ হন, তেমনি ম্লেচ্ছরাহুগ্রাসে পতিতা আমাদের স্নেহময়ী ভারতেশ্বরী আবার জাগরিতা হইয়া দিগ্‌দিগন্তে প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থা হইবেন, পুনঃ দেশের ভাগ্যলক্ষ্মী ফিরিয়া আসিবে। আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্যতীত ভারতের পরাধীনতা কখনও ঘুচিবে না, ইহমেব তথ্যম্)।

যদিও এই ঘোর অন্নসমস্যার দিনে অর্থাভাবে লোক দেব ও পিতৃপুরুষের দানীয় বস্তু সংগ্রহ করিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি যাঁহাদের হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি আছে তাঁহাদের পক্ষে সময় বা অর্থ সামর্থ্যের কখনও অভাব হইতে পারে না।

"যেন শুক্লীকৃতা হংসাঃ শুকাশ্চ হরীতীকৃতাঃ।
ময়ূরাশ্চিত্রিতা যেন সতে বৃত্তিং বিধাস্যতি॥"

বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্বনাথই সকলের বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন।

ওঁ তৎ সৎ।

হিন্দুসমাজের দুরবস্থা প্রতিকারের জন্য সম্প্রতি কর্ত্তব্য

হিন্দুসমাজের দুরবস্থা দূর করিতে হইলে, হিন্দুসমাজকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনিতে হইবে। ইংরেজীশিক্ষার ফলে একপ্রকার নূতন হিন্দু সৃষ্টি হইয়াছে, ইহাদিগকে রাজনৈতিক হিন্দু বলা যাইতে পারে। এ হিন্দুর সহিত হিন্দুসমাজের কোন সম্পর্ক নাই, হিন্দুসমাজে ইহারা সামাজিকরূপে পরিগৃহীত হয় না, অথচ রাষ্ট্রীয়-ব্যাপারে ইহারা হিন্দু নামে পরিচিত হইয়া থাকে; ইহাকে অস্বাভাবিক অবস্থা বলা যাইতে পারে; কারণ সামাজিক ব্যাপারেই হউক আর রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেই হউক—যে, যে জাতি বলিয়া আত্মপরিচয় দিবে তাহার প্রমাণ করিতে হইবে—স্বজাতীয়-সমাজ তাহাকে সেই জাতি বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। যাঁহাদিগকে রাজনৈতিক হিন্দুনামে অভিহিত করিতেছি তাঁহারা ইহার বিপরীত প্রমাণ করিতেছেন, তাঁহারা বা তাঁহাদের পিতৃপুরুষেরা সামাজিক হিন্দু ছিলেন অর্থাৎ সমাজ অবিসম্বাদে তাহাদিগকে হিন্দু বলিয়া মানিয়া লইত, যখন স্বেচ্ছায় তাঁহারা সমাজের সম্পর্ক পরিত্যাগ করিলেন ও সমাজের বিদ্বিষ্ট পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং এই কারণে সমাজ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল ও স্বজাতি বলিয়া পরিচয় দিতে অস্বীকার করিল তখন রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তাঁহাদের হিন্দুত্বের গৌরব বাড়িয়া গেল, অর্থাৎ তখন তাঁহারা বিদেশী বিধর্ম্মীর নিকট সুসভ্য হিন্দুনামে পরিচিত হইলেন ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হিন্দুসমাজের নেতৃত্বের ভার পাইলেন। স্বজাতীয় ধর্ম্ম সমাজ ও স্বীয় পিতৃপুরুষের প্রতি বিদ্বেষের বিষোদ্গারে যিনি যত কৃতিত্ব দেখাইতে লাগিলেন হিন্দুসমাজের নেতৃত্বে তাঁহার স্বত্ব তত পাকা হইতে লাগিল। শেষ পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজের নেতৃত্বের পরাকাষ্ঠা দাঁড়াইল আর্য্যসমাজী ও ব্রাহ্মকুলে। হিন্দুসমাজের এই অস্বাভাবিক অবস্থাই আজ সর্দ্দাআইন প্রবর্ত্তন করিতে পারিয়াছে ও হিন্দুসমাজে অবসাদ আনয়ন করিয়াছে, এই অস্বাভাবিক অবস্থা মুক্ত করিয়া হিন্দুসমাজকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনিতে হইবে। সমাজ পরিত্যক্ত ও সমাজে অবিসম্বাদে অহিন্দুরূপে স্বীকৃত ব্রাহ্ম আর্য্যসমাজী প্রভৃতি যাহাতে রাষ্ট্রীয় লোক গণনায় হিন্দুনামে পরিচিত হইতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সমষ্টির কাছে ব্যক্তি নগণ্য। সমাজ সমষ্টির দ্বারা গঠিত; এক একজন সামাজিক সমষ্টিরূপ সমাজের সেবকস্থানীয়, সেবকের পক্ষে প্রভুর আনুগত্য ও আদেশপালন যেমন ধর্ম্ম, সামাজিকের পক্ষে ও সমাজের আনুগত্য ও আদেশ পালন তেমনি অবশ্য কর্ত্তব্য। সেবক যদি তাহার ধর্ম্ম পালন না করে তাহা হইলে প্রভু তাহাকে পোষণ করে না। প্রভুর কোন দোষ থাকিলে সেবক তাহা সেবকোচিত বিনয়ের সহিত প্রভুকে জানাইতে পারে, দোষ শোধনের উপায় উপদেশ করিতে পারে, প্রয়োজন হইলে প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করিয়া উপায়ান্তরও অবলম্বন করিতে পারে, কিন্তু প্রভুকে শাসন করিবার অধিকার সেবকের থাকিতে পারে না, প্রভুর নিন্দা গ্লানি প্রচার করিয়া অপরের সাহায্যে প্রভুর প্রভুত্ব সেবক

নষ্ট করিয়া দিবে প্রভু ইহা কখনই সহ্য করিবে না। যাঁহারা সমাজ ও সামাজিকের এই স্বাভাবিক সেব্য সেবক ভাব বিস্মৃত হইয়া বিদ্রোহবুদ্ধিতে পরের সাহায্যে সমাজকে শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাঁহারা স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ করিতেছেন, সমাজ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে। শিক্ষার দোষে বুদ্ধিবিপর্য্যস্ত হওয়ার স্বাভাবিক অবস্থা ইঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই; যে রাষ্ট্রনীতি, রাষ্ট্রীয়শক্তি বর্দ্ধিত করিবারজন্য ধর্ম্মসমাজদ্রোহী হিন্দু সৃষ্টি করিয়াছে সেই রাষ্ট্রনীতির সহায়তায় রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ইঁহারা পরিশুদ্ধ হিন্দুরূপে পরিগৃহীত হইয়াছেন ও হিন্দুসমাজের নেতৃত্ব লাভ করিয়াছেন। এই অস্বাভাবিক অবস্থার কুফল হিন্দুসমাজ এতদিন সম্যক্ বুঝিতে পারে নাই, হিন্দুসভার আবির্ভাব এই কুফলকে সম্যক পরিস্ফুট করিয়া দিয়াছে।

যে শিক্ষা ও রাষ্ট্রনীতির ফলে ব্রাহ্ম আর্য্য সমাজীর সৃষ্টি হইয়াছে, হিন্দুসভার আবিষ্কর্ত্তা শিক্ষিতহিন্দু সম্প্রদায়ও সেই শিক্ষার ফলেই আবির্ভূত হইয়াছেন সুতরাং হিন্দুসমাজের দুর্ব্বলতা অনুভব ইঁহারা করিয়াছেন কিন্তু দুর্ব্বলতার হেতু বুঝিতে পারেন নাই। সামাজিকগণ সমাজ হইতে বিচ্যুত হইতে থাকিলে সমাজ ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে সন্দেহ নাই কিন্তু সমাজদ্রোহীর দ্বারা সমাজ পুষ্ট করিতে চেষ্টা করিলে সমাজ একেবারে ধ্বংস হইয়া যায়। উরগক্ষত অঙ্গুলি রক্ষা করিতে পারিলে শরীরের অঙ্গ হানি হয় না ইহা সকলেই বুঝে, কিন্তু উরগক্ষত অঙ্গুলি রক্ষা করিতে গেলে যে ক্ষেত্রে জীবননাশ অবশ্যম্ভাবী হয় সে ক্ষেত্রে উরগক্ষত অঙ্গুলি ছেদন আত্মরক্ষার সমীচীন উপায়রূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকে।

হিন্দুসভার প্রতিষ্ঠাতৃগণ ব্রাহ্ম আর্য্য সমাজী ও স্বেচ্ছাচার ব্যক্তিগণকে ধর্ম্মসমাজদ্রোহরূপ পাপ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করা প্রয়োজন বোধ করেন নাই অথচ তাহাদের হিন্দুসমাজের অঙ্গীভূত করিয়া হিন্দুর বল বৃদ্ধি করিবেন আশা করিয়াছেন। ইঁহারা বুঝিতে পারেন নাই— ব্রাহ্ম আর্য্যসমাজী প্রভৃতিকে হিন্দুর মধ্যে গণনা করায় হিন্দুজাতির সংজ্ঞা নির্দ্দেশ অসম্ভব হইয়াছে। পূর্ব্বে হিন্দু বলিলে বুঝাইত তীর্থদেবতায় শ্রদ্ধাবান্ সমাজ পরিগৃহীত শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ মান্যকারী জাতিকে। শাস্ত্রপ্রমাণে এই জাতির উত্তরাধিকার আইন রচিত হইয়াছে। দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর ভূসম্পত্তির বিধি ব্যবস্থা করা হইয়াছে, পোষ্যপুত্র গ্রহণাদির শাস্ত্রীয় বিধি প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। যাহারা তীর্থ দেবতা মানে না সমাজ পরিগৃহীত শাস্ত্রপ্রমাণে চলে না দেবোত্তরাদি ভূসম্পত্তির শাস্ত্রীয় অধিকার স্বীকার করে না তাহারা কোনকালে হিন্দু বলিয়া পরিচিত হইতে পারে নাই। যতকাল হিন্দুসমাজে এই অবস্থার অন্যথা না হইয়াছিল ততকাল হিন্দুর লক্ষণ নির্দ্দেশ অসম্ভব হয় নাই। যখন হইতে বিরুদ্ধ প্রকৃতির সমাজ পরিত্যক্ত ব্যক্তিগণও হিন্দুনামে পরিচিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে তখন হইতে হিন্দুর লক্ষণ নির্দ্দেশ অসম্ভব হইয়াছে। যাঁহারা ব্রাহ্ম আর্য্যসমাজী প্রভৃতিকে হিন্দুনামে পরিচিত করিয়া নূতন জাতি গঠন করিতে চাহেন তাঁহারা বুঝিতে পারেন না—পরস্পর বিরুদ্ধ প্রকৃতি দুই বা ততোধিক সম্প্রদায় লইয়া গঠিত কোন জাতির

সত্তা জগতে নাই—থাকা সম্ভবও নহে। একই ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানকে এক সম্প্রদায় বলিতেছে স্বর্গ লোকের পবিত্র সোপান, অন্য সম্প্রদায় বলিতেছে উহা ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানই নহে, ধর্ম্মজ্ঞান বিহীন বর্ব্বর মানব সঙ্ঘের কুসংস্কার পরিপোষণের স্থান। এক সম্প্রদায় যে শাস্ত্রকে প্রমাণরূপে শ্রদ্ধা করে অন্যসম্প্রদায় তাহাকে অপ্রমাণ অশাস্ত্র বলিয়া গ্লানি করে। এক সম্প্রদায় যে প্রকার পারিবারিক পদ্ধতিকে অপবিত্র পাপ পঙ্কিল বলিয়া ঘৃণা করে অন্য সম্প্রদায় তাহাকেই পবিত্র ও শ্লাঘ্য বলিয়া শ্লাঘা করে। এই প্রকার সর্ব্ববিষয়ে বিরুদ্ধ মত পোষণকারী সম্প্রদায় দ্বয় কখনও একজাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিগৃহীত হয় না। যদি অস্বাভাবিক উপায়ে এই প্রকার বিরুদ্ধ সম্প্রদায়দ্বয়কে এক জাতির অন্তর্নিবিষ্ট রাখিতে চেষ্টা করা হয় তাহাহইলে সে জাতির মধ্যে ঐকমত্য দূরের কথা বিরোধ বিচ্ছেদ ও অবসাদ ক্রমে প্রবল হইতে থাকে। বর্ত্তমানে হিন্দুজাতির অবস্থা এই প্রকার হইয়াছে। ধর্ম্মসমাজের অবমাননাকারী ব্যক্তি-গণকে স্বাভাবিক নিয়মে হিন্দুসমাজ দূরে সরাইয়া দিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছিল। হিন্দুসভা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার দ্বারা ঐ প্রকৃতির ব্যক্তিগণকে অস্বাভাবিক উপায়ে হিন্দুসমাজের অন্তর্নিবিষ্ট করিবার চেষ্টা করায় হিন্দু জাতির মধ্যে ঘোর বিপ্লব ও অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে। ইহার প্রতিকার না করিতে পারিলে হিন্দুজাতি ধ্বংসের কবল হইতে অব্যাহতি পাইবে না। অতএব অপ্রীতিকর হইলেও ধর্ম্মসমাজ বিরোধী ব্যক্তিগণের হিন্দুনামে পরিচয়ে ও হিন্দুসমাজে প্রভাব বিস্তারে বাধা প্রদান করিতেই হইবে।

বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন এই প্রকার অপ্রীতিকর কার্য্যের জন্য হিন্দুসমাজ দায়ী নহে। যাঁহারা স্বেচ্ছায় ধর্ম্মসমাজ বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছেন তাঁহারাই ইহার জন্য দায়ী।

বর্ত্তমান আন্দোলন ও হিন্দুসমাজ।

কংগ্রেস প্রবর্ত্তিত আইন ভঙ্গের আন্দোলনে সমগ্র ভারতে একটা বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে, আন্দোলনের ফল সর্ব্বত্র একরূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই, কংগ্রেসের আদেশ পালন সর্ব্বত্র করিতেছে না, পূর্ণ হিংসার ভাব অনেক স্থলে প্রকাশ পাইতেছে। আন্দোলনের চরমফল নির্দ্দেশ করা হইয়াছে পূর্ণস্বাধীনতা। যাহা হউক আমাদের তাহা বিচার করা প্রয়োজন নহে, এসম্বন্ধে বিচার বিতর্কের ভার রাজনীতি বিশারদ নেতৃদলের উপরে।

আমরা দেখিতেছি হিন্দুসমাজ যে দুর্ভাগ্যের ফলভোগ করিতেছে তাহার হাতে পরিত্রাণ কিছুতেই পাইবে না। আন্দোলনের প্রবর্ত্তক পূর্ণ স্বাধীনতা কামীগণ পূর্ণস্বাধীনতা কেন কামনা করিতেছেন তাহা তাঁহারা সুস্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন, ৪৪ বৎসর কাল তাঁহারা শাসনাধিকার প্রার্থনা করিয়া আসিতেছেন আজও তাহা পান নাই আবেদন নিবেদন করিয়া

এমন কি স্বরাজের খসড়া প্রস্তুত করিয়াও কোন ফল ফলে নাই অতএব পূর্ণস্বাধীনতার দাবী লইয়া আইন ভঙ্গ প্রবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন হইয়াছে, ইহার ফলে আর কিছু না হউক কিঞ্চিত শাসনাধিকার নেতৃবর্গের করতলগত হইতে পারে।

শাসনাধিকার হাতে পাইলে ইহারা কোন্ মূর্ত্তিতে কাহাদের উপর কি ভাবে শাসন দণ্ড চালাইবেন সে বিষয়ে বৃটিশ্ সরকারের মত ইহারা মন্ত্র গুপ্তি কর্ত্তব্য বুঝেন নাই; বীরপুরুষের মত সগৌরবে বাহ্বাস্ফোট পূর্ব্বক তাহা প্রদর্শন ও কীর্ত্তন করিয়া আসিতেছেন। প্যারিসের পোষাকের পরিবর্ত্তে খদ্দরের কৌপীন হয়ত কিছুদিন কাহারও কাহারও বহির্মূর্ত্তির শোভা বিপর্য্যয় ঘটাইবে কিন্তু অন্তর মূর্ত্তির বিপর্য্যয় কাহারও ঘটিবে না, সেটা প্রথম হইতে যেমন বিলেতে গড়া হইতেছে তেমনি হইতে থাকিবে। দণ্ড গ্রহণ করিবার জন্ত হিন্দুসমাজের মাথা পাতিয়া থাকিতে হইবে, মুসলমানেরা মাথা বাঁচাইয়া সরিয়া যাইতে পারিবে। কিভাবে শাসনদণ্ড চলিবে তাহা সর্দ্দাআইনের সমর্থনে ইহারা সুস্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়াছেন। পূর্ণস্বাধীনতার জন্ত আইন অমান্তের কল্পনাপূর্ণিমার তিনমাস পূর্ব্বে সর্দ্দাআইন সমর্থনে এমন আবেগ উপস্থিত হইয়াছিল যাহাতে প্রতিবাদকারীর মস্তকে লগুড়াঘাত করিতেও ইহারা কুণ্ঠিত হয়েন নাই। প্রেসিডেন্ট্ প্যাটেল, আইন পাস করিতে এমন রাজবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন যাহাতে ভারতের হিন্দুমুসলমান বুঝিয়াছে ইনি যদি স্বাধীন ভারতের প্রেসিডেন্টের পদ অলঙ্কৃত করিতে পারেন তাহাহইলে আমাদের সৌভাগ্যের সীমা থাকিবে না! অনেক বীরপুরুষ এমন কথাও বলিয়াছিলেন—স্বরাজ লাভ আমাদের এই জন্তই প্রয়োজন হইয়াছে যেহেতু ১৫০ বৎসরের মধ্যে বৃটিশ সরকার এই প্রকার আইন প্রণয়ন করেন নাই। অতএব শাসনদণ্ড কিভাবে চলিবে তাহা ইহারা সুস্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাই বলিতেছি হিন্দুসমাজ যে দুর্ভাগ্যের ফলভোগ করিতেছে তাহার হাতে পরিত্রাণ কিছুতেই পাইবে না, ঐ প্রকৃতির ব্যক্তিগণের অধিক সংখ্যক যে হিন্দুনামে পরিচিত, ইহাও হিন্দুসমাজেরই দুর্ভাগ্যের ফল।

বিশিষ্ট সামাজিকবর্গ যেন কিছুতেই বিচলিত না হয়েন; ধর্ম্ম সমাজ রক্ষার জন্ত দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় এখন বিশেষভাবে প্রয়োজন হইয়াছে, এ কার্য্যে অবসাদ বা উদাসীনতা আসিলে হিন্দুর সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য হইবে। এই আন্দোলনে যুবকদের যে ভাবে উত্তেজিত ও পরিচালিত করা হইতেছে, তাহাতেই বুঝা যাইতেছে, এ আন্দোলন কেবল বৃটিশ-সরকারের বিরুদ্ধে নহে, হিন্দুর ধর্ম্মসমাজের বিরুদ্ধেও। হিন্দুর পবিত্র অন্তঃপুরের বিরুদ্ধেও এ আন্দোলন কার্য্য করিতেছে, অন্তঃপুরিকাগণকে পাপকর্ম্মে প্রবোচিত করিতেছে, শুনা যাইতেছে অনেক ভদ্রমহিলাও নাকি মদের দোকানে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য মাতালগণের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পাপ ও লজ্জা অনুভব করিতেছেন না, হিন্দুপরিবারের ইহা অপেক্ষা অধঃপতন কি হইতে পারে তাহা কল্পনায়ও আইসে না; তাই বলিতেছি, হিন্দু! সাবধান তোমার আত্মরক্ষার শেষ আশাটুকুও বিসর্জ্জন দিও না, সবলহৃদয়ে ধর্ম্মসমাজবিরোধী কার্য্যে বাধাপ্রদান কর।

REGISTERED No. C—675

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়।

অষ্টাদশ বর্ষ। { ১৮৫১ শক, সন ১৩৩৬ সাল, ফাল্গুন। } ষষ্ঠ সংখ্যা।

সন্ধ্যাতাৎপর্য্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(লেখক—শ্রীশরৎকমল ন্যায়স্মৃতিতীর্থ।)

সন্ধ্যায় শক্তি-উপাসনা।

(১)

ত্রিরূপা মাতা গায়ত্রীকে শক্তিরূপেই আহ্বান করা হয়, এবং শক্তিরূপেই ধ্যানকরতঃ জপ করা হয় ইহা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বসন্দর্ভে মার্জ্জন-উপাসনায় জলদেবতায় মাতৃভাবের ভাবনা দ্বারা ফলতঃ শক্তি উপাসনাই করা হয়; ইহারও সুবিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। সন্ধ্যার অন্যান্য মন্ত্রে সর্ব্বশক্তিময়ী গায়ত্রীর ভাবনা আছে কিনা এখন তাহা দেখিব।

(২)

অঘমর্ষণ এবং সূর্য্য-উপস্থান উপাসনায় গায়ত্রীশক্তির কথা।

সূর্য্য-উপস্থানের প্রারম্ভে সকল সাধকই গায়ত্রীমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক তিন অঞ্জলি জলদান

করিয়া সূর্য্যের উপস্থান ক্রিয়া সম্পাদন করেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বৃহদারণ্যক ভাষ্যে উপস্থান শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—

"উপেত্য স্থানম্—নমস্করণম্"

বৃহদারণ্যক উপনিষদের শাঙ্করভাষ্য।৫।১৪।৭।

"উপ" সমীপে "এত্য" গমন করিয়া "স্থানম্"—নমস্কার করা, এই নমস্কার মন্ত্র বৃহদারণ্যক শ্রুতি নিজেই বলিয়াছেন—

"গায়ত্রি! একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী, চতুষ্পদী, অপদসি,
নহি পদ্যসে, নমস্তে তুরীয়ায় দর্শতায় পদায় পরোরজসে"—ইত্যাদি

বৃহদারণ্যক।৫।১৪।৭

উদ্ধৃত মন্ত্রের তাৎপর্য্য এইরূপ—"হে গায়ত্রি! তুমি পূর্ব্বোক্ত ত্রৈলোক্য পাদ দ্বারা এক পদী, ত্রয়ীবিদ্যারূপ দ্বিতীয়পাদ দ্বারা দ্বিপদী, প্রাণাদিরূপ তৃতীয়পাদ দ্বারা ত্রিপদী, এবং রজঃশূন্য চতুর্থপাদ দ্বারা চতুষ্পদী, তুমি এই চারিটি পাদদ্বারা বিশেষিত হইয়া উপাসকগণের নিকটে পরিজ্ঞাত হইয়া থাক। ইহার পর কিন্তু সর্ব্বোপাধিবিবর্জ্জিত স্বীয়রূপে তুমি অপদও বট, অর্থাৎ তোমার পদ, যাহা দ্বারা তোমাকে জানা যাইতে পারে তাহা বর্ত্তমান নাই, কারণ "নেতি নেতি" শ্রুতিগম্যনির্ব্বিশেষ ভাবই তোমার স্বরূপ; অবেদ্য (অবিজ্ঞেয়) বলিয়াই তুমি হইতেছ অপদ। অতএব লোকব্যবহারের বিষয়ীভূত তোমার পরোরজঃ দর্শত পদের উদ্দেশ্যে নমস্কার করিতেছি।"

(বৃহদারণ্যক শাঙ্করভাষ্য ৫।১৪।৭ মন্ত্র দ্রষ্টব্য)

উদ্ধৃত বৃহদারণ্যকশ্রুতিমন্ত্র স্পষ্টতঃ সূর্য্যের উপরেই গায়ত্রী ভাবনা উপদেশ করিয়াছেন কারণ ঐ মন্ত্রের প্রথমেই—"তস্যা উপস্থানম্" ইহা স্পষ্টতঃ আছে; তাঁহার সমীপে যাইয়া "গায়ত্রি!............তে তুরীয়ায় দর্শতায় পরোরজসে পদায় নমঃ বলিয়া নমস্কার করিতেছি, মাতঃ! গায়ত্রি! তোমার এই চতুর্থপদ দর্শনযোগ্য এবং রজঃশূন্য পাপ পরপারে বিরাজিত আদিত্যরূপ পদেই নমস্কার করিতেছি, কারণ শ্রুতি বলিয়া দিতেছেন যে "তুমি (মাতঃ গায়ত্রি) এই "পরোরজঃ" রজঃশূন্য পাপপরপারে বিরাজিত আদিত্যরূপ চতুর্থপদে প্রতিষ্ঠিতা আছ।

"সা এষা গায়ত্রী এতস্মিংস্তুরীয়ে দর্শতে
পদে পরোরজসি প্রতিষ্ঠিতা"

বৃহদারণ্যক।৫।১৪।৪।

সাধক ইহা বিশেষভাবে প্রণিধান করিবেন যে, আদিত্যরূপ চতুর্থপদে সেই এই গায়ত্রী প্রতিষ্ঠিতা আছেন"—এই শ্রুতি বাক্যের সঙ্গে "সেই রবিমণ্ডলমধ্যস্থা-গায়ত্রী" মাতার ত্রিমূর্ত্তির ঐক্য আছে কিনা। গায়ত্রী শক্তিকেই সূর্য্যমণ্ডলে অনুভব করতঃ আমি তাঁহার নিকটে গমন করিয়া "গায়ত্রি! একপদী দ্বিপদী" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা তাঁহাকে নমস্কার করি-

তেছি—ইহাই সূর্য্য উপস্থান উপাসনার তাৎপর্য্য ; শুক্লযজুর্ব্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণান্তর্গত বৃহদা- রণ্যক শ্রুতি

"তস্যা উপস্থানম্"

ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ঐ তাৎপর্য্য স্পষ্টতঃ প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব সন্ধ্যার সূর্য্যো- পস্থানে শক্তিময়ী গায়ত্রীমাতাই সূর্য্যপ্রতীকে উপাসিতা হইয়াছেন জন্য ইহা ফলতঃ শক্তি উপাসনা।

এ বিষয়ে আরও প্রণিধান করা আবশ্যক আমরা দেখিতেছি যে, সূর্য্যোপস্থানের প্রারম্ভে গায়ত্রীমন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক তিনবার জলাঞ্জলি দেওয়া হয়, ঐ জলাঞ্জলিত্রয় দানের মন্ত্র গায়ত্রী কেন ইহা লক্ষ্য করা অতীব আবশ্যক। মন্ত্রের উচ্চারণ মাত্রেই সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যায় না, অর্থ না জানিয়া কেবল উচ্চারণকারীকে শাস্ত্র স্বয়ংই "ভারবাহী" বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। * এই জন্যই মহর্ষি পতঞ্জলি মন্ত্রজপের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অর্থ ভাবনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ১

বেদনিরুক্তকার মন্ত্রদেবতা প্রভৃতির গূঢ় রহস্য প্রকাশক পরম প্রামাণিক মহর্ষি যাস্ক মন্ত্র লক্ষণে বলিয়াছেন যে—

* স স্থাণুবদ্ ভারবাহঃ কিলাস্তে অধীত্য বেদং ন বিবেদ যোঽর্থম্
যোঽর্থবিৎ স ফলং ভদ্রমশ্নুতে, নাকমেতি জ্ঞানবিধূত পাপ্মা ॥

ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব ধৃত বৃহদ্ যমবচন। বেদাধ্যয়ন বেদার্থ জ্ঞানফল কথন প্রকরণ দ্রষ্টব্য। উদ্ধৃত যমবচনের মূলীভূত শ্রুতিটি এই—

স্থাণুরয়ং ভারহারঃ কিলা ভূৎ, অধীত্য বেদং ন বিজানাতি যোঽর্থং। যোঽর্থজ্ঞঃ সকল ভদ্রমশ্নুতে নাকমেতি জ্ঞানবিধূত পাপ্মা ॥ নিরুক্তধৃত শ্রুতি, সায়ণাচার্য্যকৃত ঋগ্বেদীয় ভাষ্যে উপোদ্‌ঘাত প্রকরণেও এইশ্রুতি আছে।

১। "তজ্জপস্তদর্থভাবনম্"। যোগদর্শন। সমাধিপাদ, ২৮ সূত্র।

প্রণবাদি মন্ত্র জপের সঙ্গে তাহার অর্থচিন্তা করা আবশ্যক—ইহাই সূত্রের সারকথা, প্রণব অর্থাৎ ওঁকারের অর্থ পরাপর ব্রহ্ম অর্থাৎ নির্গুণ ও সগুণ ঈশ্বর, নির্গুণ ব্রহ্মের শ্রুতিবর্ণিত সচ্চিদানন্দরূপত্ব নির্ব্বিশেষত্ব প্রভৃতি এবং সগুণ ব্রহ্মের রূপলীলাদি জপকালে ভাবনা করিতে হইবে ইহাই তাৎপর্য্য। এই যোগদর্শনে সাধনপাদের আর একটি সূত্র এই "স্বাধ্যায়াদিষ্ট- দেবতা সম্প্রয়োগঃ"॥ ৪৪ সূত্র।

অভিমত দেবতার মন্ত্র জপের নাম "স্বাধ্যায়" (বৃত্তিকার। যিনি অর্থভাবনাদি পূর্ব্বক স্বাভিমত দেবতার মন্ত্র জপ করেন; দেবতাগণ, ঋষিগণ এবং সিদ্ধগণ তাঁহার প্রত্যক্ষ হয়েন এবং সমস্ত কার্য্যের সহায়ক হয়েন; ভাষ্যকার ব্যাসদেব ঐ সূত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সুতরাং মন্ত্রজপকালে তাহার অর্থভাবনা আবশ্যক।

"মন্ত্রা মননাচ্ছন্দাংসিচ্ছাদনাৎ"। (নিরুক্ত দৈবতকাণ্ড, মন্ত্রলক্ষণ প্রকরণ) "মনন" চিন্তন ধ্যান অর্থক মন ধাতু হইতে মন্ত্র পদ সিদ্ধ হইয়াছে (মন্+ত্র)। যাহা মনন চিন্তা-ধ্যানের সাহায্যকারী তাহাই মন্ত্র, সুতরাং: মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রার্থভাবনা অতীব আবশ্যক ইহাই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের সিদ্ধান্ত।

এখন মূলকথা এই যে, সূর্য্যোপস্থানের প্রারম্ভে যখন মাতা গায়ত্রীর মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়, তখন তাহার অর্থভাবনা সর্ব্বথা আবশ্যক; উক্ত মন্ত্রের অর্থ ভাবনা সহযোগে মাতা গায়ত্রীই যখন সাধক হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন তখন সূর্য্যোপস্থান উপাসনায় গায়ত্রীশক্তি উপাসিতা না হইবেন কেন?

আরও সূক্ষ্মভাবে এই কথা ভাবনা করিলে ইহা আরও স্পষ্ট হইবে—তাহা এই; সূর্য্যোপস্থানের প্রারম্ভে যেমন মাতা গায়ত্রীর কথা আছে, উহার পরেও তেমনি মাতা গায়ত্রীর কথা আছে, কারণ—সূর্য্যোপস্থান কার্য্যের পরেই "আয়াহি বরদে! দেবি! ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা মাতা গায়ত্রীকে আহ্বান করা হয়, আহ্বানের পর ভূরাদিব্যাহৃতি মন্ত্র দ্বারা অঙ্গন্যাস করিতে হয়; অঙ্গন্যাস কার্য্যের পরে ত্রিমূর্ত্তি মাতা গায়ত্রীর ধ্যান করতঃ তাঁহার মন্ত্র জপ করিতে হয়। এখানে উপাসনার এই ক্রমগুলি লক্ষ্য করা অতীব আবশ্যক। ১ম "অঘমর্ষণ" ২য় "সূর্য্যোপস্থান", ৩য় "গায়ত্রীর আহ্বান", ৪র্থ "ভূরাদিমন্ত্রের দ্বারা অঙ্গন্যাস", ৫ম "মাতা গায়ত্রীর ধ্যান", ৬ষ্ঠ "গায়ত্রী মাতার মন্ত্রজপ"। পূর্ব্বকথিত উপাসনাগুলির গূঢ় অভিপ্রায় এইরূপ—"হে বরাভয়দায়িনি! দ্যোতনশীলে! জ্যোতীরূপে! ক্রীড়াময়ি! সর্ব্বার্থসাধিকে! প্রণবরূপিণি! ব্রহ্মবাদিনি! বাগ্‌দেবতে! বেদ প্রসবিনি! বিশ্বজননি! মাতঃ! গায়ত্রি! আমি তোমার ঋত সত্যস্বরূপকে বুঝিয়াছি; যখন মহাপ্রলয়ে এই জগৎ ছিল না, তখন মা! তুমিই ঋত সত্য পরব্রহ্মরূপে একমাত্র বিরাজিতা ছিলে, তোমার এই অবস্থাকে সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ "কৈবল্যরূপা" বলিয়াছেন! ক্ষুদ্র বটবীজে যেমন মহামহীরুহ লুক্কায়িত থাকে তেমনি মা! এই সুবিশাল বিচিত্র বিশ্বসংস্থান কেবলরূপা তোমার ক্রোড়েই নিদ্রিত ছিল, বেদ ইহাকেই তোমার স্ব-রূপ লক্ষণ বলিয়াছেন। আবার যখন তুমি লীলাময়ী হইয়া সৃষ্টি বিষয়ে উন্মুখা হইলে তখন মা! তোমার ইচ্ছাতেই তোমা হইতে অহোরাত্র সম্বৎসর প্রভৃতি খণ্ড বৃহৎ কাল, কালের ধ্বজভূত ঐ চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ প্রভৃতি নিখিল ভুবন বিরাজিত হইল; আবার যখনই তোমার ইচ্ছা হইবে, মা পরমেশ্বরি! তখনই তোমার ব্যাদিতবদনে প্রলয় বিষাণ ধ্বনিত হইবে! সে প্রলয় রুদ্র তানে আবিষ্ট হইয়া মা রুদ্রাণি। সকলেই আবার তোমার কোলে ঘুমাইবে; অনাদিনিধনভূতে সনাতনি! মাতঃ! এইভাবে প্রতিকল্পে এই নিখিল জগৎ গন্ধর্ব্ব নগরাকারে তোমাতেই ভাসিতেছে, থাকিতেছে ও মিশিতেছে বলিয়া তুমি সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় লীলাময়ীও বটে, বেদ তোমার এই লীলা স্বভাবকে "তটস্থ লক্ষণ" বলিয়াছেন। মা! এইভাবে বিশ্বরহস্য এই বিচিত্র যবনিকা উত্তোলন করিয়া যে তোমাকে দেখিতে পারে, তাহার

"অঘমর্ষণ" হইয়া যায়, অর্থাৎ তাহার আর পাপ থাকে না, সেই জন্য এই উপাসনা কার্য্যের নাম "অঘমর্ষণ"। ঋষি তোমাকে পূর্ব্বোক্তভাবে দেখিয়াছেন বলিয়াই বিধৌতপাপপঙ্ক হইয়া "অঘমর্ষণ" এই সার্থক নাম গ্রহণ করিয়াছেন, এবং সাধককে ঐ অঘমর্ষণ মন্ত্র দান করিয়াছেন, তাই আজ আমিও সেই করুণাময় অঘমর্ষণ ঋষিকে স্মরণ করতঃ তাঁহারই প্রদর্শিত পথে তোমারই মহামায়াপটসমাচ্ছন্ন বিচিত্র বিশ্বরহস্য-যবনিকা উত্তোলনপূর্ব্বক তাহারই অন্তরালে তোমাকে "কৈবল্যস্বরূপে এবং সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় লীলাময়ী"রূপে দেখিতেছি, আর কি আমার পাপ থাকিতে পারে? আমার আজ অঘমর্ষণ হইয়া গিয়াছে। * তাই

* "স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত"। তৈত্তিরিয়ারণ্যকম্। ৮।৬।

"তপশ্চাত্র স্রষ্টব্য পর্য্যালোচন লক্ষণম্"। সায়ণাচার্য্য কৃত ভাষ্যব্যাখ্যা।

"যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ। অথর্ব্ববেদীয়মুণ্ডকোপনিষৎ। ১।১।৯।

"তপসা" জ্ঞানেন অব্যাকৃতং নামরূপ বিষয়েণ·· ··যথাকুবিন্দাদিরব্যাকৃতং পটাদি বুদ্ধাবালিখ্য চিকীর্ষতি। ১।১।৪ বেদান্ত দর্শনসূত্রের ভামতী টীকা।

"তদ্ভূতাপি সৃষ্টিস্থিত্যুৎপত্তিপ্রলয়ং তথা।
সূক্তেঽস্মিন্ ব্যাহৃত মেতত্তু তত্ত্বমাত্রার্থ মেব বৈ॥"

ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্বধৃত যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বচন। অঘমর্ষণসূক্ত ব্যাখ্যা প্রকরণ।

"ঋতঞ্চ সত্যঞ্চেতি পরব্রহ্ম উচ্যতে। তথাচ শ্রুতিঃ—ঋতমেবাক্ষরং ব্রহ্ম সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেতি, এতেন মহাপ্রলয়াবস্থা প্রতিপাদিতা। মহাপ্রলয় সময়ে কেবলং পরং ব্রহ্মমাত্রমাসীদিত্যর্থঃ। রাত্রিশ্চ সমুৎপন্না সকলমন্ধকারময় মাসীদিত্যর্থঃ। তথাচ স্মৃতিঃ আসীদিদং তমোভূত মপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্ (মনুঃ)·· ··সৃষ্ট্যারম্ভে তপসঃ অদৃষ্টবলাৎ সমুদ্র····· অজায়ত প্রথমতঃ সকল সংসার সৃষ্টি নিমিত্ত জলরাশিরুৎপন্ন ইত্যর্থঃ। তথাচ স্মৃতিঃ—অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজ মবাসৃজদিতি (মনুঃ)·····চরাচরাত্মক সকল লোকালোক স এব ধাতা যথাপূর্ব্বং যথাক্রমং সৃষ্টবানিত্যর্থঃ অত্র স্বঃ শব্দেন নক্ষত্রলোকোপরিস্থিত স্বর্গলোক উচ্যতে। দিবশব্দেন তু তদূর্দ্ধস্থমহর্লোকাদিলোকচতুষ্টয়ম্। তদিত্থ মনেন মন্ত্রেণ সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়াঃ" প্রতিপাদিতাঃ। (ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বকারহলায়ুধকৃত অঘমর্ষণ মন্ত্র ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

যদ্বা···অভিতঃ প্রকাশমানাৎ পরমাত্মনঃ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাজায়ত·····উদকেন যুক্তঃ সমুদ্রশ্চাজায়ত··সমুদ্রাদূর্দ্ধং··সম্বৎসরোপলক্ষিতঃ সর্ব্বকালোঽজায়ত—শ্রূয়তেহি "সর্ব্বেনিমেষা জজ্ঞিরে বিদ্যুতং পুরুষাদধি কলা মুহূর্ত্তাঃ, কাষ্ঠাশ্চ" (তৈত্তিরীয়সংহিতা। ১০।১।২)···ধাতা বিশ্বস্য সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য বশী স্বামী ভূত্বা বর্ত্ততে।···তদেতৎসর্ব্বং বিধাতা···পূর্ব্বস্মিন্কল্পে যথা সৃষ্টবান্ তথৈব আগামিন্যপি কল্পে কল্পয়িষ্যতি ইত্যর্থঃ।

ঋগ্বেদসংহিতার সায়ণভাষ্য দ্রষ্টব্য। ৮। ৮। ৪৮

"যথা পূর্ব্বস্মিন্কল্পে সূর্য্যা চন্দ্রমঃ প্রভৃতি জগৎক্লৃপ্তম্ তথাঽস্মিন্নপিকল্পে পরমেশ্বরোঽকল্পয়দিত্যর্থঃ।
(বেদান্ত দর্শন। ১।৩।৩০ সূত্রের শাঙ্করভাষ্য ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

মা! তুমি অসিতা হইয়াও অতসীবরণা সীতা সাজিয়া বিশ্বসন্তানকে শিক্ষা দিবার জন্য আমার পিতাকে যে কথা বলিয়াছিলেন—

"নয় মাং বীর! বিস্রব্ধঃ
পাপং ময়ি ন বিদ্যতে"।

বাল্মীকি রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড

আমি তেমনি সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি যে, তুমি আমাকে তোমার সঙ্গে লও, তুমি আমাকে গ্রহণ কর, কারণ "পাপং ময়ি ন বিদ্যতে" কেন আমাকে গ্রহণ করিবে না! আমাতে ত পাপ নাই, আমার আজ অঘমর্ষণ হইয়া গিয়াছে। আর কি আমার (অঘ) পাপ থাকিতে পারে? নিত্যশুদ্ধা তোমাকে দেখিলে অঘমর্ষণ হইয়া যাইবেই। আজ আমি (অঘ পাপ মর্ষণ করিয়া) ময়লামাটি ধুইয়া তোমারই মত নির্ম্মল জ্যোতির্ম্ময় হইয়া নিখিল তেজোরশ্মির আকর পাপ পরপারে উদিত, জ্বালামালা সমাকুল, সকল আশ্চর্য্য দৃশ্যসার মূর্ত্তি, মিত্র বরুণ অগ্নি প্রভৃতি দেবতা এবং সকল ভুবনের প্রকাশক, স্বর্গ অন্তরীক্ষ পৃথিবী পরিপূরিত তেজোরাশি * "সূর্য্যপ্রতীক তোমারই নিকটে উপস্থিত হইয়াছি, আহা—ইহাই আমার অঘমর্ষণপূর্ব্বক সূর্য্যোপস্থান! এইভাবে প্রক্ষালিতনিখিল মলপঙ্ক তোমার পাদমূলে উপস্থিত, আমি বুঝিতেছি যে "তুমিই সূর্য্যরূপে স্থাবরজঙ্গমাত্মক নিখিল সংসার আত্মা"। ১ আহা

স্মৃতিরপি "ঋষীণাং নামধেয়ানি যাশ্চ বেদেষু দৃষ্টয়ঃ। শর্ব্বর্য্যন্তে প্রসূতানাং তান্যেবৈভ্যো দদাত্যজঃ যথর্ত্তুষ্বৃতুলিঙ্গানি নামরূপাণি পর্য্যয়ে। দৃশ্যন্তে তানি তান্যেব তথাভাবা যুগাদিষু। যথাভিমানিনোঽতীতা স্তুল্যাস্তে সাম্প্রতৈরিহ। দেবা দেবৈরতীতৈর্হিরূপৈ র্নামভিরেবচ॥"

(বেদান্তদর্শন।১।৩।৩০ সূত্রের শাঙ্করভাষ্যধৃত স্মৃতি বচন দ্রষ্টব্য)

আমরা সুধী সাধকবৃন্দের ভাবনার সুবিধার জন্য নানাস্থান হইতে অঘমর্ষণ সূক্ত ব্যাখ্যা সঙ্কলিত করিলাম। এই সবশাস্ত্রের "সম্যক্ আলোচনা স্থানাভাবে করা হইল না। মূল এবং সারকথা এই যে, মাতা গায়ত্রীকে যেমন সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় শক্তিরূপে ভাবনা করা হয়, এই অঘমর্ষণমন্ত্রেও ফলতঃ সেইরূপ ভাবনা উপদিষ্ট হইয়াছে জন্য ইহাও পরমেশ্বরের সৃষ্টি স্থিতিপ্রলয় শক্তিরই উপাসনা। গায়ত্রীই সন্ধ্যাসার সুতরাং সন্ধ্যাসার, সমগ্র কার্য্যেই মাতা গায়ত্রীই নানাভাবে উপাসিতা হইয়াছেন, ইহা পরে ব্যক্ত হইবে।

* "লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং ভাসঃ স্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো"! গীতা।১১।৩০।

"হে বিষ্ণো! ব্যাপনশীল! 'লেলিহ্যসে' আস্বাদয়সি। 'গ্রসমানঃ' অন্তঃ প্রবেশয়ন'। 'শঙ্করাচার্য্যঃ'। 'যস্মাৎ ত্বং ভাসিজ্বলনাপূরয়সি তস্মাত্তব ভাসো দীপ্তয়ঃ প্রতপন্তি'। মধুসূদন স্বরস্বতী। উদ্ধৃত গীতার শ্লোকের সঙ্গে সূর্য্যোপস্থান মন্ত্রার্থভাবনা করিলে সাধক আনন্দ পাইবেন।

১। 'স্থাবরজঙ্গমাত্মক সকল সংসারস্যাত্মৈব সূর্য্য ইত্যর্থ'। হলায়ুধঃ।

তুমিই একদিন লীলায় ভক্তরথসারথি সাজিয়া, ভক্তকে ডাকিয়া এই সত্যই প্রকাশ করিয়াছিলে—

"অহমাত্মা গুড়াকেশ! সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ।
আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্॥" গীতা ১০।২০।২১

অহো! সূর্য্যরূপ তুমিই যখন সর্ব্বভূতের আত্মা, তখন সর্ব্বভূতান্তর্গত আমার আত্মাও বটে! এখানে আর তোমাতে আমাতে ভেদ নাই; "আমি" "তুমি" হইয়া গিয়াছি, "তুমি," "আমি" হইয়া গিয়াছ! আজ বিন্দু মহাসিন্ধুতে মিশিয়া স্বীয় অস্তিত্ব বিসর্জ্জন দিয়াছে! চিরপিপাসিত চাতক মেঘবারি সাগরে ডুবিয়াছে! শুভ্রকান্তি জ্যোৎস্নাসুন্দরী বিশ্ব হইতে অঙ্গ গুটাইয়া বিশ্বজীবন ওষধিপ্রাণ প্রেমতরল সুধাকরে মিশিয়াছে! ২

আহা অদ্বৈত সমাধিভঙ্গে এ আবার আমি কি দেখিতেছি! তুমি নিখিল বিশ্বকে স্ব অঙ্গচ্ছটায় মিশাইয়া লইয়া আমার মস্তকোপরি দেদীপ্যমান রহিয়াছ! তোমার সুলোহিত অঙ্গরাগে আমার প্রতি রোমকূপ হইতে পদ্মরাগচ্ছটা ঝলসিয়া পড়িতেছে! আহা আমি এইভাবে কণ্টকিত রক্তরাগরঞ্জিতদেহে ঊর্দ্ধ যুগলপাণি পুটাঞ্জলি হইয়া বিস্ফারিত অপলকনেত্রে তোমাকে দেখিতেছি, এবং বুঝিতেছি যে—"তুমি বিশ্বের চক্ষু স্বরূপ এবং সকল দেবতাগণের সম্যক ঈপ্সিত চেষ্টা শক্তি স্বরূপ, তুমি "শুক্র" শুক্র নির্ম্মল ব্রহ্মস্বরূপ, তুমি আজ দয়া করিয়া

'ঈদৃগভূতমণ্ডলান্তর্ব্বর্ত্তী সূর্য্যঃ অন্তর্য্যামিতয়া সর্ব্বস্য প্রেরক পরমাত্মা, 'জগত' জঙ্গমস্য, 'তস্থুষঃ' স্থাবরস্য চ, 'আত্মা' স্বরূপভূতঃ। স হি সর্ব্বস্য…কার্য্যস্য কারণম্। কারণাচ্চ কার্য্যং নাতিরিচ্যতে—তথাচ পারমর্ষং সূত্রং 'তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্য ইতি॥ সায়ণাচার্য্যকৃত ভাষ্যব্যাখ্যা।

২। বিশ্বরূপং হরিণং জাতবেদসং, পরায়ণং জ্যোতিরেকং তপন্তম্।
সহস্ররশ্মিঃ শতধা বর্ত্তমানঃ প্রাণঃ প্রজানামুদয়ত্যেষ সূর্য্যঃ॥'
অথর্ব্ববেদীয় প্রশ্নোপনিষৎ। ১।৮

"স যথাইমানদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে এব মেবাস্য পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শকলাঃ পুরুষায়ণাঃ, পুরুষং প্রাপ্য অস্তং গচ্ছন্তি, ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে, স এষোঽকালোঽমৃতো ভবতি।" প্রশ্নোপনিষৎ। ৬।৫ উদ্ধৃত হলায়ুধের ব্যাখ্যা, সায়ণাচার্য্যের ভাষ্য এবং প্রশ্নোপনিষদের মন্ত্রদ্বয়ের অর্থচিন্তা করিলে সূর্য্যোপস্থানমন্ত্রার্থ ভাল বুঝা যাইবে। সাধক এই সব শাস্ত্রার্থের সঙ্গে সূর্য্যোপস্থানের মন্ত্রার্থ মিলাইয়া ভাবনা করিলে প্রকৃত রহস্য বিশদ হইবে। ইঙ্গিতমাত্র প্রদর্শিত হইল, সবকথার বিস্তৃত আলোচনা বিস্তৃতি ভয়ে করা গেল না, সুধী পাঠক ঐ সব মিলাইয়া দেখিবেন।

এই পূর্ব্বদিকে "সূর্য্যপ্রতীক"-রূপে উদিত হইয়াছ! আহা তোমাকে দেখিয়া আজ আমি মনে প্রাণে ভরপুর হইয়া গিয়াছি! তাই আমি প্রার্থনা করিতেছি "আমি যেন এইভাবে তোমাকে দেখিয়া দেখিয়া শত শত বর্ষ বাঁচিয়া থাকিতে পারি, চিরদিন যেন অস্খলিত বাক্-ইন্দ্রিয় দ্বারা তোমারই কথা বলিতে পারি, সর্ব্বদা যেন উৎকর্ণ হইয়া তোমারই কথা শুনিতে পারি, আহা 'ভূমা'-স্বরূপ—চিরমহান্ তোমাকে আদরে হৃদয়ে ধরিয়া আমি যেন তোমারই মত চিরদিন মহান্ হইয়া থাকি, কোনদিন কাহারও নিকট কোনরূপ দীনতা প্রকাশ না করি।*

মাতর্গায়ত্রি! তুমি এক সময়ে অম্ভৃণ ঋষির বাক্ নাম্নী দুলালী কন্যা সাজিয়া বলিয়াছিলে—দেখ—

"অহমাদিত্যৈশ্চরামি।"

"আমিই আদিত্য দেবতারূপে বিচরণ করি" তাই তুমি "বিশ্বের দর্শনের জন্য "সূর্য্য"রূপে, আদিত্যরূপে নিখিল ভুবনধামে করুণা কিরণ ছড়াইয়া প্রোজ্জ্বল-পরিবেশমণ্ডল-মণ্ডিত-মূর্ত্তি 'হংস' হইয়াছ। ঋষি বামদেব জগতীছন্দোযুক্ত শ্রৌত মন্ত্র দ্বারা তোমার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন তুমি 'হংস' অধ্বানং হন্তি গচ্ছতীতি 'হংস' আদিত্যঃ—অর্থাৎ তুমি পথগমনশীল আদিত্য দেবতা। তুমি পবিত্র অগ্নিমণ্ডলে ভ্রমণ কর বলিয়া তোমার নাম 'শুচিসৎ', অর্থাৎ শুচি অগ্নি প্রভৃতি জ্যোতিঃ পদার্থে তুমি বাস কর জন্য তাঁহারা জ্যোতির্ম্ময়। তুমি তেজঃস্বরূপ পদার্থ

---

* তুমি বিশ্বের চক্ষুস্বরূপ, তুমি সকল দেবতাগণের ঈহিত চেষ্টা অর্থাৎ শক্তিস্বরূপ—এই সকল কথা যে মন্ত্রে আছে, ঐ মন্ত্র কেবল যজুর্ব্বেদীয় সূর্য্যোপস্থানে দৃষ্ট হয়। ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্বকার পূজ্যপাদ হলায়ুধ প্রকাশিত ব্যাখ্যায় তাৎপর্য্য এখানে প্রদত্ত হইল। মূল প্রবন্ধে কোনমন্ত্রেরই ঠিক অনুবাদ করা হয় নাই, প্রকৃত রহস্য বুঝাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছি। সামবেদীয় সন্ধ্যায় দুইটী মন্ত্র সূর্য্যোপস্থানে দৃষ্ট হয়, যজুর্ব্বেদীয় সন্ধ্যায় তিনটি মন্ত্র আছে। ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যায় বহু মন্ত্র আছে। সকলবেদীয় সন্ধ্যায় সকল কথা বলা স্পষ্ট না হইলেও মূল তাৎপর্য্য ফলতঃ বলা হইয়াছে ইহা সুধীগণ প্রণিধান করিলেই বুঝিতে পারিবেন। পরমেশ্বরের নানারূপ লীলার অন্ত নাই, সন্ধ্যায় সেই নানারূপ লীলার নানাভাবে আস্বাদনের সুযোগ দেখান হইয়াছে। তাহার মধ্যে শক্তিভাবই প্রধান, এইজন্য বেদে গায়ত্রীকেই সন্ধ্যার সারভূতা বেদমাতা বলা হইয়াছে, সেই মায়ের কথাই সন্ধ্যাপ্রোক্ত নানা মন্ত্র সাহায্যে বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি। অঘমর্ষণ এবং সূর্য্যোপস্থান উপাসনা শক্তিভাব-দ্যোতক কিরূপে হয় তাহা মূল প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। অঘমর্ষণে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় শক্তি-ভাবনা সুব্যক্ত; মাতা গায়ত্রীও সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় শক্তিরূপা ইহা লক্ষ্য করা আবশ্যক। "তস্যা উপস্থানম্ গায়ত্রি! একপদী" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণ প্রণিধানের যোগ্য; সুতরাং ইহা শক্তিভাব প্রধান সন্দেহ নাই॥

বলিয়া তোমার নাম 'বসু' ব্রহ্মতেজই জগতের আকাঙ্ক্ষণীয় বসু রত্ন-স্বরূপ, এই জন্যই তোমাকে 'বিষ্ণুতেজসে' বলিয়া লোকে অর্ঘ্যদান করে। তুমি অন্তরিক্ষচারী বলিয়া তোমার নাম 'অন্তরিক্ষসৎ'। তুমি যজ্ঞহোতৃমণ্ডলরূপে দেবতাগণের আহ্বান কর বলিয়া তোমার নাম 'হোতা' তুমি যজ্ঞবেদিতে অধ্বর্য্যুরূপে (যজুর্ব্বেদীয় যাজ্ঞিকরূপে) বিরাজমান বলিয়া তোমার নাম 'বেদিষৎ'। তুমি অতিথির মত কখনও একস্থানে স্থায়ী হও না, অর্থাৎ সর্ব্বদাই ভ্রমণশীল বলিয়া বেদ তোমার 'অতিথি' এই নাম দিয়াছেন। তুমি 'দুরোহে' অর্থাৎ গৃহে গৃহে গৃহস্থরূপে বাস কর জন্য বেদমন্ত্র তোমাকে 'দুরোণসৎ' বলিয়াছেন। তুমি জীবাত্মরূপে প্রতি মনুষ্যদেহে অবস্থিত বলিয়া তোমার নাম 'নৃষৎ'। তুমি বর-উৎকৃষ্ট স্বর্গাদিস্থানে দেবতারূপে বিরাজিত জন্য বেদমন্ত্র তোমাকে 'বরসৎ' বলিতেছেন। তুমি 'ঋতে' অর্থাৎ সত্যে পরমার্থরূপে বিরাজিত আছ, তাই তোমার নাম 'ঋতসৎ'। তুমি ঐ অনন্ত ব্যোমপথে জ্যোতির্মণ্ডলরূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছ জন্য বেদ তোমাকে 'বেদসৎ' বলিয়াছেন। তুমি জল অগ্নিরূপে (১) পৃথিবীতে জরায়ুজ অণ্ডজ-স্বেদজ উদ্ভিজ্জাদি চতুর্ব্বিধ প্রাণিরূপে (২) সত্যে ত্রয়ীবিদ্যারূপে (৩) পাষাণময় পর্ব্বতাদি দেশে ফুলিঙ্গাদিরূপে (৪) জন্মগ্রহণ কর বলিয়া, বেদমন্ত্র যথাক্রমে তোমার 'অব্জ' (১) 'গোজ' (২) 'ঋতজ' (৩) 'অদ্রিজ' (৪) এই চারিটি নাম দিয়াছেন। তুমি 'ঋত' অর্থাৎ সত্য 'অণোরণীয়ান্'! তুমি 'বৃহৎ' অনবচ্ছিন্নপরিমাণ সর্ব্বব্যাপী পদার্থ 'মহতো মহীয়ান্' * ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব হলায়ুধকৃত ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

অঘমর্ষণ উপাসনা ও সূর্য্যোপস্থান উপাসনার মন্ত্রসমূহের পূর্ব্বোক্তভাবে অর্থচিন্তা করিলে সাধক উহার মধ্যে সাধনার বহু ইঙ্গিত বুঝিতে পারিবেন। ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বকার হলায়ুধ এবং গুণবিষ্ণু প্রভৃতি ব্যাখ্যাতৃগণ অঘমর্ষণ মন্ত্রের ঋতসত্যশব্দে পরব্রহ্ম বলিয়াছেন, সুতরাং এ মতে গায়ত্রীই নির্গুণা কেবল ব্রহ্মরূপা। পরে তিনিই সৃষ্টি উন্মুখ হইয়া চরাচর সকল বস্তুই পূর্ব্ব পূর্ব্বকল্পানুসারে সৃষ্টি করিলেন, সুতরাং এখানে মাতা গায়ত্রী সগুণা ব্রহ্মবিষ্ণু

---

* ব্যাখ্যাত মন্ত্র 'হংসবৎ'' নামে প্রখ্যাত। এই মন্ত্র সূর্য্যের অর্ঘ্যদানে এবং তাঁহার উপস্থানে প্রযুক্ত হয়—এ বিষয়ে প্রমাণ এই—"ততোহর্ঘ্যং ভানবে দদ্যাৎ… …..শুচিহংসঃ স দিত্বা চ" ।১ "হংসঃ শুচিষদিতি… .. ..আদিত্যস্যোপতিষ্ঠেৎ" ।২ ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বধৃত নরসিংহপুরাণ (১) এবং হারীত (২) বচন। এই হংসবৎ শক্তিভাবেও ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। "পরমহংস" শব্দার্থ এবং "সোহহং"শব্দার্থেরও মূল এই হংসবৎ ইহাও সাধক-সম্প্রদায় পরিজ্ঞাত সিদ্ধান্ত। এই হংসবৎকে লক্ষ্য করিয়াই তেজস্বী শক্তিসাধকের মুখে "কালীপদ্মবনে হংস সনে হংসীরূপে করে রমণ" এই সঙ্গীত ফুটিয়াছে। এই হংস মধ্যেই মাতা গায়ত্রী ধ্যাত হয়েন এবং "আয়াহি" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা ঐ উপস্থানের পরেই আহূতা হইয়া থাকেন—ইহা লক্ষ্য করা আবশ্যক।

শিব শক্তিরূপা। আদিভূতা সনাতনী পরমেশ্বরী মাতার এই সৃষ্ট্যাদি লীলা অনাদিকাল হইতে চলিতেছে। ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষৎ শাস্ত্র জীবের দৈনিক জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তিরূপ অবস্থা বর্ণনমুখে এই সৃষ্ট্যাদি লীলারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যে সাধক এই ভাবে সৃষ্ট্যাদিকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারেন তাঁহার অঘমর্ষণ হইয়া যায়, অঘমর্ষণ না হইলে তাঁহার কাছে উপস্থিত হওয়া যায় না, এই জন্য পূর্ব্বোক্তভাবে অঘমর্ষণ করতঃ নিষ্পাপ হইয়া "তস্য উপস্থানম্" করিতেছি, "সা এষা গায়ত্রী ...... এতস্মিন্ পদে প্রতিষ্ঠিতা"—সেই এই গায়ত্রী মাতা সূর্য্যমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিতা বলিয়া, তাঁহারই নাম গায়ত্রীমন্ত্র দ্বারা জলাঞ্জলি দানপূর্ব্বক "সূর্য্যোপস্থান" করিতেছি। এই সূর্য্যোপস্থান-উপাসনায় তাঁহাকে কতরূপেই দেখিতেছি। তিনি "জাত"—অর্থাৎ প্রাণিসমূহের ধর্ম্মাধর্ম্মাদিনিয়ন্তৃরূপ, তিনি প্রাণিগণের বলরূপ, তিনি দীপ্যমান্ জ্ঞানদানস্বভাব! আরও কত কি! তাহার ইঙ্গিত পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আমি অঘমর্ষণপূর্ব্বক ইহারই কাছে উপস্থিত হইয়াছি, এবং ঐ সূর্য্যমণ্ডলান্তর্গত ভর্গঃ স্বরূপিণীকে পূর্ব্বোক্তভাবে প্রত্যক্ষ করিয়া ডাকিতেছি—

আয়াহি বরদে! দেবি!
ত্র্যক্ষরে! ব্রহ্মবাদিনি!
গায়ত্রি! ছন্দসাং মাতঃ।

ঐ ভাবে ডাকিয়া ভক্তিভাবে তাঁহারই চরণে প্রণত হইতেছি—

"ব্রহ্মযোনি নমস্তুতে"।

একই শক্তিপ্রভাবে কল্পে কল্পে উচ্চাবচ এই বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কার্য্য চলিতেছে, পরন্তু সেই শক্তি কেবলমাত্র বটে ইহাই অঘমর্ষণ মন্ত্রার্থের সার কথা, গায়ত্রী সাধনাতেও ইনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী হইয়াও আবার বিশ্বরূপিণী ভর্গঃ স্বরূপা, সুতরাং যাঁহাকে ভাবনাকরতঃ অঘমর্ষণ করিতেছি তাঁহাকেই ধ্যানপূর্ব্বক জপ করিতেছি। সূর্য্যোপস্থান মন্ত্রসমূহদ্বারা যাঁহাকে জ্যোতিরূপে, জগৎপ্রকাশরূপে, নিখিল জগতের আত্মরূপে, সমস্ত দেবতাগণের চক্ষুরূপে, ত্রয়ীবিদ্যারূপে ভাবনা করিয়াছি, গায়ত্রী আহ্বান, ধ্যান, জপাদিকার্য্যেও তাঁহাকেই পূর্ব্বোক্ত স্পষ্টরূপেই ভাবিতেছি সুতরাং গায়ত্রীশক্তিই ফলতঃ অঘমর্ষণ এবং সূর্য্যোপস্থান উপাসনায় ভাবিতা হইতেছেন।

অঘমর্ষণের পরে উপস্থান, এই দুইটি কার্য্যই শক্তিরূপা গায়ত্রীর উপাসনা কি ভাবে তাহা একরূপ বুঝিলাম, ইহার পরেই গায়ত্রী আহ্বান, ইহা সাক্ষাৎ শক্তিভাবদ্যোতক ('আয়াহি বরদে ইত্যাদি মন্ত্রার্থ স্মরণীয়), ঐ মন্ত্রদ্বারা গায়ত্রীশক্তিকে আহ্বানপূর্ব্বক ব্যাহৃতি মন্ত্রদ্বারা তাঁহাকে অঙ্গে ন্যস্ত করিতে হইবে ইহাই অঙ্গন্যাসের তাৎপর্য্য, যাঁহারা ভাবনা দ্বারা আমার অঘমর্ষণ হইয়াছে, নিষ্পাপ হইয়া আমি যাঁহার চরণতলে উপস্থান করিয়াছি যাঁহাকে 'বরদা' ইত্যাদি নামে ডাকিয়াছি, এখন 'ভূঃ' প্রভৃতি ব্যাহৃতিরূপ তাঁহারই নামদ্বারা * তাঁহাকে

* ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার স্বকৃত গায়ত্রী ভাষ্যে ভূঃ প্রভৃতি সপ্তটি ব্যাহৃতি মন্ত্রকে

প্রত্যক্ষ করতঃ আমার হৃদয়, মস্তক, কণ্ঠ, বাহু, করাঙ্গুলি প্রভৃতি নানা অঙ্গে সেইশক্তিকেই ন্যস্ত দেখিতেছি বলিয়াই আমার অঙ্গাদিন্যাস হইয়া গিয়াছে, আমি পূর্ব্বোক্তভাবে গায়ত্রী মাতাকে সমস্ত অঙ্গে ন্যস্ত প্রত্যক্ষ করিয়া, তাঁহাকেই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণী ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবশক্তিরূপে ধ্যান করিতেছি, আমি পূর্ব্বোক্তভাবে যাঁহাকে ধ্যানচক্ষে দেখিতেছি, তাঁহাকেই আবার আকাশে ভূরাদি সমগ্রবিশ্বরূপিণী অথবা কেবল জ্যোতীরূপা বলিয়া বুঝিতেছি, ইহাই আমার অঘমর্ষণ হইতে গায়ত্রীজপ পর্য্যন্ত উপাসনার ভাবনা ক্রম বিকাশ।

শঙ্করাচার্য্য অতিশয় স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছেন সপ্তব্যাহৃতি মন্ত্রও ব্রহ্মবোধক, সুতরাং সাতটি ব্যাহৃতি মন্ত্র "তারকং ব্রহ্ম নাম'—ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। গায়ত্রী আহ্বান মন্ত্রে মাতা গায়ত্রীকে "ব্রহ্ম"ও বলা হইয়াছে, "যোনি"—অর্থাৎ জগৎ কারণরূপা জগজ্জননীও বলা হইয়াছে, আবার "ব্রহ্মবাদিনী"ও বলা হইয়াছে; জপের মন্ত্রে গায়ত্রীকে জগদ্ধাত্রীও বলা হইয়াছে, আবার ভর্গঃ-তেজঃ স্বরূপাও বলা হইয়াছে। এই সব ভাবের সঙ্গে শঙ্করাচার্য্য প্রকাশিত ভাবের যথেষ্ট ঐক্য আছে। শঙ্করাচার্য্য ব্যাহৃতি মন্ত্রসমূহের যে সব ব্যুৎপত্তি দেখাইয়াছেন ঐরূপ প্রণালী বেদনিরুক্তসম্মত ইহাও সুধীগণ প্রণিধান করিয়া দেখিবেন।

অঘমর্ষণ হইতে গায়ত্রী জপ পর্য্যন্ত সাধনার ক্রম গুলি বুঝা হইল, ঐ ক্রমে শক্তি

পরব্রহ্মবাচক শব্দরূপেই বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার সে ব্যাখ্যার সার এই যে 'ভূ'শব্দের অর্থ সৎস্বরূপ। ১ ভুব পদের অর্থ চৈতন্যরূপ। ২ স্বঃ পদের অর্থ সকলের বরণীয়বস্তু সুখস্বরূপ। ৩ মহঃ শব্দের অর্থ সর্ব্বাতিশায়ী। ৪ জনঃ পদের অর্থ সকলের কারণ। ৫ তপঃ পদের অর্থ সর্ব্বতেজোরূপ। ৬ সত্য শব্দের অর্থ সর্ব্ববাধা রহিত। ৭ তাৎপর্য্য এই যে, যিনি সৎস্বরূপা যিনি সর্ব্বপ্রকাশিকা চৈতন্যরূপিণী, যিনি সকলেরই প্রার্থনীয় সুখরূপা যিনি সকলের পূজনীয়া বলিয়া সর্ব্বাতিশায়িনী যিনি সকলের জননী বলিয়া কারণরূপিণী, যিনি সর্ব্বতেজোরূপা এবং সর্ব্ববাধারহিত সত্য স্বরূপা তাঁহার ঐ পূর্ব্বকথিতনামাবলী আমি অঙ্গে জড়াইয়াছি ইহাই আমার অঙ্গাদিন্যাস, ঐ নামাবলী হৃদয়াদি অঙ্গে ন্যস্ত থাকিলে সে 'ব্রহ্ম নির্ভয়ম্' হইবেই। শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য পঙক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

সপ্তব্যাহৃতীনাময় মর্থঃ-ভূরিতি সন্মাত্র মুচ্যতে।১ "ভুব"-ইতি সর্ব্বং ভাবয়তি প্রকাশয়তীতি ব্যুৎপত্ত্যা চিদ্রূপ মুচ্যতে।২ সুব্রিয়ত ইতি ব্যুৎপত্ত্যা "স্ব"—রিতি সুষ্ঠু "সর্ব্বৈর্ব্রিয়মাণ সুখ স্বরূপ মুচ্যতে।৩ "মহ" ইতি মহীয়তে পূজ্যত ইতি ব্যুৎপত্ত্যা সর্ব্বাতিশয়িত্ব মুচ্যতে।৪ "জন" ইতি জনয়তীতি জনঃ সকল কারণত্ব মুচ্যতে। ৫ "তপ" ইতি সর্ব্বতেজো-রূপত্বম্। ৬ সত্যমিতি সর্ব্ববাধারাহিত্যম্। ৭ ……………ব্যাহৃতয়োঽপি সর্ব্বাত্মক-ব্রহ্মবোধিকাঃ" ॥ শঙ্করাচার্য্যকৃত গায়ত্রীভাষ্য দ্রষ্টব্য।

উপাসনা সুব্যক্ত, কারণ অঘমর্ষণে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় শক্তিরই ভাবনা করা হয়, মাতা গায়ত্রীও সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় শক্তিরূপে ত্রিরূপা! শ্রুতি বলিতেছেন সূর্য্যোপস্থানও

"তস্যা উপস্থানম্"

পূর্ব্বোক্ত বৃহদারণ্যক শ্রুতি ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

সেই গায়ত্রী সমীপে গমন করতঃ তাঁহাকে নমস্কার (শঙ্করাচার্য্যকৃত পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) কারণ "সা এষা গায়ত্রী ... ... এতস্মিন্ পদে (সূর্য্যমণ্ডলে) প্রতিষ্ঠিতা"। (পূর্ব্ব লিখিত বৃহদারণ্যক শ্রুতি) এই ভাবে উপস্থান করতঃ আয়াহি বরদে।" ইত্যাদি মন্ত্রে গায়ত্রী মাতাকে আহ্বান' পরে ভূঃ প্রভৃতি তাঁহারই নাম উচ্চারণ করতঃ তাঁহাকেই সমগ্র অঙ্গে ন্যস্ত করিয়া ব্রহ্মাণ্যাদি মূর্ত্তিতে তাঁহাকেই ধ্যান করতঃ বিশ্বরূপে বা জ্যোতিরূপে গায়ত্রী মহামন্ত্র জপ।

অঘমর্ষণ হইতে গায়ত্রী জপ পর্য্যন্ত সাধনায় শক্তিভাবের ইঙ্গিত আছে ইহা সম্যগ্‌ভাবে আলোচিত হইল, গায়ত্রী সাধক ঐ ইঙ্গিতে বহু কথাই বুঝিতে পারিবেন, এখন আমরা এরূপ আশা করিতে পারি।

যিনি সর্ব্বদেবতার শক্তি তিনিই গায়ত্রী। এই জন্যই শিবশিবাপ্রোক্ত আগমনিগমাত্মক তন্ত্রশাস্ত্র সকল দেবতারই গায়ত্রী মন্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন। সেখানেও মাতা গায়ত্রী ব্রহ্মাণ্যাদি ত্রিরূপেই ধ্যাত হইয়া থাকেন। বৈষ্ণব শৈব প্রভৃতি সর্ব্ব সম্প্রদায়ের সাধককেই এই ত্রিরূপ, মাতা গায়ত্রীর ধ্যান ও জপাদি করিতেই হয়। স্বয়ং শিব বলিতেছেন যে—

"শিবশক্ত্যাত্মকং জীবং যঃ পশ্যতি স বৈষ্ণবঃ"

গায়ত্রীতন্ত্র প্রথম পরিচ্ছেদ ব্রাহ্মণ পটল॥

যিনি জীব মাত্রকে শিব ও শক্তিরূপে দর্শন করেন তিনিই বৈষ্ণব। এই জীবও কিন্তু ব্রহ্মরূপিণী মাতা গায়ত্রী হইতে অভিন্ন বস্তু; ইহাও শ্রীভগবান্ শঙ্কর শ্রীমুখে স্বয়ংই বলিতেছেন—

"নচ জীবাত্মনো ভিন্না গায়ত্রী ব্রহ্মরূপিণী।
গায়ত্র্যা নহি ভিন্নঃ স্যাজ্জীবাত্মা তৎস্বরূপিণী।
সর্ব্বদা উভয়ো রেকম্"।

গায়ত্রী তন্ত্র প্রথম পরিচ্ছেদ ব্রাহ্মণ পটল।

সাধক! আরও লক্ষ্য কর, দয়াময় আশুতোষ আমাদের প্রতি আদেশ করিতেছেন যে—

"গায়ত্র্যা পুটিতং কৃত্বা
ইষ্টমন্ত্রং জপেচ্চ তম্।
এতজ্জপং মহেশানি!
আধারাধেয় মুত্তমম্॥

বিনাধারং মহেশানি !
আধেয়ঞ্চ বিনা তথা !
নাধারং সিধ্যতে ভদ্রে !
নাধেয়ঞ্চ সুসিধ্যতি ॥
সর্ব্বেষু বিষ্ণুমন্ত্রেষু
শৈবে শাক্তেষু সুন্দরি !
সৌরে গাণপত্যে ভদ্রে
শক্যতে বরবর্ণিনি ॥"

গায়ত্রী তন্ত্র প্রথম পরিচ্ছেদ ব্রাহ্মণ পটল ।

গায়ত্রীমন্ত্র পুটিত করিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে হইবে ইহাই শিবের আদেশ। কারণ এই জপ আধার আধেয় ভাবাত্মক হয় বলিয়া ইহা উত্তম, গায়ত্রীমন্ত্ররূপ আধারে ইষ্টমন্ত্ররূপ আধেয়কে রাখিয়া ভাবনা করা আবশ্যক, ঐ ইষ্টমন্ত্রের দেবতা বিষ্ণু শিব শক্তি সূর্য্য গণপতি যিনিই হউন না কেন তাঁহাকেই গায়ত্রী আধারে আধেয় ভাবে ভাবনা করিবে ইহাই শিবের আদেশ। সুতরাং গায়ত্রীশক্তিই সর্ব্বদেবতার আধার। সর্ব্বদেবতার উপাসনার মূলেই এইভাব অতিশয় সুস্পষ্ট, কারণ—ইহা অতীব সত্যকথা যে, কোন দেবতার ইষ্টমন্ত্র জপের পূর্ব্বেই সেই দেবতার গায়ত্রীজপ করিতেই হইবে, শক্তিকে প্রত্যক্ষ করিতে না পারিলে শক্তিমানকে দেখা অসম্ভব সেইজন্যই শক্তিমন্ত্র গায়ত্রীজপ পূর্ব্বক ইষ্টমন্ত্র জপের বিধান। তান্ত্রিক দীক্ষা প্রণালীতে এইপ্রথা অদ্যাবধি অতীব প্রসিদ্ধ যে, অন্যূন সহস্রগায়ত্রী জপ করিয়া ইষ্টমন্ত্র গ্রহণ করিতে হয়, এই আচারের মূলে পূর্ব্বকথিত শিবের আদেশই বর্ত্তমান ইহা নিঃসন্দেহ। পূর্ব্বেই মাতা গায়ত্রীশক্তির প্রসন্নতাই সাধকের প্রার্থনীয়, গায়ত্রীপ্রসন্নতা মূলক ইষ্টদেবতা প্রসন্নতা ইহা বুঝিতে বাধা নাই, কারণ—গায়ত্রীমন্ত্র পুটিত করিয়া ইষ্টমন্ত্র জপের বিধান, গায়ত্রীমন্ত্র জপ পূর্ব্বক ইষ্টমন্ত্রজপ যে কোনমন্ত্রে দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে অন্যূন সহস্র গায়ত্রীমন্ত্র জপ, এই সব অনুষ্ঠানের দ্বারা গায়ত্রীশক্তিই সর্ব্বদেবতার মূলাধার শক্তি ইহা নিঃসন্দেহ বুঝিতে পারা যায়। আমরা এমন সাধকের সংবাদ অবগত আছি যে, যিনি গায়ত্রীমন্ত্রের মহাপুরশ্চরণদ্বারা মাতা গায়ত্রীর বৈষ্ণবীমূর্ত্তির দর্শনলাভ করিয়াছিলেন। শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারিণী মাতাগায়ত্রী স্বীয় শঙ্খনাদে দিগ্মণ্ডল আপূরিত করিয়া জ্যোতির্ম্মণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহার নয়নের অতিথি হইয়াছিলেন ইহা সত্য ঘটনা। সুতরাং সন্ধ্যা যে শক্তিসাধনা এবং মাতা গায়ত্রী যে শক্তিরূপিণী ইহা নিঃসন্দেহ। মায়ের কৃপা হইলে একথা আরও ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিব।

হিন্দুসমাজ ও রাষ্ট্র।

হিন্দুর শাস্ত্রে—রাষ্ট্রোৎপত্তির হেতু ও কাল নির্দ্দেশ রহিয়াছে। এমন এক সময় ছিল যখন রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয় নাই। মানবের উৎপত্তি সহজাত বর্ণাশ্রম সমাজ স্বভাবতঃই জগতের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিত, হিন্দু সমাজের অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীন ভাবে স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য জন্মলাভ করিয়া থাকে; স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদনের দ্বারা ভগবানের অর্চনা তাহার জন্ম লাভের উদ্দেশ্য। ভগবানের অর্চনার দ্বারা কাম্য ফললাভ করা যায়, ফল কামনা না থাকিলে—ভগবানের স্বারূপ্যাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়। রঙ্গালয়ে নানা নেপথ্য গ্রহণ করিয়া অভিনেতৃবর্গ কর্ত্তব্যবোধের অনুপ্রেরণায় স্ব স্ব অভিনেয় অংশের অভিনয় করিয়া থাকে কিন্তু একই অভিনেয় বস্তুকে সরস ও সুশৃঙ্খল ভাবে পরিস্ফুট করিয়া রঙ্গ স্বামীর প্রীতি সম্পাদন ও স্বীয় যোগ্যতা প্রদর্শন সকলেরই উদ্দেশ্য; সে উদ্দেশ্য সাধন যখন পরস্পরের সহযোগিতা ও মৈত্রী ভিন্ন অসম্ভব তখন স্বভাবতঃই অভিনেতৃবর্গের পরস্পর সহযোগিতা ও মৈত্রী দ্বারা যেমন একটা সংঘ গড়িয়া উঠে—হিন্দু সমাজ ও এই ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে।

হিন্দু সমাজের উৎপত্তি ও স্থিতি বিষয়ে জ্ঞান লাভের জন্য কোন জটিল তর্ক বা পাশ্চাত্য সমাজ বিজ্ঞান অধ্যয়ন প্রয়োজন হয় না। সমাজ ক্রিয়াশীল প্রত্যক্ষ বস্তু, প্রত্যেক ক্রিয়ার মধ্য দিয়া নিরন্তর সে তাহার প্রকৃতি ফুটাইয়া তুলিতেছে—চক্ষুষ্মান ব্যক্তি মাত্রই অনায়াসে তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন সুতরাং কূট তর্কের বা সমাজ বিজ্ঞান গবেষণার স্থান তাহাতে থাকিতে পারে না।

হিন্দু সমাজে নানা জাতি ও নানা সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে—সমাজের অধিক সংখ্যক ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও শ্রদ্ধা পূর্ব্বক স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন করিয়া থাকে এবং একের কর্ত্তব্য অন্যে কেন করিতে পারে না তাহা প্রতি ব্যক্তি বেশ সুস্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করিতে পারে সুতরাং স্ব কর্ত্তব্যে অশ্রদ্ধা বা অবসাদ কাহারও উপস্থিত হয় না; অন্যের কর্ত্তব্যের দোষ গুণের বিচারেও তাহার প্রবৃত্তি হয় না, স্বীয় কর্ত্তব্যপালকের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা সকলেই পোষণ করিয়া থাকে—কর্ত্তব্য ভ্রষ্টের প্রতি অশ্রদ্ধা ও করুণা করে। ইহাই হিন্দু সমাজের মূল প্রকৃতি।

সমাজ ভগবানের সৃষ্ট ও স্বভাবজ, রাষ্ট্র মানব কল্পিত। অর্থাৎ লোক বিবৃদ্ধির নিমিত্ত ভগবান—আদি পুরুষ, মুখ বাহু উরু ও পাদ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্ট করিয়াছিলেন, ইহারা ভগবানের নির্দ্দেশ পালন অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে স্বাতন্ত্র্যে স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালনে প্রবৃত্ত হইলে পরস্পরের সহযোগিতা স্বভাবতঃই প্রয়োজন হয়—কারণ

অন্যের সহযোগিতা বর্জ্জন করিয়া কেহই স্ব কর্ত্তব্য সম্যক পালন করিতে পারে না। সবর্ণ্যের সংঘের নাম সমাজ, অর্থাৎ স্ব স্ব ধর্ম্ম পালন উদ্দেশ্যে পরস্পর সম্মিলিত ও প্রীতি পূর্ব্বক ব্যবস্থাপিত নিয়মবদ্ধ মানব সংঘের নাম সমাজ। এই সমাজ বর্ণাশ্রমি মানবেরই থাকিতে পারে অন্যের থাকিতে পারে না, কারণ—জগৎ কর্ত্তা ভগবান লোক বিবৃদ্ধি ও লোক রক্ষার অনুকূল বিভিন্ন ধর্ম্মাধিকারসম্পন্ন যে চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্ট করিয়াছেন সেই চাতুর্ব্বর্ণ্যের স্বভাবজ কর্ম্মের দ্বারা পরস্পরের বৃদ্ধি সংরক্ষণ ও কল্যাণ হইতে পারে, জগতের অন্য জীবজাতের সংরক্ষণ ও কল্যাণের বীজও চাতুর্ব্বর্ণ্যের কার্য্যের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ যদি যথাযথ ক্রিয়াশীল থাকে তাহা হইলে রাষ্ট্রের প্রয়োজন হয় না। এই জন্য শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় পূর্ব্বে রাষ্ট্র ছিল না, যখন বর্ণাশ্রমী মানবের নির্ম্মল হৃদ্দর্পণে অজ্ঞানের মালিন্য স্পর্শ করিল—অর্থকামের লালসা যখন ধর্ম্মের নির্ম্মল মূর্ত্তিকে কলঙ্ক রেখায় লাঞ্ছিত করিতে উদ্যত হইল, তখন সমাজ রাষ্ট্র কল্পনায় মনোনিবেশ করিল; বৈবস্বত মনুকে রাজ পদে প্রতিষ্ঠিত করিল, সমাজ কল্পিত রাষ্ট্রের সেই প্রথম উৎপত্তি।

সমাজ বৈবস্বত মনুকে রাজা কল্পনা করিয়া যে রাষ্ট্র সৃষ্টি করিল, তাহার হেতু সমাজে তখন মাৎস্য ন্যায়ের সূচনা দেখা দিয়াছিল অর্থাৎ মৎস্যেরা যেমন দুর্ব্বলকে পীড়ন করিয়া সবলগণ জীবন ধারণ করে তেমনি সমাজের সবল মানবগণ -দুর্ব্বল মানবগণের পীড়ন আরম্ভ করিয়াছিল, এই অধর্ম্ম মূলক মাৎস্য ন্যায় যাহাতে প্রবৃদ্ধ হইতে না পারে এই জন্য সমাজ বৈবস্বত মনুকে রাজা কল্পনা করিয়া রাষ্ট্র সৃষ্ট করিয়াছিল। ইহাতে বুঝা যায় হিন্দুর রাষ্ট্র সৃষ্টির মূলে যুদ্ধ বিগ্রহ নাই, ভোগ স্পৃহা—বা প্রভুত্ব লিপ্সার অনুপ্রেরণা ও নাই; সমাজ স্বেচ্ছায় আত্মরক্ষার জন্য যাহাকে প্রভাব সম্পন্ন করিয়া দিয়াছিল তিনিই রাজা নামে অভিহিত হইয়াছিলেন, এই প্রকার রাজার কর্ত্তব্যে জটিলতা ছিল না, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের যে স্থানে ব্যভিচার ঘটিতেছে—সমাজ যে ব্যভিচার নিবৃত্তি করিতে পারিতেছে না, সেই স্থানে সেই ব্যভিচার নিবৃত্তি ম . রাজার কর্ত্তব্য ছিল।

সমাজের ব্যভিচার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য বৃদ্ধি হইয়াছিল; শেষ পর্য্যন্ত হয়ত এমন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল—যাহার সহিত প্রাচীন আদর্শের বিশেষ সাম্য দেখিতে পাওয়া যায় নাই; তাহা হইলেও একটুকু অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারা যায়—হিন্দুর রাষ্ট্র ও সমাজ, মূল প্রকৃতিকে একেবারে বর্জ্জন কোন দিন করে নাই।

কোন কালেই রাষ্ট্রের অধীনতায় সমাজ পরিচালিত হয় নাই, রাষ্ট্রই সমাজের অধীনতায় পরিচালিত হইয়াছে। ইহার ফল এই হইয়াছে যে, হিন্দুর রাষ্ট্রনীতিতে প্রজা-পালন বিষয়ে কোন জটিলতা প্রবেশ করিতে পারে নাই। পৃথিবীর অন্য জাতির মধ্যে প্রজা-পালন বিষয়ে রাজশক্তির যাহা কর্ত্তব্য হিন্দুর সমাজ শক্তি তাহা সম্পাদন করিয়াছে; সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের যে সকল ক্ষেত্রে রাজ শক্তি প্রসার লাভ করিতে পারে না সে সকল ক্ষেত্রেও হিন্দুর সমাজশক্তি প্রসার লাভ করিয়া দুর্নীতি দূর করিয়া দিয়াছে। যে স্থলে,

ধর্ম বিশ্বাস বিরহিত বা দুর্নীতি পরায়ণ ব্যক্তিগণের দ্বারা সমাজ-শক্তি প্রতিবাত উপস্থিত হইয়াছে সেই স্থলে ঐ সকল অধার্ম্মিক ও দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিগণের শাসনের জন্য রাজ শক্তির সহায়তা প্রয়োজন হইয়াছে।

পাশ্চাত্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যায়, রাষ্ট্রের সহিত বিশ্লিষ্ট হইয়া স্বাতন্ত্র্যে জনসাধারণের কল্যাণ সম্পাদন করিতে পারে এমন সমাজ কোন কালে প্রতীচ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; জনসাধারণের চরিত্র রক্ষা, দাম্পত্য সম্বন্ধ, স্ত্রী পুরুষের অধিকার, প্রভু ভৃত্যের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ, ধনিক শ্রমিকের সম্বন্ধ নির্ণয়, দরিদ্রের জীবনোপায়, জল অন্নের সংস্থান, স্বাস্থ্য বিধান, রোগ প্রতীকার ইত্যাদি যাহা কিছু সবই রাষ্ট্রীয় বিধান দ্বারা সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে, হিন্দু সমাজে ঐ সকল কার্য্য সামাজিকগণের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বুদ্ধির অনুপ্রেরণায় অধিকতর শান্তি ও শৃঙ্খলার সহিত সম্পাদিত হইত। প্রতীচ্যের ইতিহাস পাঠ করিলে ও বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যায় রাষ্ট্র শক্তি আজ পর্য্যন্ত ঐ সকল বিষয়ের শান্তিকর সুব্যবস্থা করিতে পারে নাই, যে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রশক্তি বিপ্লুত হইয়াছে সে ক্ষেত্রে জনসাধারণের মধ্যে অতি বীভৎস দুর্নীতি ও অধিকার বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। ভারতের হিন্দু সমাজের অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে; রাষ্ট্রশক্তি বিরুদ্ধপ্রকৃতিমানব সংঘের করতলগত হইলেও হিন্দুসমাজে কোন বিরোধ বা দুর্নীতি প্রতীচ্যের মত ব্যাপক ভাবে প্রসারলাভ করে নাই; জল অন্নাদি অত্যাবশ্যক বস্তুর জন্য হিন্দু রাষ্ট্রশক্তির মুখাপেক্ষা করে নাই, হিন্দুসমাজের যদি রাষ্ট্র নিরপেক্ষ স্বতন্ত্রতা না থাকিত তাহা হইলে—প্রতীচ্য সমাজের ন্যায় স্বজাতীয় রাষ্ট্রশক্তির বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু জাতি বিলুপ্ত হইয়া যাইত।

রামায়ণ মহাভারতাদি পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় সাধুরাষ্ট্রপতিগণ সর্ব্বপ্রকারে সমাজের অনুগত থাকিয়া রাষ্ট্রশক্তির পরিচালনা করিয়াছেন, যে সকল রাষ্ট্রপতি ইহার অন্যথা করিয়াছেন তাহাদের আধিপত্য স্থায়ী হয় নাই—সমাজ তাঁহাদের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছে।

শিশুপাল দুর্য্যোধন প্রভৃতি—যে সকল রাষ্ট্রপতি অধার্ম্মিকরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছেন—তাহাদের সম্বন্ধেও একটি বিষয় বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য,—তাঁহারা কেহই চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের সংরক্ষণে উদাসীন ছিলেন না, কেবল অনুচিত প্রভুত্বের দুরাকাঙ্ক্ষা ও ভোগলিপ্সা তাঁহাদিগকে বিপথগামী করিয়াছিল—ধর্ম্মবিগর্হিত পন্থায় পররাজ্যের ইহাই হেতু, তবে ধর্ম্মবিরুদ্ধ পন্থার অনুসরণকারী রাজার প্রতি সাধু প্রজাগণ স্বতঃই বিদ্বিষ্ট হইয়া থাকে; বিদ্বেষ পরিস্ফুট হইয়া উঠিলে রাজা তাহা নিবৃত্তির চেষ্টা করিবেন ইহা স্বাভাবিক; এরূপ ক্ষেত্রে প্রজার প্রতি অন্যায় ব্যবহার স্বভাবতঃই হইয়া থাকে, কারণ—এরূপ ক্ষেত্রে প্রজার বিদ্বেষ ন্যায়ানুগত; অধার্ম্মিক রাজাগণ নিজেদের অধর্ম্মের অনুমোদন করাইবার জন্য প্রজার প্রতি অত্যাচারে বাধ্য হয়েন, সুতরাং সমাজ শক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কিছু না করিলেও সমাজশক্তি ক্রমে ঐ প্রকৃতির

রাজগণের বিরোধিনী হইতে থাকে। বেনরাজা স্পষ্ট ভাবে সমাজের বিরোধী হইয়াছিলেন সমাজ অচিরকালের মধ্যে তাঁহার ধ্বংস সাধন করিয়াছিল। রামচন্দ্র যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকারে সমাজের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়াই জন সমাজে পূজিত হইয়াছিলেন।

ঐতিহাসিক কালের পর্য্যালোচনা করিলে ও দেখিতে পাওয়া যায় রাষ্ট্র ও সমাজের ঐ বাধ্যবাধক ভাব অন্যথা হয় নাই। নন্দরাজত্বের অবসান ও চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুত্থানের মধ্যেও ঐ একই সত্য নিহিত রহিয়াছে। নন্দগণ সমাজের প্রভাব অস্বীকার করিয়া সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করায় বিধ্বস্ত হইয়াছিল, চন্দ্রগুপ্ত সর্ব্বপ্রকারে সমাজের প্রভাবাধীন থাকিতে সম্মত হওয়ায় প্রবল প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন।

চন্দ্রগুপ্তের শাসনকালে—যে সকল বিদেশীয়পর্য্যটক ভারতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা তৎকালে ভারতবাসীর ও চন্দ্রগুপ্তের প্রভাবের যে সকল বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছে। তাহাদিকে অনু-ধাবন করিলে বুঝিতে পারা যায় তৎকালের হিন্দুর সমাজশক্তি যতটুকু রক্ষিত হইয়াছিল তাহাতেই ভারতবাসী পৃথিবীর মানবসমাজে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিল। তৎকালে ভারত বাসীর যে সুখসমৃদ্ধি ছিল তাহা বর্ত্তমানে যে কোন মানবসমাজের স্পৃহনীয়, কিন্তু মানবসমাজের পক্ষে তাহা লাভকরা অসম্ভব। ঐসকল পর্য্যটক চন্দ্রগুপ্তের কারাগারে অত্যল্পসংখ্যক অপরাধী দেখিয়াছিলেন; উন্নতদেহ সবল সুস্থ ভারতবাসীগণেরমধ্যে মিথ্যাব্যবহার অতিশয় বিরল ছিল। চৌর্য্যাদি অপরাধ ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কোন পর্য্যটক লিখিয়াছেন তিনি রাজ-ধানীর সরোবর-সোপানে সপ্তাহকাল একগাছা সুবর্ণহার পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন; সপ্তাহ পরে যাহার হার সে আসিয়া লইয়া গিয়াছিল; বর্ত্তমানের মানুষ ইহা বিশ্বাস করিতেও পারে না। রাজধানীর সরোবর সোপানে প্রতিদিন সহস্র সহস্র লোক স্নান করিতেছে, জলাহরণ করিতেছে অথচ সোপানপতিত সুবর্ণ হারের দিকে কেহ দৃক্‌পাতও করিতেছে না। কতবড় আত্মসংযম ও ধর্ম্মভাব তৎকালে সাধারণ ভারতবাসীর অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল তাহা চিন্তা করিলেও বিস্মিত হইতে হয়। যাহারা ধর্ম্মমূলক হিন্দুর সমাজ-ব্যবস্থার-মর্ম্ম সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন না—তাঁহারা মনে করেন চন্দ্রগুপ্তের কঠোর শাসন তৎকালে ভারতবাসীর মধ্যে এই অবস্থা আনয়ন করিয়াছিল; সবল মানবহৃদয়ে—যখন ব্যাপকভাবে অসৎ প্রবৃত্তি ফুরিত হয়, তখন এমন কোন শাসনশক্তি থাকিতে পারে না যাহার সাহায্যে সে অসৎপ্রবৃত্তি দমন করা যাইতে পারে; বর্ত্তমানের প্রতীচ্য দেশসমূহ তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। চরিত্রের উৎকর্ষসাধন ও সদ্ভাব প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতীচ্য দেশে যতদূর মানবীয় শক্তিতে সম্ভব তাহা করা হইতেছে, শিক্ষার প্রসার, সদুপদেশও জীবনযাপনের সাধুপ্রণালী নিত্য নূতন রাজবিধান প্রভৃতি অসংখ্য প্রকার উপায় অবলম্বিত হইতেছে; একশ্রেণীর প্রতিভাশালী বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ অনন্যকর্ম্মা হইয়া শুধু ঐ সকল কার্য্যেই নিযুক্ত রহিয়াছেন; কিছু-তেই সুফল ফলিতেছে না বরং অশান্তি ক্রমে বাড়িতেছে, স্ত্রীপুরুষের চরিত্র অধিক কলুষিত হইতেছে; রাষ্ট্রবিরোধী ধর্ম্মবিরোধী সমাজবিরোধী দল সকল গঠিত হইতেছে;

গুরুতর দণ্ডবিধানের দ্বারা ও এখনকার প্রতীকার সম্ভব হইতেছে না, এই সকল অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াও যাঁহারা কল্পনা করেন যে গুরুতর দণ্ডের ভয়ে তৎকালে ভারতবাসী চৌর্য্যাদি দুষ্কর্ম বিরত হইয়াছিল তাঁহারা মানব প্রকৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞ নহে ইহা নিঃসংশয় বলা যাইতে পারে। প্রকৃত কথা এই—চন্দ্রগুপ্তাদির রাজত্বকালেও হিন্দুসমাজের মূলভিত্তি অধিক শিথিল হয় নাই, ভগবানের আদেশ—শাস্ত্রের বিধান অবশ্য প্রতিপালনবোধে সকলে স্ব স্ব কর্ত্তব্য করিত; পাপভীতি স্বতঃই মানুষকে অপকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত রাখিত, যে সকল ক্ষেত্রে ব্যভিচার ঘটত সুগঠিত সমাজশক্তি তাহার প্রতিকার করিতে পারিত; কদাচিৎ কোন ক্ষেত্রে সমাজশক্তি প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইলে রাজশক্তির সহায়তা প্রয়োজন হইত; এইজন্য চীন পর্য্যটক ভারতে—অন্যত্র যাহা কল্পনার অতীত তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধমতের প্রসারকাল হইতে ভারতের অধঃপতন আরম্ভ হয়, সমাজের ভিত্তি শিথিল হইয়া পড়ে ও সমাজের সংহতি বিশৃঙ্খল হইয়া যায়। তৎকালেও দেখিতে পাওয়া যায় রাষ্ট্র সমাজের অধীন ছিল।

বৌদ্ধবিপ্লব—ধর্ম্মবিপ্লব; যিনি বৌদ্ধমতের প্রবর্ত্তক তিনি রাজপুত্র ছিলেন; ইহাতে বুঝ যায় রাষ্ট্র শক্তি তৎকালে যতটা সম্ভব বৌদ্ধমতের অনুকূল ছিল কিন্তু বৌদ্ধ মতবাদের পোষকতা বা প্রতিকূলতা রাষ্ট্রশক্তি করে নাই; সমাজের বিদ্বজ্জনের মধ্যেই বৌদ্ধ মতবাদ লইয়া বিবাদ আরম্ভ হইয়াছিল। ক্রমে এই বিবাদের প্রসারণ এবং অপ্রসারণও ঐ প্রণালীতেই হইয়াছে; অর্থাৎ যতকাল বৌদ্ধমত সমর্থক পণ্ডিতগণ অনুকূল যুক্তি তর্কের সাহায্যে স্বমতের সমীচীনতা প্রতিপাদনে সমর্থ হইয়াছেন ততকাল বৌদ্ধমতের প্রসার ঘটিয়াছিল; ভট্ট কুমারিল, আচার্য্য-শঙ্কর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ যখন হইতে বৌদ্ধ মতবাদ খণ্ডন করিয়া বৈদিক মতবাদের সমীচীনতা প্রমাণ করিতে লাগিলেন—তখন হইতে বৌদ্ধ মতবাদে লোক বীতস্পৃহ হইতে লাগিল। খ্রীষ্টান ও মুসলমানেরমত, হিন্দু সমাজ যদি রাষ্ট্রের নিয়ামকতায় পরিচালিত হইত, তাহা হইলে ভারতে তৎকালে ইয়ুরোপ ও আরবের মত ঘোরতর রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইত, রাষ্ট্রশক্তি যখন যে সম্প্রদায়ের হস্তগত হইত তখন অন্য সম্প্রদায়ের রক্তস্রোতে ভারত প্লাবিত হইয়া যাইত। ইয়ুরোপ ও আরবের মত ভারতে যে তাহা হয় নাই ইহার একমাত্র হেতু রাষ্ট্র অপেক্ষা সমাজের প্রবলতা ছিল বলিয়া।

হিন্দু ভিন্ন পৃথিবীর কোন জাতির ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত মিলিবে না যে, রাষ্ট্রশক্তির হস্তক্ষেপ ব্যতীত শুধু যুক্তি তর্কের দ্বারা বিরুদ্ধ ধর্ম্মমত নিরসন করিয়া দেশে শান্তি স্থাপন করিতে পারিয়াছে—বা বলপ্রয়োগ ব্যতীত বিরুদ্ধ মতবাদীগণ স্বমত প্রচারে বিরত হইয়াছে।

বৌদ্ধপ্রভাবের পরবর্ত্তী হিন্দুরাষ্ট্রপতিগণও সমাজের প্রাধান্য মানিয়া লইয়াছেন, সমাজের অসম্মত কোন কার্য্য করিতে কেহ সাহসী হয়েন নাই, সমাজের শাসনক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয়-শাসন প্রবর্ত্তন ও কেহ করেন নাই, ভারতের শান্তি ও সমৃদ্ধি তৎকালেও পৃথিবীর আদর্শস্থানীয় ও স্পৃহনীয় ছিল।

মুসলমান-শাসনকাল ভারতের প্রাচীন ভাবধারার বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছিল, অর্থাৎ স্বজাতীয় শাসনকালে সমাজ ও রাষ্ট্রের যে সহযোগিতা ও প্রীতিবন্ধন ছিল—মুসলমান শাসন তাহা বিনষ্ট করিয়া তাহার স্থানে বিপরীত ভাব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, সমাজ ও রাষ্ট্র পরস্পর বিরোধী হইয়া পড়িয়াছিল, রাষ্ট্র সমাজকে গ্রাস করিবার জন্য প্রবল বল প্রকাশ করিতে ছিল—সমাজ আত্মরক্ষার জন্য ও রাষ্ট্রশক্তিকে প্রতিহত করিবার জন্য প্রাণপাত চেষ্টা করিতেছিল।

ইতিহাস পাঠকগণ—হিন্দু মুসলমানের তুমুলসংঘর্ষের মধ্যে হিন্দুরাজগণের অনেক ত্রুটী বিচ্যুতি দেখিতে পাইবেন। এবং সেই সকল ত্রুটি বিচ্যুতির ফলে হিন্দুর রাষ্ট্রশক্তিকে বিধ্বস্ত করিয়া মুসলমান রাষ্ট্রশক্তি ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছিল; ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু হিন্দুর সমাজশক্তির সহিত মুসলমান রাষ্ট্রশক্তির যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল তাহার ফলাফল যদি বিচার করা যায়—তাহা হইলে বুঝিতে পারা যায়, হিন্দুর রাষ্ট্রশক্তি মুসলমানের রাষ্ট্রশক্তির নিকট পরাভব স্বীকার করিলেও হিন্দুর সমাজশক্তি মুসলমান রাষ্ট্রশক্তির নিকট পরাভব স্বীকার করে নাই। ক্রমশঃ—

সামাজিক নানাকথা।

(চতুর্থ স্তবক)

সমাজসেবকস্য কস্যচিৎ।

১। উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছিলাম—

আগরার বিখ্যাত সবজজ ৺অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম বয়সে পৈতা ফেলা ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন। তাঁহার ছেলে ৺সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, পি, আর, এস্, এল এল ডি—যখন একাদশ বর্ষ বয়স্ক, তখন অবিনাশ বাবু ভাবিলেন, "ছেলেটি তীক্ষ্মধী ও সুবোধ—খুবই ভালই হইবে; আমি সঙ্কীর্ণ ব্রাহ্মসমাজের গণ্ডীর ভিতর থাকিয়া এমন ছেলের ক্ষতির কারণ হইতেছি"। তিনি পুত্রের উপনয়ন দিলেন এবং নিজেও মস্তকমুণ্ডন পূর্ব্বক রীতিমত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনর্ব্বার উপনয়ন গ্রহণ করিলেন। জ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিরূপে হয়, এই আপত্তির উত্তরে অবিনাশ বাবু বলিয়াছিলেন, "সঙ্কল্পে বলুন, আমি উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছিলাম, নচেৎ পৈতা ফেলিব কেন? * পাগল না হইলে মন্ত্রার্থ জানার জন্য যত্ন করিতাম।" এইরূপে সুগভীর পুত্রস্নেহ তাঁহার ভ্রম কাটাইয়া উদ্ধার সাধন করিল।

* বিরুদ্ধ দুষ্টাশুচি ভোজনাদি প্রধর্ষণং দেবগুরু দ্বিজানাম্।
যদেতদার্গোষু হি লক্ষ্যতেত্র উন্মাদ চিহ্নং চরকোভিধত্তে॥

কোনও ব্রাহ্মবন্ধু তাঁহার প্রায়শ্চিত্তের সংবাদ পাইয়া অনুযোগ করিলে, অবিনাশবাবু উত্তর করিয়াছিলেন "ভাই যৌবনকালে সব কথা না বুঝিয়া দৈত্য ফেলিয়াছিলাম কিন্তু এখন তুমিও জানিয়াছ আর আমিও বুঝিয়াছি যে ব্রাহ্মধর্ম উচ্চ হিন্দুয়ানির এক অশেষ অসংযম দুষ্ট ইউরোপীয় সংস্করণ মাত্র। আরও দেখ—ছেলেটার নৈসর্গিক অধিকার ছিল যে বৃহৎ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজের যে কোনও ভালঘরের মেয়েকে বিবাহ করিতে পাইবে। সংকীর্ণ ব্রাহ্মসমাজের আধুনিক ধরণের স্ত্রীশিক্ষার মধ্য হইতে কি ভাল বৌ পাওয়া যাইবে? সে পবিত্র ও গভীর পতিভক্তি যে সাবিত্রী ব্রতাদি দ্বারা সহস্র পুরুষে ভাল হিন্দু ঘরে উদ্বুদ্ধ।"

[ভূদেব চরিত্র ২য় ভাগ ১৬১ পৃষ্ঠা ফুট্‌নোট্ হইতে সঙ্কলিত]

অবিনাশ বাবুর প্রায়শ্চিত্ত তথা পুনর্ব্বার উপনয়ন গ্রহণ যথাশাস্ত্র হইয়াছিল কিনা সে বিষয়ে অভিমত প্রকাশে আমি অনধিকারী—এবং তাহা এস্থলে আলোচনার বিষয়ও নহে। পরন্তু সুবিজ্ঞ অবিনাশ বাবুর অনুতপ্ত উক্তি তথা ব্রাহ্মধর্ম্ম ও আধুনিক স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে অভিমত অনুধাবনযোগ্য—বিশেষতঃ আজকালিকার সময়ে। তাই ঐ বিবরণটুকু সঙ্কলন যোগ্য মনে হইল।

২। ডাঃ পি, সি, রায় ও স্ত্রীশিক্ষা—

আমাদের ডাঃ পি সি, রায় মহাশয় যে কখন কি বলেন, তাহা বুঝা কঠিন—আবার যাহা বলেন, তাহাতে সঙ্গতি রক্ষা হয় কি না, তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখেন না।

গত বর্ষায় তিনি টাঙ্গাইল গিয়াছিলেন—তথাকার মহিলাদের সভায় এক বক্তৃতাও দিয়াছিলেন। "প্রারম্ভেই বলিলেন—মহারাষ্ট্রে মেয়েদের পর্দ্দা নাই—পথে হাটে যান; আর বাঙ্গালীমেয়েরা পর্দ্দা আঁকড়াইয়া আছেন। "এর ফল চোখের উপর দেখিতে পাই—মহারাষ্ট্রের মেয়েরা সবল—আর বাঙ্গালী মেয়েদের স্বাস্থ্য কে হরণ করেছে।" বেশ কথা; কিন্তু ঠিক পরেই আছে—"৬১ বৎসর আগের কথা, আমার মা, জেঠী মা, খুড়ী মারা ৭১ বৎসর পর্য্যন্ত বেঁচে ছিলেন, তাঁরা গৃহকর্ম্মে পটু ছিলেন। আজকালকার মেয়েরা একবার সন্তানবতী হইলে স্বাস্থ্য হারাইয়া ফেলেন। তাঁরা খুব প্রাতে শয্যা ত্যাগ করে বাড়ীতে গোবর জল ছিটাতেন সমস্ত বাড়ী পরিষ্কার করিতেন—নিজ হস্তে গৃহকার্য্য করিতেন। আর এই সব দিদিমণিদের দেখে অশ্রুসংবরণ করিতে পারিনে।" কলিকাতার স্বাস্থ্যের রিপোর্ট এই যে ১৫ হইতে ৫০ বৎসর বয়সের ছেলেদের যে সংখ্যা মরে, ঐ বয়সে মেয়েরা তার ৫ গুণ মৃত্যুর কবলিত হয়। কারণ এরা সংসার কর্ম্ম করে না।"

অতএব স্বাস্থ্যের জন্য পর্দ্দা অর্থাৎ অবরোধ প্রথা দায়ী নহে—* আজকালকার শিক্ষিতম্মন্যা মেয়েদের সাংসারিক কার্য্য হস্তে করাটাতে অবহেলাই ইহার কারণ—ঠিকই বলা হইয়াছে।

* অপিচ বাল্যবিবাহও এজন্য দায়ী নহে; ডাঃ রায়ের মা জেঠী খুড়ীরা অল্প বয়সেই বিবাহিতা হইয়াছিলেন। বরং তাঁহার "দিদিমণি"দের বিবাহ অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সেই হইয়া থাকে।

তারপর ডাঃ পি, সি, রায় সেকালের গৃহিণীদের শিল্পকাজ—কারুকলার সৌষ্ঠব ইত্যাদির কথা বলিয়াছেন। "এক নারিকেল দিয়ে কত না স্বাদু সুদা পুষ্টিকর খাদ্য তাঁরা তৈরি করিতেন।" ক্রিয়াকর্মে বাঙ্গালীর বাড়ীবা নয়নমোহন সৌন্দর্যোমণ্ডিত হতো। সূচের কত কাজ দেখেছি; দেশে আমাদের গোসেবা ছিল ... ... ঘরে গরু ছিল দুধের অভাব ছিল না। জমিদার বাড়ীতেও আমরা ছেলে বয়সে বামুনঠাকুর দেখি নাই" ইত্যাদি।

তারপর আবার একথাও বলেছেন—

"মেয়েদের লেখা পড়া শিখ্‌তে হবে। ... .. এইতো কৃষ্ণবাবুর মেয়েরা রয়েছেন। ডাঃ অঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা সরোজিনী নাইডু মনীষীদের অন্যতম।" † কৃষ্ণবাবুর মেয়েরা—অর্থাৎ দুইটি গ্রাজুয়েট্ কন্যা। এখন জিজ্ঞাসা করি মেয়েরা গৃহকর্মে সুপটু হইতে হইলে—গোসেবা ও রন্ধনে অভ্যস্ত হইতে হইলে—বি, এ, পাস এবং 'সরোজিনী নাইডু' হইতে পারিবে কি? এই বি এ পাস মেয়েরা ও সরোজিনী গৃহকার্য্য স্বহস্তে সম্পাদন করেন কি? নিজের হাতে রন্ধন কার্য্য করেন কি? ফলকথা বি, এ, পাস হইতে হইলে বা 'সরোজিনী নাইডু হইতে গেলে—মেয়েদের প্রাচীন পন্থা পরিত্যাগ করিতেই হইবে—'বাবু' সাজিতেই হইবে। একটি সরোজিনী নাইডু বা দুই চারিটি গ্রাজুয়েট রমণীর নিমিত্ত যে আদর্শ ঘরে ঘরে চলিত—যাহাতে অনায়াসে মেয়েরা স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্যে ভূষিতা তথা গৃহকার্য্যে সুদক্ষা হইতেন সেই আদর্শকে জলাঞ্জলি দিতে হইবে?

ডাঃ রায় স্বদেশভক্তও বটেন—আবার বিলাতী মোহাবিষ্টও বটেন—তাঁহার ভিতরে তাই দুইটারই ভাব রহিয়াছে; কিন্তু এই দুইয়ের সমন্বয় করার শক্তি তাঁহাতে নাই—কেননা আর্য্যশাস্ত্রাদিতে তাঁহার ভক্তি বিশ্বাস নাই। ৺ভূদেব বাবুর ন্যায় শক্তিমান্ পুরুষই সেই সমন্বয় সাধন কতকটা করিতে পারিয়াছিলেন। ডাঃ রায় ভূদেববাবুর জীবন চরিত এবং গ্রন্থাবলীও মনোযোগ সহকারে পড়িয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না।

৩। ইংরেজীর হীন অনুকরণ—

আমরা এখন নানারূপেই সাহেব সাজিতে উন্মুখ হইতেছি; চুলছাটা, গোঁফছাটা জাজিয়া পরিধান—এসব তো আছেই—চা চুরুট বিস্কুট প্রভৃতি সেবন, সে সবত খুবই্ চলিতেছে—এস্থলে ঐ সকলের কথা বলিব না। একটি সামান্য বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি।

আমাদের মাপকাঠি 'হাত'—সাহেবদের পা—ফুট্ (বহুবচনে ফিট) কিন্তু এখন সাহেবদের অনুকরণে বাঙ্গালা গ্রন্থাদিতে ফুট বা ফিট্ই 'মাপকাঠি' হইয়া উঠিতেছে। কোনও দেব-মন্দিরের উচ্চতার বিষয় বলিতে গিয়া লেখা হয়—অতফিট্ উচ্চ। মন্দির তো বরং উপেক্ষণীয়—দেবতার মাপেও 'অতফিট্ উচ্চ'—এরূপ লেখা হয়। অর্থাৎ সোজাকথায়—দেবতার মাপও পায়ের দ্বারাই (প্রকারান্তরে) করা হইতেছে। হয়তো লোকে এটার মধ্যে যে অন্যায় কিছু হইতেছে—তাহা মনেই করিতে পারিতেছেন না।

† এই সব উদ্ধৃতবাক্য "এদেশের কথা" (২০শে শ্রাবণ ১৩৩৬) হইতে সংগৃহীত।

বিলাতী প্রকৃতির ইহাও একটা বিশেষত্ব যে—উহারা নিজের কথাটাই আগে ভাবে, তাই 'আমি' প্রথম পুরুষ। তারপর তুমি দ্বিতীয়—কেন না তুমি আমার সাক্ষাৎ রহিয়াছ; আর সে তৃতীয় পুরুষ কেননা 'আমি' তাহাকে দেখিতে পাইতেছি না। এই দেশে, প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় নাই—আছে প্রথম মধ্যম উত্তম অর্থাৎ আগের মাঝের ও শেষের ব্যক্তি। আগে তার কথা, মাঝে তোমার কথা, অবশেষে আমার কথা—আর্য্য ভাবনার এই ধারা। ব্যাকরণে এই ভাবই প্রকটিত হইয়াছে কিন্তু আজকাল ইংরেজী ধরণে সংস্কৃত ব্যাকরণেও প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় পুরুষ লিখিত হইতেছে। ডাঃ ভাণ্ডারকরের সংস্কৃত ব্যাকরণে দেখিয়াছি করোমি করোষি করোতি—এইরূপ পর্য্যায়ে ক্রিয়াকৃপ প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব তি তস্ অন্তি কে পাছে ঠেলিয়া দিয়া প্রথমে শেখা হয় 'মি বস্ মস্'। সংস্কৃত ধাতুর উত্তর ঐ সকল বিভক্তির সংজ্ঞা তিঙ্—কেননা আদ্য বিভক্তি 'তিপ্' এর তি এবং শেষ বিভক্তি মহিঙ্ এর ঙ নিয়া ঐরূপ সংজ্ঞা হইয়াছে। এখন মি যদি প্রথমে আসিল তবে মিপ্ এর মি এবং সর্ব্বশেষ 'ঝ' নিয়া মিঝ (তিঙের পরিবর্ত্তে) সংজ্ঞা হওয়া উচিত। কিন্তু এরূপ করিলে পাণিনি সূত্রে নানা বিভ্রাট বটে। অনুকরণকারীর এতটা ভাবনা মাথায় আসে কি?

৪। ইংরেজী শিক্ষিতের মোটা বুদ্ধি—

তখন স্কুলে পড়িতাম; তখন আমার একজন আত্মীয়—খুব তীক্ষ্ণবুদ্ধির লোক—বলিতেন 'ইংরেজী পড়িলে বুদ্ধিটা মোটা হইয়া যায়।' কথাটা তখন পরিহাস বিজল্পিত মনে করিতাম। এখন কার্য্য জগতে দেখি ঐ উক্তিতে যাথার্থ্য যথেষ্ট রহিয়াছে।

কোনও বাঙ্গালী সিভিলিয়ানের নিকট একখানি ৫৲ টাকা মূল্যের পুস্তক পাঠান হইয়াছিল—তখন ৫৲ টাকা পর্য্যন্ত মণি অর্ডার খরচ /০ মাত্র ছিল। ঐ মহাশয় কলিকাতার এক ব্যাঙ্কের নামে ৫৲ টাকার চেক খামে পুরিয়া রেজেষ্টারী করিয়া পাঠাইয়া দিলেন—তাহাতে ব্যয় ৵১০। পুস্তক প্রকাশক মফঃস্বলের লোক—তাঁহার তো চক্ষুঃ স্থির—কিরূপে চেক ভাঙ্গাইবেন—মহাচিন্তায় পড়িলেন। কলিকাতায় এক আত্মীয়ের নিকট চেকখানি রেজেষ্টারী করিয়া পাঠাইলেন…ব্যয় ৵১০—ঐ আত্মীয়ের ব্যাঙ্কে যাতায়াতের সময় ব্যয়ের কথা ধরিলাম না—ট্রামভাড় ৶০ ।০—টাকা পাঠাইতে মণিঅর্ডার খরচ /০ ব্যয় হইল তো? এই ব্যাপারে বুঝিলাম "হাঁ এদের বুদ্ধি 'মোটা'ই হইয়াছে বটে।" একটু চিন্তা করিয়া ইহার নিদান ঠিক করিলাম—ইঁহারা বিলাতী মোহাবিষ্ট—চেক কাটা সাহেবিয়ানা তাই করিতে হইবে—এই মোটা বুদ্ধি। কিন্তু ইহাতে যে নিজের /১০ অধিক লাগিল, প্রাপককে যে চেক্ ভাঙ্গাইতে বৃথা সময় ব্যয় আবার অর্থব্যয় ইত্যাদি অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে সেই সূক্ষ্ম ভাবনা মোহ বশতঃ মাথায় আসে নাই।

৫। মোহাবিষ্টের যুক্তি তর্ক—

আর্য্যসমাজের প্রবর্ত্তক স্বামী দয়ানন্দের জীবন চরিতে আছে—তিনি রাত্রিতে এক শিব-

মন্দিরে শয়ন করিয়াছিলেন; ভিতরে শব্দ শুনিয়া দেখেন যে একটি ইন্দুর শিবলিঙ্গের উপরিস্থিত ফলাদি উপহার ভক্ষণ করিতেছে। দেখিয়া তাঁহার মনে হইল—এই শিবলিঙ্গই সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর রূপে পূজিত হইতেছেন—আর ইঁহার মাথা হইতে উপহার গুলি অপহৃত হইতেছে, অথচ ইনি তাহা বারণ করিতে পারিতেছেন না। ফলে দয়ানন্দ মূর্ত্তিপূজার বিরোধী হইয়া পড়েন।

দয়ানন্দের ভ্রান্তির পরিচয় স্বরূপ ইহা বলা যাইতে পারে—যে শ্রীমহাদেব যে ইন্দুরের মুখেই ভক্তের উপহার খাইতেছেন না—একথা তাহাকে কে বলিল? শ্রীভগবতী শিয়ালীর রূপে বাল গ্রহণ করেন—ইহা প্রসিদ্ধ কথা। শ্রীজয়ন্তী মহাপীঠে ৺ভৈরবের নামে ভোগ কলাপাতায় করিয়া বাহিরে দেওয়া হয়, দাঁড়কাক আসিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা লইয়া যায়। যদি কোনও দিন দাঁড়কাক না আইসে, সে দিন ভোগে কোনও বিঘ্ন ঘটিয়াছে মনে করা হয়।

বলিতে পার, 'মহাদেব স্বরূপ প্রকাশ পূর্ব্বক উপহার গ্রহণ করিলেন'না কেন?' দয়ানন্দ তাহা হইলে মূর্ত্তি উপাসনায় বিশ্বাসবান্ হইতেন।' কিন্তু ভাইরে—দয়ানন্দের এমন কি তপস্যার জোর ছিল যে তাঁহার স্বরূপ দর্শন হইবে?

সোমনাথের লিঙ্গ সুলতান মামুদের আদেশে ভগ্ন হইলেও তাহা হইতে কোনও দেবমূর্ত্তি নির্গত হন নাই—বরং সুলতান মামুদের ধ্যেয় বস্তু "সোণা রূপা জহরত" নাকি বাহির হইয়াছিল।

তবে প্রহ্লাদের কথায় যখন হিরণ্যকশিপু স্ফটিকস্তম্ভ ভগ্ন করেন—তখন শ্রীভগবান্ নৃসিংহ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া হিরণ্যকশিপুর উদ্ধার সাধন করেন—কারণ, হিরণ্যকশিপুর তপস্যার জোর—যার ফলে প্রহ্লাদের ন্যায় পুত্রলাভ। আর ঐ হিরণ্যকশিপুই বা কম কি স্বয়ং বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল—যাঁর শাপান্ত করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান্‌কে বারংবার মর্ত্ত্যে আবির্ভূত হইতে হইয়াছিল।

আর এক মোহাবিষ্ট রামমোহন রায়। তিনি নাকি পুষ্পচয়নার্থ আগত কোনও ব্রাহ্মণকে বলিয়াছিলেন "দেবতা, ফুলটাও যে ভগবানেরই জিনিস্—ইহা ভগবানকে আপনি কিরূপে উপহার দিবেন?" কথিত আছে রামমোহনের যুক্তিতর্কে মুগ্ধ হইয়া ঐ ব্রাহ্মণ ফুল গুলি নাকি ফেলিয়া দিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন। কিন্তু রামমোহনরায় বলিতে পারিতেন কি—এমন কি জিনিস জগতে আছে যাহা শ্রীভগবানের নহে? যে 'মনঃপ্রাণ' ভগবানে অর্পণ করিবার জন্য উপদেশ দেও—ইহাকি তোমার? তোমার স্তোত্র, সঙ্গীত, ইত্যাদি রচনার শক্তি কোথা হইতে পাইয়াছ? আর তুমিই বা কার?

অতএব ধ্যানইকর আর অর্চ্চনাই কর—সবই সেই "গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজা"।

আর শ্রীভগবান্ স্বয়ং তাঁহার পূজার উপহার নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন—ইহাতে কার কি বলিবার আছে?

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ গীতা ৯।২৬

এইখানেই সনাতন ধর্ম্মের বিশিষ্টতা—যাঁহার অশনের কোনও প্রয়োজন নাই—তাঁহাকেও 'অশ্নামি' বলিতে হইয়াছে; ইহার অধিক ভগবদ্ভক্তির চরিতার্থতা আর কিসে হইতে পারে?

৬। শাস্ত্রোপদেশের উপর যুক্তিতর্ক—

শাস্ত্রের আদেশ "ভগ্নাং নষ্টাং ন পূজয়েৎ"—দেবমূর্ত্তি ভগ্ন হইলে পূজা করিবে না ফেলিয়া দিবে। আজকাল পুরাতন পুকুরসংস্কারের সময়ে অনেক স্থলে নাসিকাহীন, অঙ্গুলহীন, ভগ্নহস্ত, ভগ্নপাদ দেবমূর্ত্তি পাওয়া যায়। ঐ সকল খুবই সম্ভব কোনও ক্রমে ভগ্ন হইয়া যাওয়ায় পূর্ব্বজেরা বিসর্জ্জন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। পরন্তু এসব মূর্ত্তির অনেকটি এখন পুনঃ সংস্থাপিত হইয়া পূজিত হইতেছেন—তাহাও দেখা যাইতেছে। কিন্তু ইহা শাস্ত্রাদেশের বিরোধী।

এ সম্বন্ধে ৺রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের জীবন চরিতে একটী উপাখ্যান আছে তাহা এস্থলে আলোচনা যোগ্য মনে করিতেছি।

৺রাণীরাসমণির দক্ষিণেশ্বরের দেবালয়ে ৺রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি স্থাপিত আছেন। কোন ক্রমে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তিটি পড়িয়া যাওয়াতে একটি পা ভাঙ্গিয়া যায়। রাণীরাসমণি পণ্ডিতদের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন—তাহাতে ঐ মূর্ত্তিটি বিসর্জ্জন করিয়া তৎস্থলে নূতন বিগ্রহ স্থাপনের প্রস্তাব হয়। ৺রাণীরাসমণির সুন্দর মূর্ত্তিটির প্রতি খুবই আসক্তি ছিল—তিনি ঐ ব্যবস্থাতে তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। তাহাতে ৺রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁহাকে বলেন "তুমি কেন মূর্ত্তি ফেলিয়া দিবে? তোমার জামাতা যদি পড়িয়া পা ভাঙ্গিয়া ফেলিতেন তবে কি তাঁহাকে দূর করিয়া দিতে?" কথিত আছে অবশেষে রাণীরাসমণি মূর্ত্তি বিসর্জ্জন করেন নাই—'পা'টি নাকি পরমহংসই বেমালুমভাবে জোড়া দিয়াছিলেন।

অবশ্য চরিতাখ্যায়ক পরমহংসের বুদ্ধিচাতুর্য্যের নিদর্শন স্বরূপ এই আখ্যানটি গ্রন্থস্থ করিয়াছেন। কিন্তু কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলে এই যুক্তির সচ্ছিদ্রতাই প্রতীত হয়। দেবমূর্ত্তি ভাস্কর কর্তৃক নির্ম্মিত—রাণীরাসমণি যথোচিত অর্থব্যয়ে সুনিপুণ ভাস্করের কর্তৃক ভগ্নমূর্ত্তির অবিকল প্রতিরূপ আর একটি মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইতে পারিতেন। তাহাতে শাস্ত্র বিহিত প্রক্রিয়াদ্বারা "প্রাণপ্রতিষ্ঠা" করাইয়া ভগ্নমূর্ত্তির স্থান পরিপূরণ করান সুসাধ্য ছিল। কিন্তু জামাতা ভগ্নপাদ হইলে হুবহু তৎসদৃশ আর একটী "জামাতা" তৈয়ার করাইতে শিল্পীর দক্ষতা অভাব না হউক—তাহাতে "প্রাণপ্রতিষ্ঠা" করান একান্তই অসাধ্য। যদি সেই অসাধ্যসাধনপটু বিশ্বকর্ম্মার সন্ধান পাওয়া যাইত—তবে জামাতা ভগ্নপাদ হইলে তৎস্থলে নিখুঁত জামাতা গড়াইয়া আনিতে অনেকেরই আপত্তি হইত না বলিয়াই মনে করিতে পারি।

বঙ্গীয় বর্ণাশ্রম-স্বরাজ্য সঙ্ঘের বিশেষ অধিবেশনে

সভাপতির অভিভাষণ

সভাপতি—শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্।

আজ বঙ্গীয় বর্ণাশ্রমস্বরাজ্যসংঘের বিশেষ অধিবেশনে আপনারা আমাকে এই সভার সভাপতিত্বের গৌরব প্রদান করায় কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আপনাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আপনারা (আমার ন্যায় অকিঞ্চনের উপর) এই গুরুভার ন্যস্ত না করিয়া অপর কোন যোগ্যতর মহানুভব ব্যক্তির উপর অর্পণ করিলেই সুশোভন হইত। তথাপি শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতমণ্ডলীপ্রমুখ সমুপস্থিত সুধীবৃন্দের আদেশ ও অনুরোধ উপেক্ষার দ্বারা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করারও শক্তি আমার নাই, সুতরাং নানা ত্রুটি ও অযোগ্যতা সত্ত্বেও আমি এই গৌরবের পদ গ্রহণ করিতে সাহসী হইলাম। কারণ, আমার বিশ্বাস—আমি অশেষ প্রকারে অযোগ্য হইলেও এই সনাতন কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষের ক্রোড়ে সনাতন বর্ণাশ্রম সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া—

যাবৎ মেরৌ স্থিতা দেবা যাবদ্ গঙ্গা মহীতলে
চন্দ্রার্কৌ গগনে যাবৎ তাবৎ বিপ্রকুলেবয়ম্।

পুরুষপরম্পরাক্রমে বাস করিয়া এবং সন্তান সন্ততি ক্রমে বাস করিবার আশা বুকে ধরিয়া যাহাতে অবাধে স্বধর্ম্মপালন ও স্বধর্ম্মসাধন পূর্ব্বক জন্ম সফল করিতে পারি তাহার জন্য উৎসাহ সহকারে অবিরত চেষ্টার আবশ্যকতা যেরূপ অনুভব করিতেছি তাহাতে আপনাদের কাহারও অপেক্ষা পশ্চাৎপদ থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নহে।

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র যখন সমুদ্র বন্ধন করেন তখন নগণ্য কাঠবিড়ালীও বালুকাবহনে অগ্রসর হইয়াছিল এবং তাহার সেই শুভকার্য্যে ঐকান্তিক আত্মনিয়োগের সার্থকতা—শ্রীভগবান নিজে স্বীকার করিয়া তাহাকে ক্রোড়ে স্থান দিয়াছিলেন। আমার বোধ হয় আমার মত ক্ষুদ্রশক্তি অকপটে ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে কোন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলে তাহা আপনাদের ন্যায় ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণের নিকট উপেক্ষিত হইবে না, ইহা ভরসা করিতে পারি। স্বধর্ম্ম-রক্ষা-প্রয়াসী হিন্দুগণ আজ এই বিরাট সভায় স্থির করিতে আসিয়াছেন বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সনাতনী হিন্দুদিগের সম্মুখে কি কি বিরাট সমস্যা উপস্থিত হইয়া আমাদের কি কি স্বার্থ কিরূপভাবে আক্রমণ করিয়াছে এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে আমরা সেই আক্রমণের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিব। এক্ষণে এই 'সনাতনী হিন্দু' এই কথার দ্বারা আমরা কাহারা, তাহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক; কারণ, দেশে আজ

'হিন্দুসভা' নামে পরিচিত একদল লোক হিন্দুর হিন্দুত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াও জগতের সম্মুখে, গবর্ণমেণ্টের সম্মুখে, নিজেদেরই অভিমত, সমগ্র হিন্দুজাতির অভিমত বলিয়া প্রকাশ করিয়া প্রতারণাপূর্ব্বক বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুর সর্ব্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহারা শাস্ত্রের সংস্কার করিবার ক্ষমতার দাবী করেন এবং নিজেদের Reformist বা সংস্কারবাদী হিন্দু এই নামে অভিহিত করিতে ইচ্ছা করেন। সনাতনী হিন্দুগণ, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ-প্রতিপাদিত চিরপ্রচলিত সদাচারপরিগৃহীত সনাতন ধর্ম্ম, যেরূপ তাঁহাদের পিতৃপিতামহ প্রভৃতি অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন সেই পথ অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক।

যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতা পিতামহাঃ
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ ন রিষ্যতে"

ইহাই এঁদের প্রধান কথা।

পূর্ব্বোক্ত সংস্কারবাদী তথাকথিত হিন্দুগণের মধ্যে বহুসংখ্যক বিলাতপ্রত্যাগত শিক্ষিত চতুর লোক থাকায় তাঁহারা বহুদিন হইতে দেশহিতৈষণার ছলনায় নানাপ্রকার সভাগঠন পূর্ব্বক দেশের লোকের মধ্যে প্রতিষ্ঠা ও রাজদ্বারে প্রতিপত্তি লাভের চেষ্টা করিয়া আসিতে ছিলেন। সনাতন হিন্দুসমাজ তাঁহাদের এই দেশহিতৈষণার কার্য্যে এতাবৎ সাহায্যই করিয়া আসিয়াছেন কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই। কিন্তু যখন তাঁহাদের দেশ-হিতৈষণা সমাজের চিরপ্রচলিত সদাচার এবং হিন্দুসমাজের মূলভিত্তি বিবাহ প্রথাকে আক্রমণ করিয়াছে তখন আর তাঁহাদের সহিত মিশিয়া না থাকিয়া নিজেদের সম্পূর্ণ পৃথকভাবে আত্মপ্রকাশ করার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

এক্ষণে আমরা আলোচনা করিয়া দেখিব, এই সকল সংস্কারকদল আমাদের সম্মুখে কি কি সমস্যা আনিয়া ফেলিয়াছেন। এই সমস্যা গুলিকে আমরা (১) রাজনৈতিক (২) ধর্ম্মনৈতিক, (৩) শিক্ষানৈতিক (৪) অর্থনৈতিক এই কয়ভাগে বিভক্ত করিয়া একে একে তাহার আলোচনা করিব। প্রথমতঃ আমরা রাজনৈতিক সমস্যার আলোচনা করিব, কারণ ইহাই মূল সমস্যা। ইহারই পোষকভাবে, শাখাপ্রশাখাভাবে অন্যান্য সমস্যা সমুদ্ভূত হইয়াছে।

বিগত ইউরোপীয় আন্তর্জ্জাতিক মহাসমরের পর জগৎ একটা বিশাল রাজনীতিক ঘূর্ণাবর্ত্তের ভিতর দিয়া চলিয়াছে। এই ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া কত দেশের রাজনীতিক অবস্থার যে কত পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে—তাহা মনে করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। কত প্রবল-প্রতাপ সম্রাটগণের সাম্রাজ্যচ্যুতি ঘটিল; সাম্রাজ্য ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া বহুখণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়িল; কত নূতন রাজ্য তাহার স্থানে গড়িয়া উঠিল। এই ভাঙ্গা গড়ার কাজ এখনও চলিতেছে, শেষ হয় নাই; কতদিনে যে হইবে ভবিতব্যতাই বলিতে পারেন। যে মূল রোগে এই ঝটিকা উঠিয়া সমগ্র জগতকে বিধ্বস্ত করিয়াছে, সেই মূল রোগের যদি প্রতীকার না হয় তাহা হইলে এই ঝটিকা আরও প্রবল ঘূর্ণিবাত্যায় পরিণত হইয়া জগতের যাহা কিছু

অবশিষ্ট আছে তাহাও ধ্বংস করিয়া ফেলিবে; তাহা কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না। কারণ, ইহার মূলে রহিয়াছে জগদ্ব্যাপী-সংঘবদ্ধ অধর্ম্ম হেতু বিক্ষুব্ধ মহারুদ্রের তাণ্ডবলীলা। কুতপস্বী ত্রিলোকবিজয়ী হিরণ্যকশিপুর উদর বিদারণপূর্ব্বক তাহার নাড়ীমালা পরিধান করিয়া ত্রিভুবন হুহুঙ্কারে প্রকম্পিত করিয়া শ্রীভগবান নরসিংহের নৃত্য বর্ণাশ্রমী হিন্দুর মানসচক্ষে সর্ব্বদাই রহিয়াছে। দেবগণপ্রমুখ বিশ্বচরাচর সে নৃত্যে ভীত ত্রস্ত হইয়া পড়িলেও ভক্তবালক প্রহ্লাদ তাহাতে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া তাঁহার প্রাণের হরিকে জগন্মঙ্গলে রত দেখিয়া সভক্তি স্তব করিয়া জগতকে রক্ষা করিয়াছিলেন। আজিও আবার সেই লীলার পুনরাভিনয় হইতে চলিয়াছে।

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরি সংক্ষয়ম্॥

জগন্মাতার এই আশ্বাসবাণীই অশেষ ধর্ম্মগ্লানির সময় সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী ভক্ত হিন্দুর মনে চিরদিন আশার প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিয়াছে। আজিও ইহারই উপর নির্ভর করিয়া স্বধর্ম্মে অবিচলিত থাকিয়া হিন্দু এই বর্ত্তমান নানা বিপ্লব হইতে উদ্ধার পাইবে এবং জগতের লোককে উদ্ধার করিবে।

অবাধে এই স্বধর্ম্মপালনে অবিচলিত থাকাই সনাতনী হিন্দু নিজেদের স্বার্থ বলিয়া মনে করে। রাজনীতিক স্বার্থভ্রষ্ট হইয়াও হিন্দুজাতি কাতর হয় নাই, "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" বলিয়া রাষ্ট্রনায়কগণকে যথোপযুক্ত সম্মান করিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই। অর্থনৈতিক পরাধীনতায় দেশের শিল্প বাণিজ্য বিদেশীর করতলগত দেখিয়াও তেমন চঞ্চল হইয়া উঠে নাই। কিন্তু আজ তাহার ইহ-পর-কালের সর্ব্বস্ব ধর্ম্মগত স্বাধীনতার উপর অযথা আক্রমণে হিন্দুজাতি অতিমাত্র বিক্ষুব্ধ হইয়াছে। এতদিন ধর্ম্মাচরণে বিশেষ হস্তক্ষেপ না হওয়ায় আমরা মনে করিয়াছিলাম, সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার আশ্বাসবাণীই আমাদের অবলম্বন—ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ হইবে না। এ ভ্রান্তি অবসানে, প্রতীকারের জন্যই সম্প্রতি পুণ্যক্ষেত্র বারাণসীধামে নিখিল ভারতীয় বর্ণাশ্রম-স্বরাজ্য-সংঘের স্থাপন ও বঙ্গদেশে তাহার শাখা বঙ্গীয় বর্ণাশ্রম-স্বরাজ্য-সংঘের আহ্বানে আজ পুণ্য মিথুন সংক্রান্তির দিবসে ধর্ম্মগ্লানি নিবারণের উপায় নির্ণয়ের জন্য ভগবৎসদৃশ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মহোদয়গণের সম্মিলন। চিন্তা-ক্ষেত্রে, ধর্ম্ম-ক্ষেত্রে বঙ্গদেশের উচ্চস্থান ভারতের সর্ব্বত্রই স্বীকৃত হইয়া থাকে। অদ্য এই বর্ণাশ্রম-স্বরাজ্যসংঘদ্বারা এক বিরাট সংঘশক্তি সংগঠন করতঃ দেশব্যাপী ধর্ম্মবিপ্লব নিরোধে বঙ্গদেশ ভারতের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা কখনই পশ্চাতে রহিবে না, এ আশা নিঃসঙ্কোচে করা যাইতে পারে।

এই বর্ণাশ্রম-স্বরাজ্য-সংঘ কি ভাবে গঠিত হইবে সংক্ষেপে এখন তাহার একটু আভাস দিব। এই বঙ্গীয় বর্ণাশ্রম-সংঘ অখিল-ভারতীয় বর্ণাশ্রমসংঘের শাখা স্বরূপে গঠিত হইয়াছে। অখিল ভারতীয় সংঘ ২০টি কেন্দ্রে সমস্ত ভারতবর্ষকে বিভক্ত করিয়াছেন; ইহার মধ্যে

মাদ্রাজে একটি স্বরাজ্য-সংঘ গঠিত হইয়াছে। "সনাতনিষ্ট" নামে তাঁহাদের একখানি সাপ্তাহিক পত্র সমস্ত ভারতের সঙ্গে যোগরক্ষার জন্য ইংরাজী ভাষায় বাহির হইতেছে। বোম্বাইতে অদ্য এক বর্ণাশ্রমী সংঘের অধিবেশন হইতেছে। এক্ষণে আমাদিগকে এই সকল প্রান্তীয় সভার সহিত যোগ রক্ষা করিয়া কাজ করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, এ সংঘটি প্রধানতঃ রাজনীতিক শক্তি লাভের উপায় স্বরূপ হইবে। সুতরাং বাংলায় যেমন স্বরাজিষ্ট দল আছে, তেমনই আমাদিগকে এই সনাতনী দল গঠন করিতে হইবে। বিলাতে যেরূপ রক্ষণশীল, উদারনীতিক, শ্রমিক প্রধানতঃ এই তিনটি দল আছে এখানেও ক্রমশঃ সেইরূপ ভাবে দল গঠিত হইয়া উঠিতেছে। উপস্থিত এখানে স্বরাজিষ্ট, ন্যাশনালিষ্ট, এই দুইটি প্রধান দল আছে; সনাতনীগণ রাজনীতির কচকচিতে কখন প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন নাই; কাজেই সংখ্যাবহুল হইয়াও ইঁহারা ঔদাসীন্য বশতঃ এ যাবৎ সংস্কারবাদীদেরই পক্ষে ভোট দিয়া আসিয়াছেন। এখন আর তাহা চলিবে না। এখন ব্যবস্থাপক-সভা প্রভৃতির প্রত্যেক পদটির জন্য নির্বাচন-দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কারণ, দেশের রাজকীয় শক্তি হাতে আসিলে অতি সহজে দেশের নানারূপ উপকার করিতে সমর্থ হওয়া যাইবে। সুতরাং যাহাতে ধার্ম্মিক, ত্যাগশীল, উপযুক্ত লোক শাসন ও তদানুসঙ্গিক বিভাগে প্রবেশ করিতে পারেন তাহার জন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে। এই সংঘ গঠন করিতে হইলে রাজনীতি সম্বন্ধে কোন বিশেষ মতবাদ সংঘের মূল রাজনৈতিক নীতি স্বরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, এবং একখানি পত্রিকা প্রচারদ্বারা নিজেদের মত সকলকে জানাইতে হইবে, তাহার উপকারিতা বুঝাইতে হইবে। দেশের উপযুক্ত লোক সংগ্রহ করিতে হইবে। এই সমস্ত কার্য্যই অর্থসাপেক্ষ। নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে লাগিতে গেলেই অর্থব্যয় করিতে হয়। এই অর্থব্যয় নির্ব্বাহের জন্য প্রত্যেক দলের একটা তহবিল থাকে। উহা হইতে সংবাদপত্র পরিচালনাদি নানাপ্রকার ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। বিলাতে এক একটা দলের বহু লক্ষ টাকা সেই সেই দলের তহবিলে সংগৃহীত আছে। এক্ষণে আমাদেরও সংবাদপত্রাদি পরিচালনার জন্য অন্ততঃ ১ লক্ষ টাকার তহবিল থাকার দরকার। বাঙ্গালা দেশে ২ কোটি হিন্দুর মধ্যে অন্ততঃ ১ লক্ষ সভ্য সংগ্রহের আশা করা যাইতে পারে। প্রত্যেক সভ্যের নিকট প্রবেশ ফি হিসাবে যদি ১৲ করিয়া (বার্ষিক চাঁদা বাদে) লওয়া হয়, তাহা হইলে ১ লক্ষ মেম্বর হইতে এই ১ লক্ষ টাকা অনায়াসেই উঠিতে পারে।

তাহার পর দেশে যত বিভিন্ন জাতি আছে প্রত্যেক জাতির প্রতিনিধি যাহাতে কার্য্যকরী সমিতিতে আসিয়া সভার কার্য্যাদির সংবাদ অবগত হইয়া আপন আপন সমাজের মধ্যে প্রচার করেন, তাহার ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। মনে রাখিতে হইবে, এ "জগন্নাথের রথ" ইহাকে সকলে মিলিয়া টানিতে হইবে। আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে, সমাজের পক্ষে ব্রাহ্মণও যেমন প্রয়োজনীয়, মুচিও তেমনি প্রয়োজনীয়। ইহার উদাহরণ, জগন্মাতার অর্চ্চনায় যেমন পুরোহিত নহিলে চলে না, তেমনি বাদ্যকরও একান্ত প্রয়োজনীয়; ব্রাহ্মণেরও

যেমন নৈবেদ্যে অধিকার আছে, বাদ্যকারেরও তেমনি নৈবেদ্য ও দক্ষিণায় অধিকার আছে। সুতরাং সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে

"বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।"

তবে সে সমতা বাহিরের সমতা নহে,—হৃদয়ের প্রেমে সমতা, কাহাকেও তুচ্ছ না করিয়া, ক্লেশ না দিয়া যথাধিকার তাহাকে স্নেহের চক্ষে দেখা। ঘরে আগুন লাগিলে সে সময় হয়ত ব্রাহ্মণ ঠাকুর অপেক্ষা মুচির সহায়তায় অধিক ফল পাওয়া যাইতে পারে। সকল জাতিকেই সমাজ-রক্ষার সহায়ক মনে করিয়া যথাযোগ্য অধিকার দিয়া সকল জাতিকেই সমাজ হিতসাধনে রত রাখিতে হইবে। যাহাতে নিম্নস্তরের জাতি সমূহেরমধ্যে স্বাস্থ্য, ধর্ম্মজ্ঞান, আর্থিক স্বচ্ছলতা ও লেখাপড়ার সুব্যবস্থা হয়, উচ্চসমাজকে সর্ব্বদা তাহারদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কারণ, নিম্ন সমাজের দৃঢ়তা ও শ্রদ্ধার উপর উচ্চ সমাজের উন্নতি নির্ভর করে। এইভাবে সকলকে লইয়া সংঘের জনবল ও ধনবল বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হইবে।

ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি—পৃথিবী একটা বিরাট রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত্তের ভিতর দিয়া চলিয়াছে। এই ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া পৃথিবীতে রাজনীতিক উলট পালট বিস্তর হইয়া গিয়াছে। ইউরোপীয় আন্তর্জ্জাতিক মহাসমরের ফলেই এই প্রকাণ্ড ঘূর্ণাবর্ত্তের সৃষ্টি। কিন্তু ইউরোপীয় মহাসমর—বহুকাল হইতে পুঞ্জীভূত সম্বাদ্ধ পাপের ষোলকলায় পূর্ণতার পর—আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় বহির্বিকাশ। প্রতীচ্যদেশ জড়বিজ্ঞানের শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া—তাহার প্রতি অত্যাশক্তি বশতঃ ধর্ম্ম বিজ্ঞানকে অনাদর করিতে আরম্ভ করিল। জড়-শক্তির দ্বারা বলবান হইয়া তাহারা সম্বাদ্ধ ভাবে জগতের অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল দেশসমূহের উপর আপতিত হইয়া নানা ছলে বলে কৌশলে তাহাদের উপর প্রভাব বিস্তার পূর্ব্বক দেশে প্রচুর ধনাগম করিতে লাগিল। সুতরাং এই সকল জড়বিজ্ঞানবিশারদদিগের সম্মান যেরূপ দেশে বাড়িয়া যাইতে লাগিল, ধর্ম্মযাজকদিগের শক্তি সেই পরিমাণে ক্ষীণ হইয়া পড়িল। ভগবানের উপর লোক শ্রদ্ধা হারাইল। কাজেই মানুষ জড়শক্তিকেই ভগবানের স্থানে বসাইয়া পূজা করিতে লাগিল। ধনী ধনগর্ব্বে দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি ভুলিয়া গেল। যাহার যেদিকে শক্তি আছে সে সেইদিকে শক্তিপ্রয়োগ করিয়া দুর্ব্বলকে যথাসাধ্য শোষণ করিয়া নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করিতে লাগিল। উৎপীড়িত দরিদ্রগণ ক্রমশঃ বুঝিতে আরম্ভ করিল যে ধনীর শক্তিরমূল তাহাদের নিজেদের শ্রম। সুতরাং যদি তাহারা সংঘবদ্ধ হইতে পারে তবে তাহারা ধনীদের শোষণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে। এই বুদ্ধি হইতে নানা প্রকার সঙ্ঘ উদ্ভূত হইল এবং ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে একটা ঘোর শত্রুতা চলিতে লাগিল। এই সময় দেশের রাজশক্তি যদি ধর্ম্মকে অবলম্বন পূর্ব্বক ধনী দরিদ্রের বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিতেন, তাহা হইলে ইহা অধিকদূর যাইত না; কিন্তু ধনবান রাজশক্তি সাধারণতঃ ধনীদিগেরই পক্ষ সমর্থন করিয়া নির্দ্দয় ভাবে দরিদ্রদিগকে কঠোর শাসন করিতে থাকায় দরিদ্র প্রজারা

রাজশক্তির উপরও অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল এবং রাজশক্তির ধ্বংসের নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিল। এইরূপ একদিকে প্রত্যেক রাজ্যে, রাজায় প্রজায় একটা বিরোধের সৃষ্টি হইল। তাহার পর পাপ, রাজাদিগের হৃদয়ে পরস্পরকে সন্দেহ ও অবিশ্বাসরূপে আত্ম-প্রকাশ করিল। একদিকে ধর্ম্মশক্তি পঙ্গু, অপরদিকে পাপ রাজায় প্রজায় ও রাজায় রাজায় বিদ্বেষ-বহ্নি ধূমায়িত করিয়া দিল। সামান্য একটু ফুৎকারে তাহা প্রজ্বলিত হইয়া সমস্ত ইওরোপ খণ্ডকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল। ইওরোপের রাজনীতিক জগতে বিরাট পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। নৃপতিগণ সিংহাসনভ্রষ্ট হইলেন; বহুদেশেই সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। সাম্রাজ্য চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িল। যুদ্ধ বহুদিন ধরিয়া চলায় দৈনন্দিন বহুকোটি মুদ্রাব্যয়ে ইওরোপ ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িল। কোটী কোটী লোকের রক্তে মেদিনী রঞ্জিত হওয়াতে দেশ জনবিরল হইয়া গেল। ধর্ম্মের দ্বারা অরক্ষিত সমাজের মধ্যে পাপস্রোত প্রবলবেগে প্রবেশ করিয়া গার্হস্থ্য প্রথা কলুষিত করিয়া তুলিল। আজ ধর্ম্মবলহীন ইওরোপ ক্রমে ধনবলহীন জনবলহীন হইয়া শিল্প বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া উত্তমর্ণ আমেরিকার পানে চাহিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে বসিয়া আছে। ইওরোপের রাজশক্তি ধর্ম্মহীন হইয়া পড়াতেই অতি অল্পদিনের মধ্যে তাহাদের এই শোচনীয় অবস্থা হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু পরস্পরের প্রতি সন্দেহ এখনও যায় নাই। যদিও নানা প্রকার সন্ধি, নৌবলনিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির দ্বারা রোগের বাহ্য উপসর্গ দূর করিবার চেষ্টা হইতেছে কিন্তু তাহাতে ভিতরের রোগ—(যাহা একমাত্র ধর্ম্মশক্তির দ্বারা নিবারিত হইতে পারে) এই যথার্থ ঔষধ—ভগবদ্ভক্তি ও মানব-প্রীতির অভাবে কিছুমাত্র উপশম না হইয়া ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতেছে—আর হয়ত কিছুদিন চাপা থাকিয়া আবার ভীষণভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া জগতে মহাপ্রলয়ের সূচনা করিবে।

যে রোগে ইওরোপের এই দুরবস্থা, সেই রোগ আজ ভারতবর্ষেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে; তবে এখনও সর্বস্তরে বিসর্পিত হয় নাই; উপরিভাগটা আক্রমণ করিয়াছে মাত্র। ইহার ফলে রাজায় প্রজায় একটা অবিশ্বাস, যাহা পূর্ব্বে ছিল না—তাহা ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে। ভিন্ন জাতীয় প্রজাদিগের মধ্যে পূর্ব্বে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে থাকিয়া স্বধর্ম্মপালন রীতি প্রচলিত ছিল; তাহার পরিবর্ত্তে আজ ধর্ম্ম লইয়া রাজনীতি লইয়া প্রাণান্তকর ভ্রাতৃদ্রোহের সৃষ্টি হইতে বসিয়াছে! ভারতের প্রত্যেক প্রান্ত হইতে এই সংঘর্ষের সংবাদ প্রতিনিয়তই আসিতেছে। ভারতে এমন কোন শক্তি দেখা যাইতেছে না যাহা এই বিবদমান শক্তি-গুলির মধ্যে বিশ্বাস ও প্রীতি আনয়ন করিতে পারে। বর্ণাশ্রমী হিন্দুকেই এই শক্তি-সামঞ্জস্যের গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

অন্য দেশে রাজায় প্রজায় স্বার্থ লইয়া যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয় তাহা তত জটিল নহে; কারণ, রাজশক্তি ও প্রজাশক্তি একই জাতি বা ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত এবং একদেশবাসী। কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্যক্রমে রাজা বিদেশবাসী ভিন্ন ধর্ম্মী বলিয়া এই রাজায় প্রজায় স্বার্থের মিলনের

পথটা হয়ত তেমন প্রশস্ত নহে। কারণ, প্রজার উপর রাজার পূর্ণবিশ্বাস স্থাপনও সহজে হয় না; প্রজাও হয়ত রাজাকে প্রাণ খুলিয়া বিশ্বাস করিতে সমর্থ হয় না। রাজায় প্রজায় এইরূপ বিশ্বাসভঙ্গের ফলে যে অস্বস্তির সৃষ্টি, তাহা যদি সময় থাকিতে দূরীভূত না হয়, তাহা হইলে পরিণাম যে কি হইবে,—তাহা না বলিলেও মানুষের বুঝিয়া উঠা কঠিন হইবে না। ভারতের প্রজাশক্তি এখন শতধা বিচ্ছিন্ন, সুতরাং মিলিত ভাবে একটা প্রতীকারের চেষ্টার সম্ভাবনা না থাকায় এই বিবাদ বহুদিন ধরিয়া চলিবার সম্ভাবনা। ভারতের প্রজাশক্তির মধ্যে মুসলমানগণ অপেক্ষাকৃত সঙ্ঘবদ্ধ। খৃষ্টীয় জাতিও সঙ্ঘবদ্ধ। হিন্দু জাতির মধ্যে কতকগুলি অহিন্দু প্রবেশ করিয়া হিন্দুসভা নামে নিজেদের সংঘবদ্ধ করিয়াছে এবং জাতীয় মহাসমিতির (কংগ্রেস) সহিত যোগ দিয়া তাহাকে অনেকটা শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছে। এই কংগ্রেসদলের মধ্যেও সনাতনী হিন্দুগণের অনেকে আছেন। কাজেই সনাতনী হিন্দুগন রীতিমতভাবে সঙ্ঘবদ্ধ না হইলে এবং কংগ্রেস হইতে তাঁহাদের নিজের লোকদের পৃথক করিয়া না লইলে তাঁহাদের দুর্ব্বলতা দূর হইবে না। যদি রাজশক্তির সহিত কংগ্রেস একটা মিটমাট করিয়া ভারতের নূতন প্রকারের শাসন-যন্ত্র গঠিত করিতে সমর্থ হয় আর সংস্কারক হিন্দুসভা তাঁহাদের সমর্থন করেন তাহা হইলে এই নবগঠিত শাসন-তন্ত্রের দ্বারা সনাতনী হিন্দুসমাজের ধ্বংস সাধনের জন্য যে কিরূপ চেষ্টা হইবে, তাহার নমুনা বিবাহ-বিচ্ছেদ-বিল, সতী বা অসতীকন্যার পৈত্রিক সম্পত্তিতে দায়াধিকার বিল, সতী বা অসতী বিধবার স্বামীর সম্পত্তিতে দায়াধিকার বিল প্রভৃতির সূচনাতেই বুঝা গিয়াছে। সুতরাং এখন হইতে তাহার প্রতীকারের জন্য আমাদের প্রস্তুত হইতে হইবে।

শাসন-তন্ত্র যেরূপই হউক, তাহা বিলাতী পার্লিয়ামেণ্টের মত যে কতক হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং সেই মহাসভার সভ্যসমূহ, যাঁহাদের হস্তে দেশের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের ভার থাকিবে, তাঁহারা ভোটাধিক্য দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন। সুতরাং বাঙ্গালাদেশে যখন হিন্দুর সংখ্যা প্রায় অর্দ্ধেক এবং সংস্কারক হিন্দুর সংখ্যা খুব অল্প তখন সংঘবদ্ধ ভাবে একটু চেষ্টা করিলেই শাসনযন্ত্রের অধিকাংশ স্থান যাহা হিন্দুদের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিবে তাহা ভোটাধিক্যে অধিকার করিতে পারা যাইবে। ঔদাসীন্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভোটদাতৃ-গণকে শিক্ষা দিতে হইবে,যেন তাঁহারা ধর্ম্মপরায়ণ সনাতনী হিন্দু ব্যতীত অন্য কাহাকেও কোন ক্রমে ভোট না দেন। এইটি কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে সনাতনী-কেন্দ্র গঠন করিয়া ভোটদাতাদিগকে প্রস্তুত করিয়া তুলিতে হইবে। এই ভোটদাত্রীগণের মত গঠন ব্যাপারটা প্রথমে অতি গুরুতর বলিয়া মনে হইতে পারে কিন্তু একটু অনুধাবন করি-লেই ব্যাপারটা তত কঠিন বলিয়া মনে হইবে না। বর্ণাশ্রমীহিন্দুগণ সকলেই আপন আপন গুরু ও পুরোহিতগণের শাসন এখনও পরিত্যাগ করেন নাই। বর্ণাশ্রম-স্বরাজ্য-সংঘের অধীনে একটি গুরুসংঘ ও একটি পুরোহিত-সংঘ গঠন করিয়া তাঁহাদের সাহায্যে সমগ্র সনা-তনী ভোটারদিগকে প্রভাবিত করিতে পারা কঠিন হইবে না। বর্ণাশ্রমসংঘ এই বিষয়ে

বিশেষ সচেষ্ট হইয়া যাহাতে এই গুরু-কেন্দ্র ও পুরোহিত-কেন্দ্র সৃষ্টি করিতে পারেন, ভরসা করি, আপনারা সে বিষয়ে-যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

কংগ্রেসপক্ষীয়গণ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পূর্ণস্বরাজ্য লাভের জন্য গত কংগ্রেসের অধিবেশনের পর হইতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। ইহার পূর্ব্বে তাঁহারা ডোমিনিয়ন ষ্টেটস্ দাবী করিয়াছিলেন। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট যখন ডোমিনিয়ন ষ্টেটস্ দিবার প্রতিশ্রুতি দিতেছেন, তখন গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে এই আইনঅমান্য পদ্ধতি লইয়া বিবাদের আর কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। ডোমিনিয়ন ষ্টেটস্ যখন পূর্ণস্বাধীনতার প্রায় নিকটবর্ত্তী এবং বিশেষতঃ যখন মুসলমান সম্প্রদায় কংগ্রেসের সহিত পূর্ণভাবে যোগদান করেন নাই, তখন আর বৃথা বিবাদে শক্তিক্ষয় অনর্থক। কংগ্রেস ভুলভাবেই হউক, আর ঠিকভাবেই হউক, নিজেদের বিবেচনা মত যাহাতে ভারতের হিত হয় তাহাই করিবার জন্য ধনপ্রাণ বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইয়া নানা কষ্ট সহ্য করিতেছেন। কংগ্রেস যে ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান এ বিষয়েও সন্দেহ নাই। সুতরাং মান্দ্রাজের ব্রাহ্মণ-সঙ্ঘ যেমন কংগ্রেসের নিকট দেশের ধর্ম্ম ও সমাজ সম্পর্কীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিতে অনুরোধ করিয়া মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আমাদেরও তদ্রূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করা এবং কংগ্রেসকে এই আইন-অমান্য আন্দোলন তুলিয়া লইয়া মিটমাটের জন্য অনুরোধ করার মন্তব্য গ্রহণ বিধেয় কিনা আপনারা তাহা বিচার করুন।

তাহার পর সংস্কারকেরদল আমাদের সমাজে দেশ উদ্ধারের ছলনা করিয়া কিরূপ সামাজিক বিপ্লব আনিয়া ফেলিয়াছেন, এইবার তাহা সংক্ষেপে বলিব। এই সংস্কারকদল বলেন, দেশের মধ্যে একতা আনয়ন করা ও হিন্দুসমাজকে পুষ্ট করিয়া, স্বরাজ আনয়ন করাই ইঁহাদের উদ্দেশ্য। তজ্জন্য ইঁহারা হিন্দুজাতির সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা আনয়ন করিতে চাহেন; এমন কি মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি জাতির সঙ্গে হিন্দুর যাহাতে সদ্ভাবের সৃষ্টি হয়, তাহাই ইঁহাদের উদ্দেশ্য বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা প্রথমেই হিন্দু-বিধবার বিবাহ, হিন্দুজাতি মাত্রেই ব্রাহ্মণ ও উপনয়নার্হ ইত্যাদি মতবাদ প্রচার করিয়া হিন্দুর প্রত্যেক শাখার মধ্যেই উপবীত ও অনুপবীত লইয়া নূতন বিবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। মুসলমানের মধ্যে শুদ্ধিপ্রথা প্রবেশ করাইয়া, হিন্দু মুসলমানে দারুণ বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত করিয়াছেন। তাঁহারা কি এইরূপে হিন্দুর প্রত্যেক শাখা জাতির মধ্যে বিবাদ আনয়ন করিয়া হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ বাধাইয়া জাতির পুষ্টিসাধন করিতেছেন, না জাতির সর্ব্বনাশ করিতেছেন? এক্ষণে সনাতনী হিন্দুদের উচিত ইহাদিগকে হিন্দু-সমাজধ্বংসের এই প্রচেষ্টা হইতে নিবৃত্ত করা। হিন্দুজাতির স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষিশিল্প প্রভৃতি সাধারণ উন্নতিকর বিষয়ের দিকে মনোযোগ দিয়া সনাতনী হিন্দুর সহিত পাশাপাশিভাবে দাঁড়াইয়া তাঁহারা সমগ্র হিন্দুজাতিকে সবল করিয়া তুলুন।

এইবার সংস্কারকগণ দেশের ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিরূপ বিপ্লব আনয়ন করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিব। হিন্দুর ধর্ম্ম তাহার গার্হস্থ্য জীবনের পবিত্রতার উপর নির্ভর করে। হিন্দুর বিবাহ দশবিধ সংস্কারের মধ্যে একটি প্রধান সংস্কার। সংস্কারকগণ গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে বাল্যবিবাহ রহিত করিয়া যুবতীবিবাহ করিতে বাধ্য করিবার চেষ্টা করিয়া হিন্দুর গার্হস্থ্য পবিত্রতার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। ক্রমশঃ—

নূতন স্বায়ত্ত শাসনের হাতে পরিত্রাণের উপায়

পুরাতন ব্যবস্থাপক সভার আয়ুঃ শেষ হইয়াছে, এইবার সাইমন রিপোর্টের অনুরূপ নূতন স্বায়ত্তশাসন আরম্ভ হইবে; ব্যবস্থাপক সভার প্রসার ও ক্ষমতা হয়ত কিছু বৃদ্ধি পাইবে, ক্ষমতাবৃদ্ধির অর্থ—সর্দ্দা আইনের মত ধর্ম্ম-সমাজ-বিধ্বংসী আইন প্রণয়নে সরকারের যতটুকু মুখাপেক্ষা করিতে হইত তাহা হয়ত আর করিতে হইবে না, ব্যবস্থাপক সভার ভোটেই এই প্রকার আইন কানুনের চরমসিদ্ধান্ত হইয়া যাইবে। সরকারের ইষ্টানিষ্ট যে সকল বিধি ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে বা দেশের দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান যাহাতে হইতে পারে সে সকল বিষয়ে যে বিশেষ ক্ষমতা বৃদ্ধি হইবে তাহা মনে হয় না। আস্তিক হিন্দু সম্প্রদায় এতকাল এই সকল বিলাতি অভিনয়ের ভাবনায় বিব্রত হয়েন নাই; ঐ সকল অভিনয়ে যোগদান ও প্রয়োজন বুঝেন নাই। যে সকল হিন্দু সন্তান এই প্রকার অভিনয়ে অভিনেতা সাজিবার আশায়—স্বদেশ স্বজাতি স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া বিদেশ হইতে প্রভূত অর্থব্যয়ে যোগ্য অভিনেতা সাজিয়া আসিয়াছেন তাঁহারাই এই সকল অভিনয় লইয়া বৃথা কোলাহল করিয়া আসিতেছেন,; দুর্ভাগ্য হিন্দুমাত্র স্বশক্তিতে তাহার ধর্ম্মকর্ম্ম ও পারিবারিক শান্তি শৃঙ্খলা যতটুকু সম্ভব রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। এতকাল আস্তিক সম্প্রদায়ের ধারণা ছিল স্বায়ত্ত শাসনের অর্থ—সাদা সাহেবেরা ভারতবাসীকে যে প্রণালীতে শাসন করে ভারতের কিয়ৎ সংখ্যক কালা সাহেব তাহার অংশীদার হইতে চাহেন। অর্থাৎ কিয়ৎসংখ্যক শিক্ষিত ভারতবাসী প্রার্থনা করেন তাঁহারা সর্ব্বভাবে সাহেব সাজিতে রাজি আছেন এবং স্বজাতির ও স্বীয় পিতৃপুরুষের—ধর্ম্ম কর্ম্ম আচার ব্যবহার রীতি পদ্ধতির গ্লানি কীর্ত্তন করিয়া সাদা সাহেবদেরকাছে সভ্যসাজিতেও সম্মত আছেন, যদি বিনিময়ে সাদাসাহেবেরা তাঁহাদিগকে ভারত শাসনের সমান অংশীদার করিতে সম্মত হয়েন। এতকাল ঐ প্রকৃতির হিন্দু সন্তানগণের দুর্ভাগ্য ও নির্বুদ্ধিতার জন্য আস্তিক হিন্দুসম্প্রদায় অনুতপ্ত হইলেও এক বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন, ঐ প্রকারের হিন্দুসন্তানগণ সাহেব সাজিয়া সাহেবী অভিনয়েই মত্ত থাকিতেন

সাদা সাহেবেরা যেমন হিন্দুর ধর্ম্ম কর্ম্ম সমাজ সামাজিকতায় হস্তক্ষেপ করে না ইঁহারাও তাহা করিতেন না; সাহেবী চালচলনেই চলিতেন—সাহেবদেরই মত ভারতীয় সমাজ হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিতেন—অনেকে সাহেব না বলিলে উগ্রমূর্ত্তি ধরিতেন।

সম্প্রতি অবস্থা একেবারে উল্টাইয়া গিয়াছে, ইঁহারা বাহিরে আর সাহেব সাজিতে চাহেন না, সাহেব না বলিলে উগ্রমূর্ত্তিধারণও করেন না পরন্তু নগ্নগাত্রে সজলনেত্রে আবার হিন্দুর দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। হিন্দুর সভ্যতা, হিন্দুর গৌরব, ভারতের বিশিষ্টতা ইত্যাদি নানাবিধ বক্তৃতাদান করিয়া বুঝাইতে চাহিতেছেন—তাঁহারা সাহেব সাজিয়া ও বিশুদ্ধ হিন্দু ছিলেন; আজ সাহেবী পোষাক ছাড়িয়া আরও বিশুদ্ধ হইয়াছেন অধিকন্তু আজ যে তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া হিন্দু হইতে চাহিতেছেন ইহা হিন্দুসমাজের পরম সৌভাগ্য, এ সৌভাগ্যের জন্য হিন্দু সমাজের কর্ত্তব্য, অবিচারিত চিত্তে তাঁহাদের আদেশ পালন করা। ইঁহারা বুঝিতে পারেন না—ইঁহাদের মত জনকত হিন্দু বর্ব্বরতার পরাকাষ্ঠা দেখাইলে ও হিন্দু-জাতিটা বর্ব্বর হইয়া যায় নাই, এখনও তাহার ধর্ম্ম আছে, সমাজ আছে, শাস্ত্র আছে, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত আছে, হিতাহিত বোধ আছে, আত্মসম্মান জ্ঞান আছে। ইঁহাদের মত জনকত ধর্ম্ম কর্ম্ম বিহীন হিতাহিত জ্ঞান শূন্য ম্লেচ্ছবুদ্ধি ব্যক্তিকে সমাজে স্থান দিয়া হিন্দুজাতি তাহার সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন কেন দিবে? গত্যন্তর নাই—যাহাদের পাদমূলে স্থানলাভের প্রত্যাশায় স্বজাতির সর্ব্বস্ব ছাড়িয়াছেন তাহাদের পাদমূলে স্থান লাভের আশা নাই, স্বজাতির গৃহে পুনঃ প্রবেশেরও সম্ভাবনা নাই; আছে শুধু বর্ব্বরতায় আত্মাভিমান আর ধিক্কার—বিকৃতচিত্তে প্রভুত্বের দুরাকাঙ্ক্ষা; এ অবস্থায় মানুষের ক্ষিপ্ত হওয়া স্বাভাবিক ইঁহারাও তাহাই হইয়াছেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি ইঁহারা বাহিরে আর সাহেব সাজিতে চাহেন না, কিন্তু অন্তরে যে সাহেব হইয়া গিয়াছেন তাহা হইতে মুক্ত হইতেও পারেন না সুতরাং অবস্থা এখন এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, অন্তরে ও পারিবারিক ব্যবহারে সাহেবী ভাব বজায় রাখিয়া শুধু বাহিরের বেশ পরিবর্ত্তন দ্বারা হিন্দু হইতে হইবে; শুধু হিন্দু হইলেই চলিবে না; বিলেত আমেরিকার প্রদত্ত যোগ্যতার প্রশংসা পত্রের যাহাতে অমর্য্যাদা না হয় তাহাও করিতে হইবে, অর্থাৎ হিন্দুর নেতা সাজিতে হইবে!

সর্ব্বাপেক্ষা বাহাদুরী দিতে হয় ইহাঁদের উপায় উদ্ভাবনী বুদ্ধির। সভ্যতা অর্জ্জন, জাতিগঠন, বিদ্যা উপার্জ্জন, দারিদ্র্য মোচন, সংগঠন, ধর্ম্মসংস্কার, সমাজসংস্কার প্রভৃতি কর্ত্তব্য সম্পাদনে এ পর্য্যন্ত যে উপায় উদ্ভাবন করিয়া আসিতেছেন তাহা জগতে অতুলনীয়; অনেকবার এ সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি, এবার হিন্দু হইবার উপায় উদ্ভাবনী বুদ্ধির একটু পরিচয় দিব।

হিন্দু সমাজে সাহেবী ভাবে ও সাহেবী পরিবারে ইংরেজী শিক্ষিতের মধ্যে অধিক সংখ্যক লোকের অনুরাগ থাকিলেও বাহিরে অনুরূপ ব্যবহার করিতে পারেন এমন লোকের সংখ্যা অধিক নহে, বিরাটহিন্দুসমাজে ইংরেজীশিক্ষিতের সংখ্যাই নগণ্য তাহারমধ্যে সাহেবীশিক্ষিতের

সংখ্যা সমুদ্রে শিশিরবিন্দুর সহিত তুলিত হইতে পারে এ অবস্থায় হিন্দুসমাজে প্রবেশের একটা উপায় উদ্ভাবন যে দুষ্কর ইহা অনায়াসে বুঝিতে পারাযায়, গান্ধীজী অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এক উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন অস্পৃশ্যতা পরিহার; অর্থাৎ নিম্নশ্রেণীর অসংখ্য হিন্দুকে যদি শাস্ত্রাদেশ পালক হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত করা যায় এবং যদি বুঝাইয়া দেওয়া যায় নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণের ইহাঁরাই বন্ধু, তাহা হইলে তাহাদের সহায়তায় নেতৃত্বের গৌরব লইয়া হিন্দুসমাজে প্রবেশেরপথ উন্মুক্ত করা যাইতে পারে। বুদ্ধির এমন প্রখরতা যে, বুঝিতে পারিলেন না—নিম্নশ্রেণীর হিন্দুও হিন্দু, তাহাদেরও শাস্ত্রে বিশ্বাস আছে, সমাজে শ্রদ্ধা আছে, দেব ব্রাহ্মণে ভক্তি আছে। তাহারা ম্লেচ্ছের অন্ন খায় না, ম্লেচ্ছ পদ্ধতিতে পারিবারিক জীবন যাপন করে না, সুতরাং এই প্রকার আন্দোলন উপস্থিত করিলে সমাজে বিপ্লব আনয়ন সম্ভব হইবে কিন্তু নিজেদের ম্লেচ্ছভাব লইয়া নিম্নশ্রেণীর হিন্দুসমাজেও প্রভাব বিস্তার করা যাইবে না। ফল ঠিক তাহাই হইয়াছে। আর এক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন স্বায়ত্তশাসন বা স্বাধীনতা। যদি স্বায়ত্তশাসন পান; অর্থাৎ সাদা সাহেবী শাসনের সমান অংশীদার যদি হইতে পারেন; তাহা হইলে প্রাণপণে লাগিয়া যাইবেন সর্দ্দা আইনের মত আইন প্রণয়নে; দণ্ডবিধির তাড়নায় বিব্রত করিয়া হিন্দু জাতিটাকে যদি কালা সাহেবে পরিণত করিতে পারেন তাহা হইলে সমাজের ভাবনাও নেতৃত্বের ভাবনা কিছুই ভাবিতে হয় না; পূর্ণ স্বাধীনতা পাইলে ত কথাই নাই, তাঁহাদের সাহেবী ভাব ও সাহেবী পরিবারের বিরুদ্ধে যাহারা কথা কহিবে তাহাদের হাতে মাথা কাটিবেন। পূর্ণ স্বাধীনতার ভাবনা আমরা ভাবি না, স্বাধীন ভারতে ইঁহারা যদি নিজেদের স্থান অন্বেষণ করিয়া লইতে পারেন লইবেন। ভাবনা স্বায়ত্ত শাসনের। যে স্বায়ত্তশাসনের নমুনায় সর্দ্দা আইন পাশ হইয়াছে, সেই স্বায়ত্তশাসন যদি সত্যই ইঁহাদের হস্তগত হয়, তাহা হইলে হিন্দু সমাজের পরিত্রাণের কোন উপায় দেখিতে পাওয়া যায় না, স্বায়ত্তশাসন যে ইঁহাদেরই হস্তগত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই, যেহেতু স্বায়ত্তশাসন দান করিবেন দাতা; ইহারা বহুকালের প্রার্থী; বিশেষত দাতার ধারণা—ইহাদের মত কএকটি ভারতবাসী দানের সৎপাত্র এ অবস্থায় যাহারা অন্তরে ও পরিবারে কালাসাহেব হইতে অসম্মত তেমন অপাত্রে দাতা স্বায়ত্তশাসন দান কিছুতেই করিবেন না, সুতরাং স্বায়ত্তশাসনের হাতে পরিত্রাণের একটা উপায় চিন্তা হিন্দুসমাজের একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে।

কংগ্রেসীদল হয়ত সাইমনী স্বায়ত্তশাসনে রাজি হইবেন না, গোল টেবিলেও হয়ত তাঁহাদের মনের গোল মিটিবে না; কারণ তাঁহাদের সব চেয়ে বড় আবদার রাজস্বের টাকা খরচে অধিকার থাকা চাই; এই অধিকারটা পাইলে অনেক অসুবিধা দূর হয়, এখন দরিদ্রের টাকায় যেমন সহর বিলাস করেন তখন বিলেত আমেরিকা বিলাস ও দরিদ্রের টাকায় করা চলিবে; হয়ত ব্যবস্থা হইবে শাসকমণ্ডলীর উত্তপ্তমস্তিষ্ক শীতল করিবার জন্য ইয়ুরোপের বড় বড় নগরে স্বাস্থ্যনিবাস প্রস্তুত করিতে হইবে। যাহাই হউক কংগ্রেসীদলের বন্ধু

বান্ধবগণ থাকিতে ব্যবস্থাপক সভা শূন্য হইবে না; সর্দ্দা, গৌর, জয়াকরের অভাব হইবে না; সর্দ্দা আইনের মত আইন প্রণয়ন করিয়া সভ্যসমাজে যোগ্যতা দেখাইতেও কেহ ক্রটি করিবেন না। এবিপদের হাতে পরিত্রাণের উপায় কি?

যদি কংগ্রেসীদলও তাঁহার অনুরূপ শিক্ষিতম্মন্য দলের সামাজিক অবস্থা শোচনীয় না হইত তাহা হইলে উপদেশের দ্বারা বা যুক্তিতর্কের দ্বারা এই প্রকার আত্মনাশকর কার্য্য হইতে তাঁহাদিগকে নিরস্তকরা সম্ভব হইত; সর্দ্দা আইন সম্পর্কে বুঝা গিয়াছে তাহা সম্ভব নহে; বরং যুক্তি তর্কের দ্বারা এই প্রকার কার্য্যের যত বেশী দোষ প্রদর্শন করা যায় ইহাঁদের আগ্রহ তত বৃদ্ধি পাইতে থাকে; কারণ কংগ্রেসীদলও তাহাদের অনুরূপ শিক্ষিত দল নিজেদের সামাজিক অবস্থার হীনতা ও দুঃসমাধেয়তা ইহাতে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারেন; তাহার ফল হয়—ভারতে নিজেদের সামাজিক অবস্থার অনুরূপ সামাজিক অবস্থার লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করার উপায়ান্তর না দেখিয়া আইনের আশ্রয় গ্রহণই একমাত্র কর্ত্তব্য বুঝেন।

আস্তিক হিন্দুসম্প্রদায় যেমন ব্যবস্থাপক সভাবর্জ্জন করিয়া রহিয়াছেন তেমনি যদি থাকেন এবং হিন্দুর ভোটে যে সকল ম্লেচ্ছভাবাপন্ন ব্যক্তি প্রবেশ করেন তাঁহাদের হিন্দুর সমাজ সংক্রান্ত কোন কথা বলিবার অধিকার নাই—যেহেতু তাঁহারা হিন্দু সমাজে হিন্দুরূপে পরিগৃহীত হয়েননা, ইহা যদি প্রমাণ করাযায়, তাহাতেও কোন ফল হইবেনা। বৃটিশ সরকার সামাজিক অবস্থা সন্ধান করিয়া হিন্দু অহিন্দু স্থির করেন না, সেন্‌সেসে হিন্দু বলিয়া যাহারা নাম লেখায় ও সংবাদপত্রে যাহারা হিন্দুনামে কীর্ত্তিত হয় তাহারাই সরকারী হিন্দু, সুতরাং সরকারকে প্রকৃত অবস্থা বুঝাইতে পারা যাইবে না সমাজে পরিত্যক্ত হইলেও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ইঁহাদের হিন্দুসমাজের প্রতিনিধিত্ব বজায় থাকিবে। এ অবস্থায় অবাঞ্ছনীয় ও অনিষ্টকর হইলেও আস্তিক হিন্দুসম্প্রদায়ের বিলাতী অভিনয়ে লিপ্ত হইতে হইবে, ঐ প্রকৃতির ব্যক্তিগণের শোচনীয় অবস্থা ও দুরভিসন্ধি সাধারণ হিন্দুসমাজে প্রচার করিতে হইবে, সাধারণ হিন্দুগণ ঐ প্রকৃতির ব্যক্তিগণকে যাহাতে ভোট না দেয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে, প্রয়োজন হইলে ইহাঁদের প্রতিপক্ষে সমাজ সেবক আস্তিকব্যক্তিগণকে দাঁড় করাইতে হইবে। ফলকথা নূতননির্ব্বাচনে যাহাতে ধর্ম্মভ্রষ্ট সমাজচ্যুত ব্যক্তিগণ হিন্দুসমাজের প্রতিনিধিরূপে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিতে না পারেন তাহার যথোচিত বিধি ব্যবস্থা এখন হইতেই করিতে হইবে। সর্দ্দা গৌর, জয়াকর, সত্যেন্দ্র প্রভৃতি যাহাতে আর ব্যবস্থাপক সভায় স্থান না পান তাহার জন্য তাহাদের নির্ব্বাচন কেন্দ্রে যাহাতে আন্দোলন উপস্থিত হয় তাহার ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। একার্য্যে অর্থবল লোক বল দুই প্রয়োজন; আমরা আশা করি হিন্দুমাত্রেই এ বিষয়ে যত্নবান্ হইবেন।

আমার ভাবনা

(বাবুর দলের কঃ পন্থাঃ)

আজকাল দেশের যে অবস্থা তাহাতে সকলেই ভাবনায় বিব্রত, এ সময়ে আমার ভাবনা যে কেহ শুনিবে বা বুঝিবে সে আশা আমি করিতে পারি নাই—তাই আমার ভাবনাও শুনাই না। তোমরা হয়ত ভাবিয়াছ, বাবুরদল যেরূপ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে টিকির সাহসে কুলায় না যে বাবুর দলের ভাবনা ভাবে। কথা বড় মিথ্যা নহে, তবে বাবুর দল আমার যে বিশেষ কিছু করিতে পারে তাহা কোন দিনই আমার মনে হয় নাই, শুনিয়াছি যেগুলা ষোল আনা জাতির খারিজ হইয়াছে তাহারা না কি ঘরে বসিয়া বাহ্বাস্ফোট করিয়া থাকে। যাউক বাজে কথা বাড়াইব না—আসল ভাবনা শুনাই।

তোমরা কি কেহ ভাবিয়াছ—এই যে সারা ভারতে রৈ রৈ কাণ্ড বাধিয়া গিয়াছে—লাঠি চলিতেছে, গুলি চলিতেছে, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা জেলে যাইতেছে, এ সকল যাহাদের নেতৃত্বে হইতেছে তাহারা চায় কি? তোমরা খবরের কাগজ পড়িয়া বুঝ ইহারা চায় পূর্ণ স্বাধীনতা তোমরা অবশ্য তাহাই বিশ্বাস কর; যাহারা খুন যখম হইতেছে, জেলে যাইতেছে, অসীম ক্লেশ স্বীকার করিতেছে তাহারাও তাহাই বুঝে; কেহ ভাবে না পূর্ণ স্বাধীনতা ইহারা কেন চাহে। ইহারা প্রথমে চাহিয়াছিল গোলামী; অর্থাৎ ভারতের শাসন যন্ত্রটা চালাইতে যে সকল কর্ম্ম করিতে হয় তাহার বড় বড় কর্ম্মগুলা করে সাহেবেরা আর ছোট ছোট কর্ম্মগুলা করাইয়া লয় ভারতবাসীর দ্বারা, শিক্ষিতের দল ইহা সহিতে পারিলেন না, তাই কংগ্রেস বসাইয়া আন্দোলন সুরু করিলেন—চাই সাহেবদের সমান চাকরী, দাতা বলিলেন বেশ, তাহাই দিব আগে তোমরা যোগ্যতায় সাহেবদের সমান হও। কি করিলে সাহেবদের সমান হওয়া যায়? দাতা বলিলেন বিলেত যাও, ইংরেজী শিখ, সাহেবী পোষাক পর, সাহেবী চালে চল, সাহেবী খাদ্য খাও, তাহা হইলে সাহেবদের সমান হইবে, 'তথাস্তু' বলিয়া তাহাতেই লাগিয়া গেলেন, সাধনার ত্রুটি করিলেননা—গোলামী মিলিল না। বলিলেন—অমন ছিটে ফোটা দিলে চলিবে না আমাদের স্বায়ত্ত শাসন দাও। দাতার আপত্তি নাই—যোগ্য হও দিব, যোগ্য হওয়ার উপদেশ গ্রহণ করিলেন, প্রাণপনে উপদেশ পালন করিলেন, সভা সমিতি আন্দোলন আলোচনা যাহা সাহেবেরা করে তাহার কিছুই বাকী রাখিলেন না। যাহা পাইলেন তাহাতে আশা মিটিল না মিটিবার সম্ভাবনাও বুঝিলেন না, বলিলেন—আমরা চাই না স্বায়ত্তশাসন, আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা দাও। বুঝ একবার বুদ্ধির দৌড়; যখন গোলামীর যোগ্যতা প্রমাণ করিতে পারিলেন না তখন চাহিলেন স্বায়ত্তশাসন, তাহাতে নিরাশ হইয়া চাহিলেন পূর্ণ স্বাধীনতা, এতবড় প্রখর বুদ্ধি যাঁহাদের তাঁহারা যে পূর্ণস্বাধীনতার যোগ্যতার দাবী করিবেন তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই।

বাবুর দলের সাহেবী যোগ্যতা অর্জ্জনে আমার টিকির দল কিঞ্চিৎ বাধা প্রদান করিয়াছিল—টিকির দল বলিয়াছিল ওরে মূর্খের দল! কোন লোভে পরকাল খোয়াইতে যাইতেছিস? সাহেবদের সমান হইবি এই লোভে? তোদের যাহা করিতে বলিতেছে তাহাতে সাহেবদের সমান হওয়া যাইবে না হইবি বিপরীত। সাহেবদের জাতি আছে, তোরা হইবি জাতির খারিজ; সাহেবেরা নিজের ভাষা শিক্ষা করে তোরা শিখিবি পরের ভাষা; সাহেবেরা নিজের পোষাক পরে তোরা পরিবি পরের পোষাক, সাহেবেরা তাহাদের খাদ্য খায়, তোরা খাইবি তোদের অখাদ্য, সাহেবেরা স্বজাতির কাছে আদর পায় তোরা পাইবি ঘৃণা, সাহেবদের ভাই বন্ধুরা তাহাদের আদর যত্ন করে, তোরা বাবার ঘরেও স্থান পাইবি না, সাহেবেরা স্বসমাজে হয় পূজিত, তোরা স্বসমাজে হইবি ঘৃণিত; এমন হইলে কি সাহেবদের সমান হওয়া যায়? তোরা জগতে অতুলনীয় জীবে পরিণত হইবি, এমন কাজ করিস না। মূর্খেরা আমার সদুপদেশত শুনিলই না অধিকন্তু টিকিকুল নির্ম্মূল করিতে কোমর বাঁধিল।

উপদেষ্টার দল এতকাল করতালি দিতেছিল—যোগ্যতার পুরস্কারের লোভ দেখাইতেছিল, আর সাইমন বাবাজীবন স্পষ্ট কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন। বাবাজীবন বিলেতের একজন মাথাল বিচক্ষণ লোক; তাহার উপর মাথাল ছয়জন সহকারী সঙ্গে আনিয়াছিলেন, বৎসরখানেক ভারতের এ দেশ সে দেশ ঘুরিয়া অনেক প্রমাণ প্রয়োগ সংগ্রহ করিয়া মন্তব্য লিখিয়াছেন—"ভারতের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের সহিত জগতের অন্য দেশের তুলনা হয় না, ইহারা ইয়ুরোপীয়ভাষা শিক্ষা করে—ইংরেজী ভাষায় কথা কয়—চিন্তা পর্য্যন্ত ইয়ুরোপীয় প্রণালীতে করে; তবে দেশের চিরন্তন ভাবধারার সহিত পরিচিত জনসাধারণের স[হি]ত ইহারা একটা সম্বন্ধ রক্ষার চেষ্টা করিয়া থাকে।

বাবুর দল বলে সাইমন কমিশন ব্যর্থ হইয়াছে, যেহেতু বাবুর দল কমিশনে স্থানলাভ করিয়া "হংস মধ্যে বকো যথা" তথা শোভা বর্দ্ধন করিতে পারে নাই। আমি বলি বাবুর দল শোভা বর্দ্ধন করিলেই সাইমন কমিশন ব্যর্থ হইত, বাবুর দলের এমন নগ্ন চিত্র পৃথিবীর সম্মুখে উন্মুক্ত করা কোনক্রমে সম্ভব হইত না। যাহাদের বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, রাজনীতি অর্থনীতি বুঝে, যাহারা বাবুরদলকে পৃথিবীর অতুলনীয় জীবে পরিণত করিতে পারিয়াছে, তাহারা কি এত বড় ভুল করে? শুন বাবুর দল! আমার ত যাহা করিবার করিয়াছ, এইবার গুরুর মুখে যে স্পষ্ট কথাটা শুনিলে তাহাতেও কি চেতনা ফিরিয়া আসিবে না? আজও কি একবার ভাবিবে না "তোমাদের কঃ পন্থাঃ"।

সাইমন্ বাবাজীবনেরা বাবুর দলের একটা ভাব ঠিক ধরিতে পারেন নাই; ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় অতুলনীয় জীব এটা সাইমন্ বাবাজীবনেরা ঠিক বুঝিয়াছেন কিন্তু ইহারা চিরন্তন ভাবধারায় অভ্যস্ত ভারতবাসীর সহিত সম্পর্ক রাখিতে চেষ্টা করিয়া থাকে এ কথাটা সত্য নহে, ইহারা একটু উপলব্ধ করিলেও সাইমন বাবাজীবনদের জাতি গোত্রের সহিত সম্পর্ক এত গাঢ় হইয়া গিয়াছে যে, তাহা ছাড়িতে কিছুতেই পারে না, এই যে সর্দ্দা আইন

পাশ করিবার জন্য ইহাদের মেয়ে পুরুষ গোষ্ঠী গোত্র উন্মাদ হইয়া উঠিলেন এটা কাহার সহিত সম্পর্ক রক্ষার জন্য? ইহাঁরা কি বুঝেন না, যে এমন কাজ করিলে ভারতের কোটি কোটি নর নারীর সহিত সম্পর্কের আশা ছাড়িতে হইবে? জগতে অতুলনীয় জীব হইলেও এতটুকু বুদ্ধি যে নাই তাহা মনে হয় না, তবুও যে এমন কাজ করিলেন সে কেবল সাইমন্ বাবাজীবনদের সহিত সম্পর্ক রক্ষার লালসায়। মিস্ মেও যে বই লিখিয়াছে তাহাতেই ত সাইমন বাবাজীবনদের সজাতিরকাছে মুখ দেখান দায় হইয়াছে, তাহার উপর যদি সভ্যদেশের অনুরূপ এমন আইন পাশ করিতে না পারেন তাহা হইলে কি আর রক্ষা আছে? সভ্যসমাজের অনুগল চিরদিনের জন্য উঠিয়া যাইবে, সুতরাং ভারতবাসীর ধর্ম্ম কর্ম্ম রসাতলে যাইতে হয় যাউক, ভারতবাসীর সহিত চিরবিচ্ছেদ ঘটে ঘটুক, বিলাত আমেরিকার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছেদ কিছুতেই সহ্য করা যাইবে না, সর্দ্দা আইন পাশে উন্মাদনার ইহাইত মর্ম্মকথা? সুতরাং সাইমন্ বাবাজীবন এ ভাবটা ঠিক করিতে পারেন নাই।

বাবুরদলের এও এক দুর্ভাগ্য, বাবুরদল সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিয়া শিক্ষা লাভ করিল সাইমন্ বাবাজীবনদের সহিত তুলনীয় হইবার জন্য; আর আজ সাইমন্ বাবাজীবনেরাই বলিয়া ফেলিলেন তোমরা শিক্ষালাভ করিয়া হইয়াছ জগতে অতুলনীয় জীব। বাবুরদল ভারতের ধর্ম্ম কর্ম্ম, সমাজ সামাজিকতা, বন্ধুবান্ধব, পিতামাতার সহিত পর্য্যন্ত সম্পর্ক ছাড়িলেন সাইমন বাবাজীবনদের সহিত সম্পর্কের আশায়; আজ সাইমন্ বাবাজীবনেরা বলে ইহারা ভারত বাসীর সহিত সম্পর্ক রক্ষা করিতে চেষ্টা করে; হায় বাবুর দল! আমার অন্তর্জ্জলির আয়োজনে তোমরা বিলক্ষণ পটুতা দেখাইতেছ, কিন্তু আমি মরণকালেও তোমাদের দুর্ভাগ্যের ভাবনা ছাড়িতে পারি না, এই মুমূর্ষুর শেষ কথাটা শুন—একবার ভাব—তোমাদের কঃ পন্থাঃ॥

শ্রী টিকি—

বঙ্গীয় বর্ণাশ্রম স্বরাজ্যসংঘ।

সম্প্রতি ১০৪নং অপার সারকুলার রোডে বঙ্গীয় বর্ণাশ্রম স্বরাজ্যসঙ্ঘের একটী বিশেষ অধিবেশন মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সুদূর মফঃস্বলের শাখাগুলি হইতেও কয়েকজন প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন, এবং কলিকাতা কালীঘাট, হাওড়া ও নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে বিশিষ্ট ভদ্রলোকগণ উপস্থিত হইয়া উৎসাহ সহকারে সভার কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে তাঁহাকে পুষ্পমাল্য দ্বারা অভিনন্দন করা হয় ও উপস্থিত মাননীয় ও পূজনীয় ব্যক্তিবর্গকে মাল্য দ্বারা অভ্যর্থনা করা হয়। সভাপতি মহাশয়ের সুচিন্তিত সারগর্ভ অভিভাষণ পাঠ শেষ হইলে শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায় মহাশয় যাঁহারা সভায় উপস্থিত হইতে অসমর্থ হইয়া উৎসাহ ও সমর্থনসূচক পত্র দিয়াছিলেন, তাঁহাদের পত্র পাঠ করেন। তন্মধ্যে উত্তরপাড়া রাজেন্দ্র ভবন হইতে শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, মালদাহিয়াপটি দিনাজপুর হইতে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের পত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

প্রথম প্রস্তাব—দেশের বর্ত্তমান রাজনীতিক ও সামাজিক অবস্থায় স্বধর্ম্ম ও স্বজাতি বিদ্রোহের নানা লক্ষণ প্রকটিত হওয়াতে এই সভা স্বধর্ম্ম-বিশ্বাসী হিন্দুগণকে অনুরোধ করিতেছেন যে, বঙ্গদেশে গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, মহকুমায় মহকুমায় ও জেলায় জেলায় সকল সনাতন ধর্ম্মবিশ্বাসী হিন্দুজাতি ধর্ম্ম ও রাজনীতিক স্বার্থরক্ষার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হউন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব—বর্ত্তমানে দেশের নানারূপ সামাজিক আন্দোলন সম্বন্ধে এই সভা যাহা সনাতন হিন্দুধর্ম্মের ও শাস্ত্রের অনুকূল, তাহারই সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন।

তৃতীয় প্রস্তাব—গত কয়েক বৎসর হইতে দেশে যে সাম্প্রদায়িক কলহের বিষ ছড়াইয়া পড়িয়াছে, এই সভা মনে করেন যে, ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ই যদি অন্যের ধর্ম্ম বিদ্বেষ ত্যাগ করিয়া স্বধর্ম্মে নিষ্ঠাবান হন, তবে বিরোধের সম্ভাবনা থাকিবে না।

চতুর্থ প্রস্তাব—ঢাকা প্রপীড়িত জনসাধারণের প্রতি এই সভা আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন এবং এ সম্বন্ধে প্রকৃত সত্য প্রকাশ করিবার জন্য এই সভা এই ব্যাপারের একটি নিঃশেষ তদন্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করেন এবং অনতিবিলম্বে তথায় শান্তিস্থাপন করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। ঢাকার প্রকৃত ঘটনা অবগত হইবার জন্য এই সভা তথায় উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণ সঙ্গত মনে করেন।

পঞ্চম প্রস্তাব—বাঙ্গালা দেশের সকল জেলায় জনসাধারণ স্বদেশ সেবার নামে যে প্রকার আত্মত্যাগের পরিচয় প্রদান করিতেছেন, এই সভা তাহার মূলে ভগবৎ কৃপা আছে বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং হিন্দু জনসাধারণকে অনুরোধ করিতেছেন যে, স্বধর্ম্ম বিশ্বাসী ও আত্মশক্তিতে আস্থাবান প্রত্যেক হিন্দু যেন স্বদেশ সেবার ভাবে প্রণোদিত হইয়া স্ব স্ব গ্রাম ও জনপদকে স্বপ্রতিষ্ঠ করিবার চেষ্টা করেন।

ষষ্ঠ প্রস্তাব—গত তিনবার লোক গণনার পদ্ধতির ফলে যে জাতি বিদ্বেষের উদ্ভব হইয়াছে তাহার প্রতিবিধান আবশ্যক বিধায় এই সভা সিদ্ধান্ত করেন যে বর্ত্তমান লোক গণনায় জাতি নির্ণয়ের যে প্রকার পদ্ধতি আছে তাহার আমূল পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয়।

সপ্তম প্রস্তাব—"এই সভা হইতে প্রচারক প্রেরণ করিয়া যাহাতে শুদ্ধাচার শাস্ত্রবিশ্বাসী

হিন্দুই রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানে হিন্দুসাধারণের সদস্য নির্ব্বাচন করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা হউক।

মুন্সীগঞ্জের কালীমন্দিরে যে অনাচারের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার প্রতিকার কল্পে স্থানীয় লোক মোকদ্দমা করিতে সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। এই সভা তাহা সমর্থন করিতেছেন এবং দেশবাসীকে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিতেছেন, এবং যতদিন উহা পুনরুদ্ধার না হয় ততদিন অপর একটী মন্দির নির্ম্মাণের চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

বঙ্গীয় বিদ্বৎ সম্মিলনের অষ্টমবার্ষিক মহোৎসব সভার কার্য্যবিবরণী।

বিগত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার হইতে ধূলজোড়া উজীরপুরে ৺শক্তিধর বিদ্বৎসম্মিলনীর উদ্যোগে বঙ্গীয় বিদ্বৎসম্মেলনের অষ্টম বার্ষিক মহোৎসব সভার অনুষ্ঠান একরূপ শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইয়াছে, এবারের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন নাটোর মহারাজের দ্বার পণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন বেদান্ততীর্থ মহাশয়। মূলসভার স্থায়ী সভাপতি পণ্ডিতপ্রবর উপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গঙ্গাদাস স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের বহির্বাটীস্থ প্রাঙ্গনে সভার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সভার সার্ব্বত্রিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য বিদ্বৎসম্মেলন পরিচালিত বিভিন্ন বিভাগের কর্ম্মি সদস্যগণ স্বেচ্ছাসেবকের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করায় সভাকার্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। নির্দ্দিষ্টদিন পূর্ব্বাহ্নে সম্মিলনীর সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিদাস দেবশর্ম্মা বেদস্মৃতি-তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের পৌরহিত্যে শ্রীশ্রী৺দামোদর পূজা শ্রীশ্রী৺চণ্ডীপাঠ প্রভৃতি দৈবকার্য্যের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় ও অপরাহ্নে সভাকার্য্য আরম্ভ হয়। সভারপ্রারম্ভে ব্রহ্মচারী সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীমান্ প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য সম্পাদক বিরচিত "ভারত জননীর সন্তানগণ আরঘুমঘোরে রহিও না" ইত্যাদি গভীর ভাবের উদ্বোধন সঙ্গীত তাল লয় সহকারে অনুষ্ঠান করিলে সম্মেলনের অন্যতম কর্ম্মী শিক্ষক শ্রীমান শশিকুমার ভট্টাচার্য্য সাহিত্যরত্ন বি, এ, মহাশয়ের প্রস্তাব ও রাজকীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাচীন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যদুনাথ কাব্যতীর্থ মহাশয়ের সমর্থনে চন্দননগর কালিদাস চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামরত্ন বেদান্তরত্ন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ লালিত্যপূর্ণ ভাষায় সংক্ষেপে অথচ দৃঢ়তার সহিত তুলনামূলক সমালোচনার সহিত সময়োপযোগী ভাবে দেশের ও সমাজের বিভিন্নস্তরের সামাজিকগণের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া তাহার ন্যায় ধর্ম্ম সঙ্গত সমাজপ্রবিষ্ট দোষ সমূহের সুসংস্কারের আবশ্যকতা বর্ণনা করিয়া আলো-

চিত বিভিন্ন সমস্যা সমূহের প্রতীকারকল্পে সমবেত সদস্যাগণও অনুপস্থিত সামাজিকগণের উদ্দেশে গম্ভীরভাবে অনেক আলোচনা করিয়া যথানিয়মে অভ্যর্থনা কার্য্য সম্পন্ন করিলে সভাপতি মহাশয়ের আদেশে বিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীমান হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য "নিবেদনং" শীর্ষক এক সংস্কৃত পদ্য প্রবন্ধ পাঠ করেন। অতঃপর সভাপতির অভিভাষণ।

সভাপতি মহাশয়ের সুবিস্তৃত চিন্তাপূর্ণ সময়োপযোগী অভিভাষণে সভ্যসাধারণের প্রসন্ন মুখশ্রী দর্শনে মনে হইয়াছিল সমবেত সভাগণ যথার্থই এই সদনুষ্ঠানলব্ধ পুণ্যভাগী হইতেছেন।

অভিভাষণে আলোচিত হইয়াছিল অভিভাবকের পুত্রাদির শিক্ষায় বর্ত্তমান কর্ত্তব্য। ধর্ম্মবিরুদ্ধ পরিচ্ছদের অ।কারিতা অভিভাবকের স্বেচ্ছাকৃত শৈথিল্য :সামাজিক দণ্ডবিধানের প্রবর্ত্তন। প্রত্যেক মানবের ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে দৈনন্দিন কর্ত্তব্য পালনে দৃষ্টি রাখার ব্যবস্থা। অনধিকারীর গীতাদি অধ্যাত্ম-বিদ্যালোচনার পরিণাম, উপযুক্ত—উপদেশক ও ধর্ম্মযাজক প্রস্তুত, প্রাচীন-প্রণালীর বৈশিষ্ট্য, সাধনশক্তির আবশ্যকতা, বর্ণাশ্রমসম্মত শিক্ষা বিধানের অবশ্যম্ভাবী ফল। পঞ্জিকাবিভ্রাটে ধর্ম্মকর্ম্মের অবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে অতি সুন্দর ও আলোচনা পূর্ণ অভিভাষণ শেষ হইলে দেশবাসী ধর্ম্মপ্রাণ সামাজিক সাধারণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এই প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য সকলকে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্য্যের আরব্ধকার্য্যের আপনারা সমবেতভাবে সাধ্যমত সহায়তা করিলে অবিলম্বে এই সদনুষ্ঠানের সকল দেশবাসীর ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের নিদান হইবে ইহা আমার আন্তরিক বিশ্বাস।

অতঃপর সম্পাদক বিদ্বৎসম্মিলনী পরিচালনাধীন শ্রীশ্রী৺দৈবানুষ্ঠান বিভাগের গত মাঘমাসব্যাপী চণ্ডীযাগে সাধনসমর আশ্রমের সাহায্য। সম্মেলনের অন্যতম স্থায়ী সভাপতি ৺নীলকান্ত তর্কবাগীশ মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ। বিদ্বৎসম্মেলন পরীক্ষা কেন্দ্রের পরীক্ষা গ্রহণে পোষ্টাফিস কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্যত্রুটী। ব্রহ্মচারী সংস্কৃত বিদ্যালয়ের পুরস্কার। সম্মিলনী বঙ্গবিদ্যালয়ের ৯ বৎসর ধারাবাহিক বৃত্তিপ্রাপ্তিসংবাদ। বীণাপাণি পুস্তক বিভাগের আশানুরূপ উন্নতির অভাব। সভ্যসাধারণের স্বীকৃত সাহায্যদানের অবহেলায় সম্মেলনের শাখাবিভাগীয় কার্য্যানুষ্ঠানে বিলম্ব হওয়া প্রভৃতির কথা বিশদভাবে আলোচনা পূর্ব্বক স্বরচিত "কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে নিবেদনং" শীর্ষক একটি সংস্কৃত কবিতা পাঠ করেন। এই সময়ে ৺নীলকান্ত স্মৃতিপদক নামে স্মৃতিশাস্ত্রের জন্য পদক প্রদানের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

অতঃপর কালীনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত রাধিকামোহন চক্রবর্ত্তী সনাতন শীর্ষক এক সুন্দর প্রবন্ধ ও নীলকান্ত স্মৃতি তর্পণ শীর্ষক কবিতা পাঠ করেন। এই সময়ে সভাপতি মহাশয়ের নির্দ্দেশক্রমে ইভিনা, ব্রাহ্মণ-সমাজের অন্যতম নেতা আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিদ্বৎসম্মেলনে দেশবাসীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। এই প্রসঙ্গে নিখিল ভারতীয় বর্ণাশ্রম স্বরাজ শাখা-বিভাগীয়

কার্য্য সম্বন্ধেও বিস্তৃত আলোচনা করিয়া প্রস্তাব করেন। মাননীয় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ শাস্ত্রীমহাশয়ের বিশেষ সাহায্য প্রাপ্তির জন্ম অবিলম্বে আবেদন করা হউক। উদ্দেশু কার্য্যে পরিণত করিবার পক্ষে অখিল ভারতীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগীতা একান্ত আবশুক। এইরূপ প্রস্তাব গৃহীত হয়। অনন্তর সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বহুবিষয়ের আলোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন সমাজ রক্ষায় রাজশক্তির স্থান। চানক্যের দণ্ডনীতী—পরিচালিত মৌর্য্যগণের তাৎকালিক সামাজিক অবস্থা। সমাজে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কুফল। বিধবার সংযমে ৺রাণীভবানী অহল্যাবাঈ প্রভৃতির চিত্র ইত্যাদি নানাবিষয়ের আলোচনা করিয়া বক্তৃতা শেষ করিলে প্রাচীন বক্তা স্মৃতিশাস্ত্রের প্রবীন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামগোপাল স্মৃতিতীর্থ মহাশয় সম্পাদক মহাশয়ের জীবনপণ চেষ্টা, স্বেচ্ছায় দারিদ্র বরণেও সম্মিলনীর প্রতি অনুরাগ, বিভিন্ন রূপের জটিল ব্যাপারেও প্রতিকার্য্যে সাফল্য লাভ প্রভৃতির কথা উল্লেখ করিয়া বিদ্বৎসম্মেলনের ধর্ম্মরক্ষার প্রস্তাব ও বিদ্যালোচনার কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের উপযোগিতা বর্ণনা করিয়া দীর্ঘ বক্তৃতার অবসানে রাত্রি প্রায় ৮॥ঘটিকায় সভাপতি ধন্তবাদের পর প্রথম দিনের সভাকার্য্য শেষ হয়। ধূলজোড়া আর্য্য-নাট্যসমাজ এক সুন্দর সামাজিক নাটকের অভিনয় করিয়া সমবেত জনগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় দিনের কার্য্য-বিবরণ।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার অপরাহ্নে পুনরায় সভাকার্য্য আরম্ভ হয়। সভাপতি আসন গ্রহণ করিলে সম্পাদক মহাশয়-প্রাপ্ত প্রবন্ধগুলির মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত কতিপয় প্রবন্ধ পাঠ করিবার অনুমতি প্রার্থী হইলে "ভারতের মর্ম্মবেদনা" শীর্ষক ওজস্বিনীভাষায় লিখিত প্রবন্ধ পঠিত হয়। পরে কালীঘাট ২৮নং মুখার্জীপাড়া রোড হইতে শ্রীযুক্তা "বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী লিখিত "কাপড় কাচা সোডা" প্রবন্ধটি পাঠ করা হয়। পরে আলিপুরের স্বনামধন্ত উকিল শ্রীযুক্ত উষাকান্ত মুখোপাধ্যায় রায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ কবিরঞ্জন, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত অরুণকান্ত স্মৃতিতীর্থ মহোদয় প্রভৃতির পত্র ও মন্তব্যগুলি পঠিত হইলে কতিপয় প্রস্তাব পরিগৃহীত হয়। পরে শ্রীযুক্ত হরিদাস তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় সভাপতি মহোদয় ও বিভিন্ন প্রদেশীয় সমাগত ভদ্রমহোদয়গণের উদ্দেশ্তে ধন্তবাদ প্রদান করিয়া জগদীশ্বর-পাদপদ্মে প্রার্থনা করেন।

যেন ধর্ম্মেন পুণ্যানি জগন্তি সমূহান্তাপি
মতির্ভবতু তত্রৈব সদৈবাশ্রম বাসিনাং।
ওঁ তৎ সৎ।

শ্রীশশিকুমার ভট্টাচার্য্য বি,এ।

সতীশচন্দ্রের অবসর গ্রহণ।

ব্রাহ্মণ-সমাজের পাঠকগণের নিকট সতীশচন্দ্রের নাম অপরিজ্ঞাত নহে, সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বড় লাটের আফিসে চাকুরী করেন, বড়লাটের আফিস কলিকাতায় থাকিতে সতীশচন্দ্রের ব্রাহ্মণসভার সহিত সম্পর্ক ছিল, দিল্লীতে যাইয়াও সতীশচন্দ্র সে সম্পর্ক বিস্মৃত হইতে পারেন নাই, শাস্ত্রে বিশ্বাস যাহার আছে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিতের উপর শ্রদ্ধা তাহার স্বভাবতঃই থাকিবে। সতীশচন্দ্র শাস্ত্রে বিশ্বাসবান্ তিনি সাধ্যানুসারে সৎপাত্রে দান করিয়া থাকেন। সতীশচন্দ্রের দান সাত্ত্বিক দান, আড়ম্বর নাই, প্রার্থনায় অপেক্ষা নাই, প্রত্যুপকার বা আত্মখ্যাপনের ইচ্ছা নাই; সাধ্যানুসারে পাত্রাপাত্র বিচারে প্রবৃত্তি আছে। সতীশচন্দ্র রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ৺কাশীবাস করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন, সেদিনও সতীশচন্দ্র ব্রাহ্মণসভার অধ্যাপক ও ছাত্রগণের ভোজনের জন্য টাকা পাঠাইয়াছেন, শ্রীযুক্ত ভবতারণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে তিনি নানাপ্রকারে সাহায্য করিয়া থাকেন। আমরা সৎপাত্রের জন্য যখন তাহাকে দান করিতে লিখিয়াছি তখনই সাধ্যানুসারে তিনি দান করিয়াছেন। আমরা বাবা বিশ্বনাথের কাছে প্রার্থনা করি সতীশচন্দ্রের কামনা পূর্ণ হউক; তিনি অবসর গ্রহণ করিয়া বিশ্বনাথের আনন্দধামে দীর্ঘজীবী হইয়া বাবা বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণার সেবা করিয়া কৃতার্থ হউন।

নমো ব্রাহ্মণ্যদেবায়।

ব্রাহ্মণ সমাজ

মাসিক পত্র।

অষ্টাদশ বর্ষ। { ১৮৫১ শক, সন ১৩৩৬ সাল, চৈত্র। } সপ্তম সংখ্যা।

রঘুনন্দন।

(ঐতিহাসিক ঘটনা)

সূত্রপাত।

লেখক—পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন।

এই রঘুনন্দন আমাদিগের স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য নহেন, এমন কি বাঙ্গালীও নহেন, ইনি মৈথিল ব্রাহ্মণ।

মৈথিল ব্রাহ্মণদিগের বহু পুরাতন কুলপঞ্জিকা আছে। রঘু নন্দনের ইতিহাস সেইকুল পঞ্জিকাতে আছে। দ্বারভাঙ্গার পূর্ব্বতন রাজসভাপণ্ডিত ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ মীমাংসক মহামহোপাধ্যায় বিনধর মিশ্র মহাশয় এই ইতিহাস, কুলপঞ্জী লিখিত কতিপয় মূল শ্লোক সহ আমার নিকটে প্রকাশ করেন, শ্লোক গুলি স্মরণ নাই একটি শ্লোক চরণ মাত্র স্মরণ আছে; তাহা এই—

"আয়াতে রঘুনন্দনে গজঘটাঘণ্টা রবঃ শ্রূয়তে"

পরের মুখে কান্তকুব্জাধিপতি মহারাজ জয়চন্দ্রের বিকৃত ইতিহাস শ্রবণ করি, প্রকৃত ইতিহাসের খবর রাখি না, এই রঘুনন্দনের অসামান্য আখ্যান ও বিস্মৃতি সাগরে নিমগ্ন তাই তাঁহারই কথা গল্পের আকারে কহিতেছি,—

(১)

বস্তর—মধ্য ভারতে জব্বলপুর অঞ্চলের এককুদ্র সামন্ত রাজ্য। মোগল সম্রাট আকবরের সময়েও এই রাজ্য ছিল। তাৎকালিক রাজা, মৈথিলপণ্ডিত নৈয়ায়িকপ্রবর মহেশ ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন, মহেশঠাকুর শ্রোত্রিয় সাগ্নিক ব্রাহ্মণ। বর্ত্তমান দ্বারবঙ্গা ধীশগণের পূর্ব্বপুরুষ।

সেই বস্তর নগরে রাজ ভবনের উদ্যান বাটিকায় এক দ্বাবিংশ বর্ষীয় পরমসুন্দর যুবা নিঃশব্দে বসিয়া আছেন, শ্রাবণের বৃষ্টিধারা মাথার উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে, যুবকের কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই। সত্যই কি যুবক! না যুবকের মর্ম্মরপ্রস্তরময় প্রতিকৃতি! প্রতিকৃতিই বোধ হয়, নতুবা এমন নিশ্চলতা জীবিত মানবদেহে কি সম্ভব!

যদি মৃত দেহই হয়, না না, প্রতিকৃতি ও নহে মৃতদেহও নহে ঐ যে দীর্ঘনিঃশ্বাস ঐ যে অস্ফুট হাহাকার, হায় এমনরূপেও এত দুঃখ!

"হায় হায়, যে আমি গুরুদেবের নিকটে এতদিন শুকদেব ছিলাম, বিনা অপরাধে সেই আমি আজ তাঁহারই নিকটে নরকের কীট!

আমার মিথ্যা কলঙ্ক তিনি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন! এতবড় পণ্ডিত, এতবড় পুণ্যশীল, আশৈশব আমার চরিত্রে বিশ্বাস সম্পন্ন মহাপুরুষ, আজ একজনের কথায় বিনা বিচারে আমাকে চরিত্রহীন মনে করিয়া কি তিরস্কারই করিলেন; হায় হায়। কি কুক্ষণেই আজ রাত্রি প্রভাত হইয়াছিল।

ভগবন্, তুমি অন্তর্য্যামী আমি যে নিরপরাধ, কেবল নিরপরাধ নহি, তোমারই অসীম কৃপায় অসামান্য পাপ প্রলোভনে মুগ্ধ হই নাই; কিন্তু দেব, তাহারই কি এই পুরস্কার!

ঠাকুর ক্ষমা কর, দুঃখার্ত্তের অপরাধ মার্জ্জনা কর, কি করিয়াছি, যে পুরস্কারের আশা করি।

আচ্ছা আমিই বা তখন গুরুদেবের তিরস্কারে মৌনী থাকিলাম কেন? কেন তাঁহার চরণে পড়িয়া অকপটে সত্যকথা সকল বলিলাম না কেন?

বলিলে, হয় ত আরও প্রমাদ ঘটিত; দরিদ্র আমি, আশ্রিত আমি, নিঃসহায় আমি; আর আমার প্রতিকূলে স্বয়ং রাজা দণ্ডায়মান, যিনি গুরুদেবের ছাত্রপালন ও অধ্যাপনার প্রধান অবলম্বন; যাঁহার ধার্ম্মিকতা ও বদান্যতায় আমার ন্যায় শত ছাত্র, গুরুদেবের অন্ন ও জ্ঞানদানে পরিতৃপ্ত, তিনি ক্রোধও ক্ষোভে, অপমান ও অভিমানে দীক্ষাদাতা গুরুদেবের নিকটে বিচারার্থী; গুরুদেব আমার কথায় কি বিশ্বাস করিতেন।"

যুবক রঘুনন্দন গুরু মহেশ ঠাকুরের সেবার্থ তাঁহার সঙ্গে বস্তরে আসিয়াছেন। প্রতিবর্ষে চাতুর্ম্মাস্য সময়ে মহেশ ঠাকুর বস্তরে যাইতেন, দুইচার জন চরিত্রবান্ শিক্ষিত ছাত্রকে সঙ্গে লইতেন, এবারে রঘুনন্দন তন্মধ্যে প্রধান। মহেশ ঠাকুর বস্তরে যতদিন থাকিতেন

ততদিন সর্ব্বপ্রদেশের শাস্ত্রীয় জটিল প্রশ্নের মীমাংসা ও অন্তঃপুরে পুরাণ ব্যাখ্যা শ্রবণ করা প্রাত্যহিক প্রধান কার্য্য ছিল। একদিন মহেশ ঠাকুরের শরীর অসুস্থ থাকায় তাঁহার বিশ্বস্ত ছাত্র রঘুনন্দনকে অন্তঃপুরে পুরাণ শুনাইবার জন্য প্রেরণ করেন। রঘুনন্দন যুবক ও অসামান্য রূপবান্, তাঁহাকে দেখিয়া ও তাঁহার পুরাণ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া রাজমহিষী চঞ্চলা হইলেন, আকার ইঙ্গিতে ফল হইল না দেখিয়া মহিষী নিজ বিশ্বস্ত অনুচরীর দ্বারা রঘুনন্দকে নিজ পাপ অভিসন্ধির কথা জানাইলেন, প্রচুর অর্থের প্রলোভনও দেখাইলেন। রঘুনন্দন তদুত্তরে জানাইলেন, বস্তরের রাজা আমাদিগের অন্নদাতা পিতা, তাঁহার মহিষী আমাদিগের মাতা। তাহাতে ও মহিষী ক্ষান্ত হ'ন নাই, নানা কৌশল জাল বিস্তার করেন। জিতেন্দ্রিয় রঘুনন্দন যখন কিছুতেই বশীভূত হইলেন না, অন্তঃপুর হইতে প্রস্থান করিলেন, তখন মহিষী রাজাকে অন্তঃপুরে আহ্বান করিয়া সরোদনে বলিলেন, গুরুদেব আজ স্বয়ং আসিতে না পারিয়া এক ছাত্রকে পুরাণ শুনাইতে পাঠাইয়া ছিলেন, ছাত্র পুরাণ কথাচ্ছলে এমন কুভাব প্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে আমি মর্ম্মাহতা হইয়াছি। রাজার উদ্যান বটিকায় প্রশস্ত হর্ম্ম্য গুরুদেবের বাসার্থ নির্দ্দিষ্ট ছিল। রাজা তৎক্ষণাৎ তথায় গমন করিয়া গুরুদেবকে মহিষীর বর্ণিত কথা বিবৃত করিলেন ও বলিলেন, গুরুদেবের ছাত্র না হইলে আমি স্বহস্তে ইহাকে বধ করিতাম। মহেশঠাকুর লজ্জিত ও ব্যথিত হইলেন, রঘুনন্দনের বধাশঙ্কায় ভীতও হইলেন, তখন রাজাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য এবং রঘুনন্দনকে শাসন করিবার জন্য যৎপরো নাস্তি তিরস্কার করিলেন, দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই তাহাকে সমাজচ্যুত করিবেন ইহাও বলিলেন।

তখনকার সমাজচ্যুতি সদ্‌ব্রাহ্মণের পক্ষে বধদণ্ডের সমান ছিল। রঘুনন্দন নির্ব্বাক্, অধোবদনে ভূমিতলে বসিয়া পড়িলেন। উপবাসে দিন কাটিল, রাত্রিকালে প্রবল বৃষ্টির সঙ্গে সেই গৃহত্যাগ করিয়া বৃক্ষতলে আশ্রয় লইলেন বাহ্যজ্ঞান নাই, চিন্তাশক্তিও যেন বিলুপ্ত, কেবল একটা নীরব গভীর হাহাকার বাড়বানলের শিখার মত অন্তরের নিভৃত প্রদেশ আলোড়ন করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল। রাত্রি দুইপ্রহরের পর রঘুনন্দনের সেই হাহাকার মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিল।

(২)

রঘুনন্দন, ভাবিলেন, সেই সময়ই আমার মৃত্যু হইল না কেন? রঘুনন্দন সহসা দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, ছি, নিরপরাধ ব্রাহ্মণ আমি মৃত্যু কামনা কি আমার করিতে আছে; সন্ন্যাসই আমার শ্রেয়ঃ, না, অশান্ত হৃদয় সন্ন্যাসের উপযুক্ত নহে। এই অপমানের মূলোচ্ছেদ করিতে হইবে, গুরুদেবের দারিদ্র্যই আমার অপমানের মূল, মিথ্যাকলঙ্কের মূল, উচ্ছাস্ত্রবর্ত্তী লুব্ধ রাজার প্রতিগ্রহ করিতে হয় গুরুদেবকে দারিদ্র্যের জন্য, উঃ ভাবিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে সেই প্রতিগ্রহের জন্যই এই দুষ্ট স্থানে আগমন, তাহার ফলেই

আমার এই নির্য্যাতন। আমি ব্রাহ্মণ, আমি অকপটে গুরু সেবা করিয়াছি, আমার কামনা কি পূর্ণ হইবে না?

রঘুনন্দন আবার বসিলেন, পদ্মাসনে বসিলেন, শরীর ঋজুভাবে রাখিয়া নিমীলিত নয়নে হৃৎপদ্মে ইষ্ট দেবতাকে স্থাপন করিলেন, তাঁহার মাধুরীতে হৃদয় আপ্লুত হইল। তিনি যেন শুনিতে পাইলেন, দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা।" সহসা তাঁহার মুখ মণ্ডল প্রসন্ন হইল, তিনি নিজ পাণ্ডিত্যে দিল্লীশ্বরকে তুষ্ট করিয়া গুরুদেবের দারিদ্র্য মোচনে সঙ্কল্প করিলেন।

অকূল সাগরে নিপতিত মানবের অতর্কিত পোত প্রাপ্তির ন্যায় সহসা সমুত্থিত এই সঙ্কল্প তাঁহার ইষ্টদেবতা কৃত কৃপা বলিয়া অনুমিত হইল।

প্রত্যূষে শান্তচিত্তে স্নান সন্ধ্যা বন্দনাদি করিয়া গুরুদেবের চরণে দণ্ডবৎ প্রণত হইলেন। স্নেহশীল গুরু পূর্ব্বদিনের উপবাসী অপরাধী ছাত্রকে কি বলিবেন ভাবিতেছেন ইতিমধ্যেই ছাত্র সবিনয়ে বলিলেন, "গুরুদেব, সময়ে হয়ত জানিতে পারিবেন আমি নিরপরাধ, আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন, আমার যেন অভীষ্ট সিদ্ধি হয় আমি দিল্লী গমন করিব।"

গুরুদেব বিস্মিত হইলেন তাঁহার কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই রঘুনন্দন তাঁহাকে পুনঃ প্রণাম করিয়া দ্রুতপদে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। গুরুদেব চিন্তামগ্ন, কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়াই তিনি নিষেধ করিলেন না, ইষ্ট দেবতার চরণে রঘুনন্দনের কল্যাণ কামনা আন্তরিক ভাবে করিলেন। ভাবিলেন, রঘুনন্দন সত্যই কি নিরপরাধ, নিরপরাধের প্রতি রাজা মিথ্যা দোষারোপ করিবেন কেন? কখন ত এরূপ করেন নাই। পুরাণের কোন আদি রসাশ্রিত যথাযথ কথা মহিষী যুবকের মুখে শুনিয়া হয় ত কুভাব মনে করিয়াছেন, রঘুনন্দন অতটা বুঝিতে পারে নাই, ইহাত হইতে পারে। গুরুদেব অনুতপ্ত হইলেন, সহসা ঐরূপ তিরস্কার করা ভাল হয় নাই। রঘুনন্দন মনের দুঃখে একাকী দিল্লী যাত্রা করিল. কত বিপদ হইতে পারে—এমন কি দস্যু হস্তে প্রাণও যাইতে পারে, আমি ত তাহা হইলে ব্রাহ্মহত্যার নিমিত্ত ভাগী হইব, গুরুদেব অন্তরে বিশেষভীত হইলেন। ভাবিলেন, এখনই তাহাকে ফিরাইবার ব্যবস্থা করি। আবার ভাবিলেন, রাজা ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, এ অবস্থায় এখানে থাকা অপেক্ষা রঘুনন্দনের স্থানান্তরে যাওয়াই উত্তম হইয়াছে।

মা দুর্গে—রঘুনন্দনকে রক্ষা কর। অশ্রুপূর্ণ নয়নে এই কথা মাকে বলিয়া গুরুদেব মনে শান্তি পাইলেন, হৃদয়ে বল পাইলেন, রঘুনন্দনের অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে তাহার কোন অমঙ্গল হইবে না এমনই একটা বিশ্বাসে হৃদয় পূর্ণ হইল।

(৩)

দিল্লীর রাজপথ, অগণিত পথিকে লোকারণ্য, এক যুবক পথিক চারিদিকে চাহিতেছে আর লোকের ধাক্কা খাইতেছে, সব অপরিচিত; বিভিন্ন প্রকারের উষ্ণীষধারী বিভিন্ন দেশীয় জনগণ কর্ম্মব্যগ্রতার সহিত গমনাগমন করিতেছে। কাহারও কথা কাহাকেও

জিজ্ঞাসা করিবার অবসর নাই। যুবক সহর দেখিয়াছে বটে, কিন্তু এতবড় সহর আর কখন দেখে নাই, এমনভাব তাহার কল্পনাতেও জাগে নাই। মিথিলার ব্রাহ্মণ পল্লী তাহার সুপরিচিত, সে দেখিয়াছে, নবাগত কোন ব্রাহ্মণকে পল্লীমধ্যে দেখিতে পাইলে, আদর করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, কোথায় তিনি যাইতেছেন, আতিথ্য স্বীকার করিয়া অনুগৃহীত করিতে হইবে ইত্যাদি। এখানে সেরূপ জিজ্ঞাসা কেহ করে না, উপযাচক হইয়া কথা কহিতে যাইলেও শুনিতে চাহে না। অনশনক্লিষ্ট পথশ্রমার্ত্ত যুবক অনির্দ্দিষ্ট লক্ষে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একটি চৌমাথায় উপস্থিত হইল, সম্মুখে এক বৃহৎ মুদিখানার দোকান, অসম্ভব ভিড়, যুবক কোনরূপে তাহার একপার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। দুই তিন ঘণ্টা বাদে ভিড় কমিল, মুদিদোকানের যিনি কর্ত্তা তিনি বাক্স সম্মুখে বসিয়া আছেন, টাকা পয়সা তিনি তুলিতেছেন, ভৃত্যেরা বিক্রয় করিতেছে। পরমসুন্দর বিদেশী যুবক, এই কর্ত্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ভিড় কমিল কর্ত্তা তাঁহাকে ডাকিলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া দোকানের কর্ত্তা বুঝিলেন, এই যুবক সম্রাট্ দরবারে গমনে অভিলাষী, কিন্তু আশ্রয়ও সহায় শূন্য নিঃস্ব মৈথিল পণ্ডিত। কর্ত্তা যুবকের আকার দর্শনে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, কথা শুনিয়া এখন তাঁহার দয়া হইল। কর্ত্তা বলিলেন, আমি সামান্য লোক দরবারে যাইবার ব্যবস্থা আমার দ্বারা হইবে না, তবে আপনি যতদিন এই দিল্লী সহরে থাকিবেন, আমার আশ্রয়ে থাকিতে পারেন—আমি সামান্য ব্রাহ্মণ। তখন প্রায় সকল ব্রাহ্মণই বিশেষভাবে অন্নবিচার করিতেন। রঘুনন্দনের স্বপাক ব্যবস্থা হইল। রঘুনন্দন প্রায় ১ মাস সেইখানে থাকিলেন, কিন্তু, দরবারে প্রবেশের কোন সুবিধা করিতে পারিলেন না।

দোকানের মালিক রঘুনন্দনের প্রতি বড়ই শ্রদ্ধাবান্ হইয়াছেন, প্রতিদিনই তাঁহার খবর লয়েন, অকৃতকার্য্যতার সংবাদে তিনিও ব্যথিত হইয়া থাকেন।

একদিন তিনি বলিলেন, পণ্ডিত মহাশয়! বাদসাহের এক উজীর আমাদিগের স্নান ঘাটের বামদিকে স্নান করিয়া থাকেন, তাঁহাকে যদি কোনরূপে ধরিতে পারেন।

রঘুনন্দন বলিলেন, মিশিরজী, এতদিন একথা ত বলেন নাই।

মিশিরজী অর্থাৎ দোকানের মালিক বলিলেন, ঐ উজীরের সহিত দেখা করাও ত সহজ নহে, আপনি যদি কোন সহজ উপায়ে কার্য্যসিদ্ধ করিতে পারেন তাই দেখিতে ছিলাম।

রঘুনন্দন উজীরের স্নানের সময় জানিয়া লইয়া সেই ঘাটে উপস্থিত থাকিলেন। তিনি বড় বড় পণ্ডিতের যমুনানদীতে স্নান দেখিয়াছেন। কত ছাত্র সঙ্গে যায়, উজীরের স্নান সেইরূপ বা আরও একটু আড়ম্বরের সহিত হইবে এই ভাবিয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন। এমন সময় অদূরে কোলাহল ও জয়ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল,—সম্মুখে কতিপয় অশ্বারোহী রক্ষী, পথ জনশূন্য করিতেছে, তাহারা আসিয়াই রঘুনন্দনকে সরাইয়া দিল, কত তিনি বলিলেন, উজীরের সহিত দেখা করিবার অভিপ্রায় জানাইলেন, অনুনয় বিনয় করিলেন,

কিছুতেই কিছু হইল না। রঘুনন্দন অকৃতকার্য্য হইয়া বাসায় ফিরিতে বাধ্য হইলেন। মিশিরজী—অপেক্ষা করিতেছিলেন,—রঘুনন্দনকে দেখিয়াই বুঝিলেন, ফল হয় নাই।

(৪)

রঘুনন্দন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়া উজীরের দর্শনলাভ করিলেন। যে ঘাটে উজীর স্নান করিতেন, তাহার প্রতিস্রোত বা উজান ঘাটে একটী বৃহৎ বটবৃক্ষ ছিল। রঘুনন্দন উজীরের স্নানের পূর্ব্বে আসিয়া বহু বটপত্র সংগ্রহ করিলেন ও নখচ্ছেদে প্রতিপত্রে সংস্কৃত শ্লোকে নিজের দুঃখ বর্ণনা করিয়া এক একটী পত্র যমুনায় ভাসাইতে লাগিলেন, পত্রাবলী যমুনার তরঙ্গে নাচিতে নাচিতে স্রোতে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। একেবারে শত শত পত্র সারি সারি চলিয়াছে।

রঘুনন্দন আজ মনে প্রাণে যমুনার শরণাপন্ন, মা, মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া কোন ফল পাই না, আজ আমি তোমার শরণ লইয়াছি, রঘুনন্দন ভক্তিভরে ইহাই মনে মনে বলিতেছেন।

উজীর স্নানে আসিলেন, মা যমুনাও রঘুনন্দনের প্রতি দয়া করিলেন, উজীরের দৃষ্টি সেই ভাসমান পত্রাবলির উপর নিপতিত হইল। উজীরের কৌতুহল জন্মিল, তিনি একজন অনুচরকে বলিলেন, সারবন্দী কত বটপাতা ভাসিয়া যাইতেছে। দু'চারখানা পাতা ধরিয়া আন। একজন সাতার দিয়া খান কয়েক পাতা আনিল। উজীর দেখিলেন, সকল-গুলিতেই নখের দাগ। সন্দেহ একটু গাঢ় হইল, তিনি দুইজনকে বলিলেন, উজানে দেখ কোথা হইতে এই বটপাতা এমনভাবে চলিয়াছে তাহার সন্ধান কর। তখনকার দিনে রাজপুরুষগণ অনেক বিষয়েই তথ্য অনুসন্ধানে বাধ্য হইতেন, কেননা অনেক রকম সন্ধান তখন দল বাঁধিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। সেই দল বাঁধা রাজার বিরুদ্ধেও হইত।

তখন দুইজন লোক উজানের দিকে ছুটিল ও অনতিবিলম্বে একজন প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বলিল, এক বিদেশী যুবক উজানের ঘাটে বসিয়া এই পাতা ভাসাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিলে কোন উত্তর দিল না, আপন মনে কি বলিতেছে, বোধ হয় একটু বায়ুগ্রস্ত। পাহারায় রাখিয়া আসিয়াছি এখন মহারাজের যা হুকুম হয়। উজীর হিন্দু, উপাধি মহারাজ। উজীর বলিলেন, তাহাকে আমার নিকট লইয়া এস, সিপাহী হুকুম পালন করিতে ছুটিল। উজীরের স্নানাহ্নিক সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই রঘুনন্দনকে লইয়া সিপাহীদ্বয় হাজির।

রঘুনন্দনের সৌম্য সুন্দর মূর্ত্তি উজীরের নয়নগোচর হইল। স্নানাদি সমাপ্ত হইবার পরে রঘুনন্দনকে বটপত্রের বিষয় জিজ্ঞাসা করা হইল। রঘুনন্দন নিজ দারিদ্র্য, শাস্ত্রাধ্যয়ন ও সম্রাটের অনুগ্রহপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, আমি যখন সম্রাট সদনে উপস্থিত হইবার এমন কি মহারাজের দর্শণলাভেরও সুবিধা করিতে পারিলাম না তখন অনন্যগতি হইয়া মা যমুনাকে আমার দুঃখকাহিনী বটপত্রে লিখিয়া জানাইতেছি। এই বটপত্রাবলীতে

আমার দুঃখগাথা নখের সহায়তায় অঙ্কিত করিয়াছি। উজীর দু'একখানি বটপত্রস্থ বর্ণনা পাঠ করিতে আদেশ করিলেন:

রঘুনন্দন, অশ্রুপূর্ণনয়নে তাহা পাঠ করিলেন। সৌম্যমূর্ত্তি মধুরস্বর, শান্তভাব, কবিত্ব, এবং দুঃখ দুর্দ্দশার নিপীড়ন। রঘুনন্দনে একাধারে বর্ত্তমান থাকিয়া উজীরের হৃদয় আকর্ষণ করিল। উজীর বলিলেন, ব্রাহ্মণঠাকুর, বাদসাহের দরবারে আমাদিগের শাস্ত্রীয় তর্ক এ সময় হইতেছে, আপনি যদি তাহার কোন পক্ষ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়েন- দরবারে সহজেই আপনার প্রবেশ এসময় হইতে পারে। আমি আপনাকে দরবারের বাহিরে কোন স্থানে বসাইয়া রাখিব। বাদসাহের হুকুম হইলেই আপনি প্রবেশ করিতে পারিবেন। এখন আপনার পাণ্ডিত্য আপনি বুঝিয়া আমাকে উত্তর দিন।"

রঘুনন্দন স্বীয় সামর্থ্যের কথা সবিনয়ে জানাইলেন। উজীর প্রফুল্লমনে বলিলেন, আপনাকে কল্যই দরবারে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতে পারিব এইরূপ আশা করি। পরদিন উজীরের সহিত রঘুনন্দনের যে ভাবে সাক্ষাৎ হইবে তাহার ব্যবস্থা তখনই হইয়া গেল।

(৫)

মিশিরজি এ সংবাদে বড়ই আনন্দিত হইলেন। তিনি মিতব্যয়ী হইলেও সহৃদয়। দরবারে প্রবেশের উপযুক্ত পণ্ডিতের পরিচ্ছদ তিনি সেইদিনেই ক্রয় করিয়া রঘুনন্দনকে দিলেন। পরদিন সেই উজীরের সহায়তায় বাদশাহের অনুমতি মতে রঘুনন্দন দরবারে প্রবেশলাভ করিলেন। পরে নিজগুণে সেই শাস্ত্রীয় তর্কে বিশেষ যশোলাভ করিতে সমর্থ হইলেন। সপ্তাহব্যাপী তর্ক হইয়াছিল, বেগম ও সাহাজাদীগণও পর্দ্দার অন্তরালে থাকিয়া এই তর্ক শ্রবণ করিতেন।

রঘুনন্দনের জয়যুক্ত যশোলাভে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দলাভ করিলেন বাদশাহের এক কন্যা।

বাদসাহ আর কেহ নহেন, স্বয়ং মোগল কুলতিলক আকবর।

(৬)

কন্যা আনতবদনে রুমালের জরী খুলিতেছেন। পিতা বাদশাহ আকবর বলিলেন, বল মা কি বলিতে আসিয়াছ। কন্যার প্রফুল্লকমল সদৃশ মুখমণ্ডল আরক্ত হইল, কিছু বলিতে পারিলেন না। বলিবার জন্য মুখ উদ্ঘাটিত করিলেন, বটে কিন্তু পারিলেন না।

বাদশাহ কন্যার ভাব লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, বেগমসাহেবা যা বলিতেছিলেন, সেই কথাই কি তুমি নিজে বলিতে আসিয়াছ?

কন্যা নীরবে বুঝাইলেন সেই কথাই বলিতে আসিয়াছেন। বাদসাহ বলিলেন, অযোগ্য পাত্র, পথের ভিখারী সেকি বাদশাহ জাদীর পতি হইবার উপযুক্ত? ইহাত আমি বেগম

সাহেবাকে বলিয়া দিয়াছি। মা. তোমার বিবাহ করিবার জন্য কত আমীর ওমরাহ লালায়িত, যে দিন তোমার ইচ্ছা সেই দিনেই যোগ্য পাত্রের সহিত তোমার বিবাহ দিব।"

কন্যার নয়ন এবার একটু উজ্জল হইল, অভিমানের অশ্রু কি ক্রোধ রাগ এই উজ্জলতা আনিয়া দিল তাহা বুঝা কঠিন। তিনি মুখ তুলিয়া বলিলেন, অযোগ্য পাত্র তিনি আমার পক্ষে হইতে পারেন, আমি মানবী তিনি দেবতা বলিয়া; দরিদ্র বলিয়া নহেন। খুব নরম স্বরে কথা কয়টী বলিয়া বাদশাহ জাদী রুমালে চক্ষু আবৃত করিলেন।

স্নেহময় পিতা আদর করিয়া বলিলেন, কাঁদিতেছিস মা।

কন্যা ত্বরায় নয়ন মার্জ্জনা করিয়া লইলেন। কিন্তু অশ্রু রোধ হইল না। আবার নয়ন মার্জ্জনা করিলেন এবার গভীর লজ্জায় অশ্রু রোধ হইল।

পিতা বলিলেন, মা রঘুনন্দন পণ্ডিতকে কি ধনী ভাবিয়াছ!

কন্যা ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন. তাহা ভাবেন নাই।

পিতা বলিলেন, দরিদ্রের সহিত বাদশাহ জাদীর বিবাহ কি হইতে পারে!

কন্যা তখন মৃদুস্বরে বলিলেন, ব্রাহ্মণ হিন্দুস্থানের শ্রেষ্ঠ জাতি, শ্রেষ্ঠ পাণ্ডিত্যের পুরস্কার বাদশাহ স্বয়ং তাঁহাকে প্রদান করিতে উদ্যত। রূপ অতুলনীয়। বাদশাহ প্রসন্ন হইলে তাহার কি দারিদ্র্য থাকিতে পারে। আর বলিতে পারিলেন না।

বাদশাহের মুখ গম্ভীর হইল, তিনি বলিলেন, মা, রঘুনন্দন যদি এ বিবাহ করিতে সম্মত না হয়,—আমি অনেক ব্রাহ্মণ দেখিয়াছি যাহারা কোন রূপ প্রলোভনেই মুগ্ধ হয় না।

কন্যার মুখ বিবর্ণ হইল, তিনি অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, তাহা হইলে আমার অদৃষ্টে বিবাহ নাই।

এমন ভাবের কথা যে হইবে তাহা পিতা পুত্রী কেহই মনে করেন নাই। একজনের প্রেরণায় কিন্তু তাহাই হইয়া গেল।

(৭)

দরবারে যশোলাভের পর হইতেই রঘুনন্দনের বাসস্থান পৃথক হইয়াছে, তিনি এখন আর মিশিরজীর আশ্রয়ে নাই। উজীরের আশ্রয়ে পৃথক উৎকৃষ্ট ভবনে তিনি আছেন। আজ উজীর স্বয়ং তাঁহার ভবনে আসিয়া অধিকতর সম্ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন এবং এমন কথা বলিয়াছেন যাহার উত্তরে রঘুনন্দন বলিলেন, মহারাজ, আপনি আমার আশ্রয়, ব্রাহ্মণ রক্ষক ক্ষত্রিয় নরপতি, আপনি আজ আমাকে এরূপ কথা বলিলেন। রঘুনন্দনের কণ্ঠস্বর বাষ্পে রুদ্ধ হইল।

উজীর সবিনয়ে বলিলেন, ঠাকুর, বোধ হয় আপনি ভাবিয়াছেন, আপনার মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করিতে হইবে; কিন্তু তাহা নহে। আপনি ব্রাহ্মণই থাকিবেন, কেবল বাদশাহ জাদীকে বিবাহ করিবেন।

বর্ত্তমান বাদশাহ অতি উদার, তিনি ধর্ম্মমতে সকলেরই স্বাধীনতা প্রদানে অকুণ্ঠিত। রঘুনন্দন সহাস্যে বলিলেন, মহারাজ, ধর্ম্মগ্রহণে তত পাপ নহে যবনী সংসর্গে যত পাপ। একবার মাত্র যবনী সংসর্গে আমি যবনের সমান হইয়া যাইব। কিন্তু যদি যবনের সহিত পানভোজন প্রভৃতি সংসর্গ না করি ও যবনী গ্রহণ না করি, তাহা হইলে, কেবল কল্মা পড়িয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে আমি যবনের সমান হইব না। যবনের সমান হইলে চতুর্ব্বিংশতি বর্ষব্যাপী কঠোর ব্রত বা ৪৮ চন্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত। কেবল ঐ ধর্ম্মগ্রহণে বড় জোর একটি চন্দ্রায়ণ বা ষাণ্মাসিক ব্রত প্রায়শ্চিত্ত।

উজীর সবিস্ময়ে এই সব কথা শুনিয়া বিষণ্ণ ও গম্ভীর হইলেন। বলিলেন, ঠাকুর, আমি বাদসাহের আজ্ঞাকারী, আমার অপরাধ লইবেন না। এই প্রস্তাবে আপনি অসম্মত হইলে আপাততঃ তিন মাসের জন্য বন্দী হইবেন,—যদি ইতিমধ্যে আপনার মত পরিবর্ত্তন করেন উত্তম, নতুবা প্রাণদণ্ড হইবে,—ইহাই বাদশাহের আদেশ।

উত্তরের প্রতীক্ষায় উদ্বেগপূর্ণ দৃষ্টিতে উজীর রঘুনন্দনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রঘুনন্দনের নয়ন হইতে অগ্নি নির্গত হইল জল নহে। তিনি দৃঢ় ও শান্তকণ্ঠে বলিলেন।

"ন জাতুকামান্নভয়ান্ন লোভাৎ
ধর্ম্মং জহ্যাজ্জীবিতস্যাপিহেতোঃ।"

আমি ব্রাহ্মণ মৃত্যুভয়ে ভীত নহি, আমি অচল সনাতন।

উজীর সজলনয়নে প্রস্থান ক'রিলেন। সেই গৃহই রঘুনন্দনের তাৎকালিক কারাগৃহে পরিণত হইল।

(৮)

অদ্য সেই তিনমাস পূর্ণ। বন্দী রঘুনন্দনের বাসস্থান বাদশাহের অন্তঃপুর সন্নিহিত খোজা পরিবেষ্টিত প্রকোষ্ঠে মাসাবধি পরিবর্ত্তিত। বাদশাহ জাদী প্রতিদিনই আসিয়া রঘুনন্দনের নিকট অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া যান। রঘুনন্দন কিন্তু এখনও অটল। তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত।

সন্ধ্যার সময়ে সেই বিশ্বস্ত বৃদ্ধউজীর সমভিব্যাহারে স্বয়ং বাদসাহ বন্দীর নিকট আসিলেন। তাঁহাকে উজীর বিবিধ প্রকারে বুঝাইলেন, কিন্তু রঘুনন্দন নিজধর্ম্ম বিশ্বাসে সুদৃঢ়, তিনি কিছুতেই বিবাহে সম্মত হইলেন না। এই রাত্রি প্রভাতেই তাঁহার মস্তক ছেদন হইবে উজীর এ কথা ও জানাইতে কুণ্ঠিত হ'ন নাই। তখন রঘুনন্দন বলিলেন—

"জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু র্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্যচ।"

তখন উজীর বাদসাহের নিকট হইতে বিদায় লইলেন ও অশ্রুপূর্ণ নয়নে রঘুনন্দন ঠাকুরের পদধূলি গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

তখন বাদসাহের অনুমতি অনুসারে বাদসাহজাদী আসিয়া বাদসাহের চরণ তলে নিপতিতা হইলেন। আজ তাঁহার লজ্জা নাই, সঙ্কোচ নাই। নয়ন দীপ্তিময়, মুখমণ্ডল পবিত্রভাবে উজ্জল। তিনি বন্দীর জন্য পুনঃ পুনঃ ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি কাতর ভাবে জানাইলেন, "বন্দীর প্রাণদণ্ডে আমি জীবন রাখিতে পারিব না। আমি হিন্দুরমণীর ভাবকে শ্রেষ্ঠ মনে করি, আমি কখনই দ্বিচারিণী হইব না। ইনি আমাকে যবনী বলিয়া ঘৃণা করিলেও—আমাকে এ শরীরে গ্রহণ না করিলেও ইনিই আমার পতি, যে ঈশ্বর ইহাঁকে সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি আমার মন জানিতেছেন, এ শরীরে না হউক তিনিই আমাকে ইহাঁর সহিত মিলাইয়া দিবেন। আপনি পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি, আপনার চরণে আমার কাতর প্রার্থনা এই যে বন্দীকে মুক্তি দান করেন। আর ইহাঁর প্রতি কৃপা রাখিবেন।"

"ইনি জীবিত আছেন, ও আপনার কৃপা ইহাঁর প্রতি আছে, ইহা জানিলেও আমি আমার অবিবাহিত জীবন সুখে কাটাইতে পারিব।"

বাদসাহ, কন্যাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, তাহাই হইবে।

রঘুনন্দন ভাবিলেন, "আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি।"

(৯)

আজ রঘুনন্দনের নয়নে নিদ্রা নাই আকাশ পাতাল ভাবিতেছেন। বাদসাহ নন্দিনীর হৃদয়ের উচ্চতা ও প্রণয়ের গভীরতায় তাঁহার চিন্তা বিপর্য্যস্ত। তিনি ভাবিতেছেন, যবনী হইলেও হৃদয়ে এ রমণী দেবী। বস্তরের নগণ্য রাজমহিষীর চরিত্র মনে পড়িল, আর এই বাদসাহজাদীর চরিত্র তাহার পাশে রাখিয়া রঘুনন্দন ভাবিলেন, হিন্দুরমণী এত নীচ হইয়া গিয়াছে, আর যবনী কত উচ্চে। আবার ভাবিলেন, পদ্মফুল পঙ্ক হইতে জন্মে, কুসুমেও কীট হয়। চিন্তার বেগ অন্যত্র উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিলেন এই আমার প্রাণদাত্রী, চিরদিন অবিবাহিত জীবন যাপন করিবে, ইহাতে কি আমি পাপী হইব না। একটু নিস্তব্ধ হইয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। বিচার করিয়া বলিলেন, আমার পাপ কেন হইবে, আমিত ইহাঁকে প্রলুব্ধ করি নাই। পতঙ্গ স্বেচ্ছায় আগুনে ঝাঁপ দিলে, আগুনের তাহাতে অপরাধ কি?

এবার কি ভাবিয়া রঘুনন্দন শিউরিয়া উঠিলেন। যদি আমার পত্নী বস্তরের রাজমহিষীর মত দুশ্চরিত্রা হয়। দূর হউক বিবাহ না করাই ভাল। একটু প্রকৃতিস্থ হইলেন। পরক্ষণেই ভাবিলেন, অনাশ্রমী হইয়া থাকিতে যে শাস্ত্রের নিষেধ আছে। আবার চঞ্চল হইলেন, চঞ্চলতা বৃদ্ধিপাইল, ভাবিতেছিলেন, এই বাদশাহজাদীকে তিনি ভুলিতে পারিবেন কিনা। শেষ স্থির করিলেন, ইহাঁকে ভুলিতে পারা অসম্ভব। তবে ত মানস পাপ আমার হইয়াছে—"মানসৈরন্ত্য জাতিতাম্" হায় আমার ভাবীজন্মের যবনত্ব অনিবার্য্য। বড় দুঃখ হইল। তখন বিচার করিলেন, কলিতে মানস পাপ নাই, একটু দুঃখের লাঘব হইল।

পরক্ষণেই মনে আসিল। "যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং। তংতমেবৈতি" ওঃ সর্ব্বনাশ, মৃত্যু কালেও যে এভাব মনে আসিবে না তাহাও বোধ হয় না। মানস পাপ কলিতে না হইলেও মৃত্যুকালে চিন্তা অনুসারে পর জন্ম হয়। এই রমণীর প্রণয় চিন্তা আমাকে যে মৃত্যুকালেও ছাড়িবে এমনত বোধ হয় না।

রঘুনন্দন ভাবিলেন, হায় কেন বস্তরে আসিয়াছিলাম, বস্তর হইতেই আমার এই সর্ব্বনাশ। বিবাহ করিলে ত জাতিচ্যুত ও যবন সমান ইহ জন্মে হইব, পরকালে নরক ভোগ করিব। আর বিবাহ না করিলেও সদা চিন্তা ও মৃত্যুকালীন ভাবনার ফলে পরজন্মে যবন হইব। ওঃ কি ভীষণ পরিণাম, ব্রাহ্মণ আমি জীবনের গণাদিন শেষ হইলেই আমাকে যবন হইতে হইবে। তবে বর্ত্তমান জীবনে জাতিচ্যুত হইব না—ভাবিয়াই সহসা স্থির হইলেন। এই যে আমি বন্দী হইয়াছি, ইহা ত কাহারও জানিতে বাকি নাই, বিবাহ না করিলে আমার মৃত্যু হইবে ইহাও সকলের জানা কথা। মৃত্যু দণ্ড হইল না, বাদসাহ কৃপা করিলেন, বাদসাহজাদীও আর বিবাহ করিলেন না এই সব কথা প্রচার হইতে বিলম্ব হইবে না। আমি গুরুদেবের নিকট অবিশ্বাসী হইয়াছি। এই সব ঘটনা প্রকাশ পাইলে আমি যে যবনীর সহিত কোনরূপ সম্বন্ধযুক্ত হই নাই, ইহা সমাজ বিশ্বাস না করিতে পারে তাহা হইলেও জাতিচ্যুত আমাকে হইতে হইবে।

বড় দুঃখ হইল। আবার—

ভাবিলেন, তা হউক সমাজ যাই মনে করুন, আমিত বাস্তব পক্ষে নির্দ্দোষ। জাতিচ্যুত হইলেও ভগবানের কাছে আমি খাটি থাকিব। আবার ভাবিলেন কৈখাটি, তিনি ত মন দেখিতেছেন। এইরূপ তাঁহার চিন্তা রঅন্ত নাই। কঠোর দণ্ডেরভয়ে তিনি বিচলিত হ'ন নাই। আজ কুসুম কোমলার সুকোমল ব্যবহারে তিনি বিচলিত। মনে তীক্ষ্ণ তরবারির আঘাত বিফল হয়, কিন্তু পুষ্পবাণের কুসুমশরে তাহা খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যায়।

রঘুনন্দন ভাবিলেন, নিঃসম্বন্ধবাদসাহের কৃপায় কতটুকুকার্য্য হইতে পারে। গুরুদেবের চিরতরে দারিদ্র্য দূর করিবার সামর্থ্য ও আমার বাদসাহজাদীকে বিবাহ করিলেই হইতে পারে—আমার পাপ যেমনই হউক একটা ব্রাহ্মণ বংশকে নীচাশয় ধনীর মনোরঞ্জন করিবার দুষ্কর্ম্ম হইতে রক্ষা করায় কি পুণ্য হইবে না?

ব্রাহ্মণ রঘুনন্দন ধীরে ধীরে যে নামিয়া পড়িতেছেন তাহা বুঝিলেন। কিন্তু আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না। পরজন্মে অধোগতির আশঙ্কা উভয়দিক হইতেই তাঁহার মনকে জড়াইয়া ধরিল। তখন মন তথা হইতে অব্যাহতি লাভের আশায় গুরুদেবের পুরুষানুক্রমে উপকার, প্রাণদাত্রীর প্রত্যুপকার এই সব শুভ চিন্তায় আত্মসমর্পণ করিল। বস্তরের রাজান্তঃপুর শাসনের আকাঙ্ক্ষাও তাহার মধ্যে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছিল।

মনের স্তর অনেক, গূঢ়, গূঢ়তর, গূঢ়তম, মানুষ সকল সময়ে সকল স্তর খুঁজিতে পারে না, কোথায় কোন্ ভাব লুকান আছে তাহা অন্তর্য্যামীই জানিতে পারেন।

বাদসাহীর প্রণয় জনিত যে অজ্ঞাত প্রেম রঘুনন্দনের মনের গূঢ়তম প্রদেশে অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তাহা তখনই রঘুনন্দন তেমন না বুঝিলেও শেষে বুঝিলেন, আর বুঝিলেন — তাহারই জয়জয়কার। তিনি শাস্ত্রবিশ্বাসী নরকবরণে ভীত হইলেন, কিন্তু গুরুসেবার অবশ্যম্ভাবি শুভফল তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিল। সেই আশ্বাসে প্রেমের জয় হইল, নরকবরণ তিনি স্বীকার করিয়া লইলেন; এইরূপে তাঁহার বিনিদ্র নয়নে সমস্ত রাত্রি অতীত হইল। এদিকে অন্তঃপুরে বাদসাহজাদীও বিনিদ্রনয়নে রাত্রিযাপন করিয়াছেন নিদ্রার পরিবর্ত্তে নয়নে অশ্রুধারাই আসন লইয়াছিল। রাত্রি তখনও চারিটা বাজে নাই, যে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পরিচারক রঘুনন্দনের সন্ধ্যাবন্দনাদির উদ্যোগ করিয়া দেয়, তাহারও তখন আসিতে প্রায় ১ ঘণ্টা বিলম্ব আছে, এমন সময়ে সেই বন্দীবাসের দ্বার বাহির হইতে উন্মুক্ত হইল। রঘুনন্দন সবিস্ময়ে দেখিলেন, এক অনুপমা সুন্দরী, সহচরী সহ সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন।

সুন্দরী বলিলেন, অসময় আপনার নিদ্রা ভঙ্গ করিলাম, ক্ষমা করিবেন।

রঘুনন্দনের হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গেল, এ যে তাঁহার সুপরিচিত কণ্ঠস্বর এ যে তাঁহার প্রাণ দাত্রীর কণ্ঠস্বর।

রঘুনন্দন কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু বলা হইল না, সুন্দরী বলিলেন, আজ আমার জীবন সার্থক আপনার আনন্দপূর্ণ সুস্নিগ্ধ দৃষ্টি এই অভাগিনীর উপর পড়িয়াছে।

ঐ টুকু করিতেই আমি আসিয়াছিলাম। স্বামিন্, বাদসাহজাদীর কণ্ঠরুদ্ধ হইল, একটু থামিয়া বলিলেন, এ সম্বোধন আপনার অনভিমত হইলেও শেষ দিনে একবার আমি না ডাকিয়া থাকিতে পারিলাম না। স্বামিন্ একমাস হইল, প্রত্যহ এই বন্দীবাসে আসি একদিন ভ্রমেও আপনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। আমার প্রতি ঘৃণা ক্রোধ বা ক্ষোভ যাই হউক আপনার এই সৌম্য দৃষ্টি নিরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। আপনার সাক্ষাৎ সন্দর্শন চর্ম্মচক্ষে আজই শেষ। কিন্তু আজ না চাহিতেই মেঘ চাতককে জলদান করিয়াছেন। বাদসাহজাদীর গণ্ডস্থলে মুক্তা বর্ষণ হইল।

রঘুনন্দন করযোড়ে বলিলেন, সম্রাট নন্দিনী ক্ষমা করিবেন; আমি বড়ই অপরাধী হইয়াছি। এখন আমি আমার মত পরিবর্ত্তন করিয়াছি, আমি আপনাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত, বাদসাহজাদী ভাবিলেন, এ কি সত্য, না পরিহাস! একটু পরে আনন্দ প্রকাশ না করিয়া শূন্য দৃষ্টিতে বলিলেন, ঐ কথাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। রঘুনন্দন বলিলেন, কেবল মুখের কথা নহে, সম্রাটনন্দিনি আমার কাহিনী, আপনার মহত্ত্ব এবং আমার বিকার শুনুন।

সংক্ষেপে সবই বলিলেন, বাদসাহজাদী তন্ময় হইয়া শুনিয়া আপনাকে সামলাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে রাজদরবারে চলিলেন, ধন্য ঈশ্বর ধন্য তোমার মহিমা।

(১০)

ইহার পরে এই সংবাদ বাদসাহ শুনিলেন। তিনি রঘুনন্দনের ব্যাপার যথা সম্ভব গুপ্ত রাখিয়াছিলেন। কন্যার অনুরোধ না হইলেও তিনি আজ শ্রদ্ধার পরিবর্ত্তে আনন্দের সহিত রঘুনন্দনে মুক্তি দিলেন। রঘুনন্দন যবনী গ্রহণে পতিত হইলেন। কিন্তু ব্রহ্মণ্যরক্ষায় যত্নবান্ থাকিলেন, সন্ধ্যাদিকার্য্য তিনি শাস্ত্রাদেশ মতই সম্পন্ন করিতেন। বিদ্যাপতি পদাবলীর উল্লিখিত মৃত শিবসিংহ নৃপতির মিথিলারাজ্য বাদসাহ জামাতা রঘুনন্দকে যৌতুক দিলেন আর বিহার প্রদেশের শাসনকর্ত্তার পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়া উপযুক্ত হস্তী অশ্ব ও পদাতি সৈন্য সঙ্গে বিদায় দিয়া দিলেন। মুদির দোকানের মালিক মিশিরজীকে রঘুনন্দন পুরস্কার দিয়া জায়া সহ ইচ্ছা করিয়া ঘুরিয়া বস্তরের পথে স্বদেশ যাত্রা করিলেন। পথের ব্যবস্থা সরকার হইতে হইল। রঘুনন্দন সসৈন্যে বস্তরে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই বাদসাহের কথায় বস্তররাজ পরম সমাদরে বাদসাহজামাতার অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহার কথায় লাঞ্ছনা প্রাপ্ত রঘুনন্দই যে আজ তাঁহার প্রভুবৎ সম্মানার্হ প্রথমে তিনি তাহা বুঝেন নাই। রঘুনন্দন পরে তাঁহাকে আত্ম পরিচয় প্রদান করিলে রাজা ভয়ে কম্পিত হইলেন। তখন রঘুনন্দন সত্য ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিলেন, আপনি বড়ই নির্ব্বোধ ও অভাগ্যধর, সতীর পবিত্র স্পর্শে আপনার অন্তঃপুর যদি পবিত্র না হয় ত আপনার পতন অনিবার্য্য বস্তর রাজ রঘুনন্দনের আজ্ঞা মানিয়া লইলেন। মহিষী তখন বুঝিলেন পাপের ফল ভুগিতেই হয়।

(১১)

রঘুনন্দন দুইবৎসর বিহারের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তাঁহার সদর ছিল পাটনা। এই দুই বৎসরে তিনি মিথিলা রাজ্য অবাধে আয়ত্ত করেন। তৎপরেই তাঁহার সেই পতিপ্রাণা ভার্য্যার পরলোক হয়। আমি যখন রঘুনন্দনের ইতিহাস শ্রবণ করি নাই, তখন পাটনায় একবাদসাহনন্দিনীর মর্ম্মর প্রস্তরময় সমাধিমন্দির দেখিয়াছিলাম। আমার এখন মনে হয় সেই সমাধিমন্দিরের অভ্যন্তরেই রঘুনন্দনের জীবন প্রতিমা নিহিত।

রঘুনন্দন আসিয়াই গুরুদেবকে মিথিলা রাজ্য প্রদানে উদ্যত হন, গুরু মহেশঠাকুর কিন্তু রাজ্য গ্রহণ করিতে চাহেন নাই। অসম্মতির কারণ বুঝিয়া রঘুনন্দন তখন মনে করিয়াছিলেন, সুশাসিত করিয়া রাজ্য গুরুদেবকে দিবেন।

এখন মৃতভার্য্য রঘুনন্দন সুশাসিত মিথিলা রাজ্যসহ সর্ব্বস্বদান প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন।

গুরুর দারিদ্র্য মোচনের জন্য, গুরুকে বস্তর রাজার ন্যায় নির্ব্বোধ স্ত্রৈণ ধনীর প্রতিগ্রহ

প্রার্থী হইতে না হয় তাহারই জন্য অকার্য্য করিয়াছেন, ইহা মহেশঠাকুরকে প্রথমেই জানাইয়াছিলেন; তখন রাজ্যকে অধ্যাপনার অন্তরায় বলিয়া মহেশঠাকুর উপেক্ষা করিলেন। এখন রঘুনন্দন কাতরভাবে পুনরায় তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন এবং বলিলেন, রাজ্য সুশাসিত এখন হইতে অধ্যাপনার ব্যাঘাত ঘটিবেনা মহেশঠাকুরের চারি পুত্র, তিনজন বড় বড় পণ্ডিত, কনিষ্ঠ গোপাল কিছু ন্যূন ছিলেন। পিতা ও পুত্রগণ রঘুনন্দনের রাজ্য দানগ্রহণে তথাপি অসম্মত হইলে, মহেশঠাকুরের আদেশে গোপালঠাকুর তাহা গ্রহণ করিলেন।

রঘুনন্দন সর্ব্বস্বদান প্রায়শ্চিত্ত করিয়া স্বয়ং অব্যবহার্য্য ভাবেই ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ব পরিণীতা পত্নীর গর্ভে পুত্র জন্মিলে তাঁহারা শাস্ত্রমত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ব্যবহার্য্য হয়। রঘুনন্দন কুলমর্য্যাদায় মৈথিলসমাজে খুব উচ্চ ছিলেন, কিন্তু সর্ব্বস্বদান প্রায়শ্চিত্তের পরেও শাস্ত্রানুসারে অব্যবহার্য্যত্ব দোষ থাকায় তাঁহার বংশ পরে শাস্ত্রমতে ব্যবহার্য্য হইলেও কুলমর্য্যাদা পরিভ্রষ্ট হইলেন। অদ্যাপি মিথিলায় রঘুনন্দনের বংশ আছে। আর দ্বারভাঙ্গার রাজবংশ গোপাল ঠাকুরের সন্তান।

ইহাই রঘুনন্দনের ইতিহাস।

বেদ ও শাখা পরিচয়।

লেখক—শ্রীযুক্ত কৈলাস চন্দ্র তর্কনিধি।

বেদের নিত্যতা ও অপৌরুষেয়তা।

আর্য্যগণ বেদকে নিত্য, অপৌরুষেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বেদবাক্য ঈশ্বরবাক্য ইহা আর্য্য সমাজে গৃহীত। বেদ কোন সময়ে প্রথম প্রচারিত হয়, তাহা নিশ্চয়ভাবে বলা সুকঠিন, তবে—কূর্ম্মপুরাণের ৫১ অধ্যায়ে লিখিত আছে—' দ্বাপরে প্রথমে ব্যাসো মনুঃ সায়ম্ভুবো মতঃ"। অর্থাৎ দ্বাপরের প্রথম ভাগেই বেদব্যাস ("এক আসীৎ যজুর্ব্বেদস্তং চতুর্দ্ধাপ্রকল্পয়ন্') এক যজুর্ব্বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া চারিজন শিষ্য—পৈল, বৈসম্পায়ন, জৈমিনি ও সুমন্তকে যথাক্রমে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। বৃহদারণ্যকে (২।৪।১০) ও শতপথ ব্রাহ্মণে—(১৪।৬।১০।৬) লিখিত আছে,—আর্দ্রকাষ্ঠে উৎপন্ন অগ্নি হইতে যেমন পৃথক পৃথক, ধূম নির্গত হইয়া থাকে, সেইরূপ এই মহান্ ভূতের নিঃশ্বাস হইতে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, বৈদ্য, উপনিষদ শ্লোকসূত্র, ব্যাখ্যান ও অনুব্যাখ্যান উৎপন্ন হইয়াছে, এই সমস্তই ইহার নিঃশ্বাস।

অগ্নিপুরাণমতে দেখা যায় যে, পরমেশ্বর প্রথমে ব্রহ্মাকে সৃজন করিয়া বেদের উপদেশ

দেন। তৎপর ব্রহ্মা এই বেদ তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বাকে প্রদান করেন। যাই হৌক কল্পভেদেও ইহার বিভিন্ন সময়ে প্রকাশ হইয়াছে বলা যাইতে পারে। তবে—বেদ অপৌরুষেয় ইহা নিশ্চয়।

পূর্ব্বকালে বেদকে পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ করা শাস্ত্রকারদিগের নিষেধ ছিল। কিন্তু কলিতে মানবের স্মরণশক্তি হ্রাস হইবে ও পরমায়ু অল্প হইবে বিবেচনায় ঋষিগণ বেদকে লিপিবদ্ধ করেন। এই প্রসঙ্গে একটী কথা উল্লেখ করিতেছি—কোন কারণে আমার প্রকাশিত সন্ধ্যাবিধির প্রথম যজুর্ব্বেদীয় সন্ধ্যা, দ্বিতীয় ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যা ও তৃতীয় সামবেদীয় সন্ধ্যা লিখিয়াছিলাম, তাহাতে সামবেদীয় ব্রাহ্মণ একটু বিরক্তিভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু সামবেদীয় সন্ধ্যা প্রথম :—লিখিতে হইবে এরূপ কোনও শাস্ত্রীয় প্রমাণ, বলিতে পারেন নাই। আমি আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া দেখিতেছি—ঋগ্বেদ, পূর্ব্বউল্লেখের বহুপ্রমাণ মার্কণ্ডের পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়। আর পূর্ব্বোক্ত কূর্ম্মপুরাণের প্রমাণানুসারেও বুঝা যায় প্রথম এক যজুর্ব্বেদ ছিল, তাহাকে চারিভাগ করিয়া ঋগ্, যজুঃ সাম ও অথর্ব্ববেদ করা হইয়াছে। যাইহৌক পণ্ডিতসমাজে প্রার্থনা যে, 'সামবেদ' প্রথম লিখিতে হইবে এরূপ কোন শাস্ত্রীয় প্রনাণ থাকিলে দয়া করিয়া আমাকে (পোঃ রাজনগর, ডলা বেদ পুস্তকালয়, জিলা শ্রীহট্ট এই ঠিকানায়) জানাইলে সন্ধ্যাবিধির দ্বিতীয় সংস্করণে পরিবর্ত্তন করিব, নচেৎ ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যাই প্রথম, দ্বিতীঃ যজুঃ ও তৃতীয় সামবেদীয় সন্ধ্যা প্রকাশ করিব। এক্ষণে প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচনা করা যাউক। পূর্ব্বে "বেদ" অপৌরুষেয় বলিয়াছি।

ঋগ্বেদ সংহিতায় ২ম ৫ অঃ বিংশ সূক্ত যথা "অয়ং দেবায় জন্মনে স্তোমো বিপ্রেভি-রাসয়া। অকারিরত্নধাতমঃ"। ১। ইহার তাৎপর্য্য এই—উমেশবিদ্যারত্নের প্রকৃতার্থবাদিনী" .. যদাতু মাতৃমনুনন্দনা মনুষ্যাঋভবঃ ঋভুসজ্ঞকাঃ অন্তঃরীক্ষবাসিনঃ জনাঃ শিল্পনৈপুণ্যাদিগুণ বলেন দেবত্বং গতাঃ তদৈব স্তোমং ইদং সূক্তং কেচিৎ বিপ্রাঃ অক্ষরাভাবাৎ লিপিপ্রথা-প্রবর্ত্তনাৎ প্রাক্ স্বমুখেন কৃতবন্তো বিরচিতবন্তঃ। অস্যস্তোত্রস্য পাঠাৎ ঋভব স্তুষ্টাঃ সন্তঃ ধনরত্নাদিকং প্রযচ্ছন্তি ইত্যর্থ-।

অনু :—

ঋভুগণ অন্তরীক্ষ অর্থাৎ তুরুস্কপারস্যাগো স্থানবাসী মনুষ্য, তাঁহারা মাতা মনুর সন্তান। যখন তাঁহারা শিল্পনৈপুণ্যগুণে দেবত্বলাভ করেন, তখন কতিপয় ঋষি মুখে মুখে এই সূক্তটি রচনা করেন, এই সময়ে অক্ষর সৃষ্টি হইয়াছিল না। এই সূক্ত শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া ঋভুগণ বিপ্রগণকে বহু ধন-রত্ন প্রদান করেন। (উমেশ বৈদ্যরত্ন)

ভাবার্থ :-ইস্ মন্ত্রমে পুনর্জন্মকাবিধান জাননা চাহিয়ে। মনুষ্য জৈসে কর্ম্মক্রিয়া করতে হৈ বৈসেহী জন্ম ঔরভোগ উন্‌কো প্রাপ্ত হোতা হৈ। (দয়ানন্দ সরস্বতী)

এইস্থলে সায়নাচার্য্য বলিয়াছেন,—

ঋভবোহি মনুষ্যাঃ সন্ত স্তপসা দেবত্বং প্রাপ্তাঃ। তে চাত্র সূক্তে দেবতাঃ।...বিপ্রেভি-

মেধাবিভিঃ ঋত্বিভি রাসয়া স্বকীয়েনাস্তেনাকারি নিষ্পাদিতঃ। অর্থাৎ মেধাবিঋত্বিকগণ এই সূক্তটী মুখে মুখে বলিয়াছিলেন। কিন্তু রচনা করিয়াছেন বলিয়া সায়নাচার্য্য বলেন নাই উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন নিজ জাতি গোপন করিয়া তাঁহারই প্রকাশিত ঋগ্বেদে কেবল উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখিয়াছেন ; তাহাতে অনেকেই মনে করিতে পারেন উনিও ব্রাহ্মণ কিন্তু তাহা নয়। তিনি কি মনে করিয়া ব্যাখ্যায় ও অনুবাদে "রচনা করেন"। লিখিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন।

সায়ণাচার্য্য—"মেধাবিভিঃ ঋত্বিগ্ভিঃ" অর্থাৎ স্মরণ শক্তিবিশিষ্ট ঋত্বিকগণ বলিয়াছেন। সুতরাং ঋত্বিকগণ রচনা করিয়াছেন বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারি না। †

এখন বেদ ও শাখা সম্বন্ধে মনু কি বলিয়াছেন এবং উপনিষৎ ও ব্রাহ্মণভাগে কি লিখিত আছে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

মনুরুবাচ।

কিং বেদোরূপমানেন উপাঙ্গং সাংখ্যভেদতঃ।
উক্তং কিং বেদরূপস্তু তন্মেব্রূহি সমাসতঃ॥ ১।

ব্রহ্মোবাচ।

এক এব ভবেদ্বেদশ্চতুর্ব্বেদঃ পুনঃ পুনঃ।
শাখার্থে মন্ত্রসন্ধানাং গ্রহণায়াতি বিস্তরাৎ। ২।
সংবিভক্তো ময়া বৎস ঋগ যজুঃ সামাথর্ব্বণঃ।
অত্র ভেদাস্তু ঋগ্বেদা দশ্চৈব প্রকীর্ত্তিতাঃ। ৩॥
আশ্লেষাঃ সংখ্যাশ্চর্চ্চাশ্চ যাবকাশ্চর্চ্চকাস্তথা।
শ্রাবণীয়া চক্রমা চ পুটক্রমা চ বটক্রমাঃ। ৪।

মনু বলিতেছেন—হে প্রভো! বেদের রূপ কি প্রকার, পরিমাণ কত? উপাঙ্গ কাহার নাম, তাহা সংক্ষেপে আমাকে বলুন।

ব্রহ্মা কহিলেন—হে বৎস! মূল বেদ এক, কেবল উহা অতি বিস্তৃত বলিয়া হীনশক্তিগণ সহজে গ্রহণ করিতে পারেনা দেখিয়া, আমি ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছি, পুনরায় প্রত্যেকের শাখা বিভাগ করিয়াছি। তন্মধ্যে ঋগ্বেদের আশ্লেষা, সংখ্যা,

† আজকাল ব্রাহ্মণগণ, মধ্যে বেদের আলোচনা আমাদের এতদ্দেশে বা অন্যত্রও বিশেষভাবে হইতেছে বলিয়া জানিনা। কায়স্থদের মধ্যে বিশেষ শিক্ষিত যাহারা, তন্মধ্যে অনেকেই 'বেদ' গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়া সর্ব্বসাধারণের উপকার সাধন করিতেছেন। রমেশ দত্ত প্রথম ঋগ্বেদের অনুবাদ করিয়াছেন। 'ব্রাহ্মণোস্য মুখমাসীৎ'' এই সূক্তটী প্রক্ষিপ্ত বলিয়া তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত এম-এ, এ-আর, এস-সি, শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। উনি "বেদমাতাগ্রন্থাবলী'' নামে ঋগ্বেদ প্রভৃতি তত্ত্ব বাহির করিতেছেন। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় তত্ত্বনিধি। "শাস্ত্রতত্ত্ব" নাম দিয়া ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রের নিগূঢ় রহস্য বাহির করিতেছেন। উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্নের কথা উল্লেখ করিয়াছি। বড়ই দুঃখের বিষয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এবিষয়ে নিতান্তই উদাসীন।*

* ব্রাহ্মণ যে বেদচর্চ্চা করেন না ইহা খুবই দোষ; কিন্তু অনধিকারী অপ ব্যক্তিরা বেদের অপ ব্যাখ্যা করিয়া কল্যাণ করিতেছে, ইহা বলা অসঙ্গত. প্রবন্ধ লেখক তর্কনিধি মহাশয় প্রগাঢ় পণ্ডিত, "বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো-মাময়ং প্রহরিষ্যতি'' এশাস্ত্র বাক্য বিস্মৃত হইলেন কেন? সঃ—

দণ্ডশ্চেতি-সমাসেন পুনরকৈব পারগা।
শাখাশ্চ ত্রিবিধা ভূয়ঃ শাকলা ব্রহ্মমাণ্ডকাঃ। ৫ ॥
তেষামধ্যয়নং প্রোক্তং মণ্ডলাশ্চতুঃ ষষ্টিকাঃ।
বর্গাণাং পরিসংখ্যাতং চতুর্বিংশ শতানি চ।৬ ॥
ঋচাং দশসহস্রাণি ঋচাং পঞ্চশতানি চ।
মান-মশীতিপাদাশ্চ তত্র পারণ মুচ্যতে। ৭ ॥
ঋগ্বেদেতু ভবেৎসংখ্যা, যজুর্ব্বেদস্য শ্রূয়তাম্।
ষড়শীতি বিভেদেন ময়া ভিন্নং শিবাজ্ঞয়া। ৮ ॥
দশধা চরকা স্তত্র কারকা বিত্রধিষয়া।
কঠাঃ প্রাচ্যকঠাশ্চৈব কপিষ্টল কঠাস্তথা। ৯ ॥
চারণীয়াঃ শ্বেতাশ্চ শ্বেততরা মৈত্রায়ণীতি।
পুনঃ সপ্তভির্ভেদেন মৈত্রায়ণ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। ১০
মানবড়ুণ্ডুভবারাহাশ্ছাগেয়া হারিদ্রবীয়া।
সমায়া মায়নীয়াশ্চ তেষামধ্যয়ন মুচ্যতে ॥ ১১ ॥
অষ্টাদশসহস্রাণি পঠন্ শাখাবিদো ভবেৎ।
দ্বিগুণং পদপাঠীয়স্ত্রিগুণং ক্রমপারগঃ ॥ ১২ ॥
ষড়ঙ্গানি যদাধীত্য ষড়ঙ্গশ্চ বিমুচ্যতে।
শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষম্। ১৩।

চর্চ্চা, যাবকা, চর্চ্চকা শ্রাবণীয়া, চক্রমা পুটক্রমা ষটক্রমা ও দণ্ড এই কয়টী শাখা হইয়াছে। প্রতিশাখার শাকল, ব্রহ্ম ও মাণ্ডুক এই তিনটী করিয়া বিভাগ আছে। ১—৫ ॥

উহারই অধ্যয়ন হইয়া থাকে এবং ঐ ঋগ্বেদে ৬৪টী মণ্ডল ও ১২৪টী বর্গ আছে। ১০৫০০ দশ হাজার পাঁচ শত ঋক্‌মন্ত্র ও অশীতিসংখ্যক পাদ বিভাগ আছে। ঋগ্বেদের সংখ্যা এইরূপ। যজুর্ব্বেদের সংখ্যা শ্রবণ কর। আমি শিবের আজ্ঞাক্রমে ৮৬ ভাগে বিভাগ করিয়াছি। চরক নামক যজুর্ব্বেদাংশ দশধা। তাহার এক এক অংশ—কঠ, প্রাচ্যকঠ, মৈত্রায়ণী ইত্যাদি নামে বিখ্যাত ॥
মৈত্রায়ণী নামক বেদাংশের ৭০ রকম ভেদ আছে। ৬—১০ ॥

মানব ডুণ্ডুভপ্রভৃতির অধ্যয়ন নানা সংজ্ঞায় অভিহিত। অষ্টাদশ সহস্র যজুর্মন্ত্র পাঠ করিলে শাখাবেত্তা হয়। তদ্দ্বিগুণ পাঠে পদ পারগামী, ত্রিগুণ পাঠে ক্রম পারগ হয়। ষড়ঙ্গ অধ্যয়ন করিলে, "ষড়ঙ্গ" নাম প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিলাভ করে।

শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ এবং জ্যোতিষ এই ষড়ঙ্গ। আর প্রতিপদ, অনুপদ, ছন্দো, বাক্য, মীমাংসা, ন্যায় এবং তর্ক উপাঙ্গ নামে অভিহিত।

ষড়ঙ্গানি ভবন্ত্যেতেত্বাহ্যুপাঙ্গানিশৃণুষ ভোঃ।
প্রতিপদমনুপদং ছন্দোভাষা মীমাংসাচ। ১৪॥
স্থায়তর্ক সমাযুক্তা উপাঙ্গাঃ পরিকীর্ত্তিতোঃ।
পরিশিষ্টাশ্চ সংখ্যাতা অষ্টাদশ শৃণুষতৎ। ১৫॥
যূপলক্ষণ প্রতিষ্ঠাতু বাক্যং সংখ্যাশ্চরণ ব্যূহঃ।
শ্রাদ্ধকল্পশ্চ শুক্লানি পারিষদমৃগ্ যজুশ্চ। ১৬॥
অষ্টকাপুরণশ্চৈব প্রবরাধ্যায়োঽঙ্গ শাস্ত্রম্।
ক্রতুসংখ্যানিগমা যজ্ঞপার্শ্বান্তহৌত্রকম্। ১৭॥
ব্রতঞ্চপশবো হোমং কুর্ম্মলক্ষণ সংযুক্তাঃ।
কথিতাঃ পরিশিষ্টাস্ত উনবিংশামহামুনে॥ ১৮॥
কঠানাঞ্চ যূপাস্থাহশ্চত্বারিংশচ্চতুত্তরা।
প্রাচ্যোদিচ্য নিরুক্তঞ্চ বাজসনেয় পঞ্চচ। ১৯॥
দশভেদ বিভিন্নাস্ত দ্রষ্টব্যা মুনিপঙ্গব।
জাবালা বৌধেয়াঃ কাম্ব মাধ্যন্দিনাশ্চ শাখেয়াঃ। ২০॥
সুপায়িনঃ কপালাখ্যাঃ পৌণ্ড্রবসাবটিকাঃ।
পরমারবিকাঃ শরাশরা খন্ড্যা বৌধায়নীয়াঃ। ২১॥
দ্বেসহস্রে শতন্যূনে বেদে বাজসনেয়কে।
ঋগ্ গনং পরিসংখ্যাতস্ততোঽন্যানি যজুংষিচ। ২২॥
অষ্টৌসহস্রাণি শতানিচাষ্টাশীতিরন্যত্রাধিকা যজুংশ্চ। ২৩॥
তৎপ্রমাণাণি যজুষাদি কেবলম।
স্যাব ক্রিয়ং পরিসংখ্যা, অথ ব্রাহ্মণম্। ২৪॥

যূপলক্ষণ, প্রতিষ্ঠা, বাক্য, সংখ্যা, চরণব্যূহ, শ্রাদ্ধকল্প, শুক্ল, পারিষদ, শক, যজুঃ, অষ্টকা-পুরাণ, প্রবরাধ্যায়, অঙ্গশাস্ত্র, ক্রতু, সংখ্যা, নিগম, যজ্ঞপার্শ্ব ও হৌত্রিক এই সকল পরিশিষ্ট। (চতুর্বর্গচিন্তামণিমতে ২১ একবিংশতি অর্থাৎ তাহাতে পাঠ "দ্ব্যূনবিংশতিসংখ্যায়া") মতান্তরে ব্রতপদ্ধতি, পশুশাস্ত্র ও কুর্ম্মলক্ষণাদি ইহাও পরিশিষ্ট। ১১—১৮॥

কঠদিগের যূপ চতুশ্চত্বারিংশৎ। (এইস্থলে—হেমাদ্রিবিরচিত চতুর্ব্বর্গচিন্তামণিও বাচস্পত্যাভিধানে পাঠবৈষম্য আছে, দেবীপুরাণে যে পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাও পরিশুদ্ধ বলিয়া মনে হয় না, তবে নামের মধ্যে বহুস্থানেই সন্দেহ আছে, ইহা পণ্ডিতগণের বিবেচ্য) জাবাল, বৌধেয়, কাম্ব, মাধ্যন্দিন প্রভৃতি কতিপয় শাখায় বিভক্ত বাজসনেয়। শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতায় শতন্যূন দুইসহস্র মন্ত্র আছে। অপর যজুর্ম্মন্ত্রের সংখ্যা আট সহস্র আট শত অষ্টাশীতি। ইহার অতিরিক্ত ও যজুর্ম্মন্ত্র আছে। সে মন্ত্রের প্রমাণ তত্তৎক্রিয়াতেই জানিবে। তাহার পর

চতুর্গুণস্তু বিজানীয়াৎ তে ত্রিবিধা পুনঃ।
ঔতেয়াঃ খণ্ডিকেয়াশ্চ খণ্ডিকাঃ পঞ্চধাপুনঃ। ২৫ ॥

কালেয়া রৌদ্রায়ণীয়া হিরণ্যকেশ্যাস্তথাপরে।
ভরদ্বাজাপস্তম্বাশ্চ তেষাং ভেদেন কীর্ত্তিতাঃ।
অধ্যয়নং সৌপ্তিকঞ্চ প্রবচনীয়ং তথাপরম্। ২৬ ॥

সামবেদস্তু বিস্তীর্ণঃ সহস্রভেদশঃ পুরা।
অনধ্যায়েম্বধীয়স্তে তদা ইন্দ্রেণ ধীমতা।
বজ্রেননিহতাঃ শেষাস্তান্ বক্ষে শৃণুসত্তম। ২৭ ॥

রাণায়নীয়াঃ কৌথুমাস্তত্রভেদান্ পুনঃ শৃণু।
রাণায়নীয়াঃ সপ্তৈব সুগ্রাহ্যাস্তপতাং বর।

কালবেয়া মহাকালবেয়া লাঙ্গল বৈদ্যুতাঃ।
কৌথুমানামপিসপ্ত অসুরা বাদরায়ণাঃ।
প্রজালা বৈনভৃত্যাশ্চ পরিবোগ্যাঃ পরিকায়ণাঃ।
অধ্যয়নমপি তেষান্তু যথাবৎ কথিতং শৃণু।
অষ্টৌসামসহস্রাণি সামানিচ চতুর্দ্দশ।
অষ্টৌ শতানি নবতীঃ দশ সবালখিল্যকাঃ।
স সুপর্ণাশ্চ প্রখ্যাশ্চ এতৎ সামগণং স্মৃতম্।
অস অথর্ব্ববেদস্য নবভেদা ভবন্তিহ।
পিপ্পলাদানর্ম্মদাশ্চ ভৃতায়নাঃ কাত্যয়স্তথা।
জজলা ব্রহ্মবেদাশ্চ শৌনকী কুনখী তথা।
বেদদর্শিশ্চাপিবিদ্যাস্তেষামধ্যয়নং শৃণু।

ব্রাহ্মণ; মন্ত্রভাগ অপেক্ষা ব্রাহ্মণভাগ চতুর্গুণ। ব্রাহ্মণ ত্রিবিধ,—ঔতেয়, খণ্ডিকেয় ও খণ্ডিক। ইহা আবার পাঁচ প্রকার যথা—কাজেয়, রৌদ্রায়নীয়, হিরণ্যকেশ্য, ভরদ্বাজ, আপস্তম্ব এবং অপর অধ্যয়ন, সৌপ্তিক ও প্রবচনীয়। এই নাম ব্রাহ্মণ পরিচ্ছেদে আছে। ১৯—২৬ ॥

সামবেদ সহস্রভাগে বিভক্ত ছিল অনধ্যায়ে অধীত হওয়াতে পূর্ব্বকালে কতকগুলি অংশ ইন্দ্রকর্তৃক বজ্রাঘাতে বিনাশিত হয়।

অবশিষ্ট অংশের কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। রাণায়নী প্রভৃতি কতিপয় সামশাখা আছে। রাণায়ণী শাখার সপ্তভেদ।

পঞ্চকল্পাঃ—

নক্ষত্রকল্পো বৈতানশ্চ সংহিতাবিধিরাঙ্গিরসং।
শান্তিকল্পশ্চ পঞ্চৈতে অথর্ব্বস্ত ভবন্তিহ।
সর্ব্বেষামেব বেদানা-মুপবেদান্ শৃণুষ্বতান্।

অষ্ট সহস্র এবং চতুর্দ্দশ সামগীতের সংখ্যা। দশ সহস্র অষ্টশত নবতি বালখিল্য অর্থাৎ—

"বিধিনা নির্ম্মিতা পূর্ব্বং বেদী পরম পাবনী।
অগ্নিবেশ্যাদিমুনয়ো বালখিল্যাদয়ঃ স্থিতাঃ"।
(বৃহদ্রামায়নে চিত্রকূট মাহাত্ম্যে ১ সর্গঃ)
ঋগ্বেদস্যায়ুর্ব্বেদো যজুর্ব্বেদে ধনুস্তথা।
সামবেদস্য গান্ধর্ব্ব অর্থশাস্ত্রাণ্যথর্ব্বনে।
ঋগ্বেদস্যাত্রেয়ং গোত্রং সোমং দেবং বিদুর্ব্বধাঃ।
কাশ্যপঞ্চ যজুর্ব্বেদং রুদ্র দেবং তু তং বিদুঃ।
সামবেদোঽপিগোত্রেণ ভরদ্বাজং পুরন্দরং।
অধিদৈবং বিজানীয়াৎ বৈতালস্তু অথর্ব্বণে।

সুপর্ণ এবং প্রখ্যানাম সামগীত। অথর্ব্ববেদের নয় শাখা। পিপ্পলাদ, নর্ম্মদা ইত্যাদি। অথর্ব্ব বেদের পাঁচটী কল্প, নক্ষত্রকল্প ইত্যাদি। এখন উপবেদের কথা বলা হইতেছে—ঋগ্বেদের উপবেদ আয়ুর্ব্বেদ। এবং যজুর্ব্বেদের ধনুর্ব্বেদ। সামবেদের গান্ধর্ব্ব্য শাস্ত্র। অথর্ব্ববেদের অর্থশাস্ত্র উপবেদ। বেদের গোত্রের উল্লেখ আছে, তাহা বলা যাইতেছে,—ঋগ্বেদের আত্রেয়গোত্র, অধিদেবতা সোম। যজুর্ব্বেদের কাশ্যপগোত্র, অধিদেবতা রুদ্র। সামবেদের ভরদ্বাজগোত্র, ইন্দ্র অধিদেবতা। অথর্ব্ববেদের বৈতালগোত্র।

এই সকল প্রমাণ বাচস্পত্যাভিধানে, চতুর্ব্বর্গ চিন্তামণি ও দেবীপুরাণের ১০৭ অধ্যায়ে আছে, কিন্তু সর্ব্বত্রই শাখার নামগুলি বিশুদ্ধভাবে উদ্ধৃত হয় নাই। দেবীপুরাণে যাহা লিখিত আছে, তাহাও বঙ্গবাসীর মুদ্রিত ও বোম্বে মুদ্রিত দেবীপুরাণ মিলাইলে শ্লোকের পাঠ বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইতিহাস ও পু াণ বেদসমূহের পঞ্চম বেদ যথা—

"সহোবাচ ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদ-মাথর্ব্বনং চতুর্থং,—মিতিহাস পুরাণম্ পঞ্চমং বেদানাং বেদম্"। ছান্দগ্য উপনিষৎ ৭।১।১।

(ক্রমশঃ)

কৰ্ম্ম-যোগ।

লেখক শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল,

প্রথম অধ্যায়।

(কর্ম্মযোগের আবশ্যকতা প্রতিপাদন)

—— :•: ——

"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়" তাঁহাকে অবগত হইলে, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান হইলে "অতি-মৃত্যু" অমৃতত্ব বা মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়—সংসাররূপ মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়; ঐ অবস্থা পাইবার অর্থাৎ মুক্তি পাইবার অন্য আর কোনরূপ পন্থ নাই। শ্রুতির (উপনিষদের) এই বাক্য ও "তরতি শোকমাত্মবিৎ" আত্মজ্ঞ ব্যক্তির শোক থাকে না "ব্রহ্ম-বিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি" ব্রহ্ম-জ্ঞান হইলে, তিনি (ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি) ব্রহ্ম-স্বরূপ হয়েন, শ্রুতির এইরূপ বাক্যাবলী দৃষ্টে অনেকেই কর্ম্ম-যোগে অনাস্থা প্রকাশ করিয়া থাকেন; এইজন্য এই বিষয়ে শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম কি তাহা নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক বোধ করিলাম। শাস্ত্রে উপরিউক্ত উক্তি সকল যেরূপ দৃষ্ট হয়; ঐরূপ, "ধর্ম্মেন পাপং অপনুদতি"। অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়া অমৃতমশ্নুতে"। "অকুর্ব্বন্ বিহিতং কর্ম্ম নিন্দিতঞ্চ সমাচরণ্ প্রসজ্জন্ চেন্দ্রিয়ার্থেষু নরঃ পতন মৃচ্ছতি"। "নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ নাশান্ত মানসোবাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ' ইত্যাদিরূপ উক্তিও দৃষ্ট হয় "ধর্ম্মানুষ্ঠানে পাপ নষ্ট হয়" অবিদ্যা অর্থাৎ কর্ম্ম দ্বারা (শঙ্কর এই স্থলে অবিদ্যা অর্থে কর্ম্ম বলেন) সংসাররূপ মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায় ও বিদ্যা (উপাসনা দেবার্চ্চনা প্রভৃতির দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হয়) "বিহিত কর্ম্ম না করিলে এবং নিন্দিত অর্থাৎ শাস্ত্রমতে নিষিদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে আসক্ত হইলে, মনুষ্য পতিত হইয়া থাকে; দুশ্চরিত (দুষ্ক্রিয়া) হইতে বিরত না হইলে, ইন্দ্রিয় সকলকে শান্ত (সংযত) না করিলে একাগ্র চিত্ত না হইলে, মন বা চিত্তকে শান্ত (সংযত) না করিলে, কেবল জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না।" এই সকল উক্তিতে কর্ম্ম-যোগের উপকারিতা দৃষ্ট হয়।

এইরূপ আপাতবিরুদ্ধার্থক শ্লোক দৃষ্টে, অনেকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় (দিশেহারা) হইয়া পড়েন; এই জন্য এই বিষয়ে শাস্ত্রের মর্ম্ম উদ্ঘাটন করা অত্যন্ত আবশ্যক বলিয়া বোধ করিতেছি; উপরিউক্ত আপাততঃ বিরুদ্ধার্থক শ্লোক সকল বিশেষ রূপে আলোচনা করিলে এই প্রতীতি জন্মে যে বিদ্যা বা ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন অন্য কিছুই মুক্তির কারণ না হইলেও অর্থাৎ কেবল মাত্র বিদ্যা বা জ্ঞানই মুক্তির সাধন হইলেও, কর্ম্মানুষ্ঠান অপরিত্যজ্য, কারণ বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে পাপ নষ্ট হয়; চিত্ত পরিষ্কৃত হয়; চিত্ত শুদ্ধ হইলে তত্ত্ব-জ্ঞান উদয় হয় ও জ্ঞানোদয়ে মুক্তি হয়। যথা "জ্ঞান মুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ" (মহাভারত); পাপ ক্ষয় হইলে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়। নিত্য নৈমিত্তিক

কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পাপক্ষয় হইয়া চিত্ত শুদ্ধ হইয়া থাকে। যাহার চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে, ঐরূপ বিশুদ্ধ চিত্তব্যক্তির ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা হইলে, তাঁহার ঐ জ্ঞান জন্মে ইহা উপনিষদেও উক্ত হইয়াছে, যথাঃ—

"বিশুদ্ধ সত্ব স্ততস্ত পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ", (মণ্ডুক উপনিষদ):

অর্থাৎ বিশুদ্ধ-চিত্ত হইয়া সেই নিষ্কল ব্রহ্মকে ধ্যান করিতে করিতে তাঁহাকে দেখিতে পান, প্রত্যক্ষবৎ অনুভব করেন।

এই রূপে মুক্তির পক্ষে, কর্ম্মানুষ্ঠানেরও সাক্ষাৎ না হউক পরম্পরায় উপযোগিতা আছে; অতএব মুক্তি কামীর পক্ষেও কর্ম্মযোগে অনাস্থা কর্ত্তব্য নহে। ভগবান, ভগবদ্গীতায় ইহা স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা :—

"কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈ রিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম-কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্ম-শুদ্ধয়ে।।"

অর্থাৎ যোগীগণ, কর্ম্ম-ফলে আসক্তি ত্যাগ পূর্ব্বক, আত্মশুদ্ধি অর্থাৎ চিত্ত-শুদ্ধির জন্য শরীর দ্বারা, মনের দ্বারা বুদ্ধির দ্বারা ও কর্ম্মে অভিনিবেশ শূন্য ইন্দ্রিয় দ্বারা, কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ঐ রূপ ভাবে কর্ম্ম করিলে চিত্ত শুদ্ধ হইয়া, জ্ঞানোদয়ের পথ পরিষ্কৃত করে. ঐ জন্য ঐ ভাবের কর্ম্মানুষ্ঠান, কর্ম্ম বলিয়াই পরিগণিত হয় না।

যথা— "ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্ম-পত্র মিবাম্ভসা।।"

কর্ম্ম সকল ব্রহ্মে সমর্পণ করতঃ, কর্ম্মের ফলে আসক্তি শূন্য হইয়া কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম-ফলে লিপ্ত হইতে হয় না, পদ্ম-পত্র যেমন জলে থাকিয়াও জলে লিপ্ত হয় না, তাঁহারাও ঐরূপ কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্ম-ফলে লিপ্ত হয়েন না; অতএব তাঁহাদের কৃত ঐ সকল কর্ম্ম, কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হয় না।

এই জন্যই উক্ত হইয়াছে যে :—"যুক্তঃ কর্ম্ম-ফলং ত্যক্ত্বা, শান্তি মাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীং।
অযুক্তঃ কাম কারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে।।"

অর্থাৎ কর্ম্ম-যোগী কর্ম্মের ফলে অনাসক্ত হইয়া (কর্ম্ম-ফল ত্যাগ করিয়া) কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া আত্যন্তিকী শান্তি পাইয়া থাকেন পক্ষান্তরে অযুক্ত অর্থাৎ কর্ম্ম-যোগে অনভ্যস্ত ব্যক্তি ফল কামনার জন্য, কর্ম্ম-ফলে আসক্তি বশতঃ বন্ধন প্রাপ্ত হয়। অতএব ভগবান উপদেশ দিয়াছেন যে :—

"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম-সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরণ্ কর্ম্ম, পর মাপ্নোতি পুরুষঃ।।

অর্থাৎ, অতএব ফলাসক্তি রহিত হইয়া, সর্ব্বদা কর্ত্তব্য জ্ঞানে, বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। কারণ অনাসক্ত হইয়া (ফলে আসক্তি বা লোভ শূন্য হইয়া), বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে পুরুষ পরম পদ প্রাপ্ত হয়েন।

কাহার পক্ষে কি কি কর্ম্ম বিহিত তাহা ভগবদ্গীতায় বিস্তারিত বর্ণনা করেন নাই কেবল সংক্ষেপে এই মাত্র বলিয়াছেন।

"ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মানি প্রবিভক্তানি স্বভাব-প্রভবৈ-গুঁণৈঃ॥"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রগণের কর্ম্ম সকল পূর্ব্ব কর্ম্ম জ্ঞান সংস্কার হইতে জাত গুণ দ্বারা, বিভিন্নরূপে বিভক্ত, ইহা জানিবে।

"শমো দম স্তপঃ শৌচং ক্ষান্তি রার্জ্জব মেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞান মাস্তিক্যং ব্রহ্ম-কর্ম্ম-স্বভাবজম্॥"

অর্থাৎ শম (মনঃ সংযম) দম (ইংন্দ্রিয় সংযম), তপঃ (শারীরিক বাচিক ও মানসিক) শৌচ (অন্তর্ব্বহিঃশুদ্ধি), ক্ষমা, আর্জ্জব (সরলতা) জ্ঞান (শাস্ত্রার্থ বোধ) বিজ্ঞান (মানসিক প্রত্যক্ষ অনুভব) ও আস্তিক্য (শাস্ত্র ও পর লোকে বিশ্বাস) এই সকল ব্রাহ্মণগণের স্বভাব জাত ধর্ম্ম।

"শৌর্য্যং তেজো ধৃতি র্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নং;
দান মীশ্বর ভাবশ্চ ক্ষাত্র কর্ম্ম স্বভাবজং॥"

শৌর্য্য বীর্য্য ধৈর্য্য দক্ষতা, যুদ্ধে অপলায়ন, উদারতা, শাসন ক্ষমতা এই সকল কর্ম্ম ক্ষত্রিয় গণের স্বাভাবিক।

কৃষি গোরক্ষ বাণিজ্যং বৈশ্য-কর্ম্ম-স্বভাবজং।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজং॥

কৃষিকার্য্য, গোপালন ও বাণিজ্য বৈশ্য দিগের স্বভাব নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম। এবং পরিচর্য্যা শূদ্রদিগের স্বাভাবিক কর্ম্ম।

এই কথা বলিয়া ভগবান গীতায় বলিলেন :—

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।"

অর্থাৎ নিজ নিজ বর্ণাশ্রম বিহিত কর্ম্মে নিষ্ঠাবান ব্যক্তি সিদ্ধি (অর্থাৎ জ্ঞান যোগ্যতা) লাভ করেন।

কিরূপে স্বধর্ম্ম পালনে সিদ্ধিলাভ ঘটে এই প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ বলিলেন,

"যতঃ প্রবৃত্তি র্ভূতানাং যেন সর্ব্ব মিদং ততং।
স্ব কর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥"

অন্তর্য্যামী পরমেশ্বর হইতে প্রাণীগণের প্রবৃত্তি (স্বভাব) উৎপন্ন হয়, ও যিনি এই নিখিল বিশ্বব্যাপিয়া আছেন মানবগণ স্বধর্ম্ম পালন অর্থাৎ স্বীয় স্বভাবজাত কর্ম্ম সম্পাদন দ্বারা তাঁরই অর্চ্চনা করিয়া থাকেন অতএব তদ্দারা সিদ্ধিলাভ করেন।

নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি ভাবে সম্পাদন করিলে কর্ম্ম জাত দোষ না হইয়া শ্রেয়ঃ বা মঙ্গল জন্মিয়া থাকে, ভগবদ্গীতায় ইহার বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন এবং এই সম্বন্ধে এই সার উপদেশ দিয়াছেন যে স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম ঈশ্বর আদিষ্ট ভাবিয়া, তাহা ভগবানে

অর্পণ করিয়া তার ফলে আকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া, কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে অথবা ঈশ্বরপ্রীতির উদ্দেশ্যে তাহা সম্পাদন করিবে।

ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে কর্ম্মফলে আকাঙ্ক্ষা বা আসক্তি না থাকিলে কর্ম্ম, সম্পাদনে ঔদাসীন্য জন্মিতে পারে।

তজ্জন্য ভগবান বলিলেন :—

"সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত
কুর্য্যাৎ বিদ্বাং স্তথাসক্তঃ চিকীর্ষু র্লোক সংগ্রহং ॥

অর্থাৎ অবিদ্বান্ ব্যক্তিরা কর্ম্ম ও তৎফলে আসক্তি বশতঃ যেরূপ যত্ন সহকারে কর্ম্ম সম্পাদন করেন, বিদ্বান্ ব্যক্তি অন্যকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য সেইরূপ যত্ন সহকারেই কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকেন।

এই কথা বলিয়া, ভগবান বলিলেন : –

যাহাদের সমুদয় কর্ম্ম, ফল কামনা শূন্য, বুধগণ তাঁহাদিগকেই পণ্ডিত বলিয়া থাকেন। যথা: —

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কাম-সংকল্প-বর্জ্জিতাঃ
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং ত মাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥"

অর্থাৎ যাহাদের সমুদায় কর্ম্ম ফল-কামনা-শূন্য, বুধগণ তাঁহাদিগকে পণ্ডিত বলিয়া থাকেন; কারণ জ্ঞানাগ্নি দ্বারা, তাঁহাদের কর্ম্মানুষ্ঠানের দোষ সকল ধ্বংস হইয়া থাকে। সঙ্গ (আসক্তি) ও ফলা কাঙ্ক্ষা বা শূন্য হওয়ায়, তাঁহাদের কর্ম্মে বন্ধন জন্মায় না; ঐ জন্য তাঁহাদের কর্ম্মানুষ্ঠানকে প্রকৃত পক্ষে কর্ম্ম বলা হয় না; কারণ তাহাই কর্ম্ম—যাহা বন্ধন জন্মায়; "তদেব কর্ম্ম যৎ বন্ধায়।" অতএব নিষ্কাম ভাবে সম্পাদিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম, কর্ম্মই নহে।

ভগবান, পরবর্ত্তী দুই শ্লোকে ঐ কথাই স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। যথা:—

"ত্যক্ত্বা কর্ম্ম ফলাসঙ্গং নিত্য তৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোহপি, নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥"

অর্থাৎ যিনি কর্ম্ম ও ফলে আসক্তি শূন্য ঐ জন্য কর্ত্তব্য সম্পাদনে লাভ হউক বা না হউক নিত্যানন্দে পরিতৃপ্ত হয়েন তিনি নিত্য নৈমিত্তিক কিম্বা অন্য কোন লোক হিতকর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও বাস্তবিক কিছুই করেন না। অর্থাৎ নিষ্কাম বিধায় তাঁহার কর্ম্ম অকর্ম্মতা প্রাপ্ত হয়।

ঐ সকল ব্যক্তি "যদৃচ্ছা লাভ-সন্তুষ্টো দ্বন্দাতীতো বিমৎসরঃ সমঃ সিদ্ধা বসিদ্ধৌচ" হয়েন। অতএব, "কৃত্বা পি" ন বিধ্যতে।" অর্থাৎ যাহা কিছু লাভ হয় তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট হয়েন (আশানুরূপ লাভ হইল না, বলিয়া ক্ষুব্ধ হয়েন না, কারণ কোনরূপ আশা রাখিয়া তিনি ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়েন না) ও তিনি দ্বন্দ্ব কিনা, শীতোষ্ণ, সুখ দুঃখ, জয়

পরাজয়, লাভালাভ সহিষ্ণু হয়েন, কিছুতেই চঞ্চল হয়েন না, ও শত্রুতা শূন্য হয়েন ও সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সম, অর্থাৎ হর্ষ বিষাদ শূন্য হয়েন ; এই জন্য এতাদৃশ কর্ত্তা, কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্ম জনিত বন্ধন প্রাপ্ত হয়েন না।

উদাহরণ স্বরূপ, বলিলেন :—

"কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধি মাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোক-সংগ্রহ-মেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥"

অর্থাৎ জনক প্রভৃতি ঋষিগণ, বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা শুদ্ধ-সত্ব হইয়া সম্যক সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ; সম্যক সিদ্ধি বা জীবন্মুক্তি লাভ হইলেও, অন্য সকলকে ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য, কর্ম্ম কর্ত্তব্য।

কারণ :—　　　"যৎ যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোক স্তদনুবর্ত্ততে ॥"

অর্থাৎ, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে যে কর্ম্ম করেন, অন্য লোকেরা তাঁহাদের দেখিয়া ঐ ঐ কর্ম্ম করিয়া থাকে ; শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, অন্য লোকে তাহার অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে।

এই কারণে জীবন্মুক্ত ব্যক্তি-গণের নিজেদের স্বার্থের বা উপকারের জন্য কোন কর্ম্ম করা আবশ্যক না হইলেও, অন্য সকলের উপকারের জন্য অর্থাৎ অন্য সকলকে বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য; তাঁহারা কর্ম্ম করিয়া থাকেন ;

এই স্থলে বলা কর্ত্তব্য যে, জীবন্মুক্ত পুরুষেরা স্পষ্ট অনুভব করেন তাঁহাদের নিজ নিজ আত্মার অন্তরালে যে পরমাত্মা বিরাজ করেন, ঐ পরমাত্মা সকলের আত্মার অন্তরালেই, বিরাজ করিতেছেন, অতএব সকলেই সেই এক পরমাত্মারই বিভূতি ; এই জন্য তাঁহারা, নিজেদের স্বার্থ যেরূপ খোঁজেন, অপর সকলের স্বার্থও ঐরূপ খোঁজেন, কারণ ঐরূপ অনুভূতির জন্য তাঁহাদের সার্ব্ব-জনীন প্রেম জন্মায়, ঐ জন্য তাঁহারা, অন্য সকলের স্বার্থ সাধনে নিজেদেরই স্বার্থ-সাধন দেখিয়া থাকেন, তখন তাঁহাদের এইটি স্বার্থ এইটি পরার্থ এই রূপ ভেদ জ্ঞান লোপ পায়, এই জন্য তাঁহারা সার্ব্ব-জনীন মঙ্গলের জন্য স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া ধাবমান হয়েন ; সার্ব্বজনীন মঙ্গল সাধনে কষ্ট থাকিলেও, তাঁহারা তাহা আনন্দ সহকারে করিয়া থাকেন ; কারণ ঐ রূপে কর্ম্ম করাতেই তাহাদের আনন্দ বোধ হয় ; তাহা তাঁহাদের পক্ষে Labor ? Love, 'ভালবাসার' বা 'প্রীতির' খাটুনি হইয়া থাকে, ক্রমশঃ ঐরূপ আচরণ তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়।

শ্রীশঙ্কর, শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবুদ্ধদেব প্রভৃতি মহাত্মারা ঐ জন্য, সর্ব্ব সাধারণের মঙ্গলার্থ জ্ঞান, ভক্তি প্রচারেই আপন আপন জীবন উৎসর্গ করিয়া ছিলেন, ভগবানের ঐশী শক্তি ঐ জন্যই (জীবের ভোগ ও অপবর্গের জন্যই) দিন রাত্রি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়াদি কার্য্য

করিতেছেন ও সময়ে সময়ে আবশ্যক হইলে, নররূপে অবতীর্ণ হইয়া জ্ঞান ভক্তি শিক্ষা দিয়া, মনুষ্যগণকে উদ্ধার করিতেছেন।

ভগবান গীতা-শাস্ত্রে, এই জন্য বলিয়াছেন—

"ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি।।"

অর্থাৎ হে পার্থ! আমার নিজের মঙ্গলের জন্য, আমার কিছুই কর্ত্তব্য অর্থাৎ করণীয় নাই, কারণ ত্রিলোকে আমার অপ্রাপ্ত বা পাইবার যোগ্য কিছুই নাই তবুও আমি কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকি, কারণ আমি যদি আলস্য বশতঃ কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করি, তাহা হইলে মনুষ্যগণ আমার অনুসরণ করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান ত্যাগ করিবে।—তাহার ফলে মনুষ্যগণ উৎসন্ন হইবে।

যথা :—

"যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্মচেদহং।"

অতএব কি জীবন্মুক্ত কি সাধক, সকলেরই কর্ম্ম-যোগে অভ্যস্ত হওয়া উচিত। কর্ম্মযোগ কাহাকে বলে? ভগবান বলিয়াছেন; "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং" অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠানে, দোষ না জন্মিয়া যেরূপ আচরণে, কর্ম্মানুষ্ঠান হইতে মঙ্গল সাধিত হয়, ঐ কৌশলের নাম কর্ম্মযোগ।

সাধারণ লোকে, প্রবৃত্তির বশ হইয়া; প্রবৃত্তি যে দিকে লইয়া যায়, ঐ দিকেই চলিয়া থাকে, তাহারা কি প্রেয়, কেবল তাহাই দেখে; কোনটি শ্রেয়ঃ তাহা ঠিক করিবার তাদৃশ যত্ন করেন না; অথবা প্রবৃত্তির বশে, প্রেয়টীকেই শ্রেয় মনে করে। কর্ম্ম-যোগী কিন্তু কোনটি শ্রেয়ঃ, তাহা ঠিক করিয়া তাহা প্রবৃত্তির অনুযায়ী না হইলেও, প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া, শ্রেয়ের অনুসরণ করিয়া থাকেন; ক্রমশঃ অভ্যাস ক্রমে, জ্ঞানের উন্নতি সহকারে শ্রেয়ঃ আচরণই তাঁহাদের স্বভাব হইয়া দাঁড়ায়, তখন তাঁহাদের পক্ষে শ্রেয়ঃই প্রেয় হইয়া থাকে, ঐরূপ অবস্থা ঘটিলে তাঁহাদিগকে কর্ম্ম-যোগ সিদ্ধ যোগী বলা যায়।

অতএব প্রথমতঃ কিরূপ আচরণ শ্রেয়ঃ, তাহা ঠিক করা কর্ত্তব্য। পরে কিরূপ ভাবে সম্পাদন করিলে, ঐ ঐ কর্ম্মানুষ্ঠানে, দোষ না জন্মিয়া, কেবল মাত্র মঙ্গল (শ্রেয়ঃ) জন্মাইবে, তাহারও আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

কারণ, *"গত সঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিত-চেতসঃ।*
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে।।"

অর্থাৎ গত সঙ্গ অর্থাৎ নিষ্কাম ও রাগাদি হইতে মুক্ত ও জ্ঞানে অবস্থিতচিত্ত ব্যক্তিগণ

যজ্ঞের জন্য, (ঈশ্বর প্রীতির জন্য) যে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেণ, তাহা লয় প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ অকর্ম্মতা প্রাপ্ত হয়।

বলা বাহুল্য কর্ম্ম যোগের সাধকগণ চিত্ত-শুদ্ধির জন্য যে সকল কার্য্য করেন, তাহাও যজ্ঞার্থ কর্ম্ম ও কর্ম্ম-যোগে-সিদ্ধ ব্যক্তিগণ অন্যকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য যাহা করেন, তাহাও যজ্ঞার্থ কর্ম্ম। এই সকল কর্ম্মও, অকর্ম্মতা প্রাপ্ত হয়।

কেহ কেহ তর্ক করেন যে, জ্ঞানোদয়ে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া থাকে; এবং এই তর্কের পোষকে, গীতার নিম্ন-লিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করেন।

"যথৈধাংসি সমিদ্ধো ঽগ্নি র্ভস্ম সাৎ কুরুতে ঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্ব-কর্ম্মাণি ভস্ম-সাৎ কুরুতে তথা।"

অর্থাৎ যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি সকলকেই ভস্ম-সাৎ করিয়া থাকে ঐরূপ জ্ঞানাগ্নিও সমুদয় কর্ম্মকে ভস্ম-সাৎ করে। এই শ্লোকে যে জ্ঞান জন্য সর্ব্বকর্ম্ম ধ্বংস হয় বলা হইল, ইহাতে জ্ঞান জন্য জ্ঞানীর সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ হয় বলা হইল না; বলা হইল তাঁহাদের সকল কর্ম্মের দোষ সকল ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং ঐ জন্য তাঁহাদের কৃত কর্ম্ম অকর্ম্মতা প্রাপ্ত হয়।

"যজ্ঞায়া অচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে" যে ভাবে বলা হইয়াছে এই শ্লোকে সেই ভাবেই জ্ঞানাগ্নি দ্বারা সকল কর্ম্ম ধ্বংস হয় বলা হইয়াছে। ইহার মধ্যে এইমাত্র বিশেষ আছে যে "যজ্ঞায়া চরতঃ কর্ম্ম" কেবল মাত্র ক্রিয়মান কর্ম্মের দোষ নষ্ট করে; "জ্ঞানাগ্নি" কিন্তু ক্রিয় মান ব্যতীত 'সঞ্চিত" কর্ম্মেরও দোষ খণ্ডন করে অর্থাৎ সঞ্চিত কর্ম্মও, জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ বীজ তুল্য হয় ঐজন্য তাহা আর বন্ধন বা পুনর্জন্মের কারণ হয় না। এই জন্যই বলা হইয়াছে যে, জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্ব-কর্ম্মাণি ভস্ম-সাৎ করুতে ঽর্জ্জুন।" ফলে আসক্তি শূন্য হইয়া শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট বা ঈশ্বরদিষ্ট কর্ম্ম করিতে করিতে, ক্রমশঃ কর্ম্ম-যোগ হৃদয়ে "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন, যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি" অর্থাৎ "হৃদিস্থিত ভগবান যেরূপ করাইতেছেন, সেইরূপ কর্ম্ম করিতেছি" এইরূপ ভাব জন্মে। ঐরূপ মনের ভাব জন্মিলেও সামান্য কর্ত্তৃত্ব ভাব থাকিয়া যায়; মনে হয়, ঈশ্বরের অভিপ্রেত কর্ম্ম করিতেছি বটে কিন্তু আমিই তাহা, তাঁহার যন্ত্র-স্বরূপে করিতেছি; ক্রমশঃ ঐ কর্ত্তৃত্বাভিমানও নষ্ট হইয়া যায়, মনে হয়, তাঁহার কাজ তিনিই করিতেছেন, আমি উপলক্ষ্য মাত্র। এই ভাবকে লক্ষ্য করিয়া, "নিমিত্ত মাত্রং ভব সব্যসাচিন্" বলিয়া ভগবান গীতায় অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছিলেন। ঐরূপ নিমিত্ত মাত্র বা উপলক্ষ্যমাত্র ভাব জন্মিলে, প্রশান্ত অন্তঃকরণে ধীর ভাবে কর্ম্ম সম্পন্ন হয় এবং কাজটি ঈশ্বরের এই ভাব জাগরুক থাকায়, তাহা সুচারু-রূপে সম্পন্ন করিতে যথা সাধ্য প্রয়াস হয়। কৃত-কার্য্য হইলে, যে হর্ষ হয় ও ঐ জন্য সাধারণতঃ যে বাহাদুরি লইবায় প্রবৃত্তি হয়, তাহা তাঁহাদের হয় না। কার্য্য সকল হইলে যে হর্ষ হয় ও তজ্জন্য যে বাহাদুরি লইবার বাসনা জন্মায় তাহাই কর্ম্ম-যোগ বড় বেশী বিপদের কারণ, তাহা হইতে ক্রমশঃ প্রবৃত্তি ও বাসনা জাগিয়া উঠে; ঐ জন্য কর্ম্ম করিবার সময়

ঐ দিকে বাহাদুরী বা যশ পাইবার দিকে আদৌ লক্ষ্য রাখিতে নাই। ঐ ভাব জন্মাইবার জন্য, আমাদের আত্মা যে বস্তুতঃ দ্রষ্টা স্বরূপ, কর্ত্তা নয়, বুদ্ধিতে অধ্যাস বশতঃ আত্মা কর্ত্তা বলিয়া অভিমান হয়, এই তত্বটি উপলব্ধি করিবার জন্য আত্মার স্বরূপজ্ঞান অর্জ্জন করা আবশ্যক হয়। ঐ জন্য ভগবান গীতায়, প্রথমতঃ সাংখ্য যোগের কথা বলিয়া পরে কর্ম্ম-যোগের বিষয় বলিয়াছেন।

ফলাফলের জন্য চাঞ্চল্য বা কর্ম্মের সাফল্য জন্য বাহাদুরী লইবার ইচ্ছা যাহাতে না জন্মায়, তাহার জন্য ভগবান কর্ম্ম-যোগীকে বলিয়াছেন "নিদ্ধ্য সিদ্ধ্যোঃ জয়াজয়োঃ সমোভূত্বা অর্থাৎ সিদ্ধি অসিদ্ধি জয় পরাজয় এই সকলে সমবুদ্ধি হইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে।

তাঁহাকে "সম দুঃখ সুখঃ স্বস্থঃ সম লোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্য প্রিয়াপ্রিয়ো ধীরঃ তুল্য নিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥"

হইতে হইবে।

অর্থাৎ তাঁহাকে, সুখে দুঃখে অবিকৃত, অবিচলিত, প্রিয়াপ্রিয়ে তুল্য বুদ্ধি, ও লোষ্ট্র ও সুবর্ণে, তুল্য-জ্ঞান ও নিন্দা ও প্রশংসায় অনভিভূত হইয়া সুস্থ ও ধীর ভাবে কার্য্য করিতে হইবে। আত্মার স্বরূপ জ্ঞান ব্যতীত এইরূপ ভাবে কার্য্য করা যায় না। এই জন্যই ভগবান বলিয়াছেন :—

"কর্ম্মণ্য কর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্ন কর্ম্মকৃৎ ॥"

অর্থাৎ যদি যজ্ঞার্থ অনুষ্ঠেয় কর্ম্মকে, ইহা জ্ঞানোৎপাদক অতএব বন্ধ জনক নহে, বলিয়া ইহা কর্ম্ম নহে এইরূপ মনে করেন এবং অকর্ম্মকে অর্থাৎ বিহিত কর্ম্মের অকরণকে ইহা প্রত্যবায় জনক অতএব বন্ধ হেতু বলিয়া কর্ম্ম, এই রূপ মনে করেন, মনুষ্যগণের মধ্যে তিনিই বুদ্ধিমান।

তিনি যজ্ঞার্থ কর্ম্ম করিয়া তত্ব-জ্ঞান লাভ করেন, অতএব তিনি যুক্ত অর্থাৎ—

যোগসিদ্ধ। অতএব ঐ রূপে কর্ম্ম করিয়া, তিনি সর্ব্ব কাম্য-কর্ম্ম, ত্যাগ করিলেও, সর্ব্ব কর্ম্ম-কৃৎ; অর্থাৎ তাঁহার আর কাম-সংকল্পাত্মক কাম্য কর্ম্মে আবশ্যক থাকে না; অতএব যজ্ঞার্থ কর্ম্ম করিয়াই তিনি সর্ব্ব-কর্ম্ম-কৃৎ হইয়া থাকেন।

ভগবানের এইরূপ উক্তি শুনিয়া অর্জ্জুনের মনে মনে সন্দেহ হয়, তবে উপনিষদে যে উক্ত হইয়াছে :—

"ন কর্ম্মনা ন প্রজয়া ন ধনেন ত্যাগেনৈকেনা মৃতত্বমানশুঃ" অর্থাৎ কর্ম্ম দ্বারা সন্তান সন্ততি কি ধনের দ্বারা অমৃতত্বের ভরসা নাই; একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হইয়া থাকে। ঐরূপ "বেদান্ত-বিজ্ঞান-সুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাস-যোগাৎ যতয়ঃ শুদ্ধ-সত্বাঃ তে ব্রহ্ম-লোকেতু পরান্ত পরামৃতাৎ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে ॥" অর্থাৎ যাঁহারা বেদান্ত বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া সন্ন্যাস যোগ অবলম্বন করেন ঐ সকল শুদ্ধ-সত্ব যোগি মুক্ত হইয়া

থাকেন এই সকল শ্লোকে সন্ন্যাস ভিন্ন মুক্তি লাভ নাই বলা হইয়াছে ; অতএব, "আপনার উক্তির সহিত উপনিষদের এই সকল উক্তির বিরোধ ঘটিয়াছে" ; ভগবান অর্জ্জুনের হৃদয়ের ঐ আশঙ্কা অনুমান করিয়া উত্তর দিয়াছেন :—

"জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥"

অর্থাৎ যিনি দ্বেষও করেন না, আকাঙ্ক্ষাও করেন না ঐরূপ দ্বেষ ও আসক্তি শূন্য ব্যক্তিকেই নিত্য সন্ন্যাসী বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ ঐরূপ ব্যক্তি কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও তাঁহারা সন্ন্যাসী ; যেহেতু রাগ দ্বেষাদি দ্বন্দ্ব শূন্য ব্যক্তি অনায়াসেই সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হন। অতএব সন্ন্যাসী হওয়া, কর্ম্ম করা বা কর্ম্ম-ত্যাগের উপর নির্ভর করে না ; কি ভাবে কর্ম্ম করে, বা কর্ম্মত্যাগ করে, ঐ মানসিক ভাবের উপর নির্ভর করে।

ঐজন্য :—

"কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্ব-কর্ম্ম-ফলত্যাগং প্রাহু স্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥

অর্থাৎ কাম্য কর্ম্ম ত্যাগকেই সন্ন্যাস বলে ; নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য—সর্ব্ব কর্ম্মের ফল ত্যাগকেই ত্যাগ বলা যায়।

অতএব ভগবান বলিলেন :—

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোয়ং কর্ম্ম বন্ধনঃ
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥"

অর্থাৎ যজ্ঞার্থ (ঈশ্বর প্রীত্যর্থ) ভিন্ন অন্য কর্ম্ম করিলে বন্ধন হয় ; অতএব যজ্ঞার্থ কর্ম্ম মুক্ত-সঙ্গ হইয়া (নিষ্কাম হইয়া) আচরণ কর। তিনি আরও স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করিলেন :—যে, কর্ম্ম-ত্যাগ দ্বারা শাস্ত্রোক্ত নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধ হয় না ; এবং কেবল মাত্র সন্ন্যাস দ্বারা সিদ্ধি লাভ হয় না।

যথা:—　"ন কর্ম্মণা মনারম্ভাৎ নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষো ঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥"

অর্থাৎ কর্ম্ম না করিলেই, নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি হয় না ও (চিত্ত শুদ্ধি ভিন্ন) কেবল মাত্র সন্ন্যাসে (সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বনে) সিদ্ধি লাভ হয় না। অতএব কর্ম্ম-ত্যাগকে নৈষ্কর্ম্ম্য বলা যায় না ;

সঙ্গ ও ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া কর্ত্তব্য বা ঈশ্বর আদিষ্ট বোধে বিহিত কর্ম্ম ঈশ্বর প্রীত্যর্থ অনুষ্ঠান করিলে, নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি হইয়া থাকে। এই জন্য নিম্নলিখিত শ্লোকে তিনি অজ্ঞ কর্ম্ম-ত্যাগীর নিন্দা করিয়াছেন। যথা:—

"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য যঃ আস্তে মণসা স্মরণ।
ইন্দ্রিয়াথান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি জোর পূর্ব্বক কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলকে আট্কাইয়া রাখে কিন্তু মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল স্মরণ করে, ঐ বিমূঢ়াত্মা ব্যক্তিকে মিথ্যাচার বলে।

এবং বলিলেন, যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় সকলকে মন দ্বারা সংযত করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্ম যোগের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই প্রশংসা যোগ্য।

যথাঃ— "য স্থিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতে ঽর্জ্জুন।
কর্ম্মন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্ম-যোগ মসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥"

এবং যেহেতু কেহই কোন না কোনরূপ কর্ম্ম না করিয়া ক্ষণকালও থাকিতে পারেন না ঐ জন্য তিনি কর্ম্ম-যোগ অবলম্বনের জন্য পরামর্শ দিলেন।

এবং ঐ যোগের সার মর্ম্ম এই ভাবে প্রকাশ করিলেন ঃ—

"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরণ কর্ম্ম পর মাপ্নোতি পুরুষঃ॥

অর্থাৎ সঙ্গরহিত ও ফলাসক্তি শূন্য হইয়া, কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল সম্পাদন কর; অনাসক্ত হইয়া ঐরূপ কর্ম্ম করিলে পুরুষ পরমপদ (শ্রেষ্ঠ পদ, মুক্তি) প্রাপ্ত হয়।

ঐ কথা বলিয়া, জানাইলেন,

"অনাশ্রিতঃ কর্ম্ম-ফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগীচ ন নিরগ্নি ন´ চাক্রিয়ঃ॥

অর্থাৎ যিনি কর্ম্ম ফলের অপেক্ষা, না করিয়া, বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই সন্ন্যাসী, তিনিই যোগী; হঠ কারিতা করিয়া যিনি অগ্নি-সাধ্য ইষ্টাদি কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন বা অনগ্নি-সাধ্য পূর্ত্তাদি কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন; এই উভয় বিধ লোকের মধ্যে কেহই যোগী বা সন্ন্যাসী নহেন।

মনুষ্য মাত্রেরই আত্মা চিৎ স্বরূপ; কিন্তু তাহাতে ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধির সংস্কার জমিয়া, ময়লা পড়িয়াছে; ঐ ময়লা পরিষ্কার করিয়া আত্মার যথার্থ চিৎ-স্বরূপ ফুটাইয়া তুলিতে হইবে; ঐরূপ করিতে কর্ম্ম-যোগ, জ্ঞান-যোগ ও ভক্তি-যোগ সকলেরই আবশ্যক হয়; ঐ জন্য গীতায়, ভগবান অর্জ্জুনকে, ঐ তিন যোগের বিষয়ই বলিয়াছেন তন্মধ্যে কর্ম্ম-যোগ, অন্য দুই যোগের ভিত্তি স্বরূপ; কারণ ক্রিয়া-যোগ দ্বারা মন বুদ্ধি পরিষ্কার না হইলে, তাহাতে তত্ত্ব-জ্ঞান প্রতিভাত হয় না ও তত্ত্ব-জ্ঞান প্রতিভাত না হইলে, প্রকৃত পরা-ভক্তি ও উদয় হয় না। গীতায় ক্রিয়া-যোগের নাম দিয়াছেন, "বুদ্ধি-যোগ'।

শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনকে নিম্নলিখিত শ্লোকের দ্বারা, বুদ্ধি-যোগের শিক্ষা দিয়াছেন;

"দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম, বুদ্ধি-যোগাৎ ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণ মন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফল হেতবঃ॥

বুদ্ধি যুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃত দুষ্কৃতে।
তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং॥
কর্ম্মজং বুদ্ধি-যুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্ম বন্ধ-বিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ং॥
যদাতে মোহ-কলিলং বুদ্ধি র্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্যচ॥
শ্রুতি বিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধি স্তদা যোগমবাপ্স্যসি॥'

অর্থাৎ, হে ধনঞ্জয়, সকামকর্ম্মসকল, বুদ্ধিযোগ হইতে অনেক নিম্নে। তুমি বুদ্ধি-যোগের শরণ গ্রহণ কর। যাহারা ফলের উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করে, তাহারা কৃপণ, কৃপার পাত্র। যাঁহারা বুদ্ধি যোগ আশ্রয় করেন তাঁহারা সুকৃত দুষ্কৃত এই উভয়ের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান। অতএব বুদ্ধি-যোগের জন্য যত্ন কর।

কর্ম্মের কৌশলের নামই বুদ্ধিযোগ। বুদ্ধি-যোগ অবলম্বী মনীষী ব্যক্তিগণ কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া, জন্ম রূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বোপদ্রব শূন্য পরম পদ প্রাপ্ত হয়েন।

(ঐ যোগ আচরণে) যখন তোমার বুদ্ধি, মোহ-জাল কাটাইয়া উঠিবে তখন তোমার শ্রোতব্য ও শ্রুত অর্থ বিষয়ে (সর্ব্ব বিধ কর্ম্ম-ফল বিষয়ে) বৈরাগ্য জন্মিবে। নানা-রূপ কর্ম্ম-ফল শ্রবণে চঞ্চল বুদ্ধি যখন তোমার (কর্ম্ম-ফল-ত্যাগ দ্বারা) স্থিরত্ব লাভ করিবে, তখন তোমার যোগ অর্থাৎ ধ্যান-যোগ আয়ত্তাধীন হইবে।

অতএব, বুদ্ধি যোগ বা কর্ম্ম-যোগ, ধ্যান-যোগের ভিত্তি স্বরূপ; ফলের উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করিলে বুদ্ধি বা মন স্থির হয় না ঐ জন্য বেদোক্ত সকাম কর্ম্ম-কাণ্ড, অব্যবসায়ীগণেরই উপযুক্ত, ব্যবসায়ীর বুদ্ধি এক নিষ্ঠ অর্থাৎ কেবল পরমেশ্বর নিষ্ঠ ঐজন্য তাঁহারা ঈশ্বর আদিষ্ট— অতএব কর্ত্তব্য এই বুদ্ধিতেই কর্ম্ম-ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া কর্ম্ম করেন; কর্ম্মের ফলের দিকে লক্ষ্য করেন না।

কামীরা তাহার বিপরীত আচরণ করেন; তাঁহারা বেদের অর্থবাদকেই—ফল-শ্রুতিকেই সার ভাবিয়া, নানা ফলের জন্য নানা-রূপ সকাম কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন।

ভগবান, ভগবদ্গীতায় ঐ কথাই, নিম্নলিখিত শ্লোক সকলে প্রকাশ করিয়াছেন। যথাঃ—

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদ-বাদ-রতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্ম-কর্ম্ম-ফল প্রদাং।
ক্রিয়া-বিশেষ-বহুলাং ভোগৈশ্বর্য্য গতিং প্রতি॥

ভোগৈশ্বর্য্য-প্রসক্তানাং তয়াপহৃত চেতসাং।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥"

অর্থাৎ, বেদের অর্থবাদে পরিতুষ্ট ও ঐ অর্থাবাদের ফল ব্যতীত বৈদিক ক্রিয়ার অপর কিছু প্রাপ্তব্য নাই এইরূপ বাদী-গণ, কামাত্মা ও স্বর্গ পরায়ণ। ঐ প্রকার ব্যক্তিগণ, জন্ম-কর্ম্ম ফল-প্রদ ও ভোগৈশ্বর্য্য প্রাপ্তির সাধন ভূত ক্রিয়া-বিশেষ-বহুল ক্রিয়া কাণ্ডের ঐরূপ পুষ্পিত বাক্য দ্বারা (স্বর্গ ও তত্রস্থ সুখ আদি ফল-শ্রুতি দ্বারা) মোহিত হইয়া থাকেন।

ঐ সকল ফল-শ্রুতিতে অপহৃত চিত্ত ও ভোগৈশ্বর্য্যে আসক্ত ব্যক্তিগণের হৃদয়ে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি জন্মায় না। ঐজন্য ভগবান বলিলেন, বেদের কর্ম্ম-কাণ্ডের বিধি প্রায়ই ত্রৈগুণ্য বিষয়ক ; হে অর্জ্জুন তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য হও ; অর্থাৎ নির্দ্বন্দ্ব, নিত্য-সত্বস্থ, নির্যোগ-ক্ষেম ও আত্মবান হও। অর্থাৎ প্রথমতঃ নির্দ্বন্দ হও ; সুখ, দুঃখ, মান অপমান রাগ দ্বেষ, শীত উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দের অতীত হও ; কিছুতেই অভিভূত হইও না ; দ্বন্দাতীত বিমৎসর হইবে ; তৎপরে নিত্য-সত্বস্থ হইবে ; অর্থাৎ রজঃ, তমঃ দ্বারা বাধিত মিশ্র-সত্বকে অতিক্রম করিয়া রজঃ তমঃ দ্বারা অবাধিত শুদ্ধ সত্বাবলম্বী হইবে ; ঐরূপ বিশুদ্ধ সত্বাবলম্বী অবস্থা স্থায়ী হইলেই নিত্য সত্বস্থ হওয়া যায়। অতএব ঐ বিশুদ্ধ-সত্বাবস্থাকে স্থায়ী করিয়া নিত্য-সত্বস্থ হইবে।

পরমেশ্বরের বিশুদ্ধ সত্বে, নিত্য আশ্রয় লইবে ; এই স্থলে বলা কর্ত্তব্য, যে মনুষ্যের আত্মার অন্তরালে রজস্তম দ্বারা অবাধিত এক বিশুদ্ধ সত্ব আছে, যাহা ভগবৎ চৈতন্যে ও আনন্দে ওতঃ প্রোতঃ ; গীতায় ঐ ঐশী শক্তিকে জীব-ভূতা পরা প্রকৃতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ; উপনিষদে তাঁহাকেই ভগবানের "স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া শক্তি" বলিয়াছেন ; এবং তন্ত্রে, তাঁহাকেই কুলকুণ্ডলিনী শক্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ; তাঁহাকে রজের অশান্তি স্পর্শ করিতে পারে না ; তমের মোহও স্পর্শ করিতে পারে না ; তুমি ঐ নিত্য সত্বে প্রতিষ্ঠিত হও, তাহা হইলে, তুমি স্থির প্রশান্ত হইবে ; অন্য কোন বিষয়ে তোমার লোভ ও আসক্তি হইবে না, এবং তখন তুমি "নি-র্যোগ-ক্ষেম আত্মবান্" হইবে। এবং এতদতিরিক্ত তোমাকে 'আত্মবানও" হইতে হইবে ; অর্থাৎ আত্মার বা পরমাত্মার আনন্দেও প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে (আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন, এইরূপ অবস্থা প্রাপ্তির জন্য ভগবান প্রথমতঃ কর্ম্মযোগের আশ্রয় লইতে বলিলেন। বলিলেন :—

"যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি, সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যে সিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা, সমত্বং যোগ উচ্যতে" ॥

অর্থাৎ, ইহাতে এই ফল হইবে, ঐ ফলের দিকে তাকাইয়া কর্ম্ম করিও না ; যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করিবে ; কি ভাবে কর্ম্ম করিবে ? না অনাসক্ত (নিঃসঙ্গভাবে কর্ম্ম করিবে ও সিদ্ধি অসিদ্ধির প্রতি সমদর্শী হইয়া কর্ম্ম করিবে ; সিদ্ধি হইলেও, ভাল ; সিদ্ধি

যদি নাও হয়, তাতেই বা ক্ষতি কি। আমার কর্ত্তব্য, করিতেছি, এইভাবে, করিবে; কারণ, ঐরূপ সমদর্শিত্বই যোগ।

অতঃপর কর্ম্ম-যোগীকে আরও কিরূপ লক্ষণযুক্ত হইতে হয় গীতায় তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

"আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যো হর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥

অর্থাৎ যিনি প্রকৃত যোগী, তিনি সুখ ও দুঃখ আপনাতে যেমন দেখেন, অন্যতেও তেমনি; সর্ব্বত্র সমানভাবে দেখিয়া থাকেন। অর্থাৎ কর্ম্ম-যোগীতে লোকের সঙ্গে সহানুভূতি ও সম দুঃখতা পূর্ণ-মাত্রায় বিরাজ করে; অতএব প্রকৃত কর্ম্ম-যোগী হইতে হইলে, সকলের সঙ্গে সহানুভূতি ও সমদুঃখতা গুণও থাকা চাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মনুষ্যের কি কি কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য তাহা গীতাশাস্ত্রে সবিশেষ উল্লেখ করেন নাই; কি ভাবে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবেন তাহাই বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

কর্ত্তব্য নির্ণয়ের জন্য, গীতায় সাধারণভাবে এইরূপ উক্ত হইয়াছে, যথা :—

যে "তস্মাৎশাস্ত্রং প্রমাণংতে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ
জ্ঞাত্বা শাস্ত্র বিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি।"

অর্থাৎ শাস্ত্রের বিধি অবগত হইয়া শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী কার্য্য করিবে। অতএব শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে নিজ নিজ কর্ত্তব্য স্থির করিবে। গীতায় ভগবান বেদের কর্ম্মকাণ্ডের নিন্দা করিয়াছেন, এইরূপ ভাবিয়া কি জানি কেহ বেদোক্ত যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অশ্রদ্ধ হয়েন ঐ জন্য ভগবান বলিয়াছেন—

"যজ্ঞ দান তপঃ কর্ম্ম ন ত্যজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞ দান তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাং॥

অর্থাৎ যজ্ঞ দান ও তপস্যা এই সকল কর্ম্ম, কদাচ পরিত্যজ্য নহে; তাহা নিশ্চয়ই কর্ত্তব্য। কারণ যজ্ঞদান ও তপস্যায় চিত্ত শুদ্ধ করে। তবে ঐ ঐ কার্য্যের যে ফল-শ্রুতি আছে। তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া, সেই সেই ফলের জন্য তাহা করিও না; তবে কিভাবে করিতে হইবে? কিভাবে করিলে, চিত্ত-শুদ্ধি হইবে?

ইহার উত্তরে বলিয়াছেন :—

'-এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমং॥

অর্থাৎ আসক্তি ও ফল কামনা ত্যাগ করিয়া, ঐ সকল কর্ম্ম ঈশ্বরাদিষ্ট বলিয়া করা কর্ত্তব্য, ইহা আমার নিশ্চিত উত্তম মত জানিবে। পরে আরও বলিলেন যে, শাস্ত্রোক্ত নিয়ত কর্ম্ম কদাচ ত্যাজ্য নহে! যথা :—

"নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাৎ তস্য পরিত্যাগ স্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥"

অর্থাৎ নিয়ত বা নিত্য কর্ম্মের সন্ন্যাস কদাচই উচিত নয়; মোহ বশতঃ নিত্যকর্ম্ম ত্যাগকে তামস ত্যাগ বলে।

ইহাতে সূচিত হইল, যে কাম্য কর্ম্মের ত্যাগ চলে, নিত্য নৈমিত্তিকের ত্যাগ কদাচ চলে না। কি কি কর্ম্ম নিত্য কর্ম্ম ও কি কি কর্ম্ম নৈমিত্তিক কর্ম্ম, তাহা শাস্ত্রান্তরে দ্রষ্টব্য।—এতদ্ভিন্ন, প্রত্যেক মনুষ্যেরই, নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রম বিহীত কর্ত্তব্য কর্ম্ম, অবশ্য করণীয়। ভগবান গীতায় ইহা স্পষ্টরূপেই উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ অন্যই তিনি অর্জ্জুনকে, বলিয়াছিলেন:—

"স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতু মর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে॥"

অর্থাৎ তুমি যদি তোমার বর্ণ ও আশ্রমবিহিত ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য কর তাহা হইলেও, তোমার এই ধর্ম্ম-যুদ্ধ হইতে বিমুখ হওয়া উচিত হয় না। করণ ধর্ম্ম-যুদ্ধ অপেক্ষা অন্য কিছু ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেয়ঃ নাই। এইস্থলে মনোযোগ করিবেন, ভগবান, যে-কোন প্রকার যুদ্ধ যে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে কর্ত্তব্য তাহা বলিলেন না; ধর্ম্ম-যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য ইহাই বলিলেন। আজকাল যে, ছলে বলে অন্য দেশকে আত্ম-সাৎ করিবার জন্য যুদ্ধ করা হইতেছে, তাহা ধর্ম্ম-যুদ্ধ নহে, ইহা "যুদ্ধ" নামক প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্ম্ম-যুদ্ধ ত্যাগ করা মহাপাপ, ইহা ভগবান স্পষ্টই উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

"অথ চেৎত্ব মিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি।

অর্থাৎ যদি তুমি এই ধর্ম্ম-যুদ্ধ না কর, তাহা হইলে স্বধর্ম্ম ত্যাগ ও কীর্ত্তিত্যাগ জন্য তোমার পাপ হইবে।

বলা বাহুল্য ধর্ম্ম-যুদ্ধ ত্যাগ করিলে, ক্ষত্রিয়ের যেরূপ পাপ ও কীর্ত্তিনাশ হয়, অন্যা অন্য বর্ণেরও, নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রমবিহিত কর্ম্ম-ত্যাগে ঐরূপ পাপ ও কীর্ত্তি-নাশ হইয়া থাকে।

পক্ষান্তরে স্ব স্ব বর্ণ ও আশ্রমবিহিত কর্ত্তব্যপালনে, পরম পদপ্রাপ্তি ঘটে; ইহার বোধক শ্লোক পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। এমন কি স্বীয়বর্ণ ও আশ্রমবিহিত ধর্ম্ম সম্যক্‌রূপে সম্পাদন করিতে না পারিলেও তাহা সম্যকরূপে সম্পাদিত পর-ধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ ইহাও, ভগবান স্পষ্টই উল্লেখ করিয়াছেন। যথা:—

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।"
"স্বভাব-নিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষং॥"

অতএব আমার বর্ণ বা আমার আশ্রম ধর্ম্ম বড় কঠিন; ইহা সুচারুরূপে সম্পাদন করা যায় না, অন্য বর্ণ বা আশ্রমের ধর্ম্ম সুখ সম্পাদ্য অতএব, ঐ ঐ বর্ণের বা আশ্রমের ধর্ম্ম গ্রহণ করিব, এইরূপ চিন্তা কদাচ মনে স্থান দিও না।

স্বভাব নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম যথা :—ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্ম্ম-যুদ্ধ, ব্রাহ্মণের পক্ষে অপমান সহ্য করিয়াও ক্ষমা করা, সদোষ হইলেও, তাহা ত্যাগ করিতে নাই। কারণ, অগ্নির সহিত ধূমের ন্যায় সকল ধর্ম্মেই স্বল্লাধিক দোষ থাকে। কি ভাবে, কি কর্ম্ম করিলে, সেই দোষ স্পর্শ হয় না, তাহা নির্ণয় করিয়া, সেই ভাবেই ঐ কর্ম্ম করিতে হয়।—যেভাবে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিলে, দোষ স্পর্শ হয় না, তাহার কৌশল যেরূপ গীতাশাস্ত্রে লিখিয়াছেন, তাহা বর্ণন করিয়াছি। পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। পূর্ব্বে একস্থলে উল্লেখ করিয়াছি, যে উপনিষদে উক্ত হইয়াছে ',ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ', ; অর্থাৎ কেবল ত্যাগ দ্বারাই অমৃতত্বলাভ হইয়া থাকে। অতএব ভগবান ত্যাগের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, ত্যাগ তিন প্রকার; তন্মধ্যে

"কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তে অর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ॥

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, সঙ্গ (আসক্তি) ও ফল কামনা ত্যাগ করতঃ কর্ত্তব্যবোধে যে নিত্য কর্ম্ম, অবশ্য করণীয় বিধায়ে, প্রত্যহ করা যায়। তাহাকেই সাত্ত্বিক ত্যাগ বলে। অতএব সঙ্গ ও ফলাশক্তি ত্যাগ করতঃ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিবে, তাহা হইলেই "ত্যাগ ধর্ম্ম-রক্ষা করা হইবে। ঐরূপভাবে কর্ম্ম করিলে, কর্ম্ম করিলেই যে ইষ্ট অনিষ্ট ও মিশ্র এই ত্রিবিধ ফল জন্মায়, তাহা জন্মিতে পারে না। যেহেতুক :—

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলং।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য নতু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ॥"

অর্থাৎ, ইষ্ট, অনিষ্ট ও ইষ্টানিষ্ট, কর্ম্ম-জনিত এই ত্রিবিধ ফল মৃত্যু অন্তে অত্যাগীদেরই হইয়া থাকে, সন্ন্যাসীদের ঐরূপ ফল ভুগিতে হয় না। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ভগবান স্পষ্টই উল্লেখ করিয়াছেন যে

"অনাশ্রিতঃ কর্ম্ম-ফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নি ন চাক্রিয়ঃ॥

অতএব, কর্ম্ম-ফলের আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া, যিনি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, কর্ত্তব্যবোধে, সম্পাদন করেন তিনিই ত্যাগী তিনিই সন্ন্যাসী।

এই ভগবান বলিয়া উল্লেখ করিলেন যে কর্ম্ম ত্রিবিধ। সাত্ত্বিক, রাজসিক, ও তামসিক। তন্মধ্যে

"নিয়তং সঙ্গ-রহিতং অরাগ দ্বেষতঃ কৃতং।
অফল প্রেপ্সুনা কর্ম্ম যৎ তৎ সাত্ত্বিক মুচ্যতে॥"

অর্থাৎ ফল কামনা ব্যতিরেকে অনাসক্তভাবে, পুত্রাদির প্রতি অনুরাগ কিম্বা শত্রুদের প্রতি বিদ্বেষ, এই উভয়ের বশবর্ত্তী না হইয়া অবশ্য কর্ত্তব্য বিহিত কর্ম্ম করাকে সাত্ত্বিক কর্ম্ম বলা যায়।—অতএব সাত্ত্বিক কর্ম্ম করিতে গেলে, কর্ম্মটী শুদ্ধ কিনা শাস্ত্রমতে অবশ্য

কর্ত্তব্য কিনা দেখিতে হইবে ও তাহা, ফল কামনা ব্যতিরেকে, ও অনুরাগ বা দ্বেষাদির বশবর্ত্তী না হইয়া ঈশ্বরাদিষ্ট বলিয়া, ঈশ্বর প্রীত্যর্থই সম্পাদন করিতে হইবে, তবে তাহা সাত্বিক কর্ম্ম হইবে।—

'যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজস মুদাহৃতং॥"

অর্থাৎ, ফল-কামনার বশবর্ত্তী হইয়া অথবা অহংকার সহকারে এবং বিপুল আয়াসে অর্থাৎ স্বতঃ প্রবৃত্ত না হইয়া, লোকলজ্জা ভয়ে কিংবা নরকাদির ভয়ে বাধ্য হইয়া বিপুল আয়াসে, যদি শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মও করা যায়, তাহা রাজসিক কর্ম্ম হইবে।

ঐরূপ, আবার "অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসাং অনপেক্ষ্যচ পৌরুষং।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যৎ তৎ তামসমুচ্যতে॥"

অর্থাৎ পশ্চাদ্ভাবী শুভাশুভ' শক্তি ও অর্থক্ষয়, প্রাণি হিংসা ও স্বকীয় সামর্থ্য সম্যকরূপে বিবেচনা না করিয়া. মোহবশে যে কর্ম্ম করা যায় তাহাকে 'তামস" কর্ম্ম বলা যায়।

ভগবান, সাত্বিক কর্ম্ম করিতে উপদেশ দিয়াছেন

কর্ম্ম, যেরূপ সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ, কর্ম্ম-কর্ত্তাও, ঐরূপ, সাত্বিক, রাজসিক তামসিক ভেদে ত্রিবিধ, সঙ্গ বা আসক্তি শূন্য, অহঙ্কায় শূন্য, ধৈর্য্যশালী, অধ্যবসায় সমন্বিত আরব্ধ কর্ম্মের সিদ্ধি অসিদ্ধিতে বিষাদশূন্য, এতাদৃশ কর্ত্তা, সাত্বিক।

বিষয়ানুরাগ সম্পন্ন, কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী, পর-পীড়ক, শৌচ শূন্য লাভালাভে হর্ষ বিষাদ মুক্ত, এইরূপ কর্ত্তাকে রাজস কর্ত্তা বলে। অবধান শূন্য, বিবেক-হীন, উদ্ধত-স্বভাব, পরাপমান-কারী, অলস অবসন্ন চিত্ত ও দীর্ঘ সূত্রীএতাদৃশ কর্ত্তা "তামস" বলিয়া খ্যাত।

(গীতার ১৮ অধ্যায়ের ২৬, ২৭, ২৮ শ্লোক)

পূর্ব্ব-কালের মহাত্মারা এক দিকে যেমন ধ্যান-যোগে পরমাত্মার সাক্ষাৎ কার লাভ করিয়া, আর কোন লাভকেই তাহা অপেক্ষা অধিক লাভ বলিয়া মনে করিতেন না, অপর দিকে তেমনি, তাঁহারা পরমাত্মাকে স্মরণ পূর্ব্বক তাঁহাতেই কর্ম্ম-সমর্পণ করিয়া, মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেন।

ভগবদ্গীতাতেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

পরমাত্মাকে লাভ করাই যে তাঁহারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট লাভ মনে করিতেন তাহার প্রমাণ যথা:—

"যংলব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং তত :—
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥"

(গীতা, ষষ্ঠ অধ্যায়)

পরমাত্মাকে স্মরণ পূর্ব্বক তাঁহাতেই কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া, তাঁহারা যে মঙ্গল কার্য্যানুষ্ঠান করিতেন, তাহার প্রমাণ, যথা :—

"ওঁ তৎ সৎ ইতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণ ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা॥

অর্থাৎ ওঁ তৎসৎ এই তিনটি ব্রহ্মের ত্রিবিধ নাম; ইহা শিষ্টগণ কর্তৃক কথিত হয়; বিধাতা ঐ তিনটির দ্বারা ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ পুরাকালে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

"তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞ দান-তপঃ ক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাং॥"

অতএব, ওঁ এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া, অর্থাৎ ওঁকার প্রতি-পাদ্য পরমাত্মার স্মরণ করিয়া, ব্রহ্ম-বাদীগণের, যজ্ঞ দান ও তপঃ ক্রিয়া, সর্ব্বদা প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

"তদিত্য-নভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞ তপঃ ক্রিয়াঃ।
দান ক্রিয়াশ্চ বিবিধা ক্রিয়ন্তে মোক্ষ-কাঙ্খিভিঃ॥"

অর্থাৎ মোক্ষ কামীগণ, ফল-কামনা পরিত্যাগ করিয়া, "তৎ" এই শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক বিবিধ যজ্ঞ ও তপঃ ক্রিয়া এবং দান ক্রিয়া করিয়া থাকেন।

"সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা স্বচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে॥"

অর্থাৎ হে পার্থ, "ইহা আছে" এই ভাবে বা অর্থে এবং সাধুভাবে অর্থাৎ ইহা শ্রেষ্ঠ এই অর্থে "সৎ" শব্দ প্রযুক্ত হয় এবং প্রশস্ত অর্থাৎ মঙ্গল কর্ম্মেও "সৎ" শব্দ প্রযুক্ত হয়।

"যজ্ঞে তপসি দানেচ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্মচৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে।"

যজ্ঞ, তপস্যা ও দান ক্রিয়ায় তৎপর হইয়া থাকাও "সৎ" বলিয়া উক্ত হয়; এবং তদর্থীয় কর্ম্ম, অর্থাৎ যাঁহার নাম তৎ সৎ তাঁহার উদ্দেশ্যে যাহা কৃত হয় তাহা তদর্থীয় কর্ম্ম, অতএব পরমেশ্বরার্থ কর্ম্মও 'সৎ' বলিয়া কথিত হয়।

এই সকল শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, ক্রিয়া-কর্ম্মের অনুষ্ঠান-কালে কর্ম্ম-কর্ত্তা, ওঁ "তৎসৎ" উচ্চারণ পূর্ব্বক "ওঁ তৎসৎ" প্রতিপাদ্য পরমেশ্বরকে স্মরণ করিয়া কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন; "তৎ" শব্দ উচ্চারণ দ্বারা ব্রহ্মে লক্ষ্য করতঃ, ফলাভিসন্ধি ত্যাগ পূর্ব্বক কর্ত্তব্য সাধনে তৎপর হইবেন, এবং "সৎ" শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক সৎ-স্বরূপ পরমাত্মাতে কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া, সৎ-ভাবে সাধু-ভাবে শুভ-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন, কারণ মহাত্মারা ঐরূপই করিয়া থাকেন। অতএব এই কয়েক শ্লোকে, কর্ম্ম-যোগের মূল সূত্র প্রকাশ করা হইয়াছে। কর্ম্ম-যোগে সিদ্ধ হইতে হইলে, ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক, ধর্ম্মানুমোদিত কর্ত্তব্যের পথে, মন প্রাণ সমর্পণ করিবে। এতদ্ভিন্ন, সুচারু-রূপে ঐ যোগ সম্পন্ন করিতে হইলে, আহার, বিহার, নিদ্রা, চেষ্টা, জাগরণ যুক্তভাবে অর্থাৎ ঠিক ঠিক নিয়মিত ভাবে, ঠিক ঠিক পথে চালাইতে হইবে; সময়ে আহার, সময়ে ক্রীড়া-কৌতুক, সময়ে নিদ্রা সময়ে জাগরণ, সময়ে কার্য্য-চেষ্টা, পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করে পক্ষান্তরে, অসময়ে কর্ম্ম-চেষ্টা, অসময়ে আহার, অসময়ে ক্রীড়া-কৌতুক, অসময়ে নিদ্রা, অসময়ে জাগরণ, পরস্পরের পথে কণ্টক স্বরূপ হইয়া থাকে। যথা গীতায়:—

যুক্তা-হার-বিহারস্য যুক্ত-চেষ্টস্য কর্ম্মসু ।
যুক্ত স্বপ্নাববোধস্য যোগোভবতি দুঃখহা ॥"

অর্থাৎ, ঠিক সময়ে ঠিক মত আহার বিহার, ঠিক-সময়ে ঠিক মত কর্ম্ম-চেষ্টা, ঠিক-সময়ে ঠিক মত স্বপ্ন ও জাগরণ দুঃখনাশক যোগের সোপান। এই উক্তিটি, কর্ম্ম যোগ, ধ্যান-যোগ, সকল যোগের সম্বন্ধেই খাটে। অতএব, কর্ম্ম-যোগীকে, ঠিক সময়ে ঠিক মত ঐ সকল কার্য্য করিতে হয়, নতুবা কর্ম্ম-যোগ, (কেবল কর্ম্ম-যোগ কেন, কোনরূপ যোগই) সুসিদ্ধ হয় না —

ভগবান বলিয়াছেন, মনুষ্যের কর্ম্ম করাতেই অধিকার আছে; কর্ম্ম-ফলে তাহাদের অধিকার নাই; অতএব, কর্ম্ম করিবার সময়ে, কর্ম্মের ফলের জন্য উৎকণ্ঠিত হইও না; যথা সাধ্য সুচারুরূপে কর্ম্মটি করিয়া যাইবে। যথা :—

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন ।
মা, কর্ম্ম-ফল-হেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গো স্ত্বকর্ম্মণি॥"

অর্থাৎ কর্ম্মেই তোমার অধিকার; কর্ম্ম-ফলে তোমার অধিকার নাই ইহা তোমার আয়ত্তাধীন নহে; যাঁহাদের কর্ম্ম ফল প্রাপ্তিই কর্ম্ম করিবার হেতু বা কারণ হয়, তাঁহাদের ন্যায় হইও না; কর্ম্ম না করিতেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়। কর্ম্ম-ফলে স্পৃহা না থাকিলে, কর্ম্ম জন্য বন্ধ হয় না এবং কর্ম্ম করিয়া, কর্ম্মে আসক্তি না থাকা বশতঃ, উদাসীনের ন্যায় অবস্থান করিলে, কর্ম্ম-বন্ধন আসে না। ভগবান বলিলেন, ঐ জন্যই তিনি নানা-রূপ কর্ম্মাচরণ করিলেও তাঁহার কর্ম্ম বন্ধন হয় না।

যথা :— "নচ মাং তানি কর্ম্মাণি বিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ।
উদাসীন বদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু ॥

ঐ সকল কর্ম্ম, আমার বন্ধণের কারণ হয় না কারণ আমি ঐ সকল কর্ম্মে আসক্তি শূন্য হইয়া, উদাসীনবৎ অবস্থান করিয়া থাকি; অতএব ফলের অভিসন্ধি শূন্য হইয়া কর্ত্তব্য বোধে ঈশ্বর প্রীত্যর্থে ও যথা-শক্তি সুচারুরূপে, করণীয় কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া, উদাসীনবৎ অবস্থান করিবে ইহাই কর্ম্ম-যোগের কৌশল।

পৃথিবীতে দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়; এক শ্রেণীর লোক ধ্যান দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা সাধন পরায়ণ অন্য শ্রেণীর লোক কর্ম্ম দ্বারা চিত্ত ও বুদ্ধির সংস্কার পরায়ণ। এই দুই শ্রেণীর লোকের জন্য দুইপ্রকারের পন্থা নির্দ্দিষ্ট আছে যথা ১। জ্ঞান-যোগ বা সন্ন্যাস ২। ক্রিয়া-যোগ বা কর্ম্ম-যোগ।

যথাঃ— "লোকে ঽস্মিন দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ ।
জ্ঞান-যোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্ম-যোগন যোগিনাং ॥"

ঐ কথা বলিয়া ভগবান বলিলেন এই উভয়প্রকার পন্থা হইতেই মঙ্গল সাধিত হয় বটে কিন্তু জ্ঞান-যোগ অপেক্ষা কর্ম্ম-যোগেই

যথা :—　　　সন্ন্যাসঃ কর্ম্ম-যোগশ্চ নিশ্রেয়স করৌ উভৌ
তয়োস্তু কর্ম্ম-সন্ন্যাসাৎ কর্ম্ম-যোগো বিশিষ্যতে ॥”

যদি কর্ম্ম-যোগই শ্রেষ্ঠ এবং এই যোগ দ্বারা যদি মুক্তি লাভও হইয়া থাকে তাহা হইলে জ্ঞান-যোগ বা সন্ন্যাস কাহার পক্ষে বিহিত, ইহা যদি জানিবার ইচ্ছা হয় তবে শোন এই বলিয়া ভগবান বলিলেন,

‘যস্ত্বত্ম রতিরেব স্যাৎ, আত্ম-তৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্ট স্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥”

অর্থাৎ যাঁহার আত্মাতেই রতি, আত্মাতেই তৃপ্তি ও আত্মাতেই সন্তুষ্টি অর্থাৎ যাঁহাদের আত্মা ভিন্ন আর অন্য কোন বস্তুর আকাঙ্ক্ষা নাই ঐরূপ নির্ম্মলচিত্ত ও আত্ম-ধ্যান পরায়ণ ব্যক্তির কর্ম্মানুষ্ঠানে আবশ্যক নাই। তাঁহাদের নিজের জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান আবশ্যক নাই তবে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহারাও সকলকে ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান করেন ঐরূপ না করিয়া পারেন না, কারণ সকলের যাহাতে মঙ্গল হয়, ঐরূপ কর্ম্মকরা তাঁহাদের স্বভাব হইয়া পড়ে। অতএব সকল প্রকার মনুষ্যের পক্ষেই কর্ম্ম-যোগ অনুষ্ঠান শ্রেয় :— পুনশ্চ কর্ম্ম-যোগ ভিন্ন সন্ন্যাস দুঃখ-সাধ্য যথা—

“সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্ত মযোগতঃ।”

অতএব সন্ন্যাসের ইচ্ছা থাকিলেও কর্ম্ম-যোগ করা উচিত। কর্ম্ম-যোগর সম্বন্ধে গীতায় যাহা বলা হইয়াছে, তাহার আভাস দিলাম।

অতঃপর অন্যান্য শাস্ত্রে এই সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার আভাস দেওয়া যাইতেছে।

পাতঞ্জল দর্শনে, কর্ম্ম-যোগকে, ক্রিয়া-যোগ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ক্রিয়া যোগের দ্বারা অবিদ্যা অস্মিতা প্রভৃতি ক্লেশ সকল “তনু” অর্থাৎ প্রসব শক্তি রহিত হয়; ও ক্রমশঃ তাহা হইতেই সমাধি জন্মিয়া থাকে, এইরূপ পাতঞ্জল দর্শনে উক্ত হইয়াছে।

যথাঃ—“সহি (ক্রিয়া যোগঃ) “সমাধি-ভাবনার্থঃ ক্লেশতনুকরণার্থশ্চ।” ভাবানা শব্দের অর্থ ভাবনং উৎপাদনং অর্থঃ প্রয়োজনং যস্য, উৎপাদকঃ ইত্যর্থ। অর্থাৎ ক্রিয়া-যোগ দ্বারা ক্লেশ তনু হয় ও তাহা হইতে সমাধি জন্মায়।

কি কি ক্রিয়াকে ক্রিয়া-যোগ বলা যায়, তাহার উত্তরে বলিতেছেন, “তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর প্রনিধানানি ক্রিয়া যোগঃ।”

অর্থাৎ তপস্যা, ওঁ কারাদি মন্ত্র-জপ ও অধ্যাত্ম-শাস্ত্র-পাঠ এবং সমস্ত কর্ম্মফল ঈশ্বরকে সমর্পণ করাকে ক্রিয়া-যোগ বলে।

শীত-গ্রীষ্ম, সুখ দুঃখ জয়-পরাজয় লাভ অলাভ, মান অপমান আদি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা অর্থাৎ তাহাতে অভিভূত না হওয়া ও কাষ্ঠ মৌন (অর্থাৎ ঈঙ্গিতে ও মনোভাব প্রকাশ না করা) আকার মৌন (কেবল মুখে কথা না বলা) এই সকলকে, ও যথা-সম্ভব চান্দ্রায়ণাদি ব্রত উপবাসাদি ক্রিয়াকে, তপঃ বলা যায়।

ব্রত উপবাসাদিরূপ তপস্যাও চিত্ত-শুদ্ধি করে; চিত্ত-শুদ্ধি কারক তপস্যা এইরূপভাবে অনুষ্ঠান করিতে হয়, যেন ধাতুবৈষম্য না হয় এবং শরীরে পীড়া না জন্মে।

ওঁকার প্রভৃতি মন্ত্রের জপকে অথবা উপনিষদাদি অধ্যাত্মশাস্ত্রের অধ্যয়নকে স্বাধ্যায় বলে;

সমস্ত ক্রিয়া ঈশ্বরে অর্পণ ও ক্রিয়ার ফলত্যাগকে ঈশ্বর প্রনিধান বলে। ক্রিয়া-যোগ, ধ্যান-যোগ সাধনের বহিরঙ্গ যম নিয়মের অন্তর্গত। সাধন ভিন্ন সিদ্ধি লাভ হয় না; অতএব সাধন করা একান্ত কর্ত্তব্য; অন্তরঙ্গ যোগ সাধনের পূর্ব্বে বহিরঙ্গ যোগের সাধন আবশ্যক, নতুবা অন্তরঙ্গ-যোগ-সাধনে অধিকার জন্মে না।

যম, নিয়ম আসন হইতেছে, বহিরঙ্গ-যোগ-সাধন;

যম নিয়ম সাধন ক্রিয়া-যোগেরই অঙ্গ।

যোগাঙ্গ অনুষ্ঠান করিলে, অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পাঁচপ্রকার বিপর্য্যয় বা ভ্রম জ্ঞানেরও ক্ষয় হয়; তাহার ক্ষয় হইলে, সম্যক জ্ঞানের অভিব্যক্তি হয়। যম নিয়মাদি যোগাঙ্গানুষ্ঠানে, অশুদ্ধির নাশ হয়; এইরূপে, ইহা বিবেকখ্যাতি-প্রাপ্তিরও কারণ হইয়া থাকে।

তন্মধ্যে যম হইতেছে, 'অহিংসা, সত্য অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্যও অপরিগ্রহ।

উক্ত পঞ্চবিধ যমের মধ্যে অহিংসা হইতেছে, কোন প্রকারে, কোন কালে, কোন জীবকে পীড়া না দেওয়া; পরবর্ত্তী যম ও নিয়মকে, অহিংসা মূলক হইতে হইবে; অতএব যে স্থানে সত্য বলিলে, কারো বিশেষ দুঃখ বা মনোকষ্ট হয় তথায় চুপ করিয়া থাকাই শ্রেয়ঃ; তবে যদি চুপ করিয়া থাকিলে, অন্য কারও অনিষ্ট হয়, তখন অপ্রিয় সত্য বলিতে হয় এবং যখন সত্য না বলিলে চলে না, যেমন কষ্টপ্রদ হইলেও দূতকে সত্য সংবাদই দিতে হয় ও সভায় গিয়া অপ্রিয় সত্যও বলা কর্ত্তব্য, নতুবা বিচারে দোষ জন্মে; অতএব ঐরূপ স্থলে অপ্রিয় সত্য বলিতে হয়)

তবে, "অশ্বথামা হত ইতি গজের" ন্যায় যে সত্য বঞ্চনার কারণ হয়, তাহা সত্যই নহে; অতএব এইরূপ সত্য বলিয়া, নিজের সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কার করিও না। এই স্থলে বলা কর্ত্তব্য, যে অহিংসা বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন জন্য, সাংখ্য পাতঞ্জল দর্শন, বৈধহিংসা (বলিদানকে)কেও পাপের কারণ বলিয়াছেন।

মনে মনে, পরের দ্রব্য লইবার অভিলাষ করিলেও "অস্তেয়" রক্ষা হয় না; ঐরূপ লোকলজ্জা বশতঃ বা ধার্ম্মিকতার ভান করিয়া প্রকাশ্য স্ত্রী-সঙ্গ ত্যাগ করিয়া মনে মনে ঐ ভাবনা করিলেও, ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা পায় না।

অপরিগ্রহ, বিষয়-বৈরাগ্যেরই নামান্তর;

পূর্ব্বোক্ত অহিংসাদি যম, যদি জাতি, দেশ, কাল ও শপথ দ্বারা সীমাবদ্ধ না হয় ও তাহা সমস্ত বিষয়ে সর্ব্বথা অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে তাহা "মহাব্রত" হয়।

যথা :—"জাতি দেশ কাল সময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্ব্বভৌমাঃ মহাব্রতং।" জাতি দ্বারা সীমাবদ্ধ অহিংসা, যেমন ধীবরগণ, মৎস্য-জাতিরই হিংসা করে, অন্য প্রাণীর হিংসা করে না।

দেশ দ্বারা অবচ্ছিন্ন অহিংসা, যথা তীর্থে হিংসা করিব না; কাল দ্বারা অবচ্ছিন্ন, যথা একাদশী চতুর্দ্দশীতে হিংসা করিব না।

সময় বা প্রতিজ্ঞা দ্বারা অবচ্ছিন্ন, যেমন দেবতা ও ব্রাহ্মণ সেবার জন্য হিংসা করিব, নতুবা করিব না।

ঐরূপ, যেমন ক্ষত্রিয়, যুদ্ধ স্থলেই হিংসা করে; অন্যত্র করে না, এইরূপে জাত্যাদি দ্বারা অনবচ্ছিন্ন অহিংসা, সর্ব্বতোভাবে অবিচলিত ভাবে অনুষ্ঠান করিলে মহাব্রত হয়।

অহিংসার ন্যায় সত্যাদিরও, উক্তরূপে অনবচ্ছেদ আবশ্যক। নিয়ম, হইতেছে, "শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ঈশ্বর প্রণিধানানি।" তন্মধ্যে মৃত্তিকা ও জলাদির দ্বারা মার্জ্জনা করায় ও পবিত্র বস্তু পরিমিত পরিমাণে আহার দ্বারা, বাহ্য শৌচ সম্পাদন হয়। অর্থাৎ মৃত্তিকা, গোবর প্রভৃতি শরীর লেপ, পবিত্র জলে স্নান, ও পবিত্র খাদ্য পরিমিত পরিমাণে আহার করিলে, বাহ্য-শৌচ অর্থাৎ স্থূল শরীরের শৌচ হয়।

চিত্তের মল, দ্বেষ অসূয়াদি দূর করার নাম, আন্তর-শৌচ।

মৈত্রি, করুনাদির ভাবনার দ্বারা ও—আন্তর-শৌচ হয়।

যথা :—

"মৃদ্বারিভ্যাং বাহ্যং। মৈত্রি, করুণা মুদিতো পেক্ষাণাং সুখ দুঃখ
পুণ্যাপুণ্য বিষয়াণাং ভাবনাতঃ চিত্ত-প্রসাদনং।"

অর্থাৎ মৃৎ বারি দ্বারা, বাহ্য অর্থাৎ স্থূল শরীরের শৌচ সম্পাদন হয়, ও সুখীদিগের প্রতি প্রেম, দুঃখীদিগের প্রতি দয়া, ধর্ম্ম দেখিলে হর্ষ, ও পাপ দেখিলে ঔদাসীন্য করিলে চিত্ত-প্রসন্ন হয়, অতএব এই সকল অনুষ্ঠান চিত্ত-শুদ্ধি-কারক,

বহিঃ—শুদ্ধি, অন্তর শুদ্ধির কারণ, অন্তর শুদ্ধির দিকে অভিলাষ থাকিলে, বহিঃ শুদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়,

শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে 'আহার শুদ্ধৌ সত্ত্ব-শুদ্ধিঃ, সত্ত্ব শুদ্ধৌ ধ্রুবা-স্মৃতিঃ, স্মৃতেলব্ধে সর্ব্ব-গ্রন্থীনাং বিমোক্ষঃ।" শুচি হইতে হইলে অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে, আমি শুচি হইব, নির্ম্মল অন্তঃকরণ হইব, মাত্র এইরূপ ইচ্ছায় কোন ফল হয় না অভিলাষ অনুসারে চিত্ত-শুদ্ধ হইতেছে কিনা ঈর্ষা মল প্রভৃতি চিত্ত-মল দূর হইতেছে কিনা, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য করিতে হয় ও ঐ জন্য, মৈত্রি করুণাদির অনুষ্ঠান করিতে হয়।

চিত্ত-শুদ্ধি অতি দুর্ল্লভ পদার্থ, চিত্ত শুদ্ধির জন্য সর্ব্বদা, সদাচার, সৎ-সংসর্গ ও সৎ-কর্ম্মানুষ্ঠানে রত থাকিতে হয়, ব্রত নিয়মাদি পালন করিতে হয় প্রাতঃস্নান করিয়া, সন্ধ্যা বন্দনাদি করিতে হয়, নতুবা চিত্ত শুদ্ধির ভরসা বৃথা।

হিংসা ও মিথ্যাদি পাপ হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছা থাকিলে, নিজে হিংসা ও মিথ্যাচারাদি না করিলেই পর্য্যাপ্ত হয় না, আদেশ বা উৎসাহ বা প্রলোভনাদি দ্বারা অন্য কাহার দ্বারাও হিংসা মিথ্যাচারাদি করাইতে পারিবেন না, এমন কি অন্য কেহ হিংসাদি করিলে, তাহার অনুমোদনাদিও করিবেন না, কারণ হিংসাদি প্রধানতঃ তিন প্রকারের, অন্যের দ্বারা করান নিজে করা,ওতাহার অনুমোদন করা। ইহার প্রত্যেকটি আবার তিন প্রকার,যথা লোভ বশতঃ করা, যেমন, চর্ম্ম বা মাংস পাইবার জন্য হরিণ, ছাগাদি বধ, ক্রোধ বশতঃ বধ অহরহ দৃষ্ট হইতেছে। ইহার উদাহরণের আবশ্যক নাই। মোহ বশতঃ, যথা, পুণ্য হয়, এইরূপ বিশ্বাসে যথা পূজার সময় ছাগাদি বলিদান করা;

বহিঃ ও আন্তর-শৌচ হইতে "সত্ত্ব-শুদ্ধি সৌমনস্য-একাগ্রেন্দ্রিয়জয়াত্ম-দর্শন যোগ্যত্বানি" (ভবন্তি), অর্থাৎ বহিঃ ও আন্তর-শৌচ হইতে চিত্ত-শুদ্ধি হয়, ও তজ্জন্য মনের প্রসন্নতা জন্মে; মনের প্রসন্নতা হইলে বিক্ষেপ নাশ হইয়া একাগ্রতা জন্মে ও তাহা হইতে ইন্দ্রিয় জয় হইয়া থাকে ও আত্ম-দর্শনের যোগ্যতা জন্মায় সন্তোষ গুণ জন্মিলে, অনুত্তম সুখ হয়, কারণ তৃষ্ণা-ত্যাগীই সুখী। তপস্যার দ্বারা তামস-অধর্ম্ম মলা দূর হয়; ও অনিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ হয়, স্বাধ্যায় রূপ, বেদাদি পাঠ ও প্রণবাদি জপ দ্বারায় দেবতা দর্শন লাভ হয়, এবং সর্ব্ব-কর্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করিলে সমাধি পর্য্যন্ত লাভ হইয়া থাকে, যথা "ঈশ্বর প্রনিধানাৎ বা",—

অর্থাৎ অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা সমাধি লাভ হয়, অথবা কেবল, ঈশ্বর প্রণিধান হইতেই ঈশ্বরানুগ্রহে সমাধি পর্য্যন্ত লাভ হয় পাতঞ্জলে ও এইরূপ উক্ত হইয়াছে অতএব ক্রিয়া-যোগে অনাস্থা করা, বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ক্রিয়া-যোগ বা কর্ম্ম-যোগ, ধ্যান-যোগের ভিত্তি স্বরূপ, ক্রিয়া-যোগ সাধন ব্যতীত জ্ঞান-যোগ বা ভক্তি-যোগ সাধনা অসম্ভব, আজি কাল লোকে কর্ম্ম-যোগ সাধন না করিয়াই রাজ-যোগ, বা জ্ঞান-যোগ সাধন করিতে অগ্রসর হয়েন, ঐ জন্য ঐ যোগ-সাধনে কোনরূপ ফললাভ করিতে পারেন না, কিছুদিন সাধন করিয়া, বলিয়া থাকেন, রাজ-যোগ ও জ্ঞান-যোগ, বুজ্‌রুকি মাত্র, তাহাতে কিছুই ফল হয় না।

নীচের পথ দিয়া ক্রমশঃ উচ্চ-শিখরে উঠিতে হয়, উচ্চ-শিখরে ঐরূপে না উঠিয়া লাফাইয়া উঠিতে গেলে, অধিকাংশ স্থলেই অকৃত কার্য্য হইতে হয়, কখনও বা হাত পা ভাঙ্গিয়া চিরকালের জন্য পঙ্গু হইতে হয়, ঐরূপ ক্রিয়া-যোগ সাধন ব্যতীত, একেবারে রাজ-যোগ (ধ্যান-যোগ) বা জ্ঞান-যোগ সাধনা করিতে গেলে, প্রায়ই বিফল মনোরথ হইতে হয় কখন ও বা উৎকট পীড়া জন্মে।

সদাচার পালন ক্রিয়া-যোগেরই অঙ্গ।

পাতঞ্জল দর্শনে ক্রিয়া-যোগ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার আভাস দিলাম, অতঃপর শ্রীশঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থে এই সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

প্রায়ই উক্ত হইয়া থাকে যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য কর্ম্ম-যোগে অনাস্থা করিতেন, বলিতেন, কোটী কর্ম্মেও মুক্তি হয় না, এবং এই ভ্রম ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অনেক ব্যক্তি কর্ম্ম-যোগ সাধনা ত্যাগ পূর্ব্বক একেবারে জ্ঞান-যোগ অবলম্বন করিতে ধাবমান হয়েন। তাঁহাদের ঐ ধারণা বাস্তবিক যে ভ্রমাত্মক ইহা দেখাইবার জন্য শ্রীশঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থ হইতে তাঁহার নিজের দুই চারিটী উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি; ইহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য সুপ্রকাশ হইবে; তিনি বিবেক-চূড়ামণি গ্রন্থে লিখিয়াছেন বটে, যে—

"চিত্তস্য শুদ্ধয়ে কর্ম্ম, নতু বস্তূপলব্ধয়ে,
বস্তু-সিদ্ধি বিচারেণ, ন কিঞ্চিৎ কর্ম্ম-কোটিভিঃ'।

এই উক্তিতে তিনি বলিলেন, যে কর্ম্ম-যোগের দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধ হয়, কর্ম্ম দ্বারা বস্তু সিদ্ধি অর্থাৎ ঈশ্বরের উপলব্ধি হয় না বলা বাহুল্য বেদান্ত সার মতে কেবল ঈশ্বরই বস্তু; অন্য যাবতীয় পদার্থ অবস্তু; বস্তু-সিদ্ধি, বিচার দ্বারা অর্থাৎ অবিচ্ছেদ জ্ঞানালোচনা দ্বারা হইয়া থাকে; কোটি কোটি কর্ম্ম দ্বারা হয় না।

ইহা দ্বারা এইমাত্র বলা হইল যে কেবল কর্ম্ম যোগে ক্ষান্ত থাকিবে না! ক্রিয়া-যোগ দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি সম্পাদন পূর্ব্বক জ্ঞানালোচনা করিবেন। কারণ জ্ঞানালোচনা ব্যতিরেকে কেবল ক্রিয়াযোগে, বস্তু কিনা ঈশ্বরের উপলব্ধি হয় না! অতএব মুক্তি হয় না। এই উক্তিতে কিন্তু ক্রিয়া-যোগ ত্যাগ করিতে বলা হইল না; চিত্ত-শুদ্ধি ভিন্ন জ্ঞানালোচনায়, জ্ঞান প্রতিভাত হয় না। ক্রিয়া-যোগে চিত্ত-শুদ্ধি হয়; ইহা ঐ শ্লোকেও প্রকাশ অতএব ঐ উক্তি মতে ও ক্রিয়া-যোগ পরিত্যজ্য নহে।

ক্রিয়া-যোগ দ্বারা ইন্দ্রিয় ও মন সুসংযত হয়। বুদ্ধির চাঞ্চল্য দূর হইয়া তাহা সমাহিত হয় অতএব ক্রিয়া-যোগ ভিন্ন কেবল প্রজ্ঞা দ্বারা পরম-পদ লাভ হয় না। ভগবান শঙ্কর, তাঁহার "উপদেশ সহস্রী" নামক গ্রন্থে এই কথা স্পষ্টরূপেই উল্লেখ করিয়াছেন, যথা :—

চিত্তে হ্যাদর্শবদ যস্মাচ্ছুদ্ধে বিদ্যা প্রকাশতে।
যমৈ র্নিত্যৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ তপোভি স্তস্য শোধনং॥

অর্থাৎ যেহেতু বিদ্যা নির্ম্মল দর্পণের ন্যায়, কেবল শুদ্ধ-চিত্তে প্রকাশিত হয়, অতএব, যম নিয়ম যজ্ঞাদি কর্ম্ম এবং তপস্যা দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি করিবেন।

'শারীরাদি তপঃ কুর্য্যাৎ শুদ্ধ বিশুদ্ধ র্থমুত্তমং।
মন-আদি-সমাধানং তত্তদ্দেহ বিশোষণং॥

অর্থাৎ চিত্ত-শুদ্ধির জন্য উৎকৃষ্ট শারীর বাচিক ও মানসিক তপস্যা করিবে, ও তদ্বারায় মন ইন্দ্রিয় আদির একাগ্রতা সম্পাদন করিবে এবং দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা দ্বারা দেহকে শোষণ করিবে।

"মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ হ্যৈকাগ্র্যং পরমং তপঃ।
তজ্জ্যায়ঃ সর্ব্ব ধর্ম্মেভ্যঃ সধর্ম্মঃ পর উচ্যতে।"

মন ও ইন্দ্রিয়ের একাগ্রতাই পরম তপঃ, ইহা সমস্ত ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; ইহাকেই পরম ধর্ম্ম বলা যায়।

শ্রীশঙ্করের এতাদৃশ উক্তি সত্ত্বেও যিনি বলেন যে শ্রীশঙ্কর কর্ম্ম-যোগের নিন্দা করিতেন, তাঁহার সাহস ধন্য।—এই স্থলে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে শ্রীশঙ্কর গৃহ-ত্যাগ করিলেও, কর্ম্ম কখনও ত্যাগ করেন নাই। লোক সকলকে ধর্ম্ম পথে রাখিবার জন্য আজীবন ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।—

ক্রিয়া-যোগে সিদ্ধ হইলে, কালে তত্ত্বজ্ঞান আপনা হইতেই উদ্ভব হয় যথা:—

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্র মিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগ সংসিদ্ধঃ কালেন আত্মনি বিন্দতি।

অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের ন্যায় পবিত্র বস্তু ইহ সংসারে আর নাই। যোগ সংসিদ্ধ হইলে, জ্ঞান যথাকালে আপনা হইতেই অর্থাৎ বিনা বিশেষ আয়াসে জন্মিয়া থাকে।

শ্রীশঙ্কর তাঁহার অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থে লিখিয়াছেন:—

"বর্ণাশ্রম ধর্ম্মেণ, তপসা, হরি-তোষণাৎ
সাধনং প্রভবেৎ পুংসাং বৈরাগ্যাদি চতুষ্টয়ং।"

অর্থাৎ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম-পালন দ্বারা ও তপস্যা দ্বারা, ও সর্ব্ব-কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করতঃ হরির তোষণ দ্বারা বৈরাগ্যাদি চতুষ্টয় মুক্তির সাধন জন্মিয়া থাকে; বৈরাগ্যাদি চতুষ্টয় হইতেছে, বিবেক, বৈরাগ্য, ষট-সম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পালন, তপস্যা ও ঈশ্বর প্রনিধান বা হরি-তোষণ এই সমস্তই ক্রিয়া যোগেরই নামান্তর; তপস্যা, বলায় ভয় পাইবেন না; উপবাস চান্দ্রায়ণাদির ন্যায়, অনুদ্বেগ কর বাক্যকথনাদিকেও তপস্যা বলা যায়। যথা ভগবদ্গীতায়াং:—

তপস্যা তিন প্রকার, শারীরিক, বাচিক ও মানসিক; তন্মধ্যে:—

"দেব-দ্বিজ গুরু প্রাজ্ঞ-পূজনং শৌচ মার্জ্জবং।
ব্রহ্মচর্য্য মহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥"

অর্থাৎ দেব, দ্বিজ, ও তত্ত্বজ্ঞ সাধুগণের পূজা, শৌচ ও সরলতা এবং ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসাকে "শারীর" শরীরের দ্বারা সম্পাদ্য তপস্যা বলা যায়।

"অনুদ্বেগ-করং-বাক্যং সত্যং প্রিয়-হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনঞ্চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে॥"

অর্থাৎ অনুদ্বেগ-কর, সত্য প্রিয় ও হিতকর বাক্য কথন ও বেদাভ্যাস এইসকলকে বাক্য দ্বারা সম্পাদ্য তপস্যা বলা যায়।

এবং "মনঃপ্রসাদ, সৌম্যত্বং মৌনমাত্ম বিনিগ্রহঃ।
ভাব সংশুদ্ধি রিত্যেতৎ তপো মানস মুচ্যতে॥"

অর্থাৎ মনের প্রসন্নতা, অক্রুরত্ব, বাকসংযম ইন্দ্রিয় ও চিত্ত সংযম, ব্যবহারে কপটতা রাহিত্য, এই সকলকে মানসিক তপস্যা বলা যায়। ইহাদের মধ্যে আবার, চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের একাগ্রতা, সকল তপস্যার শ্রেষ্ঠ। যথা:— উপদেশ সহস্রী:—

"মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ হ্যৈকাগ্রং পরমং তপঃ।"

অতএব, তপস্যা বলিলে প্রধানভাবে এইসকল ক্রিয়াকেই লক্ষ্য করে। উপবাস, চান্দ্রায়ণাদিকে এইরূপভাবে লক্ষ্য করে না।"

পুনশ্চ, গীতা ভাষ্যের উপক্রকমণিকায়, শ্রীশঙ্কর স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে, প্রবৃত্তি লক্ষণো ধর্ম্ম * * ঈশ্বর অর্পণ-বুদ্ধ্যা অনুষ্ঠীয়মানঃ-সত্ত্ব-শুদ্ধয়ে ভবতি, ফলাভিসন্ধি-বর্জ্জিতঃ শুদ্ধ-সত্ত্বস্য, জ্ঞান-নিষ্ঠা যোগ্যতা প্রাপ্তি দ্বারেণ জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বেন চ নিঃশ্রেয়স হেতুত্বমপি প্রতিপদ্যতে।"

অর্থাৎ শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট প্রবৃত্তি লক্ষণ কর্ম্ম যাহাকে ধর্ম্ম বলে,তাহা ঈশ্বরকে অর্পণ করিলাম—এই বুদ্ধি পূর্ব্বক ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতঃ অনুষ্ঠান করিলে সত্ত্ব-শুদ্ধি হয়; সত্ত্ব-শুদ্ধি হইলে জ্ঞানলাভে উপযোগিতা জন্মে এবং জ্ঞান জন্মাইয়া ইহা তদ্দারা মোক্ষ লাভেরও সহায়ক হইয়া থাকে।

অতএব শ্রীশঙ্কর কোথাও কর্ম্ম-যোগের অনাদর বা নিন্দা করেন নাই; তিনি এই মাত্র বলিয়াছেন যে, জ্ঞান, মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ, কর্ম্ম তাহার, পরম্পরায় কারণ; কিন্তু যখন তাঁহার মতেও কর্ম্ম-যোগ ব্যতীত চিত্তশুদ্ধি হয় না ও চিত্ত-শুদ্ধি ব্যতীত জ্ঞান লাভের অধিকার হয় না, তখন প্রথমতঃ ক্রিয়া-যোগের অনুষ্ঠান ব্যতীত মোক্ষ লাভের ভরসা বৃথা। উপনিষদেও বলিয়াছেন:—"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিবী বিষেৎ শতং সমা" অর্থাৎ শত বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিবার ও যাবৎ জীবন, কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবার জন্য প্রার্থনা করিবে অতএব, কর্ম্ম-যোগে অনাস্থা মূঢ়তা মাত্র।

তবে এই স্থলে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য, যে শ্রীশঙ্করের মতে নির্ব্বিশেষ আত্ম-জ্ঞান, অবিদ্যার নাশক; কর্ম্ম, অবিদ্যাসম্ভূত; আত্মাতে স্থূলত্ব ও কৃশত্বাদি গুণ ও ব্রাহ্মণত্ব ক্ষত্রিয়ত্বাদি জাতি আরোপ করিয়া, লোকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়; অবিবেকবশতঃই লোকে দেহের ধর্ম্ম স্থূলত্ব কৃশত্ব ও ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্বাদি ও মনের ধর্ম্ম সুখ দুঃখ, আত্মাতে আরোপ করিয়া থাকে; অতএব কর্ম্ম অবিবেক বা অবিদ্যাসম্ভূত; ঐরূপ ভ্রান্ত-আত্ম-জ্ঞান জীবের স্বাভাবিক; যতদিন ঐরূপ ভ্রমাত্মক আত্ম-জ্ঞান থাকে, (দূর না হয়), ততদিন কর্ম্ম অপরিত্যজ্য; ততদিন কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিয়া, চিত্ত শুদ্ধি করা বিধেয়; চিত্ত-শুদ্ধ হইলে বিশুদ্ধ কিনা নির্ব্বিশেষ আত্ম-জ্ঞান জন্মে, তখন নেতি নেতি শ্রুতি দ্বারা দেহ ও দেহধর্ম্ম ও মন বুদ্ধি ও তাহার ধর্ম্ম আত্মা হইতে পারে না, এইরূপ দৃঢ় প্রতীতি জন্মে; ঐরূপ হইলে কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব রহিত আত্ম জ্ঞান জন্মায়; ঐরূপ আত্মজ্ঞানই বিদ্যা; ঐ বিদ্যার উদয় হইলে, কর্ম্ম-নাশ পায়; তাহার আগে কর্ম্ম বিধি প্রমাণ। উপদেশ সহস্রীর নিম্নলিখিত শ্লোক দৃষ্টে তাঁহার যে ঐরূপই মত, তাহা স্পষ্ট জানা যায় যথা:—

"দেহাদ্যৈরবিশেষেণ দেহিনো গ্রহণং নিজং।
প্রাণিনাং তদবিদ্যোত্থং তাবৎ কর্ম্ম-বিধি র্ভবেৎ॥"

অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রাণ ও তাহাদের ধর্ম্মের সহিত অবিশেষে আত্মাকে গ্রহণ করা, মনুষ্যের স্বভাব। যত-কাল প্রাণীদিগের ঐরূপ সংস্কার হইতে জাত আত্ম-জ্ঞান বিদ্যমান থাকে, ততকাল কর্ম্ম-কাণ্ড প্রামাণ্য, হইয়া থাকে ;

"নেতি নেতীতি দেহাদীনপোহ্যাত্মাবশেষিতঃ।
অবিশেষাত্ম-বোধার্থং তেনাবিদ্যা নিবর্ত্তিতা॥"

অর্থাৎ, "ইহা আত্মা নহে," 'ইহা আত্মা নহে," এইরূপ অবধারণ দ্বারা দেহ, ইন্দ্রিয়াদিগকে আত্মা নয় বলিয়া, সচ্চিদানন্দ আত্মা-স্বরূপ-বোধের জন্য, নির্ব্বিশেষ আত্মাই অবশিষ্ট ঐ আত্ম-জ্ঞান দ্বারা অবিদ্যা ও (তৎপ্রসূত কর্ম্মের) নাশ হয়। যাঁহাদের আমি এই কর্ম্মের কর্ত্তা ও আমি এই কর্ম্মের ফল-ভোক্তা এইপ্রকার অহঙ্কার বা ধারণা আছে, বিহিত-কর্ম্ম অকরণ জন্য তাঁহারই প্রত্যবায় হইয়া থাকে ;

যথা :—

"প্রত্যবায়স্তু তস্যৈব যস্যাহংকার ইষ্যতে।

অর্থাৎ, (বিহিত-কর্ম্ম অকরণ জন্য) প্রত্যবায়, তাঁহারই হইয়া থাকে, যাঁহার, (এই কর্ম্মের আমি কর্ত্তা, এই কর্ম্মের আমি ফল ভোক্তা) এইরূপ "অহংকার" আছে।

অতএব যতদিন, কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব অভিমান সমূলে নাশ না পাইবে, ততদিন কর্ম্ম বিধির প্রামাণ্য ; ততদিন বিহিত কর্ম্মের অকরণে প্রত্যবায় হয়,ইহা শ্রীশঙ্করের ও অভিমত। তিনি এইমাত্র বলিয়াছেন, যে কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি রহিত, নির্ব্বিশেষ আত্ম-জ্ঞান-রূপ বিদ্যার উদয় হইলে কর্ম্মের আবশ্যক হয় না। তখন ঐ বিদ্যাই অজ্ঞান নাশ করতঃ মোক্ষের কারণ হয়। চিত্ত-শুদ্ধি না হইলে, ঐরূপ বিদ্যা প্রতিভাত হয় না, ইহা শ্রীশঙ্কর স্পষ্টই উল্লেখ করিয়াছেন ; চিত্ত শুদ্ধির দ্বার দিয়া, কর্ম্মের বিদ্যা জননে উপযোগিতা আছে, ইহাও তিনি স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার পোষক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। জীবন্মুক্তি হইলেও তাঁহারা অন্যের জন্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন। অতএব কোন অবস্থাতেই কর্ম্ম-যোগ অনাদরণীয় নহে। শ্রীশঙ্করও সকলকে ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য আজীবন প্রচারকার্য্য করিয়াছিলেন।

উপনিষদ ও বেদান্তে (ব্রহ্ম-সূত্র), নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠানের উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন।

যথা ; বৃহদারণ্যক উপনিষদ :—

"তমেতং বেদানু বচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন, দানেন তপসা অনাশকেন চেতি।"

অর্থাৎ সেই ব্রহ্মকে ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান তপস্যা ও অনাশক (ভোগেচ্ছা-ত্যাগ) দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন। অতএব উপনিষদ মতেও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান ব্রহ্ম জ্ঞান উৎপত্তির কারণ হইয়া থাকে ; সাক্ষাৎ না হউক ইচ্ছা জন্মাইয়া পরম্পরায় কারণ হইয়া থাকে।

ব্রহ্ম-সূত্র বা বেদান্তেও উক্ত হইয়াছে :—৩।৪।২৬—

"সর্ব্বাপেক্ষাচ যজ্ঞাদি শ্রুতে রশ্ববৎ ॥"

ইহাতে ও বুঝা যায় যে ব্রহ্ম-জ্ঞানের জন্য যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের অপেক্ষা আছে। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে :—

"সহ বা আত্ম-যাজী যো বেদ ইদং মে অনেন অঙ্গং।
সংস্ক্রিয়তে ইদং মে অনেন অঙ্গং উপধীয়তে ॥"

অর্থাৎ সেই ব্যক্তিই আত্ম-শুদ্ধ্যর্থ যাগ করিয়া থাকেন, যিনি জানেন যে এই কৰ্ম্ম দ্বারা আমার এই অঙ্গটি সংস্কৃত কিনা পাপ-বিমুক্ত হইতেছে, আমার এই অঙ্গটি উপহিত অর্থাৎ পুণ্য-যুক্ত হইতেছে। এই স্থলে, অনেন এই শব্দ দ্বারা যজ্ঞাদিকে বুঝাইতেছে।

মনু ও লিখিয়াছেন :—

"মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ ॥" (মনু ২। ৮);

অর্থাৎ মহাযজ্ঞ ও যজ্ঞ-দ্বারা এই দেহ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎ কারের উপযুক্ত হয়।

মহাযজ্ঞ হইতেছে পাঁচটি : ব্রহ্ম যজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, দৈব-যজ্ঞ, ভূত-যজ্ঞ ও পিতৃ যজ্ঞ। তন্মধ্যে ব্রহ্ম বা ঋষি যজ্ঞ হইতেছে বেদাধ্যয়ন।

নৃযজ্ঞ হইতেছে, অতিথি সেবা ;—দেব-যজ্ঞ হইতেছে, হোম।

ভূত-যজ্ঞ হইতেছে, বলি বৈশ্ব-দেব অর্থাৎ ভূত সকলের উদ্দেশ্যে অন্ন-দান। ও পিতৃ যজ্ঞ হইতেছে, তর্পণ।

যজ্ঞ শব্দের অর্থ অগ্নিহোত্র ও দর্শ পূর্ণমাসাদি, শ্রৌত (শ্রুত্যুক্ত) যাগ, ঐরূপ গৌতম সংহিতাতে উক্ত হইয়াছে যে :—

"যস্যৈতে অষ্ট চত্বারিংশৎ সংস্কার"।

অর্থাৎ যাঁহার এই আট চল্লিশটী সংস্কার হয়।

তাহার ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার যোগ্যতা হয়।—

নিত্য নৈমিত্তিক কৰ্ম্মের ফল, দুরদৃষ্ট নাশ বা উপাত্তদুরিতক্ষয় ইহা অনেক মীমাংসক স্বীকার করেন। যথা :—

"ক্ষয়ং কেচিৎ উপাত্তস্য দুরিতস্য প্রচক্ষতে।
অনুৎপত্তিং তথা চান্যে প্রত্যবায়স্য মন্যতে ॥"

অর্থাৎ কোন কোন মীমাংসক বলেন, নিত্য নৈমিত্তিক কৰ্ম্মের ফল উপাত্ত-দুরিত ক্ষয়, অন্যে বলেন, তাহা অকরণ জন্য যে প্রত্যবায় হয় তাহার অনুৎপত্তিই তাহার ফল।

নিত্য, নৈমিত্তিক কৰ্ম্মানুষ্ঠান হইতে যে ধৰ্ম্ম উৎপন্ন হয়, তাহাতে সঞ্চিত পাপ নিবৃত্ত হয়। সঞ্চিত পাপ হইতেই, অনিত্য, অশুচি ও দুঃখময় সংসারকে নিত্য, শুচি ও সুখময় বলিয়া ভ্রম জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া চিত্তকে মলিন করিয়া থাকে ; ঐ পাপ নিবৃত্ত হইলে, সংসার যে অশুচি, অনিত্য ও দুঃখময় তাহা উপলব্ধি হইয়া থাকে। তাহার ফলে অনাসক্তি

নামক বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়। ঐ বৈরাগ্যের প্রসাদে সংসার বিবৃত্তির উপায় অন্বেষণে প্রবৃত্তি জন্মে। ঐরূপ অন্বেষণে প্রবৃত্তি হইলে, আত্ম-সাক্ষাৎকারই সংসার নিবৃত্তির এক মাত্র উপায় ইহা শাস্ত্রানুশীলনে জানিয়া, আমার ঐরূপ জ্ঞান হউক, এইরূপ উৎকট উৎকণ্ঠা জন্মে।

এইরূপে, নিত্য, নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান জ্ঞানেচ্ছা জন্মাইয়া, জ্ঞানের পরম্পরা কারণ হয়। পরে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্ম সাক্ষাৎকারের যোগ্যতা জন্মায়।—এইরূপে চিত্ত শুদ্ধিকে দ্বার করিয়া কর্ম্ম সমূহ, তত্ত্ব জ্ঞানোৎপত্তির পরম্পরায় উপযোগী হয়, ইহা শ্রীশঙ্কর ও স্বীকার করেন। চিত্ত শুদ্ধ হইলে পর বৈরাগ্য উৎপন্ন হইলে আর কর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যক হয় না ইহা শ্রীশঙ্কর বলিয়া থাকেন; অন্য মহাত্মাগণ কিন্তু যাবজ্জীবন কর্ম্মানুষ্ঠান আবশ্যক বলিয়া থাকেন। চিত্তশুদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত চিত্ত শুদ্ধার্থ বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম ত্যাগ করা আবশ্যক ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত। কয় জনার চিত্তশুদ্ধ, শ্রীশঙ্করের ন্যায় দুই চারি ব্যক্তি ব্যতীত কয়জনাই বা জ্ঞান-যোগের (ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার) অধিকারী। শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার পারিষদ ব্যতীত কয় জনাই বা অহৈতুকী প্রেমের অধিকারী, অথচ আজকাল সর্ব্ব সাধারণেই অধিকার না বুঝিয়া, হয় জ্ঞান যোগ, নয় মধুর প্রেম-যোগের জন্য ধাবিত হইয়া, নিত্য কর্ম্মে অনাস্থা করিতেছেন; ইহাতে কিরূপ যে বিষময় ফল হইতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নহে।—অতএব, আমার সানুনয় প্রার্থনা কেহ যেন বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত না হয়েন, ও সকলেই যেন নিষিদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠান হইতে ক্ষান্ত হয়েন।

কর্ম্ম-যোগ সিদ্ধি ব্যতীত অন্য কোন যোগভ্যাসের অধিকার লাভ হয় না, ও করিলে প্রায়ই বিপরীত ফল ফলিয়া থাকে।

বাল্য কাল হইতে আমরা আমাদের ছেলে পিলেকে (বালক ও যুবকগণকে) স্বজাতীয় ও স্ব স্ব বর্ণের ও আশ্রমের বিহিত ধর্ম্ম কর্ম্ম ও আমাদের সামাজিক ও পরিবারিক সদাচার ও ব্যবহার বিষয়ে শিক্ষা দান করি না ও ঐ ধর্ম্ম কর্ম্ম আচার ব্যবহারের অনুষ্ঠানে অভ্যস্থ করাই না; তৎপরিবর্ত্তে ছেলে বেলা হইতে, ইংরেজী শিক্ষার জন্য তাহাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাই; তথায় ঐ সব বিষয়ে কোন শিক্ষা দেওয়া হয় না, পক্ষান্তরে তথায় ইংরেজী গ্রন্থ হইতে বিদেশীয় আচার ব্যবহার বিষয়ে শিক্ষা লাভ হইয়া থাকে। এই কারণে আমাদের যুবকগণ বিশ্ববিদ্যালয়ে যেরূপ শিক্ষা দীক্ষা পায় তাহার ফলে তাহারা জাতীয় ও নিজ নিজ সম্প্রদায় ও সমাজ ও পারিবারিক আচার ব্যবহার রীতি নীতিতে শ্রদ্ধা হারাইয়া, তৎপরিবর্ত্তে, ইয়ুরোপীয় সমাজের ও পারিবারিক রীতি পদ্ধতিতে শ্রদ্ধাবান হইয়া তাহার অনুকরণ প্রিয় হইয়া, তাহা নিজসমাজে ও পরিবারে চালাইতে যত্নবান হয়, ইহাতে কিরূপ বিষময় ফল হইতেছে তাহা ভুক্ত ভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। ইহাতে আমাদের সমাজ ধ্বংসের মুখে আসিয়াছে। সমাজ না থাকিলে সে

জাতির পতন, অবশ্যম্ভবী হইতেছেও তাহাই। অতএব বর্ত্তমানে প্রত্যেক গৃহের অভিভাবকের প্রধান কর্ত্তব্য এই যে, ছেলেরা কিরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ভালরূপে উত্তীর্ণ হইয়া ভাল চাকুরি পায়, এই বিষয়ে যেমন তাঁহারা তীব্র দৃষ্টি রাখেন ঐ সঙ্গে আমাদের বালক ও যুবকগণের মধ্যে যেন বিজাতীয় ভাব প্রবেশ করিতে না পারে তাহার জন্য তদ্রূপই বিশেষরূপে সাবধান হইবে, এবং ঐ জন্য ছেলে বেলা হইতে, তাহাদিগকে আমাদের জাতীয় সামাজিক ও পারিবারিক আচার ব্যবহারের অনুষ্ঠানে অভ্যস্থ করাইতে হইবে, আমরা এই বিষয়ে যত্ন লই না বলিয়াই আমাদের ছেলে, পিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয় আমাদের নিজেদের পিতা মাতা খুড়া মামা, মামী, জ্যেষ্ঠ সহোদর প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি ও নিজেদের সামাজিক ও পারিবারিক আচার অনুষ্ঠানের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা ভক্তি করেন না। নিজেদের ধর্ম্মানুষ্ঠান ও সামাজিক ও পারিবারিক আচার ব্যবহারের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন ও নিজ নিজ ঘরে, বিলাতী চাল চলন প্রবর্ত্তন করিতে প্রয়াস পান। তাঁহারা হিন্দুসমাজোচিত বিনয়, নম্রতা, মৃদুতা হারাইয়া উদ্ধত স্বভাব, ও স্বেচ্ছাচারী ও কদাচারী হইতেছে। ইহাতে প্রত্যেক পরিবারেই যে অনর্থ উৎপাদন হইতেছে, তাহার বিষময় ফল আমারা প্রত্যেক পরিবারেই অল্প বিস্তর ভোগ করিতেছে।

বাল্যকাল হইতে ক্রিয়াযোগে অনভ্যাসই ইহার প্রধান কারণ। যে যে সম্প্রদায়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা বেশী প্রবেশ করে নাই, ঐ ঐ সম্প্রদায় এই অনর্থ হইতে অনেক পরিমাণে মুক্ত আছে

বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা না দেওয়া ভাল, তবু বাল্যকাল হইতে ছেলে পিলেদের দেশীয় আচার ব্যবহার রীতিনীতি, গুরুজনে শ্রদ্ধা, সকলের সহিত সৌহার্দ্দ্য, বিনয় ও দেব দ্বিজে ভক্তি ও শাস্ত্র ও দেবে, বিশ্বাস ও যে যে অনুষ্ঠানে ঐ সকল রক্ষা হয়, তাহা প্রথম হইতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া ও ঐ ঐ অনুষ্ঠান অভ্যাস করা বিশেষ দরকার। ইহাতে বাড়ীতে সুখ শান্তি হইবে ও ছেলে পিলেরা সচ্চরিত্র ও সদাচার সম্পন্ন হইয়াও দেশীয় রীতিনীতির প্রভাবে "সন্তোষ" গুণ লাভ করিবে ও ঐজন্য বেশী উপার্জ্জন করিয়া নানারূপ ভোগ লালসা তৃপ্তি করিতে না পারিলেও, নিজকর্ম্মে যাহা কিছু লাভ হয়, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতে পারিবে ও ঐজন্য সুখ ও শান্তিতে থাকিবে। কারণ সন্তোষে অত্যুত্তম সুখলাভ হয়। ইহা আমাদের সকল শাস্ত্রেই উক্ত হইয়াছে।

বঙ্গীয় বর্ণাশ্রম-স্বরাজ্য-সঙ্ঘের বিশেষ অধিবেশনে—

সভাপতির অভিভাষণ।

সভাপতি—

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অল্পদিন পূর্ব্বে সর্দ্দা আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। তাহাতে যে হিন্দু;মুসলমানের ধর্ম্মাচারে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিস্ময়ের ও দুঃখের বিষয় এই যে, যাঁহারা অবিলম্বে স্বরাজ চাহিতেছেন এবং সে জন্য ত্যাগ স্বীকারও করিতেছেন, তাঁহারাই আমাদের সামাজিক স্বরাজ ইংরাজের সাহায্যে নষ্ট করিতে দ্বিধানুভব করেন নাই। তাঁহারা মনে করিয়াছেন, ইংরাজ যাহাকে 'অসভ্যতার" পরিচায়ক মনে করে, তাহা ত্যাগ করাই হিন্দু-মুসলমানের পক্ষে গৌরবজনক। আমি মুসলমানদিগের কোন কথা বলিবার অধিকারী নহি। কিন্তু আমি ব্রাহ্মণসন্তান—যত আচারভ্রষ্টই কেন হই না, ব্রাহ্মণের বিধিনিষেধের আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছি হিন্দু-শাস্ত্রকারেরা ভুল করেন নাই। বিধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা নিষেধের ও ব্যবস্থা করিয়াছেন। নিষেধগুলি অবজ্ঞা করিয়া কেবল বিধি গ্রহণ করিলে তাঁহাদিগের প্রতি অত্যাচার করা হয়। যাঁহারা বাল্য বিবাহের নামে শিহরিয়া উঠেন, তাঁহারা কি একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন, আজ যাহারা পুলিসের লাঠি সহ্য করিয়া জাতীয় কাজ করিতেছে, তাহারা বাল্য বিবাহের সন্তান? মিস মেয়ো কোথায় কোন হাঁসপাতালে কি দেখিয়া সমগ্র জাতির নিন্দা করিয়াছেন, তাহা অবজ্ঞা করাই সঙ্গত। এদেশে যে আচার এত কাল চলিয়া আসিতেছে-এবং যাহার ফলে অনিষ্ট হয় নাই, পরন্তু আমাদের সমাজের শৃঙ্খলা রচিত হইয়াছে, তাহা ত্যাগ করিয়া বিদেশীয় অনুকরণ করা কখনই সমর্থনযোগ্য নহে। আমরা সংস্কারের নামে সংহারের বিরোধী এবং আশা করি, আমরা অনুকরণের মোহে সানতন প্রথা কুসংস্কার মনে করিব না। সর্দ্দা আইন হিন্দুর মত অগ্রাহ্য করিয়া প্রবর্ত্তিত হইয়াছে—একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

যদিও গবর্ণমেণ্ট এ আইন ভঙ্গের প্রতি তাদৃশ মনোযোগ দিতেছেন না, কিন্তু উপযুক্ত অবসরে যে এ আইন প্রবলভাবে আক্রমণ করিবে না তাহাই বা কে বলিতে পারে। সুতরাং হিন্দুর ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ হিন্দু কখনই সহ্য করিবে না এবং যতদিন এ আইন উঠিয়া না যায়, ততদিন তাহার বিরুদ্ধে যুক্তি তর্ক চলিবে। তাহার পর হিন্দুর ধর্ম্মনাশকর বিবাহ-বিচ্ছেদ বিল; সতী বা অসতী বিধবার স্বামীর সম্পত্তিতে দায়াধিকার বিল প্রভৃতি আরও আইন প্রণয়নের চেষ্টা তাঁহারা করিতেছেন তাঁহাদিগের সে চেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে।

তাহার পর সনাতনপন্থী হিন্দুদিগের ধর্ম্মশিক্ষা ও ধর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য সমাজে উপযুক্ত গুরু পুরোহিতের একান্ত-অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে কুলগুরু ও কুলপুরোহিত প্রায় উঠিয়াই যাইতেছে, কারণ, এসব বৃত্তিতে উদরান্ন সংস্থাপন করা কঠিন। সুতরাং উপযুক্ত গুরুর অভাবে হিন্দুর দীক্ষা ব্যাপার প্রহসনে পরিণত হইয়াছে। পুরোহিত অভাবে অনেক হিন্দু দৈব পৈত্র্য কার্য্যাদি নিয়মমত অনুষ্ঠান করিতে পারেন না। উপযুক্ত গুরুর অভাবে হিন্দুসমাজের অনেকেই জাতিবিচারবিহীন সন্ন্যাসীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছেন। এই সকল হিন্দুর জীবনে ধর্ম্মোন্নতি সাধনার পথে নানা বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া হিন্দুকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদাসীন করিয়া তুলিয়াছে অথচ এদিকে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পুত্র ইংরাজী শিখিয়া চাকরীর জন্য ঘুরিয়া ও অন্নেরসংস্থান করিতে পারিতেছেন না। হিন্দুসমাজ যদি এইদিকে দৃষ্টি দিয়া গুরু পুরোহিতের সন্তানদিগের শিক্ষার উপযুক্ত একটী কেন্দ্র সৃষ্টি করিতে পারেন, তাহা হইলে বোধ হয় লোকের ধর্ম্মভাব ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয় এবং আবার সমাজের মধ্যে ক্রিয়াবান লোকের আবির্ভাব হয়। আমাদের সংস্কারপন্থিগণ আমাদের দেশে সাম্যবাদের অভাব দেখিয়া রুশিয়া হইতে এক প্রকারের সমানাধিকারবাদ আনিবার চেষ্টা করিতেছেন। ভারতের ন্যায় দেশে সমানাধিকারবাদের বা সাম্যবাদের অভাব কোথায়?

বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকেচ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥

যে দেশের শাস্ত্রে এইপ্রকার নির্দ্দেশ, সে দেশে কি সাম্যবাদের অভাব আছে? সাম্য জিনিষটা বাহিরের সাম্য নহে, জ্ঞানে ও প্রেমে সাম্য। ভারতের যাহারা ধর্ম্মাত্মা, তাঁহারা সকলকে সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি হইতে উপদেশ দিয়াছেন। সকলেই এক বিরাট প্রয়োজনের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট, কোন না কোনরূপ কার্য্যসাধন করিয়া জগতের কল্যাণসাধনে নিরত; ইহাই প্রত্যেকের স্বকর্ম্ম বা স্বধর্ম্ম। এই স্বধর্ম্ম-পালন দ্বারা প্রত্যেক জীব শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করিয়া জীবন সফল করিতেছে। উপনিষদে দেখি,—

ঈশা বাস্য মিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্য চিৎ ধনং।

জগতে যাহা কিছু আছে, সকলই ঐশী শক্তি দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট, অতএব কাহারও ধনের প্রতি লোভ না করিয়া ত্যাগের সহিত বিধিপূর্ব্বক সংযত হইয়া ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট ভোগ্য দ্রব্য ভোগ করিয়া যাও। তাই সনাতনধর্ম্মী হিন্দু তাঁহার সৃষ্ট মৃত্তিকা হইতে তাঁহারই মূর্ত্তি গঠনপূর্ব্বক তাঁরই সৃষ্ট নানাপ্রকার ফলফুলে তাঁহাকেই অর্চ্চনা করে—তাঁহারই অর্চ্চনা উপলক্ষে ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলকে আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার প্রসাদ দিয়া সকলকে তৃপ্ত করে। হিন্দু আপনার জন্য অর্থ সঞ্চয় করে না—ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ এই উপদেশ স্মরণ করিয়া প্রতিদিন পঞ্চযজ্ঞশীল হইয়া যদি গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করে, তাহা

হইলে দেবলোক, ঋষিলোক, পিতৃলোক, নরলোক, প্রাণিলোক সকলের আশীর্ব্বাদে হিন্দুর সংসার স্বর্গসুখের আকর হয়। হিন্দুর পবিত্র ধর্ম্মময় জীবন জগতের সকল লোকের আদর্শ হইয়া উঠে।

সংস্কারবাদিগণের দ্বারা দেশের ছাত্রদের শিক্ষানীতির কিরূপ সর্ব্বনাশ হইতেছে তাহার সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। ইঁহারা ছাত্রদিগের মধ্যে সত্যাগ্রহ নামক একটী করণীয় উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তাহার অর্থ বুঝা যায় এই যে, সত্যের জন্য আগ্রহ অর্থাৎ যাহা সত্য বলিয়া বুঝিবে, আগ্রহের সহিত তাহা সম্পন্ন করিতে হইবে কিন্তু এই সত্য বোধের অধিকার সত্যাগ্রহকারীর ভিতর হইতে গ্রহণ করিয়া কোন নেতার উপর রাখিয়াছেন, অর্থাৎ সেই নেতা যাহা সত্য বলিয়া বোধ করিবেন তাহাকেও সেইটী সত্য বলিয়া বোধ করিতে হইবে। ইহার মত মিথ্যাগ্রহ আর কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। শাস্ত্র বলেন—"সত্যং শিবং সুন্দরং—' যাহা সত্য, তাহা কল্যাণজনক সুশোভন। কিন্তু এই সত্যাগ্রহিগণ যে সত্য শিক্ষা দেন, তাহা কিরূপ সুন্দর, তাহা একটী উদাহরণ হইতে বুঝা যাইবে। হিন্দুশাস্ত্র শিক্ষা দেয়, পিতৃদেবো ভব মাতৃদেবো ভব আচার্য্যদেবো ভব। ইঁহারা প্রকাশ্য সভায় শিক্ষা দেন "তোমাকে পিতামাতা যদি তোমাদের দেশসেবায় বাধা প্রদান করেন, তোমরা তাঁহাদের পরিত্যাগ করিবে।" ইহা অপেক্ষাও গুরুতর উপদেশ শুনা গিয়াছে। তাহা প্রকাশ করা সঙ্গত মনে করিলাম না। যাহা হউক, এই সকল উপদেশে ছাত্রেরা বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া সত্যাগ্রহ অবলম্বন করিয়া কারাবরণ করিতেছে, পুলিশের নিকট প্রহারে জর্জ্জরিত হইতেছে, জানি না তাহাদের সত্যাগ্রহের পরিণাম কি হইবে শুনিয়াছি কানপুরে ১৭ বৎসরের একটী ছাত্র, পিতামাতা সত্যাগ্রহে যোগ দিতে বাধা দিয়াছেন বলিয়া রেলের চাকায় গলা দিয়া জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে। আমাদের শাস্ত্রানুসারে "বালানামধ্যয়নং তপঃ"। শরীর মন বাক্যের সংযমশিক্ষা অধ্যয়নের প্রধান উদ্দেশ্য। এ অবস্থায় "আইন অমান্য" দল বাঁধিয়া বেড়াইলে তপস্যা কিরূপে হয়, তাহা ত বুঝা যায় না। তাহার পর এই সত্যাগ্রহ নাকি আবার অহিংস। ইহাতে বলপ্রয়োগের বা অস্ত্র শস্ত্রাদি প্রয়োগের কোন কথা নাই। কিন্তু ঢাকা মুন্সিগঞ্জের কালী মন্দিরে সত্যাগ্রহীরা নাকি দা, কুড়ুল করাত প্রভৃতির দ্বারা সত্যাগ্রহ চালাইয়া মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক স্পৃশ্যাস্পৃশ্য নির্ব্বিশেষে বিগ্রহস্পর্শ করিয়া সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। এই সত্যাগ্রহীদল কতকগুলি সম্ভ্রান্ত ঘরের স্ত্রীলোকগণকে খন্তা কুড়ুল করাতাস্ত্রে সুশোভিত করিয়া অগ্রে স্থাপন করিয়া দেবমন্দির আক্রমণ ও দখল করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

আবার এই সংস্কারকগণের দ্বারা দেশের অর্থ-নীতির উন্নতির ব্যবস্থা কতদূর হইতেছে তাহারও কিঞ্চিৎ আলোচনা না করিলে ইঁহাদের সর্ব্বত্রপ্রসারিণী শক্তির অমর্য্যাদা করা হয়। একে এদেশের লোক অধিকাংশই দরিদ্র গৃহস্থ, সন্তানসন্ততিভারে প্রপীড়িত;

তাহাদের আয়ের পথও অতি সঙ্কীর্ণ। নেতৃবৃন্দের সম্মান রক্ষার্থ, হরতাল করিতে গিয়া চাকরি ছাড়িয়া, কারাবরণ করিয়া এই শ্রেণীর লোক যে নিজে কিরূপ কষ্টে পড়ে এবং তাহাদের পরিবার বর্গকে বিপদে পাতিত করে, তাহার উদাহরণ আমাদের সম্মুখে বিরল নহে। মাদক দ্রব্য বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া লোকের তাল খর্জ্জুর বৃক্ষের বিনাশ সাধন করা সত্যাগ্রহীদের সত্যধর্ম্মের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে। দেশে মাদক দ্রব্যের অভাব নাই—একটা ছাড়াইলে আর একটা ধরিতে বড় অধিকক্ষণ লাগে না। এ অবস্থায় মাদকাসক্ত ব্যক্তির মাদকাসক্তি কমাইবার জন্য সৎকর্ম্ম, নির্দ্দোষ আমোদের, সৎসঙ্গ প্রভৃতির ব্যবস্থা না করিয়া তাল খর্জ্জুর বৃক্ষ ধ্বংস করিতে থাকিলে দেশের গুড় চিনির আয় হইতে এই দেশ কি বঞ্চিত হইবে না? ধান্য হইতে পাঁচুই নামে একপ্রকার মদ্য প্রস্তুত হয় বলিয়া এই শ্রেণীর সংস্কারকগণ কি ধান্যবৃক্ষ ছেদনের কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিবেন?

তাহার পর উচ্ছৃঙ্খলভাবে পিকেটিংএর ফলে কোন কোন দেশী বস্ত্রের ব্যবসায়ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে বলিয়া শোনা যাইতেছে। যে সকল তন্তুবায় মিলের সূতায় সূক্ষ্ম কাপড় তাঁতে বুনিয়া হাটে বিক্রয় করে, তাহাদের উপর অত্যাচারের কথা আমাদের শ্রুতিগোচর হইয়াছে। এইরূপ নানাপ্রকার উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারের জন্য দরিদ্র দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা ক্রমশঃ জটিল হইয়া উঠিতেছে।

যাঁহারা দেশের হিতের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন, দেশের জন্য নানা দুঃখ কষ্ট বরণ করিয়া লইতেছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে ক্রমাগত আলোচনা করিয়া আমরা যে আনন্দ অনুভব করিতেছি, তাহা নহে। আমাদের মনে হয় তাঁহারা অকারণ এই সকল দুঃখ বরণ করিয়া লইতেছেন। তাঁহাদের শক্তি যদি তাঁহারা অপর দিকে প্রয়োগ করিতেন, তাহা হইলে হয় ত এতদপেক্ষা স্থায়ী সুফল ফলিত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ইঁহাদের এই আইন অমান্য আন্দোলনের উদ্দেশ্য হইতেছে—গভর্ণমেণ্টের উপর চাপ দিয়া গভর্ণমেণ্টকে আমাদের সত্বর স্বরাজ দিতে বাধ্য করা। কিন্তু আমাদের দেশের কঠোরব্রতী যুবকদল ও প্রবীণ নেতৃগণ পুলিশের লাঠি খাইয়া কারাগারে যাইলে তাহাদের মনে করুণার উদয় হইতে পারে বটে, কিন্তু যখনই তাহাদের নিজের গৃহের বেকার-সমস্যা এবং ভবিষ্যৎ বাণিজ্যের আশায় অন্ধকার দেখিবে তখন সে করুণা তাহাদের অধিক দূর লইয়া যাইতে পারিবে না। বাণিজ্যনীতিতে কোন্ঠেসা করিতে পারিলে তবেই ইংরাজ বণিকের সুবুদ্ধির উদয় হইবে। বৃটিশ-পণ্য একেবারে বর্জ্জন করিবার সঙ্গত ভয় জন্মাইয়া দেওয়া ভিন্ন চাপ দিয়া স্বরাজ আদায়ের অন্য উপায় নাই। বৃটিশ পণ্য বর্জ্জন ব্যাপার দেশব্যাপী করিতে হইলে অপেক্ষাকৃত অল্প আয়োজনে অল্প কষ্ট স্বীকার দ্বারা ও সাধিত হইতে পারে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

আমাদের সম্মুখে যে ভবিষ্যৎ বিপদ রহিয়াছে তাহারই বর্ণনা করিলাম। এইবার

আমাদের এতৎসম্বন্ধে কর্ত্তব্য কি তাহার সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আভাষ দিয়া আমার বক্তৃতার উপসংহার করিব। আমরা বেশ বুঝিতেছি যে, ইংরাজের সঙ্গে সম্পর্ক আমাদিগকে এখনও বহুদিন বাজায় রাখিতেই হইবে। তবে সে সম্পর্কটা পূর্ব্বকার বিজিত আর বিজেতার তিক্ত সম্বন্ধ নহে; এবার অনেকটা সমান সমান ভাবে শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি চলিবে। যতদিন না ভারতবাসী ও ইংরাজ উভয়ের মধ্যে অবিশ্বাস দূর হইয়া মাতা ধরিত্রীর সন্তানবোধে ভ্রাতৃ ভাব আসিবে, ততদিন এই শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি চলিতে থাকিবে। ইহাতে কোন পক্ষই সাহস করিয়া কিছু লাভবান হইতে পারিবেন না। মুষ্টিমেয় ইংরাজের পক্ষে ৩২ কোটী ভারতবাসী, যাহার মধ্যে নানা ভাবের নানা ধর্ম্মের নানা প্রকার লোক আছে, তাহাদের হঠাৎ বিশ্বাস করিয়া উঠা বড় কঠিন। তাহা হইলেও ইংরেজকে তাহা করিতেই হইবে; ভারতের বাণিজ্য বজায় করিতেই হইবে; ভারতের কৃষি শিল্পের উন্নতি করিতেই হইবে এবং উন্নতির ফল ভারতবাসীর সহিত তুল্যাংশে ভোগ করিতেই হইবে; নতুবা ইংরেজের অর্থনীতিক সমস্থার সমাধানের অন্য কোন উপায় নাই। সুতরাং এ অবস্থায় স্বাধীনতার ষোল আনা পাইব কি বার আনা পাইব ইহা লইয়া ছেঁদো কথাকাটাকাটি, স্ত্রীজনসুলভ মানঅভিমানের অভিনয়ের কোন প্রয়োজন দেখা যায় না।

ভারতের শাসন-তন্ত্রের ভিতর ভারতবাসীর আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতে চলিয়াছে। সংখ্যা বাহুল্য হিসাবে ২২ কোটী হিন্দুর এই শাসন-চক্রের মধ্যে প্রাধান্য অনিবার্য্য বুঝিয়া ভারতে আবার হিন্দুরাজ্য আসিল ভাবিয়া অন্যান্য জাতি বিশেষ শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু কেবল সংখ্যাবাহুল্যে কোন কাজ হয় নাই, হইবেও না। "সংঘ শক্তিঃ কলৌ যুগে" এই মন্ত্রের সাধন করিতে হইবে। যদি আমরা অভ্যুদয়ে দৃপ্ত না হইয়া ভারতীয় হিন্দুর "বসুধৈব কুটুম্বকং" এই আদর্শ বিস্মৃত না হইয়া ধীরভাবে ধর্ম্মের ভিত্তিতে সমস্ত ভারতীয়ের প্রতি জাতিনির্ব্বিশেষে প্রীতির ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ হই, তাহা হইলে অচিরকালের মধ্যেই আবার হিন্দুর সৌভাগ্যসূর্য্য—পূর্ব্বগগনে উদিত হইবে এবং হিন্দু ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে জগতের ধর্ম্ম অভ্যুদিত হইয়া পৃথিবী শান্তির আলয় হইবে। বর্ণাশ্রমী হিন্দু! সংযম পরায়ণ তপস্বী হিন্দু! জগতের এই পরমানন্দময় অবস্থা আনিবার জন্য তোমাকেও তপস্যা করিতে হইবে। উদ্দেশ্য ভগবানের চরণে ঢালিয়া দিয়া তপস্যা দ্বারা নিজে শক্তিমান হও এবং আত্মশক্তিতে সকলকে প্রীতির বন্ধনে বদ্ধ করিয়া সনাতন ধর্ম্মের বিজয় নিশান উড্ডীন কর ঐ শুন ভগবান্ পার্থসারথীর অভয়বাণী তোমাকে আশ্বাস দিতেছে—

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

একখানি পত্র

কস্যচিৎ তত্ত্বদর্শিনঃ।

বিগত ১৭ই ফাল্গুন পাবনা—বেড়া নামক স্থানে তথাকথিত 'পাবনা হিন্দুসম্মিলনীর" (!) নাকি এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভার নামে হাঁসি পাইল। কেননা "গাঁয় মানে না আপনি মোড়ল! মন্দ নহে! যাহার যাহা খুসি বলিলেই যখন এ বাজারে অবাধে চলিয়া যায় তখন আর না বলিবে কেন?

যাহা হউক তথাপি তথাকথিত সভায় নাকি এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। আগে পিছে দুই দিকে লম্বা চওড়া উপাধিযুক্ত এক ছাঁদ্‌রেল পণ্ডিত নাকি আসিয়া তাহার মোড়লী করিয়াও গিয়াছেন। শুনিতে পাই এক মেথর পুঙ্গব ও নাকি তাঁহার সভায় সহকারীরূপে বর্ত্তমান ছিলেন। অতি অপূর্ব্ব সম্মিলন অবশ্য বলিতে হইবে।

সভায় আরও একটু বিশিষ্টতা আছে। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগকে সভায় যোগদান করাইবার নিমিত্ত বিশেষভাবে যত্ন চেষ্টা হইয়াছে। এবং ভদ্র মহিলাগণ ও লজ্জা মান পরিত্যাগপূর্ব্বক দলে দলে সবেগে সভায় যোগদান করিয়াছেন। কাহারও বাধা মানেন নাই। বলা বাহুল্য বাধাও কম। আমি স্বয়ং কাহাকে কাহাকেও নিষেধ করিয়াও রাখিতে পারি নাই। সম্মুখে বাধা মানিয়াছে। কিন্তু পরক্ষণে অজ্ঞাত অন্য পথে চলিয়া গিয়াছে। বুঝিলাম হিন্দুর অতি দুঃসময় উপস্থিত। বীজ ত বহুপূর্ব্বেই নষ্ট হইয়াছে, এইবার ক্ষেত্রও নষ্ট হইতে চলিল। সুতরাং আর রক্ষার উপায় কি? ধর্ম্মটা অন্তঃপুরেই কতকটা উজ্জ্বল ছিল। কেননা স্ত্রীলোকেরই যথারীতি ধর্ম্মাচরণ করিতেন। এইবার তাহাও গেল। সুতরাং আর রক্ষা নাই।

যাহা হউক সভা অতিসন্নিকটে হইলেও ঐরূপ অহিন্দু সভার অসত্য অভিভাষণ, ঋষিকল্প মহামান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের গ্লানিকর কথা শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা নাস্তিকতা বাদ— অতএব সর্ব্বথা পাপ কথা শ্রবণ করা ও প্রকৃত নিষ্ঠাবান আস্তিক হিন্দুর পক্ষে পাপ বলিয়া সভায় যোগদান করা কর্ত্তব্য বোধ করি নাই। কিন্তু তথাপি সকল কথাই কর্ণকুহরে প্রবেশলাভ করিয়াছে। বন্ধুবান্ধব কেহ কেহ গিয়াছিলেন এবং শুনিতে না চাইলেও সভার কথা বর্ণনা করিয়াছেন, কাজে কাজেই বাধ্য হইয়া শুনিতেও হইয়াছে। একজনা ত অযাচিতভাবেই এক কপি অভিভাষণই পকেট হইতে বাহির করিয়া পড়িবার নিমিত্ত বিশেষ অনুরোধ করিলেন! তাঁহার উদ্দেশ্য প্রতিবাদ করিয়া কিছু লিখিব।

অবশ্য প্রতিবাদ করিয়া কিছু লিখি, না লিখি—তাহা স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু উহা কোনও হিন্দু-পদ-বাচ্য হিন্দুরই পাঠ করা কর্ত্তব্য নহে, পরন্তু উহা অগ্নিদগ্ধ করা কর্ত্তব্য—ইত্যাদি বলিলাম। তারপর আমাদের প্রতিবাদ করিবারই কি ক্ষমতা আছে? আমাদের কোনও ক্ষমতা নাই আমরা উহার কি বুঝি কি জানি? কিছুই বুঝি না, কিছুই জানিনা। যেহেতু

আমরা পণ্ডিত নহি, নিরেট মুর্খ। সুতরাং আমরা উহার কি প্রতিবাদ করিব? প্রতিবাদ করিবার ভার পণ্ডিতগণের উপর ন্যস্ত আছে। তাঁহারাই তাহা করিতেছেন ও করিবেন ইত্যাদি ও অন্যান্য অনেক কথা তাঁহাকে বলিলাম।

কিন্তু তথাপি তাঁহার বিশেষ অনুরোধে বাধ্য হইয়া একবার পাঠ করিতে হইল। পাঠ করিয়া একবারে যুগপৎ হাঁসি কান্না—বিস্ময়ের উদয় হইল! একবারে ত্র্যহস্পর্শের যোগ! না জানি ইহার ফল কিরূপ কুফলে পরিণত হয়! ভগবান ভরসা। তিনিই তাঁহার ভক্ত সেবকবিগকে নিশ্চিতই রক্ষা করিবেন সন্দেহ নাই।

কাজে কাজেই একটু লিখিতেও প্রবৃত্তি হইতেছে—তাই যাহা মনে উদয় হইল তাহাই লিখিলাম। যুগপৎ হাঁসি—কান্না। বিস্ময়ের উদয় হইল বলিয়াছি। হাঁসির কারণ—এমন করিয়া বিবেক-ধর্ম্ম, জ্ঞান-বুদ্ধি পাণ্ডিত্য জাতিকুল বিসর্জ্জন দিয়া পরের গোলাম সাজিতে পারে ও গোলামী করিতে পারে, নিজের কথা ভুলিয়া পরের পড়া-কথা কপ্‌চাইতে পারে ও সেই পড়া বুলি বলিতে পারে ইহা কখনও জানিতাম না এবং স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। হায়রে সাধের ময়ূরপুচ্ছ ধারণ! হায়রে অর্থের মোহ!! হায়রে নীচ স্বার্থ সাধন!!! তাই একটু হাঁসি পাইল।

কান্না—এমন করিয়া বিকট কালাপাহাড় সাজিয়া সমাজের বুকের উপর বসিয়া দিন দুপুরে ডাকাতি করিতে পারে,—ধর্ম্ম ধ্বংশ, শাস্ত্র ধ্বংশ, সমাজ ধ্বংশ, জাতি ধ্বংশ করিতে পারে এবং তাহা করিয়া নিরাপদে হাঁসিয়া খেলিয়া বুক ফুলাইয়া সগর্ব্বে বেড়াইতে পারে ইহাও কখন ত দেখি নাই ও শুনি নাই। হায়! আজ তাহাও দেখিতে হইল শুনিতে হইল। ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে। আজ কোথায় ভগবান রামচন্দ্র যিনি শূদ্রের অনধিকার চর্চ্চার কথা শ্রবণমাত্র খড়্গ হস্তে যাইয়া তাহাকে বধ করণান্তর পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণকুমারকে জীবিত করিয়াছিলেন। আর সে দিন নাই। এখন সকল বিষয়েই অবাধ বাণিজ্যের কাল। তাই সকল বিষয়েই সকলের যাহার যাহা খুসি তাহাই বলিতেছে ও করিতেছে। আমাদিগকেও নীরবে তাহা দেখিতে হইতেছে ও শুনিতে হইতেছে, কিছু বলিবার উপায় নাই। প্রতিকারের পথ নাই। তাই প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিল আঘাতে কান্না পাইল।

বিস্ময়—হায়রে কাল মাহাত্ম্য! ইহারা অন্যায় ও করে, আবার ভালও দেখায়, চুরিও করে, আবার সাধুও সাজে; সাড়ে ষোল আনা অধর্ম্মাচরণও করে; আবার ধর্ম্মের ধ্বজাও উড়ায়, মহাধার্ম্মিক বলিয়া প্রচারও করে; অধঃপতনের শেষ সীমায় যাইতেছে, কেবল মজ্জা মাত্র বাকী, তথাপি মুখে বলিতেছে উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিতেছে ও নবজীবন লাভ করিতেছে এবং তাহারই ভাগ্য লইয়া কৃতার্থম্মন্য হইবার নিমিত্ত সকলকে আহ্বানও করিতেছে। "কিমাশ্চর্য্য অতঃপরম।" আজ যদি

যুধিষ্ঠির থাকিতেন ও তাঁহাকে "আশ্চর্য্য কি ?" প্রশ্ন করা হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই গুলির উল্লেখ করিতেন। হায়রে কাল! তোমার অপার মহিমা! না জানি অতঃপর আর কি দেখাইবে! তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। তাই বিস্ময়ের উদয় হইল।

হাঁসি কান্না বিস্ময়ের কথা যাউক। দেশে এ কি হাওয়া উঠিল! এযে দারুণ জ্বালাময়ী হাওয়া! এ হাওয়ায় যে দেহ পুড়িয়া যায়, কণ্ঠ শুষ্ক হয়, হৃদয় অবসন্ন হয়! ইহার উপায় কি? অবশ্য সর্ব্বোপায়ের উপায় ভগবান। কিন্তু আমাদের ও ত কর্ত্তব্য আছে? তাহা হইতেছে কৈ? কি হইতেছে?

সে কথা পরে আলোচনা করা যাইবে। আগে সভার কথা শেষ করা যাক্।

অভিভাষণ পাঠে আমার যেরূপ হৃদয়ঙ্গম হইল তাহা আমারই ভাষায় সংক্ষেপে একটু বর্ণনা করা আবশ্যক। নিম্নে তাহা প্রদত্ত হ'ল।

বহুকালের মোহ নিদ্রার পর হিন্দু আজ জাগিয়াছে। জাগিয়া চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে—সম্মুখে বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র। তথায় সকলেই (ভিন্ন দেশস্থ) আপন আপন পোঁট্‌লা বাঁধায় ব্যস্ত মুখে কথা নাই। আশে পাশে দেখে হাত বাড়াইবার উপায় নাই—অর্গল বদ্ধ। তখন দুঃখে অগত্যা পশ্চাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। অমনি মধুর ছবি চোখে পড়ে। অতীতে পূর্ব্বপুরুষদের ত সবই ছিল দেখে। অমনি একটা শ্লোকও—"এতদ্দেশ প্রসূতস্য" ইত্যাদি কর্ণকুহরে আসিয়া প্রবেশলাভ করে। তবেত সবাই আমাদেরই শিষ্যত্বে বড়। কুচপরোয়া নাই। অমনি লম্ফপ্রদানে গা ঝাড়া দিয়া উঠিলেন।

কিন্তু ও হরি! এ কি বিপদ! ঘরে ঘরে যে গৃহ বিবাদ! প্রাচীনে নবীনে যে দুই দল। প্রাচীন বলে সাবেক সাবেক বহাল থাকুক নইলে নিস্তার নাই। কালপাহাড়গুলি বাদ দাও ইত্যাদি; নবীন বলে তাহাতেই ত এই দুর্দ্দশা; এখন উঠিতে হইলে মুখোস বেমালুম বদলাইতে হইবে; বামুনের কবল হইতে মুক্ত হও ইত্যাদি।

দুই দলের দ্বন্দ্বে দেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে তাই দয়াল প্রভু ভগবান দয়া করিয়া মুক্তি পথ স্বরূপ হিন্দু মহাসভা সৃজন করিলেন এবং অশেষ গুণ সম্পন্ন পণ্ডিত প্রবরকে তাহার কর্ণধাররূপে নিয়োগ করিলেন।

তাই কর্ণধার মহাশয় কর্ণধারণপূর্ব্বক বলিলেন তোমরা বিবাদ করিও না আমি সব মীমাংসা করিয়া দিতেছি। সেকেলে পণ্ডিতরা কি জানে? সনাতন ধর্ম্মের মর্ম্ম তাহারা অবগত নহে। আমার নিকট সব পকেট জাত আছে। আমি তাহাই নিষ্কাশনপূর্ব্বক তোমাদের যে পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছি, তাহা ভিন্ন অন্য পথ নাই। অন্য পথ—সব অ—পথ।

পথ নির্দ্দেশে—ধর্ম্মটাকে বাদ দেওয়া যায় না। যেহেতু এ যুগের প্রধান ব্যক্তি স্বয়ং বিবেকানন্দ তাহাই বলিয়াছেন। তাঁহার কথা অবহেলা করা কর্ত্তব্য নহে। কেমনা—তিনিই আমাদের পথ প্রদর্শক মহাগুরু।

তিনি যে সবার বড় ধার্ম্মিক গুরু তাঁহার একটু পরিচয় এইখানে দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না, মাপ করিবেন; পরম্পর শুনা যায় তিনি নাকি বলিতেন "শতবার গীতা পাঠ অপেক্ষা একবার ফুটবল খেলা ভাল।"—ইত্যাদি। কি উত্তম কথা, কি চমৎকার উদ্ভাবনী শক্তি! এমনটী না হইলে, এমন উচ্চ অঙ্গের কথা না বলিতে পারিলে কি কলির গুরু সাজা যায়? বলিহারী যাই তাঁহার ধার্ম্মিকতায়, বলিহারী যাই তাঁহার গুরুর গৌরবে, বলিহারী যাই তাঁহার অদ্ভুত তুলনায়, আর বলিহারী যাই তাঁহার অতি বড় দাম্ভিকতায়! হা ভগবন্! তোমার সাধের গীতা আজ কালমাহাত্ম্যে ফুটবলের তলায় আশ্রয় পাইল! যাহার পরিচয় হইতেছে—

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপাল নন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধী র্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥

তাহারই আজ এই দুর্দ্দশা। তাহারই আজ ফুটবলের তলায় আশ্রয়।

যাহার মাহাত্ম্য বর্ণনে কেহই সমর্থ নহেন, কেন না উহার মর্ম্ম কেহই সম্যক অবগত নহেন। কেবলমাত্র—

কৃষ্ণো জানাতি বৈ সম্যক কিঞ্চিৎকুন্তী সুতঃ ফলম্।
ব্যাসো বা ব্যাসপুত্রোবা যাজ্ঞ্যবল্কোঽথ মৈথিলঃ॥

তারপর—

অন্যে শ্রবণতঃ শ্রুত্বা লেশং সংকীর্ত্তয়ন্তি চ।

তাহারই আজ এই দুর্দ্দশা। তাহারই আজ ফুটবলের তলায় আশ্রয়।

যাহা পাঠে ক্রিয়াফল হইতেছে—

সোপানাষ্টা দশৈরেবং ভক্তি মুক্তি সমুচ্ছ্রিতৈঃ।
ক্রমশো চিত্তশুদ্ধিঃস্যাৎ প্রেমভক্ত্যাদি কর্ম্মণি॥

তাহার আজ এই দুর্দ্দশা।

যাহার ফল শ্রুতিতে আছে—

পাঠেঽসমর্থঃ সম্পুর্ণে তদর্দ্ধপাঠমাচরেৎ।
তদা গোদানজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥
ত্রিভাগং পঠমানস্তু সোম-যাগ-ফলং লভেৎ।
ষড়ংশং জপমানস্তু গঙ্গাস্নান ফলং লভেৎ॥
তথাধ্যায়দ্বয়ং নিত্যং পঠমানো নিরন্তরম্।
ইন্দ্রলোকমবাপ্নোতি কল্প-মেকং বসেদ্ধ্রুবং॥
একমধ্যায়কং নিত্যং পঠতে ভক্তি সংযুতঃ।
রুদ্রলোকমবাপ্নোতি গণোভূত্বা বসেচ্চিরম্॥

অধ্যায়ার্দ্ধঞ্চ পাদং বা নিত্যং যঃ পঠতে জনঃ।
প্রাপ্নোতি রবিলোকং স মন্বন্তর সমাঃশতম্॥
গীতায়াঃ শ্লোক দশকং সপ্ত পঞ্চ চতুষ্টয়ম্।
চন্দ্রলোক মবাপ্নোতি বর্ষানামযুতন্তথা।
ত্রিশ্লোক মেক-মর্দ্ধং বা শ্লোকানাং যঃ পঠেন্নরঃ।
গীতার্থ মেক পাদঞ্চ শ্লোকমধ্যায় মেবচ।
স্মৃত্বা ত্যক্ত্বা জনো দেহং প্রযাতি পরমং পদম্॥
গীতার্থ মপি পাঠং যঃশৃনুয়াদ্দণ্ড কালতঃ।
মহা পাতক-যুক্তোঽপি মুক্তিভাগী ভবেজ্জনঃ॥
সংসার সাগরং ঘোরং তর্ত্তুমিচ্ছতি যো নরঃ।
গীতানাবং সমাসাদ্য পারং যাতি সুখেন সঃ।

আর কত তুলিব? অনেক হইয়াছে। আর উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। যাহার মাহাত্ম্যের অন্ত নাই, উদ্ধৃত করিয়া আর তাহা কত দেখাইব? বর্ব্বরের চোখে আঙ্গুল দিয়া কিছু দেখান দরকার—তাই একটু উদ্ধৃত করিতে হইল।

যাহা হউক উদ্ধৃত শ্লোকগুলি সবই সহজ বোধ্য, সুতরাং ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

এক্ষণে ঐ উদ্ধৃত শ্লোকগুলির দ্বারা গীতা সম্বন্ধে আমরা কি বুঝিতে পারি? গীতা কি প্রকৃতই ঐরূপ হেয় পদার্থ? ঐরূপ ঘৃণিত পদার্থ? ঐরূপ পদ দলিত হইবার উপযুক্ত সামগ্রী? বোধ হয় না। গীতা—হেয়, ঘৃণিত ত নহেই, পরন্তু উপাদেয় অমৃত; পদদলিত হইবার জিনিষ ত নহেই পরন্তু শিরোধারণের উপযুক্ত।

আরও বুঝিতে পারি গীতা অনন্ত রত্নের খনি, গীতা অনন্ত রত্নের ভাণ্ডার। জীব ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে প্রতিদিন নিয়ম মত এক গীতা অধ্যয়ন করিলেই ধর্ম্ম-অর্থ-কাম মোক্ষ —এই চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করিতে পারে। ঘোর সংসার রূপ সাগর তরিবার পক্ষে এক মাত্র গীতাই ভেলা স্বরূপ। গীতার সম্পূর্ণ পাঠ হইতে আরম্ভ করিয়া অর্দ্ধাংশ, এক তৃতীয়াংশ ষড়ংশ দুই অধ্যায়, এক অধ্যায়, অর্দ্ধ অধ্যায় এমন কি ১০, ৫, ১ বা অর্দ্ধ শ্লোক পর্য্যন্ত পাঠেও অনন্ত ফল। গীতা এমন কি জিনিষ, গীতার এতই মাহাত্ম্য!

তাই বলি যাহার এত মাহাত্ম্য, যাহা সংসার রূপ সাগর হইতে তরিবার একমাত্র সহজ উপায় স্বরূপ, এবং যাহার চরম ফল মুক্তি,—তাহারই আজ এই দুর্দ্দশা। যাহা যত্ন করিয়া অধ্যয়ন করিলে জীব কৃত-কৃতার্থ হইতে পারে তাহাই আজ ফুট বলের তলায় রাখিবার উপদেশ! অহো কি দুর্দ্দৈব! কি দুর্দ্দৈব!!

না—হইবে কেন? শূদ্রাধম নরু দত্তের মাথায় ইহার অধিক আর কি আশা করা যায়?

শূদ্রের মস্তিষ্কে ইহার অধিক আর কি ফুটিতে পারে? কিছুই নহে। তমো-রজঃ একবারে 'নক্কষ্ট—তমো ও রজোগুণের আধারে সত্ত্বের অত সহজে আবির্ভাব অসম্ভব।

ঐরূপ দত্ত পুঙ্গব রমেশ চন্দ্রও একদিন বলিয়াছিলেন—"বেদ চাষার গান" ইত্যাদি। তাহার তেমনি উপযুক্ত উত্তর পণ্ডিত প্রবর স্বর্গীয় শশধর তর্কচূড়ামনি মহাশয়ের নিকট পাইয়াছিলেন। উপযুক্ত কষাঘাতে উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সর্ব্বত্রই ঐরূপ কষাঘাত প্রদান কর্ত্তব্য, নইলে শিক্ষা প্রাপ্ত হয় না।

এই সব কারণে বেশ বুঝা যায় বেদে শূদ্রের অধিকার দেওয়া হয় নাই কেন? স খ করিয়া বিনা কারণে কেহই ঐরূপ নিষেধাজ্ঞা কখনও প্রচার করে না। প্রকৃষ্ট কারণ বর্ত্তমান দেখিয়াই ঐরূপ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। শাস্ত্রকারগণ কেহই সাধারণ লোক নহেন, সকলেই ঋষি, মহাত্মা, ভূত-ভবিষ্যৎবেত্তা ত্রিকালজ্ঞ। তাঁহারা অতীন্দ্রিয় শক্তি সম্পন্ন; দিব্য চক্ষু ও দিব্য জ্ঞান সম্পন্ন। সমস্ত জ্ঞানই তাঁহাদের করতলগত। কাজেই কোন্ মস্তিষ্কে কি বিষয় ফুটিতে পারে, না—পারে, তাহা তাঁহারা দিব্য চক্ষু ও দিব্য জ্ঞানে অনায়াসে সব জানিতে পারিতেন। কাজেই বিধি নিষেধও সেইরূপ করিয়া লিখিয়াছেন। তপঃশুদ্ধ বুদ্ধি ব্যতীত অন্য মস্তিষ্কে বেদ কখনও প্রতিভাত হয় না, বেদের প্রকৃত মর্ম্ম ধারণাই করিতে পারে না, তপঃশুদ্ধ বুদ্ধি জিনিষটা অমনি হয় না। তাহা তপঃ সাধ্য; সাধন সাপেক্ষ কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত মূলে চাই। যাক সে সব কথায় প্রয়োজন নাই। ফল কথা যে সে মস্তিষ্কেই বেদের প্রকৃত অর্থ আদৌ প্রস্ফুটিত হইবার উপায় নাই। একে, আর বুঝিবে, হিতে বিপরীত হইবে। কাজেই ঋষিগণ ঐরূপ আদেশ করিয়া গিয়াছেন। এবং এরূপ আদেশ কোন মতে অন্যায় নহে, প্রত্যুত ন্যায় সঙ্গত।

শ্রীমানের ঐরূপ আরও অনেক কথা আছে, উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কারণ ভাত একটী টিপিলেই সকল ভাতের খবর পাওয়া যায়। ঐ একটি মাত্র আঘাতেই বুঝিয়াছি তিনি অতি নিকৃষ্ট রাজো ও তমো গুণের উপাসক। তিনিই হইলেন আবার যুগের প্রধান ব্যক্তি বা যুগাবতার। হায়রে কলির প্রভাব! আরও কত কথা শুনিতে হইবে।

প্রসঙ্গক্রমে বহু দূরে আসিয়া পড়িতে হইয়াছে। দুষ্ট লোকের দুষ্ট কথা বড়ই অসহনীয় হয়, একেবারে যেন আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠে। তাই দু'কথা না বলিলেও প্রাণে শান্তি পাওয়া যায় না। তাই বলিতে হয় মাপ করিবেন।

এক্ষণে পূর্ব্ব কথিত কর্ণধারের কথা; স্বয়ং গুরুদেব যখন বলিয়াছেন—তখন কাজে কাজেই ধর্ম্মকে বাদ দেওয়া যায় না। কোন রূপে কাছার সহিত উহাকে বাঁধিয়া রাখিতেই হইবে। ধর্ম্ম বাদ দিয়া আমি ও কিম্ভূত কিমাকার কিছুই গড়িতে ইচ্ছা করি না।

মহাভারতে স্বয়ং ব্যাস দেব ধর্ম্মের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"সত্যং দম স্তপঃ শৌচং" ইত্যাদি। এ ধর্ম্মে সকলেরই সমভাবে অধিকার আছে।

আবার ভাগবতে কলির ধর্ম্ম এইরূপ নিরূপিত আছে।—"কৃতে যৎ ধ্যায়তো বিষ্ণু"— ইত্যাদি। অর্থাৎ কলিতে শুধু নাম কীর্ত্তন করিলেই চলিতে পারে। আর সন্ধ্যা, আহ্নিক, জপ, তপ, পূজা, অর্চ্চনা, আচার, নিয়ম, ব্রত পালন ইত্যাদি কিছুরই প্রয়োজন নাই। কেবল এক নাম কীর্ত্তনেই সকল জাতি সমভাবে শুচি ও পবিত্র হইবে, এক বর্ণ হইবে, এবং তাহাতে চতুর্ব্বর্গ লাভ হইবে।

কলিকে ভয় করিও না। কলিই ভয়ে পলায়ন করিবে। তারপর কলিকে তাড়াইবার এক সিদ্ধ মন্ত্র ও আমার পকেটে আছে। ঐ মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক কলিকে "পালাও" বলিলেই সে বাধ্য হইয়া পলায়ন করিবে এবং সত্যকে "এস" বলিলেই বাধ্য হইয়া সে আসিবে। এবং আমাদের সদ্য মুক্তি তখন করতলগত হইবে।

এই রূপে এই ধর্ম্ম যথারীতি গ্রহণান্তর প্রথমতঃ চারটি অত্যাবশ্যকীয় কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে! যথা—শুদ্ধি, অস্পৃশ্যতা পরিহার, বিধবা বিবাহ ও সংগঠন।

শুদ্ধি—শব্দের দ্বারাই ইহার অর্থ সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবার সম্ভাবনা। ব্যাখ্যার বিশেষ প্রয়োজন দেখি না তথাপি একটু বলা কর্ত্তব্য। শুদ্ধি অর্থে ইহাই বুঝিতে হইবে যে হাটে মাঠে ঘাটে যেখানে যে জাতীয় মানবরতনই পাওয়া যাক্ না কেন তাহাকে আনিয়াই সমাজ ভাণ্ডারে পুরিতে হইবে। তাহা হইলে অচিরাৎ ভাণ্ডার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। এ কার্য্য শাস্ত্রানুমোদিত এবং ঋষিগণ সম্মত। অতএব নির্দ্দোষ।

অস্পৃশ্যতা পরিহার অর্থাৎ আ-চণ্ডাল—হাড়ি—ডোম—মেথর—মুচি-মুদ্দাফরাশ—শূদ্র ও ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় একত্রে মেসামেসি ও পান ভোজনাদি দ্বারা খুব মাখামাখি, ঢলাঢলি করিতে হইবে। তাহা হইলে সকলের মধ্যে অপূর্ব্ব প্রেমের বন্যা প্রবাহিত হইবে। প্রেমের বন্যা না বহিলেও ত মুক্তি নাই। ইহাও শাস্ত্রেরই বচন, ঋষি বাক্য।

বিধবা বিবাহ—অর্থাৎ বিধবার উর্ব্বর ক্ষেত্র আর অনাবাদে রাখা যুক্তি যুক্ত নহে। কেননা—"এমন মানব জমীন্ রইল পতিত, আবাদ করলে ফল্‌ত সোনা" কবি বাক্যইত রহিয়াছে? অতএব এখন আবাদ করিয়া সোনা ফলাইতে হইবে। ভারতও দীন হীন কাঙ্গাল—সুতরাং হইবে ভাল! অতএব খুব জোরে আবাদ চালাও, বীজ বপন কর, তাহা হইলে অচিরে ঘটোৎকচ সদৃশ মহাকায় সব জারজ পালোয়ান জন্ম গ্রহণ করতঃ দেশ উদ্ধার করিয়া দিবে। এ বিধবা বিবাহ যে শাস্ত্র সম্মত তাহা বলাই বাহুল্য। স্বয়ং ব্রহ্মর্ষি বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু কষ্টে ইহা আবিষ্কার করিয়াছেন। কাহার সাধ্য ইহার প্রতিবাদ করে? কেহই এতাবৎ করিতে পারেন নাই (!)।

তারপর সংগঠন—এইটি অতি জটিল বিষয়। সুতরাং একটু বিশদ ভাবে বলিতে হইবে। সংগঠন অর্থ দাসোচিত মনোবৃত্তির অর্থাৎ Slave Mentalityর পরিহার। তাহার ফলিতার্থ—বঙ্গের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণই ধর্ম্ম জানেন, শাস্ত্র জানেন আর কেহ জানেন

না, এবং তাঁহারা যেরূপ বলিবেন সেই রূপই চলিত হইবে—ইহা অতীব ঘৃণিত কুসংস্কার উহা সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। উহাতেই দেশের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। এক্ষণে ঐ কুসংস্কার ত্যাগ করতঃ বামুনগুলোকে go to hell (নরকস্থ) করণান্তর স্বাধীন ভাবে স্ব স্ব প্রধান হইয়া জাগ্রত হইতে হইবে, তাহা হইলেই স্বরাজ করতলগত হইবে।

ঐ চারিটী প্রধান কার্য্য বাদে আরও কয়েকটী অপ্রধান কার্য্য ও করিতে হইবে। যথা—জাতি নির্ব্বিশেষে সকলেই এক কূপের জল লইতে পারিবে; দেবায়তনে সকলেই এক সঙ্গে দেবদর্শন করিতে পারিবে, আর একটী বিশেষ কার্য্য ইহাই করিতে হইবে যে, পল্লীতে পল্লীতে খোলা যায়গায় একটী করিয়া ভজনালয় নির্ম্মান করিতে হইবে; তথায় গ্রামের সমস্ত বালক বালিকা, যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়-পৌঢ়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলে একত্রে হাত ধরা ধরি করিয়া শুচি হইয়া যাইয়া সকলে নামকীর্ত্তন করিবে, নাচিবে গাহিবে ইত্যাদি করিবে। এইরূপ প্রতিদিনই করিতে হইবে। বালক বালিকা, যুবক যুবতীগণকে লেখা পড়া, লাঠি খেলা ছুরী খেলা, শিখাইতে হইবে। ইহা একবারে বাধ্যতা মূলক হওয়া চাই। ইত্যাদি ইত্যাদি কত কথা তাহা উল্লেখ করিতে ও ঘৃণা বোধ হয়। এবং এই গুলিই নাকি পুণ্য শ্লোক বিবেকানন্দের যুগ পরিবর্ত্তন কারী সিদ্ধ মহামন্ত্র, এবং ইহাই হিন্দু-গঠণের মূল এবং সুদৃঢ় ভিত্তি। ইহারই সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেই আমাদের সিদ্ধি—স্বরাজ অচিরে করতল গত হইবে, আমরা সদ্য জোঁয়াল মুক্ত হইব ইত্যাদি।

মাঝখানে একটী গুরুতর কথা ছাড় পড়িয়াছে। ভারতের নাকি শুধু মাথা ও পা আছে, কিন্তু বক্ষ উদর শিশ্নাদি অন্য অঙ্গ নাই। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও শূদ্র আছে। ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতি নাই। এক্ষণে উপায়? রক্ষা করিবে কে? আহার যোগাবে কে? অতএব এ সব অঙ্গ কাটিয়া ছাঁটিয়া সঞ্জিবনী মন্ত্রে ভারতের অঙ্গহীন অঙ্গগুলির সহিত যোজনা করিয়া দিতে হইবে। অর্থাৎ ঐ সব জাতি, না—না, ঐ শ্রেণীর জীব, সৃজন করিতে হইবে। জাতি কথাত রাখিবার উপায় নাই। উহা অস্পৃশ্য, ঘৃণ্য ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন।

ইহাই হইল পণ্ডিত প্রবরের ভক্তৃতার সংক্ষিপ্ত সার মর্ম্ম। বক্তৃতার মর্ম্ম কথা হৃদয়ের মর্ম্ম গাঁথায় প্রকাশ করিলাম। যেমন কথা, তেমনি ভাবে প্রকাশ করিলে কথার মাধুর্য্য রক্ষা পায় না। এক্ষণে কিঞ্চিৎ সাদর স্বাগত প্রশ্ন ও টীকা টীপ্পনির সমাবেশে ইহার উপসংহার প্রয়োজন।

প্রথম কথা হইতেছে—তাঁহারা কি গড়িতে চাহেন; তাঁহাদের সাধের বস্তুর মূর্ত্তিটী কি? আমিত কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না; সকলের ভাবের একটা ধারা আছে। কি খৃষ্টান, কি মুশলমান, কি বৌদ্ধ, কি হিন্দু সকলেরই ভাবের এক একটী স্বতন্ত্র ধারা আছে। কিন্তু ইহারা ধারা বিহীন। পূর্ব্বের সংস্কার ও ভুলিতে পারেন না, আবার নবীনের মূর্ত্তিও কল্পনায় সম্যক ফুটিয়া উঠে না। মাঝখানে কিম্ভূত কিমাকার এক উৎকট ভাবের ঘোর আবর্ত্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন। ও দিকে মুখে ও আবার বলিতে কসুরি

নাই; সর্ব্বদাই বলিতেছেন—আমরা ধর্ম্ম বাদ দিয়া কিম্ভূত কিমাকার কিছুই গড়িতে চাই না ইত্যাদি। কোন কথারই সামঞ্জস্য নাই।

কেমন করিয়া সামঞ্জস্য থাকিবে, সত্য কখনও দুইটী হইতে পারে না সত্য এক। সনাতন ধর্ম্ম কাহাকে বলে? ইহার উত্তর ও একটী বই দুইটী নহে। এখানে কিন্তু দুইটী ব্যাখ্যা দেখিতেছি। প্রাচীনের এক নবীনের অন্য; প্রাচীন শাস্ত্রীয় যুক্তি সহ বলেন নবীনের ব্যাখ্যা সর্ব্বদা অপব্যাখ্যা, তাঁহাদের ব্যাখ্যাই প্রকৃত ব্যাখ্যা। পক্ষান্তরে নবীন বলেন প্রাচীনের ব্যাখ্যাই অপব্যাখ্যা, তাঁহাদের ব্যাখ্যাই খাঁটি ব্যাখ্যা। ইহার কোন্ কথা সত্য; সত্য অবশ্য একটীই হইবে সন্দেহ নাই; সেটী কোনটী? ইহা এক মহা সমস্যার বিষয়। এই ভাবে সমাজে সাধারণ অজ্ঞ জনের মধ্যে এক মহা বিভীষিকার ভাব আসিয়াছে ও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। অবশ্য সকলের নহে কোনও কোনও অর্ব্বাচীনের। যাহা হউক তথাপি তাহা অপনোদিত হওয়া অতীব আবশ্যক।

এখন বিচার ক্ষেত্রের কথা হইতেছে—যদি দুইটী কথা অন্ততঃ সাধারণ জ্ঞানের দ্বারা ও বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া দেখা যায় তাহা হইলে কি অনুমিত হয়? নবীন অপেক্ষা প্রাচীনের কথাই ন্যায় সঙ্গত ও সত্য বলিয়া অনুমিত হয়। এ অনুমান শাস্ত্র পড়িয়া ও সব দেখিয়া শুনিয়া জানিয়া অনুমান নহে, আবার গায়ের জোরের অনুমান ও নহে। ইহা সাধারণ জ্ঞানের (Common Sense) অনুমান। সুতরাং ইহা পক্ষপাত শূন্য নিরপেক্ষ অনুমান। তাহার কারণ হইতেছে—সেই পুরাকালের ঋষিগণ হইতে পুত্র পৌত্রাদিক্রমে বা গুরু শিষ্য পরম্পরায় যে অর্থ ধারাবাহিকরূপে গৃহীত হইয়া আসিতেছে এবং সমাজের সকল শ্রেণীর সকল লোকের মধ্যে যে অর্থ এক ভাবে প্রচলিত আছে তাহাই মিথ্যা হইবে আর আধুনিক ২।৪ জন লোকের উদ্ভাবনী শক্তির বলে উদ্ভাবিত, কষ্ট কল্পিত অর্থই সত্য হইবে—ইহা কখনই হইতে পারে না। ইহা সাধারণ জ্ঞানের বিরুদ্ধ অনুমান। তাঁহারা কিছু অমানুষিক শক্তি সম্পন্ন লোক নহেন, কোন প্রকার সাধনায় সিদ্ধ ও নহেন অতীন্দ্রিয় শক্তি সম্পন্ন বা ভগবৎ বিভূতি যুক্ত লোক ও নহেন, ভূত ভবিষ্যৎ বেত্তাত নহেনই। ইহার কিছুই যখন নহেন, তখন তাঁহাদের কথার একটা মুল্য কি? তাঁহারা ও অতি সাধারণ শ্রেণীর পণ্ডিত মাত্র। তাঁহারা পদ প্রান্তে বসিয়া উপদেশ পাইয়া কৃতার্থ হইতে পারেন এখনও এমন মহামনীষাসম্পন্ন পণ্ডিত ব্যক্তির সমাজে বোধ হয় খুব অভাব হয় নাই, প্রত্যুত বহু পণ্ডিত আছেন। সুতরাং তাঁহাদের (আধুনিক নবীন পণ্ডিত) কৃত ব্যাখ্যাই যে নিঃসন্দেহ অপব্যাখ্যা ইহা সজোরে ও নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। তাঁহারা ভূত ভবিষ্যৎবেত্তা ত্রিকালজ্ঞ কোন ঋষি নহেন। সুতরাং তাঁহাদের কথার মূল্য খুব বেশী নহে। ইহা সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারাই বেশ সহজেই বুঝা যায়। অথচ ঐ সকল পণ্ডিত সুদূর মফঃবলে

আসিয়া মিথ্যা বাগ্‌জালের দ্বারা অজ্ঞ সাধারণের মতিবিভ্রম জন্মাইবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহা অতীব ঘৃণিত কার্য্য। ইহারাই আবার পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ!

যাহা হউক এখন হিন্দু দিগেরও কর্ত্তব্য হইতেছে অমনি সঙ্গে সঙ্গে সেই সব স্থানে পাল্টা সভা করিয়া স্বনাম ধন্ত পুরুষ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণকে আনয়ন পূর্ব্বক বক্তৃতা দ্বারা প্রকৃত অর্থ বিশদ ভাবে বুঝাইয়া দেওয়া ও ঐ অপব্যাখ্যা হৃদয় ক্ষেত্র হইতে একবারে উন্মুলিত করিয়া দিয়া সকলকে প্রকৃতিস্থ করা। অন্যথা মহা বিপদের সম্ভবনা।

কিন্তু তাহার উপায় কি? হিন্দুগণ যে এখনও শিথিলাঙ্গ ও জড় পদার্থ সদৃশ। সে উৎসাহ নাই, উত্তম নাই, যত্ন নাই, চেষ্টা নাই। ইহাতে যে কর্ম্ম শক্তির প্রয়োজন তাহার ও সুদারুণ অভাব। চারিদিকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের পরিব্রাজকরূপে ভ্রমণ ও সভা-সমিতি করিয়া ব্যক্তৃতা প্রদান কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা হইতেছে কৈ? হইবেই বা কেমন করিয়া? লোকেরও অভাব, অর্থেরও অভাব। তথাপি অর্থ হইলেও লোকের অভাব কতকটা পূরণ হইতে পারে। কিন্তু সে অর্থ কোথায়? ধনীগণ এবিষয়ে একদম উদাসীন। যাহা হউক ব্রাহ্মণ সভার এদিকে বিশেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা এখন অতীব প্রয়োজনীয় হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ সভা ব্যতীত আর কে দেখিবে? ধর্ম্ম ও সমাজরক্ষা করা এখন ব্রাহ্মণ সভারই অবশ্য করণীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম। দেশে সে হিন্দু রাজা নাই; সে পূর্ব্বের শক্তিশালী সমাজও নাই; সুতরাং ধর্ম্ম ও সমাজ এখন রক্ষকবিহীন! তাই দেশময় উচ্ছৃঙ্খলতার পূর্ণ প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হইতেছে। এখনই ইহার সত্ত প্রতিকার প্রয়োজন এ অবস্থায় ব্রাহ্মণ-সভা ব্যতীত ধর্ম্ম ও সমাজের রক্ষক আর কে হইতে পারে? ব্রাহ্মণ সভাই এখন রাজাসন ও সমাজাসন প্রভৃতি সকল আসনেই সমাসীন। ব্রাহ্মণ-সভাই এখন সকল শক্তির কেন্দ্রীভূত শক্তি স্থান। সুতরাং ব্রাহ্মণ সভাকেই এখন সব দেখিতে হইবে ও যথা কর্ত্তব্য বিধান করিতে হইবে। অন্যথা আর গতি নাই।

অবশ্য ব্রাহ্মণসভা ও সে বিষয়ে পশ্চাৎপদ নহেন যেহেতু তাঁহার সৃষ্টি বা আবির্ভাবত ঐ উদ্দেশ্যেই হইয়াছে। কিন্তু তথাপি দুঃখের সহিত বলিতে হয় যে, যেরূপ তৎপরতার প্রয়োজন তাহার সুদারুণ অভাব। অবশ্য ক্রমশঃ সকল অভা ই দূরীভূত হইবে এবং যথারীতি কার্য্য ও হইবে সন্দেহ নাই। বিপদ জাল ও যতই ঘনীভূত হইতে থাকে, কার্য্য তৎপরতাও ততই দ্রুত হয়। ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যে পরিমাণ বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, প্রতিকার চেষ্টা তাহার তুলনায় কিছুই হয় নাই বলিলে ও অত্যুক্তি হয় ন। আশা করি ব্রাহ্মণ সভা বিশেষ তৎপরতা অবলম্বন করিবেন, এবং অন্যান্য সকলেই অর্থাৎ নিষ্টাবান হিন্দু মাত্রেই শক্ত্যনুযায়ী স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালনে ত্রুটি করিবেন না। অতিদারুণ দুঃসময়। এ সময় নিশ্চেষ্টতা একবারে সদ্য মৃত্যু লক্ষণ জানিবেন।

তারপর, পণ্ডিত প্রবরের ধৃষ্টতার বিষয় একটু আলোচনা করা অন্যায় নহে। যদি

ও তাঁহার ধৃষ্টতার অন্ত নাই ; প্রতি পদেই ধৃষ্টতা সুতরাং তাহার আলোচনা করা ও বৃথা, কতই তাহা আলোচনা করা যায়। তথাপি একটী গুরুতর ধৃষ্টতার বিষয় একটু আলোচনা না করিয়া ও উপায় নাই।

মুখে যাহা আসিতেছে তাহাইত বলিতেছেন। সে সম্বন্ধে কোন প্রকার বিচার নাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার ইহা ও বলিতে কসুর নাই যে, "আমাদের এই মতবাদ যদি কেহ নায্য ভাবে খণ্ডন করিতে পারেন তাহা হইলে সেই মুহূর্ত্তেই আমরা ইহা পরিবর্ত্তন করিতে প্রস্তুত আছি" ইত্যাদি। ইহা ধৃষ্টতার উপর ধৃষ্টতা একবারে চূড়ান্ত ধৃষ্টতা!

ইহা বোধ হয় উহাঁদের মামুলি বুলি। তাঁহাদেরই একপাড়ার শ্রীমান্ শশধর ও ঐরূপ বুলি বলিয়া থাকেন অজ্ঞ মূঢ়ের মধ্যে বাকজাল বিস্তার করতঃ যাহা তাহা বলেন, "নীচ লোককে কোলে তুলে লও, জল খাও, আহার বিহার কর, বিধবা বিবাহ দাও" ইত্যাদি। আবার সঙ্গে সঙ্গে বড়গলায় বলা হয় "ইহা শাস্ত্রোক্ত, কেহ খণ্ডন করিতে পারেন, করুন, এখনই এ মত ত্যাগ করিব ও প্রায়শ্চিত্ত করিব" ইত্যাদি।

কি দারুণ ধৃষ্টতা! বলি তোমাকে বুঝাইবার নিমিত্ত তোমার দ্বারস্থ হইবেন কেন? কাহার এত মাথা ব্যথা? কাহার সে গরজ? চৌদ্দ পুরুষ নরকস্থ হইবে তোমার, মাথা ব্যথা হইবে অপরের, ইহা মন্দ নহে! অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া পুড়িয়া মরিবে তুমি, মাথা ব্যথা হইবে অপরের, ইহা মন্দ নহে! গলায় কলসী বাঁধিয়া জলে ডুবিবে তুমি, মাথা ব্যথা হইবে অপরের, ইহা মন্দ নহে। কথায় বলে,—"যার বিয়ে তার বিয়ে নয়, পাড়া পড়শীর ঘুম নাই"। ইহাও ঠিক তাহাই। বলি তোমার যদি গরজ থাকে, তুমি যদি সত্যই জ্ঞান পিপাসু হইয়া থাক—তাহা হইলে মাথা ব্যথাও ত তোমারই হওয়া কর্ত্তব্য। তোমারইত প্রতি পণ্ডিতের দ্বারস্থ হইয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন পূর্ব্বক মনের সন্দেহ নিরসন করা কর্ত্তব্য। উহাই ত উপযুক্ত ন্যায় সঙ্গত পথ। তাহা অবলম্বন করিতে পারেন না কি? না তাহা পারেন না তাহা হইলে যে ভ্রম ঘুচিয়া যায়। সব ফাঁক হয়, আর কালা পাহাড়ি আচরণ যে করা চলে না। স্বার্থ সাধন যে হয় না? তাই তাহা করিতেও পারেন না। ওদিকে মুখে বাহাদুরীটুকু লওয়া আবশ্যক তাই ঐ পড়া বুলি কপচান হয়!

তাই বলিতেছিলাম - উহা তাঁহাদের মামুলি বুলি। সুতরাং পণ্ডিত প্রবরই বা না বলিবেন কেন? তথাপি প্রকাশ্য সভায় এইরূপ মিথ্যা স্পর্দ্ধা করা যে কত বড় বেয়াদপি, কতবড় গুরুতর ধৃষ্টতা তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না।

বলি এতখানিই যদি স্পর্দ্ধা ছিল, বুকের পাটা যদি এতই শক্ত ছিল—তাহা হইলে ৺কাশীধামে যখন অখিল ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণ মহাসম্মেলন হয় এবং যে সভায় ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশের বহু গণ্যমান্য মহামহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ উপস্থিত হইয়া সামাজিক বহু বিরোধী ও জটীল বিষয়ের যথা শাস্ত্র বিচার মীমাংসা পূর্ব্বক শেষ সিদ্ধান্ত নিরূপিত করেন, তখন পণ্ডিত প্রবর কোথায় ছিলেন? তখন এগলাবাজী কোথায় ছিল? তখন

সেখানে উপস্থিত হইয়া বিচার প্রার্থী হইলেন না কেন? তখন সমবেত পণ্ডিত মণ্ডলীকে পরাজয় পূর্ব্বক স্বমত স্থাপন করতঃ জয় জয়কার লইলেন না কেন? তাহা হইলেত খুব বাহাদুরীর কার্য্য হইত, আপনারও গৌরব শতগুন বর্দ্ধিত হইত, সমগ্র হিন্দু সমাজও তোমার চরণ প্রান্তে লুটাইয়া পড়িত ও যাহা বলিতে তাহাই করিত। এখন তোমায় এত প্রয়াসও পাইতে হইত না।

তাহা না করিবার অর্থ কি? অর্থ গুরুতর। অজ্ঞ মূঢ় জনে তাহা বুঝিবে না। কিন্তু আমরা ত তাহা বেশ বুঝি। অর্থ—দুর্ব্বলতা, বা শক্তিহীনতা, অসম্ভবনীয় মূর্খতা, অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্তি, বিশ্বাসঘাতকতা, নীচ স্বার্থপরতা, মতিবিভ্রম ইত্যাদি সুতরাং উহা নিদ্রার ভাণ মাত্র, বস্তু ত নিদ্রা নহে; যে জাগিয়া ঘুমায়, তাহাকে জাগান কঠিন, যে বুঝিয়া অবুঝ সাজে তাহাকে বুঝানও কঠিন। বিশেষ ইহারা আদৌ বুঝিতেই চাহেন না। কেন বুঝিতে চাহিবেন? বুঝিতে চাহিলেই স্বার্থে আঘাত লাগে, আর স্বার্থ সাধন হয় না। যাহা স্বার্থের দারুণ বিঘ্নকারী তাহা আবার স্বেচ্ছায় কে করিয়া থাকে। কেহই নহে।

এখানে স্বার্থ কি। তাহার হানি হয় কিরূপে ইত্যাদির বিষয় বুঝাইয়া বলা আবশ্যক। সে অনেক কথা। তাহা অন্য সময় বুঝাইয়া বলিবার চেষ্টা করিব।

তবে মোটের উপর কথা এই যে তাঁহারা স্বার্থসাধনার্থই এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন। ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া দেশে একাকার করাই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্যেই ধর্ম্মের দোহাই দিয়া অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত ও জনসাধারণকে ও সেই দিকে লইয়া যাইবার জন্য সচেষ্ট। কাজে কাজেই অজ্ঞের মনে বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য মুখে বলিতেছেন, "আমাকে তর্কে হারাইতে পারিলেই আমি সব ত্যাগ করিব" ইত্যাদি। নিজের মনে ওদিকে ঠিক আছে তিনি ত হারিবেন না, যেহেতু হারিয়া যাওয়া তাঁহার কার্য্য নহে; সর্ব্বথা জিতিয়া যাওয়াই হইতেছে তাঁহার কার্য্য। কাজে কাজেই সেই ভাবেই ত কার্য্য করিতে হইবে। এবং করিয়া ও যাইতেছেন তাহাই।

একটী গল্প মনে পড়িল! আমার এক আত্মীয় কোন এক বড় জমিদারের ম্যানেজার ছিলেন। তাঁহার নিকট দুইটী সরকারী চাকর ছিল, একটী মুশলমান ও অপরটী হিন্দু। মুসলমানটী খুব বলবান্, হিন্দুটী অতি দুর্ব্বল। কোন কথা লইয়া উভয়ের মধ্যে খুব কলহ হয়। মুশলমানটী বলে "তুই ফের্ কথা বল্‌বি কি মার খাবি।" হিন্দু—"কি আমাকে মারবি! আয় ত?" বলিয়াই মালকোঁচা মারিল। মুসলমানটী তৎক্ষণাৎ যাইয়া দু'ঘা জুতা মারিল। হিন্দুটী মার খাইয়া আবার বলিল—"কি মারবি? আয় ত!" মুশলমানটী অমনি গিয়া জুতা মারিল। হিন্দুর মুখে পুনঃ পুনঃ ঐ বুলি ও পুনঃ পুনঃ মার খাওয়া চলিতে লাগিল। মুসলমানটী শেষে ইহাকে মারা বৃথা বলিয়া ত্যাগ করিল।

ইহাদের কথাও ঐ প্রকার। "বুঝাইয়া দিন, এখনই ত্যাগ করিতেছি"—

একথা ও ঠিক ঐ 'মারবি, আয় ত!" তাহাকে আর মারা যেমন নিষ্প্রয়োজন, তেমনি হাজার বুঝাইলে ও যিনি বলিবেন "বুঝাইয়া দিন", তাঁহাদের বুঝান ও নিষ্প্রয়োজন বা বিড়ম্বনা।

সুতরাং উহাদিগকে বুঝান দুঃসাধ্য এবং বুঝাইতে যাওয়া ও নির্ব্বুদ্ধিত। আমাদের এখন কর্ত্তব্য আমাদিগকেই অর্থাৎ যাঁহারা স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠ তাঁহাদিগকেই বুঝান কর্ত্তব্য। তাঁহাদের বুদ্ধি যাহাতে বিকারগ্রস্ত না হয়, তাঁহারা যাহাতে প্রকৃতিস্থ থাকেন তাহাই করা এখন সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

তাহা করিতে হইলে কালা পাহাড়ী দলকে একদম সমাজ হইতে কাটিয়া ছাঁটিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। সমাজের বুকের উপর বসিয়া খাইবে আবার সমাজের বুকেই ছুরি মারিবে। ইহা সঙ্গত নহে। শত্রু প্রকাশ্যই শত্রু হওয়াই শ্রেয়ঃ, মিত্র বেশে প্রচ্ছন্ন শত্রু থাকা ভাল নহে। উহাতে এক সময় জীবননাশের সম্ভাবনা। এখন প্রায় সেই জীবন নাশের কালই উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং আর উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে।

এক আপত্তি—কাটিলে ছাঁটিলে সংখ্যা কমিয়া যাইবে। তাহাও ত শ্রেয়ঃ বলিয়াই মনে হয়। কেন না যাহা থাকিবে তাহা খাঁটি। বহু পরিমাণ ভেজাল জিনিষ অপেক্ষা, অল্প পরিমাণ খাঁটি জিনিষ ভাল। খাঁটি জিনিষ অল্প হইলেও অধিকতর সুফল ও স্বাস্থ্যপ্রদ। সুতরাং সংখ্যা হ্রাস হেতু ক্ষতির সম্ভাবনা খুব বেশি নহে। কতকগুলি দুষ্ট এঁড়ে দিয়া গোয়াল ঘর পরিপূর্ণ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য নহে। উহা অপেক্ষা খালি গোয়াল শতগুণে ভাল। ইহা পণ্ডিতগণেরই সিদ্ধান্ত।

পণ্ডিত পুঙ্গবের কোন্ কথা বাদ দিয়া কোন্ কথার আলোচনা করিব। তাঁহার সকল কথাই প্রতিবাদের যোগ্য সকল কথাই প্রতিবাদের অযোগ্য। অশাস্ত্রীয় কথা বলিয়াই প্রতিবাদের যোগ্য। আবার আশাস্ত্রীয় লোক অর্থাৎ শাস্ত্র মনেন না জন্যই প্রতিবাদের অযোগ্য। কারণ শাস্ত্র যে মানে না সে নাস্তিক। নাস্তিকের সহিত কোন আস্তিকের শাস্ত্রীয় আলাপ নিষেধ। সুতরাং উহার কোন কথাই প্রতিবাদের যোগ্য নহে। তবে দুটী একটী যাহা বলিতে প্রবৃত্তি হয় তাহা শুধু গায়ের জ্বালায়।

তাঁহার নাস্তিকতার পরিমানটা বুঝুন। লোক যাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পায় না তাহা বরং অবিশ্বাস করিতে পারে; কিন্তু যাহা প্রত্যক্ষ দেখা যায় ও ফল ও উপলব্ধি করা যায়, তাহা ও কি অবিশ্বাস করিতে হইবে? পণ্ডিত পুঙ্গবের তাহা ও অবিশ্বাস করিবার কত বড় দুঃসাহস একবার দেখুন।

আমাদের গ্রামের একটী গ্রাজুয়েট যুবকের মুখে শুনা; সে "বেতা" কোন কার্য্যোপলক্ষে গিয়াছিল। এবং তত্রস্থ স্বদেশী দোকানে পণ্ডিত প্রবরকে দেখিয়া কৌতুহল বশতঃ তথায় গিয়া একটু বসিয়াছিল; তথায় স্থানীয়, হাইস্কুলের হেডমাষ্টার মহাশয়ও ছিলেন আরও কেহ কেহ ছিলেন।

কথা প্রসঙ্গে পণ্ডিত মহাশয় বলেন—"এই যে বৃহস্পতির শেষে যাইতে নাই, শনির শেষে যাইতে নাই—ইত্যাদির কথা পঞ্জিকায় আছে, উহা পণ্ডিতদিগের কর্ম্ম নাশা বাচ্‌লামি এ আর কিছুই নহে" ইত্যাদি। উপস্থিত সকলেই পণ্ডিত প্রবরের মন্তব্য শুনিয়া অবাক্।

আমাদের গ্রামের সেই যুবকটীর উহার উত্তর দিবার জন্য খুব ইচ্ছাও জন্মিয়াছিল বটে কিন্তু সে তথাপি তাহা কোনই উত্তর দেয় নাই। দেওয়া তাহার খুবই উচিত ছিল, কিন্তু তথাপি দেয় নাই। সকলেই নীরব তাই সেও নীরবই ছিল।

যাহা হউক কুসংসর্গে পণ্ডিত প্রবরের এতদূর উন্নতি হইয়াছে যে তিনি গ্রহের প্রভাব ও মানিতে চাহেন না। কোন কোন গ্রহ প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে এবং তাহার ক্রিয়া ও কিছু কিছু প্রত্যক্ষ দৃষ্টি গোচর হইতেছে। তথাপি তিনি গ্রহের প্রভাব মানিতে অনিচ্ছুক এবং উহা পণ্ডিতগণের বাচ্‌লামি বলিতেও কুণ্ঠিত নহে। কি ধৃষ্টতা। এতবড় ধৃষ্টতা কখনও দেখি নাই।

যাহার বড় প্রত্যক্ষ শাস্ত্র আর নাই এবং পৃথিবীর যাবতীয় বড় বড় পণ্ডিতগণ যাহার আলোচনায় ও গভীর গবেষণায় অক্লান্তভাবে নিযুক্ত, তাহাই তাঁহার নিকট মিথ্যা। তাঁহার ধারণার অতীত বিষয় হইলেই তাহা মিথ্যা। মন্দ নহে। পাগল আর কাহাকে বলে?

ভাল, পণ্ডিত মহাশয়কে একটী কথা জিজ্ঞাসা করা যাক্। মনে করুন নদীর ঘাটে আপনার নৌকা প্রস্তুত, আপনি পারে যাইবেন। এমন সময় আকাশে একখানি মেঘের উদয় হইল। আপনি কি করিবেন? তরী ভাসাইবেন কি তীরে বাঁধিয়া রাখিবেন মেঘের অপেক্ষায়? বোধ হয় কিছুতেই তরী ভাসাইবেন না। অথবা আপনি যেরূপ পণ্ডিত ও নাস্তিক তাহাতে তরী ভাসাইতেও পারেন, যে হেতু আপনি মহাকর্ম্মী লোক। মেঘ কর্ম্ম নাশা। অতএব কর্ম্ম নাশাকে কর্ম্মী কখনও মানিতে পারে না সুতরাং আপনি তরী ভাসাইতে পারেন। কিন্তু আপনি ভাসাইতে চাহিলেও ঐ নিরক্ষর মূর্খ মাঝিরা কিছুতেই ভাসাইবেনা ইহা একেবারে ধ্রুব সত্য। অতএব মেঘ আপনার কর্ম্মনাশা হইলেও মেঘকে আপনার সসম্মানে মান্য করিতেই হইবে।

গ্রহের প্রভাবও জীবের উপর ঐরূপ মেঘের মত। যখন যে সময়ে তাঁহারা জীবের বিরুদ্ধ ভাবে অবস্থিত থাকেন, তখন তাঁহারাও ঐরূপ মেঘের মত ফল দান করেন। মেঘ মাত্রই যেমন বিপদজনক হয় না, গ্রহের ফলও স্থল বিশেষে মারাত্মক হয় না। সম্ভাবনা অবশ্য সকল স্থানেই থাকে এবং সেই জন্যই সতর্কতারও প্রয়োজন হয়।

উহা হইল এক ভাবের উত্তর। অন্য ভাবেও একটু বলা আবশ্যক। আপনি ত গ্রহের প্রভাব মানেন না। বেশ! ভাল, বলুন দেখি—দিনের বেলা যেখান দিয়া যাইতে আপনি এতটুকুও দ্বিধা বোধ করেন না, রাত্রিতে অন্ধকারে সেই স্থান দিয়া যাইতে আপনি সাহসী হন না কেন? হৃদয় কাঁপে কেন? ইহার কারণ কি?

তারপর, রাত্রিতে অন্ধকারে যাইতে ভয় হয়, কিন্তু একটী আলো থাকিলে তত ভয় হয় না ; ইহারই বা কারণ কি ?

আবার একাকী কোন স্থানে যাইতে ভয় হইলেও আর একটি লোক যদি সঙ্গে থাকে তাহা হইলে দুজনায় একত্র বেশ যাওয়া যায়, কোন ভয় হয় না। ইহারই বা কারণ কি ? পণ্ডিত মহাশয় বলিতে পারেন কি ?

ইহা সমস্তই ঐ গ্রহ এবং গ্রহের অনুকল্পের ফল। প্রথমটিত সম্পূর্ণ সূর্য্য গ্রহের ফল তাহা বোধ হয় অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেছেন। শেষের দুইটি গ্রহের অনুরূপ, আলো ও মানুষের ফল। ঠিক গ্রহ ও গ্রহের অনুকল্প বলাও ঠিক নহে। আত্মশক্তির ফল বলা যাইতে পারে।

আমরা ভীত হই ইহার অর্থ কি ? আমাদের এই দেহই কি ভীত হয় ? না তাহা নহে। আমাদের অন্তরস্থ জীবাত্মা ভীত হয়, তাই আমরা ভীত হই। জীবাত্মার সহিতই সব সম্বন্ধ। সে মহান্ তত্ত্ব কথা বলিবার এ স্থান নহে। ফল কথা জীবাত্মার ভীতি ও নির্ভীকতাই আমাদের ভয় ও নির্ভয়ের কারণ। ইহা সত্য কথা।

জীবাত্মার স্বরূপ কি ? জীবাত্মা জ্যোতি রূপে অবস্থিত। সুতরাং সমস্ত জ্যোতিষ্ক পদার্থের সহিতই তাহার একটা মিল আছে। অন্য যে কোন জ্যোতিষ্ক পদার্থই আত্মার কিছু না কিছু বল বিধান করে। সূর্য্য প্রকাণ্ড জ্যোতিষ্ক পদার্থ। উহা দ্বারা আমাদের হৃদয়স্থ আত্মা বহুগুণ বল লাভ করে। এবং তজ্জন্য দিবাভাগে কোন স্থান দিয়া যাইতে ভয় হয় না।

লণ্ঠনের আলোও জ্যোতিঃ বিশেষ। তাই উহা দ্বারাও আমার দেহস্থিত আত্মা কিঞ্চিৎ বল পায় বলিয়া অন্ধকারে যাইতে ভয় হইলেও, লণ্ঠনের সাহায্যে যাওয়া যায়, ভয় হয় না।

তারপর মনুষ্য সম্বন্ধে। মনুষ্যের ভিতর ত স্বয়ং আত্মাই বর্ত্তমান আছেন। আমার নিজের আত্মা একাকী ভীত হইলেও, অপরের আত্মা আসিয়া যখন আমার আত্মার সহিত মিলিত হয়, তখন আমার আত্মা বলবান হয় ; কাজে কাজেই একাকী যাইতে ভয় পাইলেও দুই জন একত্রে মিলিয়া যাইতে ভয় হয় না। এইরূপে লোক সংখ্যা যত বেশী হইবে, আত্ম শক্তিও ততগুণ বর্দ্ধিত হইবে ও ততগুণ অধিক সাহসের কার্য্যও করা যাইবে।

পণ্ডিত মহাশয় কি বলিতে চাহেন ? এ তত্ত্বগুলি মিথ্যা, না সত্য ? একটু শুনিতে ইচ্ছা করি।

এইরূপ অন্যান্য গ্রহ সম্বন্ধেও জানিবেন। তাঁহাদের সকলেরই প্রভাব আছে। তাঁহারা সকলেই গুরুতর প্রভাব সম্পন্ন। তবে তাঁহাদের প্রভাবের প্রভাব বুঝিবার শক্তি আমাদের নাই। আমরা তাঁহাদিগকে দেখিতেও পাই না, তাঁহাদের প্রভাবও বুঝি না সে শক্তি আমাদের নাই। তাঁহাদের প্রভাবেই বুঝা যায়, সে শক্তি আমরা হারাইয়াছি। তপস্যা

বিহীন হইয়া হারা হইয়াছি। আবার তপস্যা করিলে সে শক্তি পুনরায় জাগ্রত হইতে পারে। আবার তপস্যা দ্বারা সে দিব্য চক্ষু ও দিব্য জ্ঞান লাভ হইতে পারে। কিন্তু আমাদের দারুণ দুর্ভাগ্য যে আমরা একবারেই তপস্যা বিমুখ হইয়াছি। কাহারই আর তপস্যায় প্রবৃত্তি নাই। এতদূর অধঃপতিত হইয়াছি।

তথাপি একটু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে আমরা এখনও বিশ্বাস হারা হই নাই। আমরা দেখি বা না দেখি, বুঝি বা না বুঝি, তথাপি বিশ্বাস করি, গ্রহ আছে, এবং গ্রহের প্রভাবও আছে। আর একবারেই তপস্যা বিহীন সকলেই হইয়াছে তাহাও নহে। কেহ কেহ নিভৃতে, নির্জ্জন কোনে বসিয়া এখনও তপস্যায় নিরত আছেন এবং তাঁহাদের দিব্য চক্ষে ও দিব্য জ্ঞানে সব দেখিতেছেন। আবার তাঁহাদের মুখ নিঃসৃত সত্য বাক্যে অপরের বিশ্বাস দৃঢ় হইতেছে। ক্রমশঃ

হিন্দুসমাজ ও রাষ্ট্র

(মুসলমান শাসনকালের অবস্থা)

রাষ্ট্রোৎপত্তির কাল হইতে বৈদেশিক বিধর্ম্মীর শাসনকালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমাজ ও রাষ্ট্র কি ভাবে পরস্পরের সহযোগিতায় পরিচালিত হইয়াছে এবং তাহার ফল কি হইয়াছে তাহা পূর্ব্ব প্রবন্ধে সংক্ষেপে বলিয়াছি। ঐ সময় পর্য্যন্তের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, নানাপ্রকার বিপ্লব বিপর্য্যাসের ফলে ও কালপ্রভাবে হিন্দুর সমাজ ও রাষ্ট্র অবনত হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু মূল প্রকৃতির বিপ্লব বিপর্য্যয় ঘটে নাই। হিন্দুর প্রাচীন উজ্জ্বল আদর্শের দিকে লক্ষ্য করিলে তদানীন্তন সমাজের ও রাষ্ট্রের অবনতি বুঝিতে পারা যাইত সন্দেহ নাই কিন্তু তৎকালে পৃথিবীতে এমন কোন মানব সমাজ ছিল না যাহার দিকে লক্ষ্য করিলে, হিন্দুর সমাজ ও রাষ্ট্রকে অবনত বলিতে পারা যাইত। হিন্দুর জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য, সত্য, সংযম, ভক্তি, প্রীতি প্রভৃতি জগতে তখনও অতুলনীয় ছিল। হিন্দুর সমাজশক্তি যেভাবে হিন্দুর পারিবারিক শান্তি রক্ষা করিয়াছে ও সমাজকে পাপ ও দুর্নীতি হইতে মুক্ত রাখিয়াছে, জগতের কোন রাষ্ট্রশক্তি আজও তাহা কোন দেশে পারে নাই।

মুসলমান রাষ্ট্রব্যক্তির নিকট যখন হিন্দুর রাষ্ট্রশক্তি পরাভূত হইল, তখন হিন্দুসমাজে যে ভয়াবহ বিপৎপাত হইয়াছিল তাহা চিন্তা করিলেও হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে। মুসলমান রাষ্ট্রশক্তি তৎকালে ভারতের ধন ঐশ্বর্য্য অধিকৃত করিয়াই নিরস্ত হয় নাই। হিন্দুর সমাজ ও সমাজের মূলীভূত বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে বিধ্বস্ত করিতে ও প্রবলবল প্রয়োগ করিয়াছিল।

আজ হিন্দুজাতির যে অবস্থা ও যেমন শিক্ষা দীক্ষা, তাহাতে সে বিপদের সম্যক অনুভূতি অসম্ভব। বিকৃত ইতিহাস, বিক্ষিপ্ত হিন্দুকে এত উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছে যে, হিন্দু নিজের প্রকৃত স্বরূপ বিস্মৃত হইয়াছে পরন্তু একটা অসম্ভব হীনতাময় আত্মরূপে আস্থা স্থাপন করিয়াছে। ঐতিহাসিক তত্ত্ব পরিস্ফুট করা সংক্ষেপে সম্ভব নহে, আমি শুধু হিন্দুর সর্ব্বোচ্চ স্বরূপ উপলব্ধি শক্তি যে তৎকালেও বিনষ্ট হয় নাই তাহা সংক্ষেপে বলিব, তাহা হইলেই বুঝিতে পারা যাইবে মুসলমান আক্রমণকালে হিন্দুসমাজ আকস্মিক বিপদকে কত ভয়াবহরূপে অনুভব করিয়াছিল।

হিন্দু জানিত—ধর্ম্ম বলিলে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকেই বুঝায়, ধর্ম্মাধিকারে বঞ্চিত হইলেই মানুষ ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হয়, ম্লেচ্ছভাবপ্রাপ্ত মানব ধর্ম্মের বিরোধী হইয়া থাকে, বর্ণাশ্রমীগণের পক্ষে ম্লেচ্ছাদির সংস্পর্শ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে। শাস্ত্রানুগত এই প্রকার দৃঢ় ধারণা যখন হিন্দুসমাজের প্রতি ব্যক্তির অন্তরে বদ্ধ মূল, যখন হিন্দু বিশ্বাস করে—শকজবনাদি পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিল স্বধর্ম্ম বিচ্যুত হওয়ায় ক্রমে ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, এইজন্য ভারতীয় হিন্দুগণ তাহাদের পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে, ও তাহাদের সংস্পর্শ মুক্ত থাকিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করিতে প্রাণপাত চেষ্টা করিয়া আসিতেছে, পক্ষান্তরে শক জবনাদি জাতি, বর্ণাশ্রমীগণ শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষার জন্য যাহা করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহা বিদ্বেষপ্রসূত ও অবমাননাজনক মনে করিয়া প্রতিশোধ কামনায় নিরন্তর ভারতে আপতিত হইতেছে ও ভারতকে পুনঃ পুনঃ লুণ্ঠিত বিধ্বস্ত করিতেছে, তথাপি ভারতবাসী বর্ণাশ্রমীগণ ধর্ম্ম বিচ্যুত হয় নাই, ম্লেচ্ছ সংস্পর্শ করে নাই। হিন্দুসমাজের যখন এইপ্রকার স্বরূপ উপলব্ধির শক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে তখন প্রবল পরাক্রমশালী মুসলমানগণ ভারতের রাষ্ট্রশক্তি করতলগত করিল। কি সর্ব্বনাশ! হিন্দুর সর্ব্বস্ব বুঝি বিধ্বংস্ত হইয়া যায়। ধন ঐশ্বর্য্য যায়, প্রভাব প্রতিপত্তি যায়, স্বাধীনতার গৌরব বিনষ্ট হয়; এসকল ভাবনা হিন্দুর জাতীয় ভাবনা নহে, এসকল ভাবনা হিন্দু সমাজের উচ্চ নীচ ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মুর্খ সকলের অন্তরে তুল্যরূপে জাগে না। হিন্দুসমাজের প্রতি ব্যক্তির অন্তরে জাগিয়া উঠে ধর্ম্মের ভাবনা। ধর্ম্মের জন্য হিন্দু অনেক সহিয়াছে, আজ যাহারা শত্রু হইয়াছে একদিন হয়ত তাহারাই হিন্দুর মিত্র ছিল, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ধর্ম্মরক্ষার জন্য যে ক্ষত্রিয়কুল পবিত্র করিয়াছিলেন তাহারাও হয়ত একদিন সেই ক্ষত্রিয়কুলেরই সুসন্তান ছিল, তাহারাই হয়ত ভগবানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম্মরক্ষার জন্য প্রাণপাত করিয়া দেবলোকের স্পৃহনীয় অতিথি হইবার জন্য অহমহমিকায় রণক্ষেত্রে ঝাপাইয়া পড়িত, অর্থকামের লালসায় ভুজবীর্য্য প্রদর্শনের ব্যগ্রতায় কর্ম্মভূমি ভারত পরিত্যাগ করিয়া ম্লেচ্ছদেশবিজয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, ক্রমে ক্রিয়ালোপ হইল, ব্রাহ্মণগণ ম্লেচ্ছদেশে যাইলেন না, তাহারা ধর্ম্মবিচ্যুত হইল, ক্রমে সদাচার ভুলিল, খাদ্যাখাদ্য বিচার ছাড়িল, পরলোক দৃষ্টি বিনষ্ট হইয়া গেল। বাড়িতে লাগিল ধনের আকাঙ্ক্ষা ও ঐশ্বর্য্যের লালসা। এঅবস্থায় যাহা হয় ইহাদেরও

তাহাই হইল, বুদ্ধি প্রতিভা ভোগসাধনঅন্বেষণে ব্যগ্র হইয়া উঠিল, ক্রমে ইহরা দুর্জ্জয় ম্লেচ্ছজাতিতে পরিণত হইল। হিন্দু কি করিবে? গত্যন্তর নাই, স্বজন পরিত্যাগে বাধ্য হইল, তাহাদের সংস্পর্শ মুক্ত থাকিতে চেষ্টা করিল, স্বজন বৈরী হইল; মিত্র শত্রু হইল, প্রবল বিরোধের বহ্নি কুণ্ডে হিন্দু আত্মাহুতি দিল। এই প্রাচীন যথার্থ অনুভবমূলক স্মৃতি তখন ও হিন্দুর অন্তর হইতে অপসৃত হয় নাই—যখন মুসলমান হিন্দুর রাষ্ট্রশক্তি হস্তগত করিয়াছিল। হিন্দু তখন কি করিবে? যে ধর্ম্মের জন্য হিন্দু এত করিয়াছে, এত সহিয়াছে, আজ রাষ্ট্রশক্তি হিন্দুর হস্তচ্যুত হইল বলিয়া কি হিন্দু সেই অমূল্যনিধি ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিবে? যদি তাহাই দিতে হয় তাহা হইলে বাচিয়া ফল কি? নরক ভোগ? তদপেক্ষা ধর্ম্মের হস্তাবলম্বন করিয়া নশ্বরদেহের মায়া ছাড়িয়া অমরতা লাভ কি সহস্রগুণে শ্রেয় নহে?

তখনও হিন্দুর বুদ্ধি বিপর্য্যয় হয় নাই—ইন্দ্রিয়বৈকল্য ঘটে নাই; তাই হিন্দু পিতৃপুরুষের পদাঙ্ক দেখিয়া লইতে পারিয়াছিল, প্রত্যেক হিন্দুর শ্রুতিবিবরে শ্রুতিস্মৃতির বাণী ধ্বনিত হইয়াছিল, হিন্দু বুঝিয়াছিল তাহাই শ্রেয়ঃ।

হিন্দু তাহার সমাজ শক্তিকে তেজস্বিনী করিয়া তুলিল; ধর্ম্ম রক্ষার জন্য হিন্দু সঙ্ঘবদ্ধ হইল! সভা নাই, বক্তৃতা নাই, প্রচার নাই, প্ররোচনা অনুপ্রেরণা নাই, স্বভাব বশে—ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে—উচ্চ নীচ ধনী দরিদ্র পণ্ডিত মূর্খ নির্ব্বিশেষে; প্রত্যেক হিন্দু দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইল—ধর্ম্ম রক্ষা করিব, ধর্ম্মের জন্য জীবন দান করিব, ধর্ম্ম পরিত্যাগ কিছুতেই করিব না, ম্লেচ্ছের সংস্পর্শে কিছুতেই যাইব না। এ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হিন্দু রক্ষা করিয়াছিল, হিন্দু সমাজ-শক্তির বলে প্রবল রাষ্ট্র শক্তিকে পরাভূত করিয়া ছিল, রাষ্ট্র শক্তি হিন্দুর সমাজ শক্তির অনুবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

যতকাল মুসলমান রাষ্ট্রশক্তি হিন্দুর সমাজ শক্তির আনুগত্য স্বীকার করে নাই ততকাল হিন্দু জাতি মুসলমান রাষ্ট্রশক্তির অনুবর্ত্তন করিতে সম্মত হয় নাই, পরন্তু সমাজশক্তির সাহায্যে হিন্দু তাহার ধর্ম্ম কর্ম্ম ও পারিবারিক শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়াছে, রাষ্ট্র শক্তির বল প্রয়োগের গতি রোধ অনেক ক্ষেত্রে করিতে পারে নাই বটে কিন্তু বল প্রয়োগে ভীত হইয়া সমাজশক্তি রাষ্ট্র শক্তির নিকট আত্মসমর্পণও করে নাই। সম্রাট আকবর ভারতে প্রকৃত রাষ্ট্রশক্তি, প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার হেতু মুসলমান রাষ্ট্র শক্তিকে তিনি হিন্দুর সমাজ শক্তির অনুগামিনী করিতে সম্মত হইয়াছিলেন, অর্থাৎ সম্রাট আকবর বুঝিয়াছিলেন, হিন্দুর সমাজশক্তি অজেয়, ইহাকে জয় করিয়া রাষ্ট্রশক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভব, ভারতে রাষ্ট্রশক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে তাহাকে হিন্দুর সমাজশক্তির অনুগামিনী করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। তাই সম্রাট্ আকবর মুসলমান রাষ্ট্রশক্তিকে স্বেচ্ছায় হিন্দুর সমাজশক্তির অনুগামিনী করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রশক্তিকে হিন্দুর সমাজশক্তির অনুগামিনী করায় যে শুধু আত্মাভিমান ব্যাহত লইয়া ছিল তাহা

নহে, মুসলমানের ধর্ম্ম কর্ম্মগত বিশিষ্টতার ও অনেকাংশ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। যে উন্মাদনা লইয়া মামুদ সোমনাথের মন্দির বিধ্বস্ত করিয়াছিল তৎকালে সে উন্মাদনার লেশও ছিল না, পরন্তু তাহার বিপরীত ভাব সম্রাটের অন্তরে বাহিরে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সম্রাট্ আকবর দেবিগ্রহের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন ও তাঁহার অন্তঃপুরে দেবিপ্রহের পূজা হইত।

প্রবাদ আছে—সম্রাট্ আকবর পণ্ডিতসভা আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন প্রায়শ্চিত্ত করিয়া হিন্দু হইতে পারেন কিনা পণ্ডিতরা ব্যবস্থা দেন নাই তাই হিন্দু হইতে পারেন নাই। অন্য দিকে দেখিতে পাওয়া যায় মুসলমান রাষ্ট্র শক্তির বিরোধিনী বলিয়া হিন্দু তাহার ধর্ম্ম কর্ম্মের বিশিষ্টতা কোন দিন পরিত্যাগ করে নাই, রাজা টোডরমল্ল ও মহারাজ মান সিংহ সম্রাটের অধীন কর্ম্মচারী ছিলেন, সম্রাটের অনেক প্রিয়কার্য্য করিয়া তাঁহারা বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন কিন্তু মুসলমানরাষ্ট্রশক্তির অপ্রিয় হইলেও তাঁহারা স্বীয় ধর্ম্ম কর্ম্মের বিশিষ্টতা পরিত্যাগ করেন নাই। রাজা টোডরমল্ল সম্রাটের সহিত পরিভ্রমণকালে শালগ্রামশিলা সঙ্গে লইতেন নারায়ণ পূজা না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। ইহা সকলেই বুঝিতে পারেন যে, শালগ্রাম শিলা যাহাতে মুসলমানের স্পর্শাদির দ্বারা দূষিত না হয়েন তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হইত এবং মুসলমান স্পৃষ্ট বস্ত্রাদি ধৌত করিয়া স্নান পূর্ব্বক টোডরমল্ল শালগ্রাম শিলার পূজা করিতেন, টোডরমল্লের এ সকল কার্য্যের বিরুদ্ধে সম্রাটের কিছু বলিতে সাহস হইত না।

মহারাজ মানসিংহ যে একজন দেব সেবক হিন্দু ছিলেন তাহা জয়পুর রাজ্যের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

জয়পুরে যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের দেব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, পূজক ব্রাহ্মণগণ এখন জয়পুরী হইয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা পূর্ব্বে বাঙ্গলী ব্রাহ্মণ ছিলেন, মানসিংহ যখন প্রতাপাদিত্যকে পরাভূত করিয়া তাঁহার রাজ্য ঐশ্বর্য্য সমস্ত বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন, হিন্দুকে অধিকার চ্যুত করিয়া যশোহরে যখন মুসলমান প্রভাব প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করিলেন, তখন অন্য কোন চিন্তা তাঁহার অন্তরকে চঞ্চল করিতে পারে নাই। হয়ত মানসিংহ ইহাতে বীরত্বের গৌরব অনুভবই করিয়াছিলেন তাঁহার বীরত্বের খ্যাতি বাড়িবে; মুসলমান সম্রাটের নিকট পুরস্কৃত হইবেন, ইত্যাদি আশায় তিনি উৎফুল্ল হইয়াছিলেন; কিন্তু একটি চিন্তা মানসিংহের উৎফুল্লতায় বাধা প্রদান করিয়াছিল—প্রতাপাদিত্যের দেববিগ্রহের কি উপায় হইবে, কে দেব বিগ্রহের সেবা পূজার ব্যবস্থা করিবে, কে তাহার পবিত্রতা রক্ষার জন্য যত্ন করিবে, মুসলমানগণ তাহা বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিবে কিনা, ইত্যাদি চিন্তায় মানসিংহ বিব্রত হইয়া পড়িয়া ছিলেন। তিনি প্রতাপাদিত্যের কুলদেবতাকে প্রতাপাদিত্যের রাজধানীতে রাখা সমীচীন বুঝিলেন না, স্বীয় রাজধানীতে লইয়া গিয়া পুনঃ প্রতিষ্ঠা কর্ত্তব্য বুঝিলেন। বাঙ্গলার দেব বিগ্রহ বাঙ্গলী ব্রাহ্মণেরা চিরদিন

পূজা করিয়া আসিতেছেন এ পূজার বিধি ব্যবস্থা রীতি পদ্ধতি ইহাঁরা সম্যক্ পরিজ্ঞাত আছেন, জয়পুরের ব্রাহ্মণেরা হয় ত চিরন্তন পদ্ধতি অনুসারে এ দেববিগ্রহের সেবা পূজার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন না, ইহা চিন্তা করিয়া পূজক ব্রাহ্মণগণকেও সপরিবারে জয়পুরে লইয়া গিয়াছিলেন। সেই দেব বিগ্রহ, সেই যশোহরের পূজক ব্রাহ্মণগণের বংশধরগণ আজও জয়পুরে বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

মহারাজ মানসিংহের আন্তরভাব বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যায় রাষ্ট্রীয় ব্যবহারে মহারাজ মানসিংহ মুসলমানসম্রাটের আনুগত্য করিয়া ছিলেন কিন্তু ধর্ম্ম ও সমাজ বিষয়ে তিনি স্বাধীন ছিলেন। রাষ্ট্রীয়স্বাধীনতা অপেক্ষা এ স্বাধীনতার মূল্য কম নহে, যাঁহারা স্থির চিত্তে চিন্তা করিতে পারেন ও অভিনিবেশ পূর্ব্বক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারেন তাঁহারা বুঝিবেন—রাষ্ট্রীয়স্বাধীনতা অপেক্ষা এস্বাধীনতার মূল্য অনেক অধিক। এ স্বাধীনতা সম্রাট্‌কে পরাধীন করিয়াছিল, এপরাধীনতা আন্তর পরাধীনতা। সম্রাটের অন্তরেও, যে পরাধীনতা হীনতা জাগরিত করিয়া দেয় তাহার ফল অতি মারাত্মক হয়। এই প্রকারে যে জাতি পরাধীন হয় সে জাতি ক্রমে জ্ঞান বিজ্ঞানে ও আত্মসম্মান বোধে হীন হইয়া পড়ে; সে জাতির পুনঃ অভ্যুত্থানের পথ অবরুদ্ধ প্রায় হইয়া যায়; পক্ষান্তরে যে জাতি রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার কালেও ঐ প্রকার আন্তরভাবে স্বাধীন থাকে তাহার বুদ্ধি প্রতিভা অধিক মলিন হয় না, আত্মসম্মানজ্ঞান জাগরূক থাকে, রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা মুক্ত হইলেই সে মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, ভারতে হিন্দু মুসলমানের অবস্থা বিচার করিলেও ইহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। তবে ইহা সত্য যে, অপরাজেয় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে এবং রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা বহুকাল স্থায়ী হইলে ধর্ম্ম সমাজ গত স্বাধীনতা কোন জাতি রক্ষা করিতে পারে না, এই জন্য হিন্দু জাতি ভিন্ন জগতের অন্য কোনজাতির মধ্যে এমন অবস্থা ঘটিতে পারে নাই। ইতিহাস ও তাহাই প্রমাণ করে। জগতের অনেক বিজিতজাতি বিজেতৃজাতির সাম্য প্রাপ্ত হইয়াছে একমাত্র হিন্দু জাতি বিজিত হইয়াও বিজেতৃ জাতিকে নিজের ধর্ম্ম সমাজের বশীভূত করিয়া লইয়াছে।

আমার মনে হয় সম্রাট্ আওরঙ্গজেব এই বিষয়টি বেশ অনুধাবন করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন—মুসলমান নিজের যে বিশিষ্টতা ভারতে প্রতিষ্ঠিত করিবে বলিয়া গর্ব্ব ও ঔদ্ধত্য লইয়া ভারতে আপতিত হইয়া ছিল, সে বিশিষ্টতা ভারতে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই পরন্তু নিজের বিশিষ্টতা হারাইয়া হীনতা বরণ করিয়া লইয়াছে, তাই তিনি একবার মুসলমানের নষ্ট বিশিষ্টতার পুনরুদ্ধারে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তৎকালে হিন্দু রাজন্যের মধ্যে এমন কেহ ছিলেন না যিনি সম্রাট্ আওরেঙ্গজেবের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইতে পারেন; অর্থাৎ নির্ব্বিবাদে সমগ্র হিন্দুস্থান মুসলমানের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে, ইহা তাহার পূর্ব্বে হয় নাই। আওরেঙ্গজেব দেখিলেন ইহাই সুসময়, হিন্দুরাজন্যগণ প্রভাবহীন, তিনি অসাধারণ প্রভাব সম্পন্ন ও রাজনীতি কুশল, এই সময়ে মুসলমানের লুপ্ত বিশিষ্টতা জাগরিত

করিয়া তোলা কর্ত্তব্য তাই তিনি হিন্দুর ধর্ম্মগত স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন ইহার ফল যাহা হইয়াছিল তাহা মুসলমানগণ আজও ভোগ করিতেছেন। হিন্দুর অনাদি-কালের এই অপরাজেয় শক্তিকে বৃটিশ জাতি রাজনীতি কুশলতায় জয় করিতে চেষ্টা করিতেছে তাহারই ফল আমাদের আত্মবিরোধ ও অশেষ প্রকার দুর্গতি। বৃটিশ সাম্রাজ্য কালের অবস্থা পরে সবিস্তার বলিব।

শ্রীহট্ট বৈদিক সমিতির সভাপতি

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম, বি-এল, মহাশয়ের

অভিভাষণ।

হে! দেবরত ব্রাহ্মণ বৃন্দ। বর্ত্তমানে কলির প্রভাবে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে। ম্লেচ্ছ জাতির শাসন প্রভাবে যথার্থ ব্রাহ্মণাচার নীতি রক্ষার পথে বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে। ম্লেচ্ছাচার পরায়ণ দুর্ব্বৃত্তগণের প্রভাবে ব্রাহ্মণের দেহরক্ষা দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে। এতাদৃশ দুর্দ্দিনে আপনারা আমাকে সভাপতিত্বে বরণ করায়, তন্নিহিত সম্মান ও আনন্দ বিষয়ে চিন্তা করিবার অবসর আমার নাই। আপনাদের ঐকান্তিক স্নেহ ও আশীর্ব্বাদের নিদর্শন স্বরূপ এই পদ যখন আমাকে প্রদান করিয়াছেন, তখন আমার একমাত্র চিন্তার বিষয় হইতেছে, "কি ভাবে কার্য্য করিলে ঈদৃশ পদের মর্য্যাদা রক্ষা করা যায় ও আপনাদের প্রকৃত হিত সাধন করা যায়। একান্ত কৃষ্ণভক্ত যেমন চিন্তামণির চিন্তা চাড়া অন্যচিন্তা করেন না, সেইরূপ আমার পক্ষে ও আপনাদের হিত চিন্তাই কেবল হওয়া উচিত। আশা করি, আপনাদের যে আশীর্ব্বাদ আমাকে সভাপতিত্বে অধিষ্ঠিত করিয়াছে, সেই নির্ম্মল আশীর্ব্বাদেই আমার কর্ত্তব্য সাধনে সফলতা প্রদান করিবে।

ব্রাহ্মণ জাতির যে বিপুল অতীত গৌরব বর্ত্তমান আছে, অনেক ব্রাহ্মণ কেবল তাহার উপর নির্ভর করতঃ নিজেরা জড়ভাব ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহারা শাস্ত্রানুশীলন করেন না, অথচ শাস্ত্রবিৎ বলিয়া পরিচিত হইতে চান। তাঁহারা ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন না কিন্তু ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইতে চান। তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানোপার্জ্জনের চেষ্টা করেন না অথচ ব্রহ্মতত্ত্ববিৎ বলিয়া খ্যাত হইতে চান। এই বুদ্ধি নিতান্ত ভ্রান্তির পরিণাম মাত্র। অতীত স্মৃতির কার্য্য বর্ত্তমান জগৎকে উৎসাহ ও প্রাণদান করা; জড়ত্ব উৎপাদন করা নয়। আজ কোন ব্রাহ্মণ সন্তান যদি "আমি মহর্ষির বংশধর" এই স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া

তপোনুষ্ঠানে ব্রতী হন, তিনি নিশ্চয়ই সেই স্মৃতির প্রভাবে তপস্যায় দ্বিগুণ বল ও উৎসাহ প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু যদি কেহ মনে করেন, "আমি মহর্ষির সন্তান। বিনা তপস্যায় গৃহে বসিয়া তপস্যার ফল লাভ করিব" তিনি সেই অতীত স্মৃতির যথার্থ ব্যবহার জানেন না। যে স্থানে যে অতীত স্মৃতি আছে, সেই স্থানবর্ত্তী ব্যক্তিরা যদি সেই স্মৃত্যনুযায়ী কার্য্য করেন তাহা হইলেই যথার্থ ফলোদয় হয়, অন্যথা হয় না। অতীত স্মৃতি বর্ত্তমান স্থলাভিষিক্তগণকে স্মৃত্যনুসারী কার্য্য করিবার একমাত্র অধিকারী করে বটে, কিন্তু প্রকৃতি বলে, কার্য্য ছাড়া ফলপ্রদান করিবার শক্তি অতীত স্মৃতির নাই।

হে ঋষিতনয়গণ! যাগ যজ্ঞ, জপ তপ দ্বারা আত্মোদ্ধার ও জগতের উদ্ধার সাধন বিষয়ে অতীত স্মৃতি প্রভাবে আপনারা একমাত্র অধিকারী। আপনারা বর্ত্তমান জড়তা পরিহার পূর্ব্বক আবার যথোপযুক্ত ব্রহ্মানুশীলন ও ধর্ম্মানুষ্ঠান করুণ। আত্মার মুক্তি সাধন করুন। জগতের মুক্তিসাধন করুন। ভারতের মুক্তিসাধন করুন। আপনাদের উদ্যমছাড়া ভারতের মুক্তি চিন্তা স্বপ্নমাত্র।

ব্রাহ্মণ সমাজে অনেকের হয়ত এই ধারণা আছে যে পূর্ব্বপুরুষের সাধন শক্তি ও গৌরবের প্রভাবে তাঁহারা চিরকালই মানবের কাছে সম্মানিত ও গৌরবান্বিত থাকিবেন। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অনেকে হয়ত মানবের কাছে সম্মানের দাবিও করিয়া থাকেন। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। মানব কেবল শক্তির নিকটেই মাথা নত করিয়া থাকে, শক্তিহীনের নিকটে নয়। এক ব্যক্তি আর একব্যক্তিকে গুরু বলিয়া প্রণাম করেন কেন? যখন প্রথমোক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির সবিশেষ গুণের পরিচয় পান, কেবল তখনই তিনি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে গুরু বলিয়া স্বীকার করেন ও তাঁহাকে নমস্কার করেন। আজ ব্রাহ্মণের গুরুতা ও পৌরহিত্য বিনাশ করিবার জন্য ম্লেচ্ছভাবাপন্ন কতিপয় লোক উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। হে মানব কুলতিলক! ব্রাহ্মণবৃন্দ! আজ যদি আপনাদের যথার্থ সাধন শক্তি ও তত্ত্বজ্ঞান থাকে, তবে এই সমস্ত ব্রাহ্মণদ্বেষি ব্যক্তিগণকে আপনারা মুহূর্ত্তে বিনাশ করিতে পারেন ও ব্রাহ্মণের শক্তির পরিচয় দিতে পারেন। সুতরাং সেই শক্তি উপার্জ্জন করিবার জন্য আপনারা যথোচিত সাধন ভজনের অনুষ্ঠান করুন ও ব্রাহ্মণের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখুন।

হিন্দু সমাজ বিদ্বেষী অনেক পাষণ্ড জাতিভেদ উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে বটে, কিন্তু আপনারা যদি যথার্থ ব্রাহ্মণের পবিত্রতা রক্ষা করিয়া চলেন, তবে এইরূপ চেষ্টায় আপনাদের কোন অনিষ্ট হইবে না। কারণ যদিও কতিপয় পাশ্চাত্যবিদ্যার উপাসক পাষণ্ড আপনাদের পবিত্রতার মূল্য বুঝিতে না পারে, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা কখনও আপনাদের পবিত্রতার উপরে হাত দিবেন না। আর প্রকৃত জ্ঞানীর সংখ্যা আজও ভারতবর্ষে অন্যদেশ অপেক্ষা বেশী। জ্ঞানী ব্যক্তিরা যদি দেখেন যে এইরূপ

কোন বস্তু তাহাদের সম্মুখে আছে, যাহা তাঁহাদের স্পর্শে অপবিত্র হইতে পারে, তাঁহারা কখনও সেই বস্তু স্পর্শ করেন না। অধিকন্তু অন্যলোক স্পর্শদ্বারা যাহাতে সেই বস্তুর পবিত্রতা নষ্ট করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে তাঁহারা যত্নশীল হন। সুতরাং আপনারা যদি প্রকৃত ব্রাহ্মণ সুলভ সদাচার ও পুণ্যনিষ্ঠা রক্ষা করিয়া চলেন, তাহা হইলে; আপনাদের পবিত্রতা নাশের কোন আশঙ্কা নাই। কেবল ভারতবর্ষ কেন, সমস্ত জগত আপনাদের পবিত্রতা রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। স্বয়ং ভগবান ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া আপনাদের পবিত্রতা রক্ষা করিবেন। ' চাতুর্ব্বর্ণ্যের" সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান, রক্ষার ভার ও তাঁহারই হাতে। 'চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম্মবিভাগশঃ" আপনারা কেবল স্বকীয় গুণ ও কর্ম্মদ্বারা ব্রাহ্মণের বর্ণশ্রেষ্ঠতা প্রতিপালন করুন। তাহা হইলেই আপনাদের পবিত্রতা রক্ষা হইবে।

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।"

তবে পবিত্রতারক্ষার জন্য আপনাদের অনেক অত্যাচার সহ্য করিতে হইবে। অনেক দুঃখ ভোগ করিতে হইবে; অনেক কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে। আপনাদের সম্মুখে কৃত্রিম সম্মানের প্রলোভন আসিবে, অর্থের প্রলোভন আসিবে রাজ্যপরিচালনে পদপ্রাপ্তির প্রলোভন আসিবে। আপনারা যদি যথার্থ ব্রাহ্মণের সন্তান হন, যদি একবিন্দু ও ব্রাহ্মণের রক্ত অপনাদের ধমনীতে প্রবাহিত থাকে, তবে এই সমস্ত প্রলোভনবশে আপনারা আত্মসমর্পণ করিবেন না। পার্থিব ঐশ্বর্য্য ও পদমর্য্যাদা ব্রাহ্মণের নিকট অতি তুচ্ছ জিনিষ। আর আপনাদের পবিত্রতা নষ্ট করিবার জন্য অনেক পশুবলের প্রয়োগ হয়ত আপনাদের উপর হইবে। তদ্বারা আপনাদের জীবন ধারণ বিষয়ে হয়তঃ কঠিন কায়ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে। হয়ত আপনাদেব ধর্ম্ম ও পবিত্রতা নষ্ট করিবার জন্য বিবিধ আইন প্রণয়ন করা হইবে। আমার এই আশঙ্কা ভিত্তিহীন নয়। বর্ত্তমানেই হিন্দুর সনাতন বিবাহ প্রথায় হস্তক্ষেপ করিবার জন্য কতিপয় ম্লেচ্ছভাবাপন্ন ব্যক্তি ভারতীয় আইন সভায় আইন প্রণয়ণ করিয়াছেন। এই সমস্তঅত্যাচার আপনারা গ্রাহ্য করিবেন না। ব্রাহ্মণের কাছে আত্মাই সর্ব্বস্ব। দেহ কিছুই নয়। সুতরাং কায়ক্লেশের ভয়ে স্বধর্ম্ম পরিহার করা আপনাদের শোভা পায় না। এই ভারতবর্ষে মহাশক্তির অবতার সতী রমণীরা কি ভাবে প্রাণবিসর্জ্জন দিয়াও সতীত্ব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, তাহা আপনাদের অবিদিত নয়। আপনারা ও নিজের পবিত্রতা রক্ষার জন্য সেই মহাশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করুণ। মহাশক্তির পুণ্যপ্রভায় আপনাদের অন্তরের অন্ধকার দূরীভূত করুন। প্রাণপাত করিয়া ও স্বধর্ম্ম রক্ষা করুন।

হে পুণ্যময় ভূদেববৃন্দ। আপনাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহ জগতে আপনাদের আবির্ভাব মানবের উদ্ধারের জন্য আপনারা জগৎকে ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া তত্ত্বজ্ঞানোপার্জ্জনের উপযুক্ত করিবেন। সাধনায় অশক্ত মানবের জন্য অর্চ্চনাদির অনুষ্ঠান করিয়া তাহার পরকালের পথ পরিষ্কার করিয়া দিবেন। সর্ব্বদা যাগ, যজ্ঞ, ধ্যান ও তপস্যায় নিরত থাকিয়া

জগতের হিতসাধন করিবেন। কেবল আপনাদের দ্বারাই যে জগতের উদ্ধার সাধন হইতে পারে, তাহা মহর্ষিদের কৃত শাস্ত্রাদির এক অক্ষরও যে উপলব্ধি করিয়াছে, সেই স্বীকার করিবে। আপনাদের শাস্ত্র সত্য ও ধর্ম্মের অব্যক্ত স্বরূপ। ব্রাহ্মণসমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া যে হিন্দুর বেদ বেদান্ত অধ্যয়ন না করে, সে নিতান্তই দুর্ভাগ্য। আজকাল সামাজিক ধর্ম্মানুষ্ঠান নিয়া মানব সমাজে, বিশেষতঃ প্রায়ই ভারতবর্ষে বাদ বিসম্বাদ হইতেছে। হিন্দুরা মুসলমানকে প্রহার করিতেছে আর মুশলমানেরা হিন্দুকে প্রহার করিতেছে। কিন্তু এই বাদবিসম্বাদ তমোগুণগুণমূলক ভ্রান্তির পরিচায়ক মাত্র। হিন্দুত্ব, মুশলমানত্ব ইত্যাদির সৃষ্টি হইয়াছে সম্প্রদায় গঠন করিবার জন্য। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই নিজের দলপুষ্টির জন্য নিজের সামাজিক ধর্ম্মের প্রশংসা ও অন্য ধর্ম্মের নিন্দা করিয়া বিসম্বাদের সৃষ্টি করেন। কিন্তু যথার্থ ধর্ম্ম একস্বরূপ। যথার্থ ধর্ম্ম সত্যের উপর অধিষ্ঠিত। "তৎসৎ" সত্যের আর দ্বিতীয় প্রতিকৃতি নাই। সুতরাং প্রত্যেক সম্প্রদায় যদি বিদ্বেষ পরিহার পূর্ব্বক কেবল সত্য ও ধর্ম্মের অন্বেষণ করেন, তাহা হইলেই সমস্ত বিবাদ চিরকালের জন্য ধ্বংস হইয়া যায়।

এই সত্যান্বেষণ করিবার একমাত্র স্থান হিন্দুর বেদবেদান্ত। হে বিশ্ববাসিগণ। আমি অকপটহৃদয়ে তোমাদিগকে হিন্দুর শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আহ্বান করি। হিন্দু হও মুশলমান হও, খ্রীষ্টান হও, আপত্তি নাই। যদি যথার্থ সত্যপিপাসু হও তাহা হইলে 'ব্রাহ্মণের শাস্ত্র অধ্যয়ন কর। যথার্থ সত্য 'অনুভব করতঃ পরমানন্দলাভ কর। আত্মাকে পবিত্রীকৃত করিয়া নিজের শুদ্ধিসাধন কর। আমার এই আহ্বানে সাম্প্রদায়িকতার গোলমাল নাই। ব্রাহ্মণের অসংখ্য শাস্ত্রের মধ্যে অতি সামান্যই আমি অধ্যয়ন করিতে সক্ষম হইয়াছি। কিন্তু এই সামান্য শাস্ত্রপাঠের ফলে আমার ঈদৃশ সত্যানুভব হইয়াছে যে, এই শাস্ত্রপাঠে জগদ্বাসী মানবগণকে আহ্বান না করিয়া আমি থাকিতে পারি না। সুতরাং যে কেহ জগতে সত্যপিপাসু থাক, 'আমার আহ্বান গ্রহণ কর। ব্রাহ্মণশাস্ত্রের অনুশীলন করিয়া জীবন ধন্য কর। আর হিন্দুশাস্ত্রোক্ত তত্ত্বজ্ঞানলাভে ব্যতীত কাহারও মুক্তির উপায় নাই। কারণ একমাত্র সত্যের অনুভব দ্বারাই জীবের মুক্তি হইয়া থাকে। অন্যান্য সম্প্রদায়ের শাস্ত্রবিৎ ব্যক্তিগণ হয়ত: বলিতে পারেন "তবে কি আমাদের শাস্ত্রে সত্য নাই ?" মুশলমান বলিতে পারেন কোরাণে কি সত্য নাই। খ্রীষ্টান বলিতে পারেন বাইবেলে কি সত্য নাই!' সমস্ত সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যেই কতকগুলি সাধারণ সত্যের উল্লেখ আছে বটে। যেমন 'অহিংসা পরমধর্ম্ম', মিথ্যা কথা বলা মহাপাপ' 'সদা সত্যকথা কহিবে। কিন্তু হিন্দুর শাস্ত্রেতে যে ভাবে তন্ন তন্ন করিয়া সত্য বিচার করা হইয়াছে, অন্য কোন সম্প্রদায়ের শাস্ত্রে সেইরূপ বিচার নাই। সুতরাং সত্যের একমাত্র সম্পূর্ণ প্রতিকৃতি ব্রাহ্মণের শাস্ত্র। এই শাস্ত্রের মর্ম্ম উপলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত কাহারও সত্যানুভব হইবে না। কাহারও মুক্তিও হইবে না। পাশ্চাত্যজাতিরা যেমন অসত্য

ভোগবিলাসে মত্ত হইয়া পশুজীবন যাপন করে, পরস্বাপহরণ, পরপীড়ন ও হিংসাবৃত্তিতে রত থাকে, হিন্দুশাস্ত্রোক্ত তত্ত্বজ্ঞানলাভ ছাড়া, সেইরূপ জীবনই সম্ভব। কেবল তত্ত্বজ্ঞান লব্ধ ব্যক্তিই সারসত্যে চিত্তনিবেশ করিয়া ত্রিতাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং ব্রাহ্মণের সৃষ্টি হইয়াছে জগতের উদ্ধারের জন্য। যে ব্রাহ্মণ এই ধর্ম্ম কর্ত্তব্য সাধন করিতে প্রস্তুত নন, তিনি ব্রাহ্মণ নন, অব্রাহ্মণ। প্রাণান্ত স্বীকার করিয়া জগতের হিতসাধনই যথার্থ ব্রাহ্মণের কার্য্য।

জগতের উদ্ধারের জন্য যে ব্রাহ্মণের সৃষ্টি, সেই ব্রাহ্মণের সংরক্ষণের জন্য জগদ্বাসী সকলেরই যত্নবান হওয়া উচিত। যাহাতে ব্রাহ্মণের তপস্যাদির কোন ব্যাঘাত না হয়, তদ্বিষয়ে সকলেরই মনোযোগী হওয়া উচিত। যাহাতে ব্রাহ্মণেরা যাগ যজ্ঞাদির জন্য পবিত্র ঘৃতাদি প্রাপ্ত হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে সকলেরই যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। যাহাতে ক্রিয়াশীল ব্রাহ্মণেরা অন্নাভাবে কষ্ট না পান, তজ্জন্য প্রত্যেক সম্পন্ন ব্যক্তিরই সাধ্যমত ব্যবস্থা করা উচিত। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণরক্ষার ভার হিন্দু রাজাদের উপরে ছিল। এখনও সেই কর্ত্তব্য বর্ত্তমান রাজার ও রাজপ্রতিনিধিগণের উপরে কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা কি ভাবে আছেন, তদ্বিষয়ে ভারতীয় রাজপ্রতিনিধিরা একবার খবরও করেন না। আমি ব্রাহ্মণ সন্তান হিসাবে এই কথা গর্ব্ব করিয়া বলিতে পারি যে আজ ও যদি ব্রিটিশরাজ ব্রাহ্মণ ও তৎকথিত ধর্ম্মের যথার্থ সহায় হন, ভারতে আজ যে অশান্তি ও উপদ্রবের উদয় হইয়াছে, তৎসমুদয় মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইবে। কারণ ব্রাহ্মণ সর্ব্বদাই সত্ত্বগুণপ্রধান। সত্ত্বগুণের প্রধান লক্ষণ পরমানন্দ ও শান্তি। সুতরাং ব্রাহ্মণোপদিষ্ট পরমানন্দ ও শান্তিলাভ সম্বন্ধেই জগৎকে উপদেশ দিয়া থাকে। সুতরাং যে সমস্ত পরঘাতী ও পরস্বাপহারী তমোগুণসম্পন্ন ব্যক্তি এই শান্তির আসন ভারতবর্ষে অশান্তি ও উৎপাতের সৃষ্টি করিতেছে, তাহাদের চিত্ত যদি ব্রাহ্মণের উপদেশে পরিবর্ত্তিত হইয়া, পরমানন্দ ও শান্তির অন্বেষণে নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে, আর ভারতে অশান্তি থাকিবে না। সর্ব্বত্র কেবল শান্তি ও আনন্দ বিরাজ করিবে। যে পরের জীবন নাশ করিত, সে নিজের জীবন আশ করিয়া ও পরের জীবন রক্ষা করিবে। যে পররাজ্য ও পরস্বাপ হরণে আনন্দলাভ করিত, সে নিজের সর্ব্বস্ব দান করিয়া জগতের হিতসাধনে ব্রতী হইবে।

ম্লেচ্ছশাসকগণ যদি যথার্থ জগতের অনিষ্ট করিয়া থাকেন, সে অনিষ্ট ভারতবর্ষকে অধীন করিয়া রাখা নয়, ভারতে সর্ব্বতোভাবে ম্লেচ্ছাচারের প্রবর্ত্তন। প্রাচীনতম কাল হইতেই ভারতবর্ষ সত্য ও ধর্ম্মসেবার জন্য 'গুরুস্থানীয়। ম্লেচ্ছশাসকগণ সেই পবিত্র গুরুস্থানে অপবিত্রাচরণের প্রশ্রয় দিয়া জগতের অবর্ণনীয় অহিত সাধন করিতেছেন, অগ্নি, দেবতাদের নিকট ঘৃত বহন করিয়া থাকেন। সেইজন্যই যজ্ঞের অনুষ্ঠান। তজ্জন্য

প্রচুর ঘৃতের প্রয়োজন ঘৃতোৎপাদনের জন্য গো পালনের প্রয়োজন। ম্লেচ্ছারাজার শাসনে গো পালনের পরিবর্তে গো হত্যা ও চর্ম্মব্যবসায়ীদের সমৃদ্ধিরই ব্যবস্থা হইতেছে। সত্বগুণোৎপাদক খাদ্যের পরিবর্তে তমোগুণোৎপাদক মদ্যমাংসাদি আহার করিয়া লোকে যাহাতে পরস্ত্রীহরণ নরহত্যা ইত্যাদি কুকর্ম্ম করিতে পারে, ম্লেচ্ছশাসকগণ, মদের দোকান মাংসের দোকান, বারাঙ্গনালয় প্রভৃতির স্থাপনে প্রশ্রয় দিয়া, তাহার যথাবিহিত উপায় করিতেছেন। হে! ম্লেচ্ছশাসকগণ! এই সমস্ত বিধানের পরিণামে তোমরা অশান্তি ছাড়া আর কি আশা করিতে পার? এই সমস্ত বিধানের ফলে তোমরা নিজের বিনাশ ছাড়া আর কি আশা করিতে পার? বিষতরুমূলে বারিপ্রদান করিলে, সে বিষফলই বিতরণ করিয়া থাকে, অমৃতফল দিবার তাহার শক্তি নাই। হে! ম্লেচ্ছভ্রনগণ! যদি তোমাদের মঙ্গল ইচ্ছা কর, তবে এখনও তোমাদের স্বভাব পরিবর্ত্তন কর। তমোগুণের অনুশীলন পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্বস্থ হও। ব্রাহ্মণের ভাব গ্রহণ পূর্ব্বক ভারতে ব্রাহ্মণের পবিত্রতা রক্ষা কর, জগতের হিতসাধন কর, হিংসাবৃত্তি ও পরস্বাপহরণ পরিহার কর। ভারতবর্ষে কেন, সমস্তজগতে যাহাতে শান্তিস্থাপিত হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান হও।

এই শান্তিস্থাপনের একমাত্র উপায় ত্যাগ ও তমোগুণের বিনাশ সাধন। নিজের ভোগ বিলাসের জন্য পরের সর্ব্বস্ব হরণই বর্ত্তমান ম্লেচ্ছপ্রকৃতি। হে! ম্লেচ্ছগণ! তোমাদের এই প্রকৃতি ত্যাগ করিয়া পরের সুখবর্দ্ধনের জন্য নিজের সর্ব্বস্বত্যাগের প্রকৃতি অবলম্বন করিতে হইবে। আর তমোগুণের বিনাশের জন্য তমোভাবোৎপাদক খাদ্য পানীয়াদির বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিতে হইবে; আর ভারতে জগতে যাহাতে যথার্থ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের (অতএব সর্ব্বধর্ম্মের) সত্য প্রচার হয়, তাহার বিধান করিতে হইবে। ইহাই ভারতে ও জগতে শান্তি স্থাপনের একমাত্র উপায়।

(ক্রমশঃ)

REGISTERED No. C—675

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়।

অষ্টাদশ বর্ষ। { ১৮৫২ শক, সন ১৩৩৭ সাল, জ্যৈষ্ঠ। } নবম সংখ্যা।

যজ্ঞের প্রসার।

(লেখক—শ্রীযুক্ত বনওয়ারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বিএল,)

দেবতাগণ আমাদের ভাগ্য-বিধাতা; তাঁহাদের কৃপা না হইলে আমরা কোনরূপ শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারি না; ঐ জন্য প্রথমতঃ দেবতাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থ ও তাঁহাদের তৃপ্তি বিধানার্থ, তাঁহাদের উদ্দেশ্যে অগ্নিতে হবিঃ আহুতি দেওয়া কর্ম্মকেই প্রধানতঃ যজ্ঞ বলা হয়।

দেবতার তৃপ্ত্যর্থ পুরোডাশ, ছাগাদি পশু এবং সোমরসও আহুতি দেওয়া হইত এবং ঐ ঐ ক্রিয়াকে যজ্ঞ বলা হইত। পূর্ব্বকালে অগ্নিহোত্র, দর্শপৌর্ণমাস, ইষ্টিযাগ, পশুযাগ ও সোমযাগ আদি অনেক প্রকার যজ্ঞ সম্পাদিত হইত; সকলেরই উদ্দেশ্য ছিল দেবতা তৃপ্তি ও দেবতাতে আত্মোৎসর্গ করিয়া দেবতাভাবাপন্ন বা দেবতা হওয়া। কেবল দেবতা কেন, ঋষিগণ ও পূর্ব্বপুরুষগণের নিকটেও আমরা বিশেষ [illegible] নী।" যজমানো বৈ ব্রাহ্মণ স্ত্রিভিঃ ঋণবান জায়তে।" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কেন মনুষ্য মাত্রেই তিনটি ঋণ লইয়া জন্মগ্রহণ করেন। জীবজন্তুদের নিকটেও মানুষ বড় কম ঋণী নয়।

দেবগণ মানুষের ভাগ্যবিধাতা। পিতৃগণ তাঁহাদিগকে জন্ম দিয়াছেন; ও ঋষিগণ

শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া তাঁহাদিগকে হিতাহিত জ্ঞানবান্ করিয়াছেন; বন্ধু প্রতিবেশী ও সংসারের সকল ব্যক্তিই তাঁহাকে কম বেশী রক্ষা ও সাহায্য করিতেছেন, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ কোন না কোনরূপে তাহার জীবন রক্ষায় সাহায্য করিয়া থাকে অতএব ইহাদের সকলের নিকট তিনি ঋণী। জীবন ব্যাপিয়া ঐ সমগ্র ঋণশোধে চেষ্টা করিতে হইবে। ঐ ঐ ঋণ শোধের চেষ্টাকেই পঞ্চমহাযজ্ঞ বলা হইয়াছে। ঐরূপ দেব-যজ্ঞ, ঋষি-যজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ মনুষ্য মাত্রেরই করণীয়।

প্রত্যেক যজ্ঞেই কিছু না কিছু ত্যাগ করিতে হয়। গৃহস্থ মাত্রেরই ঐ পাঁচটি যজ্ঞ করা অবশ্য কর্ত্তব্য এবং এখনও অনেক গৃহস্থ ঐ পঞ্চযজ্ঞ করিয়া থাকেন। এইরূপে কেবল দেবতা ভিন্ন ঋষি, পূর্ব্বপুরুষ, সমসাময়িক মানুষ ও পশু পক্ষীদের উদ্দেশ্যে দ্রব্যদানরূপ কর্ম্মকেও যজ্ঞ বলা হইল—অতএব প্রথমতঃ—দেবতাগণের নিকট আমরা অত্যন্ত ঋণী; ঐ ঋন পরিশোধার্থে অর্থাৎ তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থ দেবতাদের তৃপ্তির উদ্দেশ্যে দ্রব্য ত্যাগরূপ ক্রিয়াকে যজ্ঞ বলা হইত। ঋষি ও পূর্ব্বপুরুষদের নিকটও প্রত্যেক মানুষ ঋণী; অতএব ঐসকল ঋণস্বীকারার্থ তাঁহাদের উদ্দেশ্যেও কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকাররূপ ক্রিয়ার বিধি। ঐ সকল ক্রিয়াও "যজ্ঞ" নামে অভিহিত হইল। এইরূপে পিতৃদিগের, উদ্দেশ্যে তর্পণ ও শ্রাদ্ধক্রিয়া "পিতৃ-যজ্ঞ" নামে ও বেদ অধ্যয়ন অর্থাৎ বিদ্যা অর্জ্জন ও বেদ অধ্যাপন অর্থাৎ বিদ্যা দান, "ঋষি-যজ্ঞ" বা "ব্রহ্মযজ্ঞ" নামে কথিত হইল; বংশ লোপ হইলে, তর্পণ ও পিণ্ডপ্রদান লোপ পাইবার সম্ভব, ঐ জন্য সন্ততিধারা অবিচ্ছিন্ন রাখিয়া, ধারাবাহিক পিণ্ড দিবার জন্য পুত্র উৎপাদনও "যজ্ঞ" নামে কথিত হইল ও ইহাই পিতৃযজ্ঞ নামে উক্ত হইল।

কেবল ঋষি দেবতা ও পূর্ব্বপুরুষের নিকট প্রত্যেক মানুষ ঋণী নহেন; সমকালীন মনুষ্য ও পশু-পক্ষিগণের নিকটেও মানুষ ঋণী; ঐ জন্য পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ ও ঋষি-যজ্ঞ ব্যতীত আরও দুই যজ্ঞের বিধান হইল; যথা:—অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞ; পিতৃ-যজ্ঞস্তু তর্পণং; হোমো দৈবো (এতদ্ব্যতীত) "বলি র্ভৌতো নৃ-যজ্ঞঃ অতিথিপূজনং" "অর্থাৎ অধ্যাপন বা বিদ্যা দান হইতেছে ব্রহ্মযজ্ঞ বা ঋষি-যজ্ঞ; তর্পণ হইতেছে পিতৃযজ্ঞ; হোম হইতেছে, দেবযজ্ঞ; এতদ্ভিন্ন, পশুপক্ষীকে বলি প্রদান—অর্থাৎ অন্নদান হয়, ভূতযজ্ঞ ও অতিথিসেবা হয়, মনুষ্য-যজ্ঞ; যথা:—"যৎ ভূতেভ্যঃ বলিং হরতি তৎভূতযজ্ঞ অর্থাৎ ভূতগণের, পশুপক্ষিগণের উদ্দেশ্যে অন্নদান করিলেই ভূতযজ্ঞ সম্পন্ন হয়; "যৎ ব্রাহ্মণেভ্যঃ অতিথিভ্যঃ অন্নং দদাতি তৎ মনুষ্যযজ্ঞ"; অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও অতিথিকে অন্ন দিলে মনুষ্যযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। স্মৃতি অনুসারে মানব মাত্রেরই, অর্থাৎ মনুবংশীয় সকলেরই এই পঞ্চ মহা-যজ্ঞের অনুষ্ঠান একান্ত কর্ত্তব্য। নিষ্ঠাবান্ হিন্দুমাত্রেই এখনও যথাশক্তি ঐ পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

ঐহিক ও পারলৌকিক স্বার্থত্যাগরূপ, যে কোন ভোগত্যাগাত্মক ক্রিয়াকে, পশুষ ঘুচিয়া, দেবত্ব জন্মায়, যাহাতে ভগবানের প্রীতিসম্পাদন হয় তাহাও "যজ্ঞ" নামে

অভিহিত হইল। এইরূপে যজ্ঞ শব্দ ক্রমশঃ বহু ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইল। তখন মন্ত্রজপও যজ্ঞ নামে কথিত হইল এমন কি ইহা "বিধিযজ্ঞ" অর্থাৎ দর্শ পৌর্ণমাস্যাদি শ্রৌত (শ্রুতিবিহিত) যজ্ঞ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইল।

যথা— "বিধি-যজ্ঞাৎ জপযজ্ঞো বিশিষ্টো দশভি গুঁণৈ।
উপাংশু স্যাৎ শতগুণং সহস্রো মানসঃ স্মৃতঃ॥" (মনু)

অর্থাৎ বিধিযজ্ঞ দর্শ পৌর্ণমাসাদিরূপ যজ্ঞ অপেক্ষা জপযজ্ঞ দশগুণ শ্রেষ্ঠ, উপাংশু জপ শতগুণ ও মানসজপ সহস্রগুণ শ্রেষ্ঠ।

এইরূপ "যে পাক যজ্ঞা শ্চত্বারো বিধিযজ্ঞসমন্বিতাঃ
সর্ব্বে তে জপযজ্ঞস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং। (মনু)

অর্থাৎ ব্রহ্ম বা ঋষি যজ্ঞ ব্যতীত পঞ্চযজ্ঞের অন্য চারিটি যজ্ঞ অর্থাৎ বৈশ্বদেব, হোম, বলিকর্ম্ম বা নিত্যশ্রাদ্ধ ও তর্পণ এবং অতিথি-ভোজন এই চারিটি পাকযজ্ঞ ও দর্শ পৌর্ণমাসাদি বিধিযজ্ঞ, এই সকলে জপযজ্ঞের তুল্য নয়, এমন কি ষোল ভাগের এক ভাগেরও সমান নয় এইরূপ কথিত হইল। ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধিকর, নানারূপ ক্রিয়া বা অনুষ্ঠান যজ্ঞ নামে অভিহিত হইল। ভগবদ্গীতায় উল্লিখিত হইয়াছে যে "দ্রব্যযজ্ঞা স্তপো-যজ্ঞা যোগযজ্ঞা তথা পরে। স্বাধ্যায়-জ্ঞান-যজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ অর্থাৎ কেহ কেহ দ্রব্য ত্যাগরূপ যজ্ঞ করেন, কেহবা চান্দ্রায়ণাদি তপোরূপ যজ্ঞ করেন; কেহ বা যোগরূপ (চিত্ত বৃত্তিনিরোধরূপ) যজ্ঞ করেন; এবং অপর সংশিতব্রত যতিগণ বেদপাঠ ও বেদের অর্থজ্ঞানরূপ যজ্ঞ করে।

আবার অন্য কেহ

"শ্রোত্রাদীন্ ইন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি
শব্দাদীন্ বিষয়ান্ অন্যে ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি।
সর্ব্বানীন্দ্রিয় কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে
আত্মসংযম-যোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে॥

অর্থাৎ আবার কেহ "ইন্দ্রিয়সংযমরূপ অগ্নিতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সকলকে হোম করেন, আহুতি দেন। অন্য কেহ ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে শব্দাদি বিষয় সকলকে আহুতি দেন। অর্থাৎ অনাসক্ত ভাবে কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে বিষয় ভোগ করেন) আবার কেহ আত্মসংযমরূপ যোগাগ্নিতে, ইন্দ্রিয়কর্ম্ম ও প্রাণকর্ম্ম আহুতি দেন। এইরূপে ভোগত্যাগাত্মক কর্ম্মমাত্রই "যজ্ঞ" আখ্যাপ্রাপ্ত হইল, এবং ঐরূপ ত্যাগের পর যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই ভোগ করিবার বিধি হইল যথা—"যজ্ঞ-শিষ্টামৃত-ভূজো যান্তি ব্রহ্মসনাতনং" অর্থাৎ যজ্ঞের অবশিষ্ট যাহা থাকে, তাহা অমৃত; ঐ অমৃত ভোজনের দ্বারা সনাতনব্রহ্মকে পাওয়া যায়। ক্রমশঃ জীবনের যাবতীয় কর্ম্মকে যজ্ঞস্বরূপে অর্থাৎ ভগবানের প্রীতির জন্য সম্পাদন করিবার পরামর্শ দেওয়া হইল।

জীবনের প্রত্যেক কর্ম্মকে যজ্ঞরূপে দেখিলে, জীবন ক্রমশঃ উন্নত হয়; অপকর্ম্মে মতি যায় না; যখন যাহা করা যায়, তাহা পবিত্রভাবে করিবার আকাঙ্ক্ষা জন্মে। এইরূপে জীবনের অর্থ, জীবনের উদ্দেশ্য বদলাইয়া যায়। ঐজন্য পরামর্শ দেওয়া হইল, তুমি যে অন্ন খাইতেছ, মনে করিবে, তুমি তাহা দ্বারা, প্রাণরূপ অগ্নিদেবকে আহুতি দিতেছ। এইরূপে সাংসারিক যাবতীয় কার্য্যকে অর্থাৎ জীবনের প্রত্যেক কর্ম্মকেই যজ্ঞের কর্ম্মাঙ্গস্বরূপে দেখিবার উপদেশ দেওয়া হইল; ঐ জন্যই ভগবান, ভগবদ্গীতায় অর্জ্জুনকে শিক্ষা দিয়াছিলেন—"যৎ করোষি, যদশ্নাসি, যজ্জুহোসি, দদাসি যৎ, যৎ তপস্যসি কৌন্তেয়, তৎকুরুষ্ব মদর্পণং"। অর্থাৎ তুমি যে কর্ম্ম করিবে, যাহা খাইবে, যে যজ্ঞ করিবে, যে দান করিবে ও যে তপস্যা করিবে অর্থাৎ তোমার দান, তোমার তপস্যা, তোমার পূজা, এমন কি তোমার পান ভোজনাদি যাবতীয় কর্ম্মই, তুমি যজ্ঞস্বরূপে আমাকে আমার উদ্দেশ্যে, অর্পণ করিবে; তন্ত্রভক্তও ঐরূপ কথাই প্রকারান্তরে বলিয়াছেন; যথা:—

"যৎ করোমি জগন্মাতঃ তদেব তব পূজনং"।

অর্থাৎ হে জগন্মাত! আমি (যেমন) যাহা কিছু করি, তাহাই তোমার পূজা (হউক) অর্থাৎ সকল কর্ম্মকেই তোমার পূজার অঙ্গস্বরূপ দেখি ও ঐরূপভাবেই সকল কার্য্যই সম্পাদন বা নির্ব্বাহ করি।

যজ্ঞ ও পূজা উভয়ের তাৎপর্য্য একই, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন; এইস্থলে বলা কর্ত্তব্য যে "যজ" ধাতু হইতে "যজ্ঞ" শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে; "যজ" ধাতুর অর্থ পূজা।

জীবনরক্ষার জন্য পশুর ন্যায় ভক্ষণ করায় কোন বিশিষ্টতা নাই; কিন্তু ঐ পাশবিক ভোজন ব্যাপারকেও, "অগ্নিহোত্র"রূপে দেখিলে তাহার পাশবিকতা লোপ হয়; তদ্দ্বারায় ঐ ক্রিয়াকেই উন্নত করা যায়; কাজেই তখন ইচ্ছা হয়, যেন ঐ কার্য্য পবিত্রভাবে সম্পন্ন করা হয়, যেমন খাদ্যদ্রব্য পবিত্র হয় ও পবিত্রভাবে ভক্ষণ করা হয় ঐদিকে লক্ষ্য হয়। অর্থাৎ পবিত্র শরীরে, পবিত্র আসনে, পবিত্র দ্রব্য ও পবিত্র মনে যেন ভোজনক্রিয়া সম্পন্ন হয়, এই দিকে দৃষ্টি পড়ে। ঐজন্যই খাদ্যাখাদ্য বিচার করিতে হয় ও খাইবার সময় গণ্ডূষ করিতে হয় ও খাদ্যদ্রব্য ভগবানকে নিবেদন করিবার পর খাইতে হয়।

এইভাব প্রকাশার্থ প্রশ্নোপনিষৎ বলিলেন—"স এষ বৈশ্বানরো বিশ্বরূপ প্রাণঃ অগ্নিরুদয়তে" অর্থাৎ বিশ্বরূপ বৈশ্বানর অগ্নিই জীবের দেহে প্রাণাগ্নিরূপে উদিত হয়েন। তাঁহারই প্রসাদে "অৎসি অন্নং পশ্যসি প্রিয়ং" অর্থাৎ উঁহারই প্রসাদে তুমি অন্ন খাও ও প্রিয়দর্শন কর। ঐ অগ্নিতে তুমি অন্নরূপ আহুতি দাও; অতএব অন্ন ভক্ষণ, এক রকম নিত্য অগ্নিহোত্র ব্যাপার। ইহার নাম "প্রাণাগ্নি-হোত্র"।

অন্ন ভক্ষণকে এইরূপে অগ্নিহোত্ররূপে চিন্তা করিলে, উহাদ্বারা অগ্নিদেবকে আহুতি হইতেছে, ভাবিলে আপনা হইতেই অন্নের শুদ্ধতা, আসনের শুদ্ধতা ও দেহের শুদ্ধতার দিকে নজর পড়ে; এবং অন্ন ভক্ষণ ব্যাপারকে আর জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ জন্য পশুর ন্যায়

গলাধঃকরণ ব্যাপার বলিয়া মনে হয় না। ঐ ক্রিয়াকে বড় করিয়া তোলা হয়। ঐ জন্য ছান্দোগ্য উপনিষৎ আদেশ করিলেন :—

"তদ্ যদ্ ভক্তং প্রথমং আগচ্ছেৎ হোমীয়ং, স যাং প্রথমাহুতিং জুহুয়াৎ, তাং জুহুয়াৎ প্রাণায় স্বাহা ইতি, প্রাণ স্তৃপ্যতি"।

অর্থাৎ অন্নের যে প্রথম গ্রাস উপস্থিত হয় তাহা হোমদ্রব্য। প্রাণায় স্বাহা বলিয়া উহা আহুতি দিবে; তাহাতে প্রাণ তৃপ্ত হইবে। এইরূপে প্রাণ অপানাদি পঞ্চপ্রাণের উদ্দেশ্যে পাঁচটি আহুতি দিবার পরে ভাবিবে ও বলিবে "ব্রহ্মণি মে আত্মা অমৃতত্বায়" অর্থাৎ আমার আত্মা ব্রহ্মে যুক্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করুক।

এইরূপে আপনার দেহকে যজ্ঞ সম্পাদন করিবার উপায় মনে করিলে, অন্ন ভক্ষণের তাৎপর্য্য বদলাইয়া যায়; ইহার ফলে, ক্রমশঃ যে প্রাকৃতিক প্রণালীমতে চলিয়া, ইতর জীবজন্তু, জীবনরক্ষা করতঃ উৎকর্ষ লাভ করে, ঐ সকল মানুষ তখন ঐ প্রাকৃতিক প্রণালী অনুসারে চলিয়া উৎকর্ষ লাভ করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন; তৎপরিবর্ত্তে যাজ্ঞিক ভাবে বা ধর্ম্ম-প্রণালী অনুসরণ মতে, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে যত্নবান্ হয়েন।

প্রাকৃতিক প্রণালীমতে উৎকর্ষ লাভের উপায় হইতেছে, অন্য প্রাণীকে নির্য্যাতন করিয়া তাহাকে গ্রাস বা আত্মসাৎ করিয়া নিজেকে বড় করা, এখনও অনেক মানুষ ঐ প্রণালীমতে বড় হইতেছে; তাঁহারা অন্য মনুষ্যের সর্ব্বস্ব ছলে বলে কৌশলে গ্রাস করিয়া ঐরূপে তাঁহাকে আত্মসাৎ করিয়া বড় হইতেছেন; ইহাই হইতেছে, প্রাকৃতিক প্রণালীমতে বড় হইবার উপায়। যাজ্ঞিক পদ্ধতিমতে বড় হইবার উপায়, ইহার ঠিক বিপরীত। যাজ্ঞিক পদ্ধতিমতে, অন্যকে গ্রাস করিয়া নয় বরং তাহার উন্নতিসাধন করিয়া, অন্যকে আত্মসাৎ করিয়া নহে বরং অন্যের জন্য নিজে খাটিয়া, অন্যের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করিয়া, বিলাইয়া দিয়া অর্থাৎ অন্যের মঙ্গল জন্য নিজের ঐহিক ও পারত্রিক স্বার্থত্যাগ করিয়া, মানুষ বড় হইতে ইচ্ছা করে। এই পদ্ধতিতে আপনাকে পরের সঙ্গে মিশাইতে হয় অর্থাৎ পরকে আপনার করিয়া লইতে হয়; তাহাকে গ্রাস করিয়া নয়, তাহাকে আপনার করিয়া লইয়া বড় হইতে হয়। এই পদ্ধতিমতে উৎকর্ষলাভ করিতে হইলে, সকলকেই বন্ধু করিয়া লইতে হইবে ও ঐজন্য নিজের স্বার্থপরতা ও পাশবিকতাকে বিধি নিষেধের শাসনে বশীভূত করিতে হইবে। সকলেই একই ভগবানের সন্তান ও সকলের মধ্যে এক আত্মা বিরাজমান, এই জ্ঞানকে হৃদয় মধ্যে দৃঢ়ীভূত করিতে হইবে ও সকলের সঙ্গে মিশিয়া সম্বন্ধ পাতাইয়া আপনাকে সকলের সঙ্গে এমন করিয়া এক করিতে হইবে, যেমন সকলের স্বার্থেই নিজের স্বার্থ হয়। এই পদ্ধতিমতে উৎকর্ষ লাভ করিতে হইলে, আমাদের ভিতরে যে পাশবিক ভাব আছে; যাহা অপরের সর্ব্বস্ব গ্রাস করিতে সদাই ইচ্ছুক তাহাকে যম, নিয়মের শাসনে বশীভূত করিতে হয় ও ব্রহ্মজ্ঞানে তাহাকে বলি দিতে হয়। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য শাস্ত্রে, নানারূপ নিয়মের

সৃষ্টি হইয়াছিল; সকল কার্য্যকেই ধর্মের সহায়, ধর্মের অঙ্গীভূত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল; এবং জীবনযাত্রাকে একটি "মহাযজ্ঞ" বলিয়া ধারণা করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল; এবং জীবনের প্রত্যেক কর্ম্মকেই ঐ মহাযজ্ঞের কর্ম্মাঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল; অর্থাৎ খাওয়া দাওয়া, দাঁতন করা, ইত্যাদি যাবতীয় কার্য্যকেই যজ্ঞের অঙ্গ, ধর্মের অঙ্গ বলিয়া ধারণা করিবার বিধি হইয়াছিল; ফলে দাঁড়াইয়াছিল যে তখন জীবনযাত্রাকে আজিকালিকার মত ভোগের ব্যাপার বলিয়া মনে করা হইত না; যজ্ঞের ব্যাপার, ধর্মের ব্যাপার, ত্যাগের ব্যাপার বলিয়া বিবেচিত হইত; ঐজন্য সাধক প্রার্থনা করিতেন :—

"প্রাতঃ আরভ্য সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ
যৎ করোমি জগন্মাতঃ তদেব তব পূজনং।"

অর্থাৎ প্রাতঃ হইতে সায়াহ্ন পর্য্যন্ত ও সায়াহ্ন হইতে প্রাতঃ পর্য্যন্ত যাহা করিব,তাহা সকলি হে মাতঃ, যেন তোমার পূজা হয় অর্থাৎ তোমার পূজার স্বরূপে নির্ব্বাহ করা হয়।

সাধক রামপ্রসাদের একটি গানে, ঐ ভাবটি সুন্দররূপে প্রকাশ পায়। অতএব ঐ গানটি এইস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

"শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান,
ওরে নগর ফির, মনে কর, প্রদক্ষিণ শ্যামামা'রে।
যত শোন কর্ণপুটে, সবই মায়ের মন্ত্র বটে,
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে নাম ধরে॥
কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে, ব্রহ্মময়ী সর্ব্ব ঘটে,
ওরে আহার কর, মনে কর, আহুতি দেই শ্যামা মারে॥"

বাস্তবিক আগেকার মনুষ্যেরা সকল কার্য্যেই ধর্ম্মভাব রক্ষা করিতেন। ঐজন্য সামান্য চিঠি লেখা হইতে গাত্রোত্থান করা, শয়ন করা, সকল কাজই ঈশ্বর স্মরণ পূর্ব্বক করিবার বিধি ছিল ও সকল কাজই ঈশ্বর স্মরণপূর্ব্বক করা হইত। হৃদয়ে ঐরূপ ভাব উদ্রেক করিবার জন্য ভগবদগীতায় শ্রীকৃষ্ণ পরামর্শ দিয়াছেন, যে প্রত্যেক কার্য্য বিষ্ণুকে অর্পণ করিবে; যথা "যৎ করোষি যদ শ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণং"।

অর্থাৎ যখন যাহা করিবে, যাহা খাইবে, যে যজ্ঞ করিবে, যাহা দান করিবে, অর্থাৎ তোমার যাবতীয় কর্ম্ম আমাকে (বিষ্ণুকে) অর্পণ করিবে। ভাবার্থ এই যে, যাহা কিছু করিবে, তাহা ভগবানের পূজার ভাবেই করিবে।

দুঃখের কথা এই যে, সর্ব্ব কার্য্যেই পবিত্র ভাব পূজার ভাব রক্ষা করা দূরে থাক্ এখন প্রত্যহ নিত্যকৃত্য সন্ধ্যা-বন্দনা ও নিত্য পূজা করিতেও মানুষে অনিচ্ছুক। এখন প্রায় লোকই বলিয়া থাকেন, প্রত্যহ সন্ধ্যাবন্দনা ও পূজা করিবার দরকার কি। ইঁহাদের

মতে ইংরেজদের ন্যায় সপ্তাহের কোন এক নির্দ্দিষ্ট দিনে পূজা করিলেই যথেষ্ট। ইঁহারা বলেন, যে বিষয়কার্য্যের সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সম্পর্ক নাই; অতএব বিষয়কার্য্য নির্ব্বাহ কালে ধর্ম্মাধর্ম্মের দিকে নজর রাখিবার আবশ্যক নাই। ইঁহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ বলেন যে চাকুরি করিতে আসিয়াছি, তীর্থ করিতে আসি নাই, যে, এখানে (চাকুরি স্থানে) সন্ধ্যা পূজাদির নিয়ম রক্ষা করিতে হইবে; আবার এমন বলিতেও শোনা যায় যে, বার্দ্ধক্যে অর্থাৎ বৃদ্ধ বয়সেই ধর্ম্ম করিবার সময়। ধর্ম্ম এমন জীবনব্যাপী ব্যাপার নয়; ইহা এখন অন্য নানা কাজের মধ্যে একটি কাজ মাত্র। ইহাকে বিশেষ কোন আবশ্যক কাজ বলিয়াও বিবেচনা করা হয় না; ইহা একটি বেগারে কাজ মাত্র, করিলেও হয়, না করিলেও ক্ষতি নাই, এইরূপ ভাবা হয়। ইহাতে আমাদের মধ্যে ধর্ম্মভাবের কত অবনতি হইয়াছে, স্পষ্টই জানা যায়। আবার এমনও নিন্দাবাদ শোনা যায়, যে গোঁড়া হিন্দুদের "দাঁতন করা থেকে, ভাত খাওয়া পর্য্যন্ত সবই ধর্ম্ম।" যিনি জীবনযাত্রাকে যজ্ঞের ব্যাপার বলিয়া বুঝিবেন, তিনি কখনই ঐরূপ নিন্দাবাদ করিবেন না; বরং বলিবেন উহাই হিন্দুদিগের গৌরবের বিষয়; আর এক দোষ, আমাদের মধ্যে এখন বড়ই প্রবল হইয়াছে; ইহা হইতেছে, ঐহিক ও পারলৌকিক স্বার্থপরতা। ত্যাগের অর্থাৎ স্বার্থত্যাগের নামান্তর যজ্ঞ; জীবনযাত্রা ত্যাগের ব্যাপার হইবার কথা; ত্যাগের উপর স্থাপিত হইবার কথা; কিন্তু এখন জীবনযাত্রা ভোগের ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। উপনিষদের উপদেশ "ত্যক্তেন ভুঞ্জীত" এখন আর কেহ শোনে না। এমন কি এখন জীবনের জন্য খাওয়া হয় না; খাবার জন্যই জীবনধারণ।

জীবনযাত্রার উদ্দেশ্য ভুলিয়া আত্মার স্বরূপের অজ্ঞান বশতঃ বিজেতা ইংরেজদিগের জীবন-যাত্রার অনুকরণে, এই দোষ জন্মিয়াছে; আজকাল অনেকেই দেশ ও গ্রামবাসীর কথা দূরে থাকুক, আত্মীয় স্বজনের কথা দূরে থাকুক, এমন কি নিজের পিতামাতা ভ্রাতা ভগ্নি ও কন্যাদেরও পীড়া জন্মাইয়া, গাড়ী ঘোড়া আদির দ্বারা নিজের ও নিজের স্ত্রী, পুত্রের ভোগ সাধন করেন; ইহারা ঐহিক স্বার্থ-পর।

আবার অন্য কেহ কেহ নিজের পুত্র কন্যাগণ, উপযুক্ত খাদ্যাভাবে কষ্টপাইলেও তাহা উপেক্ষা করিয়া তাহাদের উপযুক্ত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষার বিধান না করিয়াই নিজের পারত্রিক মঙ্গলের জন্য তীর্থযাত্রাদি করিয়া থাকেন, এবং গ্রামবাসী কি আত্মীয় স্বজন কি করিতেছে, কি না করিতেছে তাহার বিন্দুমাত্র সংবাদ না লইয়া তাঁহারা নিজের পরকালের সদ্গতির জন্য নিশ্চিন্তমনে, ইষ্টমন্ত্রের জপাদি করিয়া থাকেন, ইহাই পারলৌকিক স্বার্থ-পরতা; ইঁহারা, একবারও ভাবেন না, যে আত্মা বিভু ও সকলেই সকলের সঙ্গে বিশেষ আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে এমনভাবে জড়ীভূত যে, তাঁহাদের সকলের উন্নতিতে তাঁহার উন্নতি ও আর সকলে অধর্ম্মাচরণ করিলে তাহার কুফল, তাঁহার উপরেও অর্শিবে; অতএব পারলৌকিক স্বার্থপরতা ও ঐহিক স্বার্থপরতা প্রায় তুল্যই নিন্দার্হ।

পারলৌকিক স্বার্থপরতা দোষ, আজকাল কি গৃহস্থ, কি সন্ন্যাসী সকলের মধ্যেই দেখা যাইতেছে। ইহাও আমাদের অধোগতির প্রবল চিহ্ন। শাস্ত্রে পারলৌকিক স্বার্থপরতার নিন্দাবাদ না থাকা নহে; তবে আজকাল শাস্ত্রের আদর কোথায়? তাহা না হইলে, আমাদের এমন দুর্গতি হইবে কেন? শাস্ত্রে দেখা যায়, ভৃত্যানামুপরোধেন যৎ করোত্যৌর্দ্ধদেহিকং, তৎ ভবত্যসুখোদর্কং জীবতশ্চ মৃতস্য চ। ভৃত্যানাম অর্থাৎ ভৃত্যসকলের (কেবল চাকরগণের নহে, অবশ্য ভর্ত্তব্য সকলের) উপরোধেন (পীড়া জন্মাইয়া) অবশ্য ভর্ত্তব্যগণের পীড়া জন্মাইয়া যে ঔর্দ্ধদেহিক নিজের পরলোকের উর্দ্ধগতি হইবার জন্য যে ক্রিয়া করা যায় যথা —শ্রাদ্ধাদি যাত্রা ও ব্রতাদি কাম্যক্রিয়া বহু কিছু করাবার তাহা জীবিত ও মৃত উভয়েই উভয়ের উভয়কালের অসুখের আকর হইয়া থাকে অর্থাৎ ইহকাল ও পরকাল উভয় কালেরই অসুখের কারণ হয়। বলা বাহুল্য পুত্র, পৌত্রাদি, মাতা, পিতা, আত্মীয় স্বজন ও আশ্রিত ব্যক্তি ইহাঁরা সকলেই অবশ্য ভর্ত্তব্য। আমরা যে আবার জীবনযাত্রা যজ্ঞরূপে নির্বাহ করিতে পারিব জীবনের প্রতিকার্য্য ভগবানের পূজাজ্ঞানে পবিত্রভাবে সম্পাদন করিতে যত্নবান হইব, ঐহিক পারলৌকিক সর্ব্বপ্রকার স্বার্থপরতা ত্যাগ পূর্ব্বক নিজেকে দেবভাবে পরিণত করিতে সক্ষম হইব, আবার যে যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্ববৎ সম্পাদিত হইবে, তাহা দুরাশা মাত্র।

তবে যজ্ঞানুষ্ঠানের ভাবটি হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমরা যেন ঐভাব সহকারে যথাসম্ভব আমাদের কৃতকার্য্য সম্পাদন করিতে যত্নবান্ হই ঐরূপ চেষ্টা করা আমাদের সকলের উচিত। শ্রৌতযজ্ঞের অনুষ্ঠান আবার যে চলিবে তাহা আশা করা যায় না। তবে যজ্ঞের তাৎপর্য্য যে স্বার্থত্যাগ, অর্থাৎ অন্যের মঙ্গলার্থে নিজের কষ্ট স্বীকার, সুখভোগেচ্ছা ত্যাগ আমরা যেন আমাদের জীবনযাত্রায় তাহা ভুলিয়া না যাই; যেন ঐহিকসর্ব্বস্ব হইয়া ভোগই জীবনের উদ্দেশ্য এমন না বুঝি; তৎপরিবর্ত্তে সকলের মঙ্গলের জন্য নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থত্যাগ করতঃ, সকলের সঙ্গে আমি জড়িত, কাজেই সকলের মঙ্গলেই আমার যথার্থ মঙ্গল এইটি নিশ্চয় করিয়া, আমরা প্রত্যেকই যেন আপন আপন ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি সকলের মঙ্গলের জন্যই নিয়োগ করিতে ও আমরা সকলে যেন নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থত্যাগ করিয়া, এক মন এক বুদ্ধি ও সমবেত হইয়া দেশের মঙ্গলের জন্য কিম্বা অন্ততঃ অধিকার অনুসারে নিজ নিজ গ্রামের বা পরিবারের মঙ্গলের জন্য কার্য্য করিতে শিখি। যেন "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই না হই। ইহাও এক প্রকার যজ্ঞ। সর্ব্ব শাস্ত্রের শিক্ষার এই উদ্দেশ্য। কর্ম্মযজ্ঞ সম্পাদন এইরূপ ব্যাপকভাবে করিবার সোপান। কর্ম্মযজ্ঞ করিলে ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধ হইয়া, এইরূপে ব্যাপকভাবে যজ্ঞ করিবার অধিকার জন্মাইয়া থাকে।

ইষ্টিযাগ, পশুযাগ, ও সোমযাগ, বৈদিক ব্রাহ্মণগণের চক্ষে পরমপ্রিয় ও অত্যন্ত উপাদের অনুষ্ঠান বলিয়া পরিগণিত ছিল সন্দেহ নাই; কি কারণে পরবর্ত্তী কালে ঐসকল যজ্ঞের অপ্রচলন হইল, স্বতঃই ইহার কারণ অনুসন্ধানের ইচ্ছা জন্মে; এই স্থলে ইহার কারণ

অনুসন্ধান অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া বোধ হইল না। অতএব ইহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম।

পশুযাগে ও সোমযাগে যজ্ঞার্থ পশুবধ করিতে হইত। অবৈধ হিংসায় (পশুবধে) পাপ হয়, ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। বৈধহিংসায় অর্থাৎ যজ্ঞার্থে পশুবধে পাপ হয় কিনা, এ বিষয়ে অতি পুরাকাল হইতেই বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে। সাংখ্য, পাতঞ্জল ভিন্ন, সাধারণ আস্তিক-দর্শনের মতে বৈধহিংসায় পাপ নাই; তাঁহারা বলেন, "মাহিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি" ইত্যাদি নিষেধ, সাধারণ বিধি, "অগ্নিসোমীয়ং পশুমালভেত" ইত্যাদি বিধি, বিশেষ বিধি; সাধারণ বিধি বিশেষ বিধিদ্বারা বাধিত হইয়া থাকে; বিশেষবিধির স্থলকে পরিত্যাগ করিয়া সামান্যবিধি প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, অতএব যাগাদিস্থলে পশুঘাতরূপ বৈধহিংসার অতিরিক্ত হিংসা সম্বন্ধেই "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি" ইত্যাদি সামান্য বিধি প্রবৃত্ত হইবে ও ঐরূপ অতিরিক্ত হিংসাই পাপজনক হইবে। যজ্ঞার্থ পশুহিংসার পাপজনকতা নাই, থাকিলে শ্রুতি তাহা অনুমোদন করিতেন না। সাংখ্য পাতঞ্জল কিন্তু উক্তমতের অনুমোদন করেন নাই; তাঁহারা বলেন, এক অধিকার সম্বন্ধে, সামান্য ও বিশেষ দুই প্রকারের বিধি থাকিলে, সামান্যবিধি বিশেষ বিধিদ্বারা বাধিত হয়; এবং এইরূপ ক্ষেত্রেই বিশেষ বিধির অতিরিক্ত স্থলে সামান্য সাধারণ বিধি প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; বর্ত্তমান অর্থাৎ আলোচ্য বিষয়ে কিন্তু "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি" ও "অগ্নি-সোমীয়ং পশুমালভেত" এই বিধিদ্বয় এক অধিকারের সম্বন্ধে বিধি নহে; একটি ধর্ম্মীতে বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের সমাবেশ হইলেই বিরোধ হয়; হিংসা অনর্থের হেতু ও হেতু নহে এইরূপ হইলেই বিরোধ ঘটে; আলোচ্য স্থলে কিন্তু এইরূপ ঘটে নাই; কারণ "মাহিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি" বিধির তাৎপর্য্য, হিংসা মাত্রই অনর্থের কারণ, "অগ্নিসোমীয়ং পশুমালভেত" বিশেষবিধির অর্থ, পশুবধ যজ্ঞের সাধন; অনর্থের কারণ নয় এরূপ নহে;—সুতরাং বিরোধের সম্ভাবনা নাই; ইহাদের মতে যজ্ঞে প্রচুর পরিমাণে ধর্ম্ম হয় সঙ্গে সঙ্গে পশু ও বীজাদি বধ হয় বলিয়া অল্প পরিমাণ অধর্ম্মও সঞ্চিত হয়; যৎকিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিলে ঐ স্বল্প পাপ বিনষ্ট হয়; প্রায়শ্চিত্ত না করিলেও যজ্ঞফল স্বর্গভোগের সময় ঐ পাপের জন্য সামান্য দুঃখ হয় বটে কিন্তু অধিক সুখের মধ্যে সেই সামান্য দুঃখ সহজেই সহ্য হয়; বিশেষ অসুখ হয় না, আমরা এই উভয়মতের পরীক্ষা করিতে এখানে বসি নাই; অতএব কোনমতটি সমীচীন দেখিবার প্রয়োজন নাই, বলিতেছিলাম যজ্ঞ স্থলে পশুবধেও পাপ জন্মে এইরূপ মতবাদ বহুপূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব বশতঃ হউক কি অন্য যে কারণেই হউক যজ্ঞে পশুবধ করিতে অনেক লোকের ক্রমশঃ শ্রদ্ধার হ্রাস হইতেছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উল্লিখিত একটি আখ্যায়িকা দৃষ্টে জানা যায় যে বেদের সময় হইতেই যজ্ঞে পশুবধ করিতে লোকে দ্বিধা বোধ করিত; শতপথ ব্রাহ্মণেও আখ্যায়িকা দৃষ্ট হয়। আখ্যায়িকাটি সংক্ষেপে এই :—

পুরাকালে দেবগণ, মনুষ্যকে পশুরূপে আলম্ভনে অর্থাৎ যজ্ঞার্থে বধ করিতে উদ্যত হয়েন; সেই মনুষ্য হইতে যজ্ঞভাগ পলায়ন করিল এবং অশ্বে প্রবেশ করিল; তখন অশ্ব মেধ্য যজ্ঞযোগ্য অর্থাৎ দেবতাকে অর্পণযোগ্য হইল; দেবতারা অশ্বকে আলম্ভন করিতে উদ্যত হইলেন; ঐ অশ্ব হইতে যজ্ঞভাগ পলায়ন করিল, এবং গরুতে প্রবেশ করিল; তখন গরু মেধ্য হইল; ঐরূপে ক্রমশঃ যজ্ঞভাগ গরু হইতে মেষে; মেষ হইতে ছাগে ছাগ হইতে পৃথিবীতে প্রবেশ করিল; তদবধি পৃথিবীই মেধ্য হইল; যজ্ঞভাগ পলায়ন করায়, ঐ সকল পশু অমেধ্য অর্থাৎ যজ্ঞের অনুপযুক্ত হইল। দেবতারা পৃথিবীতে প্রবিষ্ট যজ্ঞভাগের অনুগমন করিয়াছিলেন, তখন সেই যজ্ঞভাগ ব্রীহি-ধান্য হইল; এইজন্য ব্রীহি ধান্য হইতে প্রস্তুত পুরোডাশ যজ্ঞে দান করা হয়; ইহাতে পশু আলম্ভনেরই ফল পাওয়া যায়।

ইষ্টিযাগে এমন কি পশুযাগে এবং সোমযাগেও পুরোডাশ আহুতি দেওয়া হইত; পৌর্ণমাসাদি ইষ্টিযাগে পশুবধ একেবারেই আবশ্যক হইত না। পশুযাগে ও সোমযাগে পুরোডাশও ছিল; তবে পশু একেবারে বর্জ্জিত হয় নাই কিন্তু পশুর সংখ্যা বাঁধাবাঁধি নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। প্রাচীনপ্রথা একেবারে ত্যাগ করা যায় না; বিশেষ ধর্ম্মানুষ্ঠানে; এইজন্য পশুবধ ঐ ঐ যজ্ঞে একেবারে উঠিয়া যায় নাই। তবে ঋষিগণ স্থলবিশেষে বলিলেন যে পশুর বদলে কৃষিজাত যব বা চাউল দিলে, পশু দেওয়ার ফল হয়; ইহাই নিষ্ক্রয়; পশুর পরিবর্ত্তে নিষ্ক্রয় হইতেছে, পুরোডাশ। ইহাতে জানা যায় বেদের সময় হইতে পশুবধে অনিচ্ছা হইতেছিল; পশুযাগে ও সোমযাগে পশু-বধ করিবার প্রথা ছিল বলিয়া ক্রমশঃ ঐ ঐ যাগ অপ্রচলন হইতে লাগিল, এইমত নিতান্ত অসঙ্গত মনে হয় না। তবে দেবতাগণের নিকট আমরা বিশেষভাবে ঋণী; তাঁহাদিগকে আমাদের সর্ব্বস্ব দান করিলেও ঐ ঋণ শোধ হয় না। যাহা কিছু আমাদের প্রিয়তম তাঁহাদিগকে তাহাই দেওয়া কর্ত্তব্য; সর্ব্বতোভাবে আত্ম-সমর্পণ করাই উচিত। তবে মানুষ সর্ব্বস্ব দিতে পারে না, আপনাকে উৎসর্গ করিতে পারে না, ঐজন্য নিষ্ক্রয়রূপে, অন্য কিছু দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের এক স্থানে উক্ত হইয়াছে যে যজমান সোমযাগে দীক্ষিত হইবার সময়, তিনি সেই দেবতাদের নিকট নিজের আলম্ভনেই (অর্থাৎ আত্মসমর্পণেই) প্রবৃত্ত হয়েন। ঐ উদ্দেশ্যে সেই সকল দেবতাদের নিকট নিজের বদলে পশুকে নিষ্ক্রয় করেন; অতএব যাগে যে পশু দেওয়া হয়, তাহা যজমানের ই প্রতিনিধি;—পুরোডাশ আবার পশুর নিষ্ক্রয়। অতএব পুরোডাশও যজমানেরই প্রতিনিধি। ক্রমশঃ শাস্ত্রের মর্ম্ম অবধারণের সঙ্গে সঙ্গে প্রতীতি হইল যে দেবতাগণকে সর্ব্বস্ব দান ও আত্মসমর্পণ করাই উচিত। তাহার পরিবর্ত্তে নিষ্ক্রয়-স্বরূপ, পশু বা দ্রব্য দান তাহার তুল্য হইতে পারে না; এইজন্যই ভগবদ্গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—

"শ্রেয়ান্ দ্রব্য-ময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে" ॥

"নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্র মিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগ সংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥"

অর্থাৎ দ্রব্য ত্যাগরূপ যজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। যে হেতু হে পার্থ সমুদয় কর্ম জ্ঞানের অন্তর্ভূক্ত হয়। অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্মের ফলস্বরূপ হইতেছে জ্ঞান।
ইহলোকে তপস্যা, যাগাদির মধ্যে কোন যজ্ঞ, জ্ঞান-যজ্ঞের তুল্য পবিত্র নহে; কর্ম্ম-যোগে সিদ্ধ হইলে, (যোগ্যতা প্রাপ্ত হইলে) এই জ্ঞান স্বতঃই লাভ হইয়া থাকে; ভগবানকে সর্ব্বস্ব-দান ও আত্ম-সমর্পণ বিধেয়; আমাদের যাহা কিছু আছে, সমস্তই ভগবানের, অতএব সমস্তই ভগবানের কার্য্যে অর্থাৎ তাঁহার সেবা পূজায় ও তাঁহার সৃষ্ট জীবের মঙ্গলার্থে ব্যয় করা কর্ত্তব্য; এতদ্ভিন্ন আমাদের ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি ও ঐ কার্য্যেই নিয়োজিত করা উচিত; যাবতীয় কার্য্যই তাঁহার সেবা পূজা স্বরূপে সম্পাদন করা বিধেয়; অতএব যাবতীয় কার্য্য ভগবানের সেবা পূজা ভাবেই সম্পাদিত করিতে হইবে, ক্রমশঃ মনের এইরূপভাব জন্মিয়া থাকে; মনের এইরূপ ভাব জন্মিলে, যজ্ঞশব্দ ক্রমশঃ যেরূপ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা প্রবন্ধমধ্যে যথাসাধ্য বর্ণনা করিয়াছি। তবে প্রাচীন ধর্ম্মানুষ্ঠান একেবারে লোপ করা যায় না; তৎ পরিবর্ত্তে অন্ততঃ অন্য কিছু করিতেই হয় ' ঐ জন্য প্রাচীন যজ্ঞানুষ্ঠানের পরিবর্ত্তে 'ইদানীং তান্ত্রিক ও পৌরাণিক পূজা পদ্ধতির প্রচলন হইয়াছে; যজ্ঞ সম্পাদন পূর্ব্বক, ইড়া কিম্বা পশু উৎসর্গ করিয়া, তাহার শেষ ভক্ষণে, দেবতার সহিত তাদাত্ম্য লাভ হইয়া থাকে; পূজাদির উদ্দেশ্যও তাহাই; ইড়াদেবী হইতেছেন বাক্-দেবী; ইহা "যজ্ঞকথার" ইষ্টিযাগ প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে; বেদপন্থীর বাক্‌দেবীকেই তন্ত্রে "মাতৃকা সরস্বতী" বলা হইয়াছে। ইনি "শব্দাত্মিকা"; অ হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত পঞ্চাশবর্ণে ইহার দেহ নির্ম্মিত। অঙ্গে অঙ্গে অক্ষর বসাইয়া ইঁহার বর্ণময় দেহ নির্ম্মিত।

এইজন্য ইনি "পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্তা ইনি "ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধ চন্দ্রশকলা" অর্থাৎ ইহার ললাটে সোমকলা নিবদ্ধ হইয়া শোভা পাইতেছে; ইনি ত্রিনয়না; ইনি সর্ব্বদেবময়ী; পূজক যে কোন দেবের পূজায় বসিয়া আপনার স্থূল ও অন্তঃশরীর ও চক্রে চক্রে বর্ণবিন্যাস করিয়া, মাতৃকা, অন্তর্মাতৃকা ন্যাস করিয়া, দেবতার সহিত নিজের অভিন্নতা সাধন করেন; বৈদিকযজ্ঞে, ইড়া ভক্ষণের তাৎপর্য্য যেমন যজমানের সঙ্গে ইড়া-দেবতার, বাগ্‌দেবীর শব্দব্রহ্মের ঐক্যসম্পাদন; তান্ত্রিকপূজায়ও ঐ এক অভিপ্রায়। অতএব তান্ত্রিক ও পৌরাণিক পূজা, বৈদিক-যজ্ঞের স্থান অধিকার করিয়াছে। যে সকল আস্তিক মনুষ্য বৈধ-হিংসায় দোষ দেখেন না, তাঁহারা পূজায় পশুবলি দেন। পশু নিজেরই প্রতিনিধি; তাৎপর্য্য—দেবতার উদ্দেশ্যে আত্মবলিদান। অর্থাৎ দেবকার্য্যেই নিজের যাবতীয় ধন সম্পত্তি, নিজের শক্তি, বুদ্ধি নিয়োগকরণ। দুর্গোৎসব এখন সোমযাগের স্থান অধিকার করিয়াছে; ইহাও উক্ত যাগের ন্যায় ৫ দিনে নিষ্পান্ন। বোধন হইতে বিসর্জ্জন করিতে ৫ দিনই লাগে। বৈদিক যজ্ঞের পরিবর্ত্তে পৌরাণিক ও তান্ত্রিকপূজা-পদ্ধতি পাইয়া আমাদের

লাভ কি লোকশান হইয়াছে বুঝি না। তবে আজিকাল প্রায় সকলের জীবনযাত্রাই ভোগার্থ, ত্যাগমূলক নহে।

যজ্ঞমাত্রই ত্যাগমূলক। ইদানীং ভোগই জীবনের লক্ষ্য হওয়ায় কাহারও যজ্ঞ করিবার ইচ্ছা হয় না। বলিদান দিয়া যে দেবদেবীর পূজা করা যায়, তাহা আর দেবতার সঙ্গে তাদাত্ম্য সম্পাদন জন্য করা হয় না। ভোগলালসাতৃপ্তি বা বাহ্যাড়ম্বর জন্যই করা হয়; কারণ এখন আর ত্যাগে বা বৈরাগ্যে লক্ষ্য নাই ভোগ ও বিলাসিতা চরিতার্থ করণেই লক্ষ্য। এইজন্যই বাহ্যজগতের উপর আধিপত্যের দিকে, ইয়ুরোপীয়-বিজ্ঞানের দিকে, প্রায় সকলের নজর পড়িয়াছে; সকলেই মনে করিতেছে, বিজ্ঞানের দ্বারা জগৎকে বশে আনিয়া ভোগলালসা চরিতার্থ করাই পরমপুরুষার্থ; চার্ব্বাকদর্শনের প্রাদুর্ভাব কালে আর একবার আমাদের দেশের এইরূপ মতিগতি হইয়াছিল; এখনকার ন্যায় তখনও ভোগ লালসা চরিতার্থ করা বা ইন্দ্রিয়সুখই পরমপুরুষার্থ ছিল; তখনও এখনকার ন্যায়, "যাবৎ জীবেৎ, সুখং জীবেৎ; ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" এইরূপ মতবাদ প্রচলিত ছিল; আমার বিবেচনায় আজিকালিকার অবস্থা, চার্ব্বাকের সময়ের অবস্থারই নূতন ও সংশোধিত সংস্করণ; চার্ব্বাকের প্রভাব এ দেশে বেশী দিন স্থায়ী ছিল না; এ দেশ তাহা ত্বরায় অতিক্রম করিয়াছিল; এখনকার মোহও এদেশে বেশী দিন স্থায়ী হইবে না আমার ইহা বিশ্বাস, তবে কতদিন পরে যে এই মোহত্যাগ হইবে, তাহা বলা যায় না। কারণ মোহটি বড় প্রবল হইয়াছে। বহির্জগতের উপর আধিপত্যের জন্য যে প্রভাব, প্রতিপত্তি ও সুখ হয়, রাবণরাজত্বের তাহার পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল। অগ্নি, পবন, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, এমন কি যমও রাবণরাজার আজ্ঞাকারী ছিলেন। তিনিও যখন ঐশ্বর্য্যমদে গর্ব্বিত হইয়া ব্রহ্মবিদ্যা লোপের চেষ্টা করিলেন (সীতা হরণ করিলেন) অর্থাৎ জ্ঞানহারা হইতে লাগিলেন তখনই ভগবানের কৌশলে, নগণ্য নরবানরের হস্তে, তাঁহার পতন হইল; রামায়ণে এই শিক্ষা দিয়াছেন। সুদৃঢ় ও সুবিস্তৃত রোমরাজ্যেও যখন বিলাসিতা প্রবেশ করিল তখন তাহাও নগণ্য "গথ ভ্যাণ্ডেন" কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছিল; অতএব বহির্জগতের উপর আধিপত্যজনিত, প্রতিপত্তি ও সুখ স্থায়ী নহে; ইহা ছাড়া অন্য আর এক জগৎ আছে; তাহা হইতেছে, অন্তর্জগৎ; এই জগতের উপর আধিপত্য করিবার জন্যই আমাদের শাস্ত্রের আদেশ ও উপদেশ। ইহার জন্যই যজ্ঞ করিবার বিধি; তাহার জন্যই পূজা করিবার ব্যবস্থা; আশাকরি, আমরা শাস্ত্রের এই উপদেশ ভুলিব না; শিক্ষা ও অনুষ্ঠানের অভাবে, দ্রব্যত্যাগরূপ অর্থাৎ পুরোডাশ বা পশুবলিদানরূপ, দ্রব্যযজ্ঞ করিতে না পারিলেও আশাকরি আমরা আমাদের যথাসর্ব্বস্ব ও মন, প্রাণ শক্তি ও বুদ্ধি ভগবানের পূজায় ও তাঁহার সৃষ্ট জীব ও জগতের মঙ্গলার্থে উৎসর্গ করিয়া, ব্যাপকভাবে যজ্ঞসম্পাদনের চেষ্টা পাইব; ঐরূপ যজ্ঞার্থেই শ্রীশঙ্কর, শ্রীগৌরাঙ্গদেবও জগতের যাবতীয় মহাত্মাগণ নিজ নিজ মন প্রাণ বুদ্ধি উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন; ঐরূপে যজ্ঞ করিবার অধিকার জন্য, আমাদের প্রত্যেকের জীবন ব্যয়িত করা উচিত; সর্ব্ব-

দাই ভগবদ্গীতার ভগবানের উক্তিটি স্মরণ রাখিতে হইবে যে "যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ"। এবং "যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ"। অর্থাৎ যজ্ঞভিন্ন (ত্যাগাত্মক কর্ম্ম ভিন্ন) ভোগার্থে জীবন ব্যয়িত করিলে, বন্ধন আইসে; পক্ষান্তরে যজ্ঞসম্পাদন করিয়া, অবশিষ্ট যাহা থাকে, কেবলমাত্র তাহা ভোগ করিলে, সকল পাপ হইতে মুক্তি ঘটে। অতএব ভোগার্থে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সুখের জন্য বা বিলাসিতা চরিতার্থ জন্য জীবন ব্যয় করিও না; যজ্ঞার্থে অর্থাৎ ভগবানের পূজা ও তাঁহার সৃষ্ট জীবের মঙ্গলার্থে নিয়োজিত কর।—তবে এস্থলে ইহাও বলা কর্ত্তব্য যে, এইরূপ ভাবে কার্য্য করিব বলিলেই এরূপভাবে কার্য্য করা যায় না; ইহার জন্ম অধিকারী হইতে হয়। ইহার অধিকার অর্জ্জন করিতে হইলে, প্রথমতঃ শিক্ষার প্রয়োজন। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে, বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদন করিতে না পারিলেও স্মৃতির নির্দ্দিষ্ট পঞ্চযজ্ঞ সম্পাদনের অভ্যাস করিবে। বিদ্যাধ্যয়ন ও বিদ্যাদান রূপ ঋষিযজ্ঞ, শ্রাদ্ধ তর্পণাদি অনুষ্ঠানরূপ পিতৃযজ্ঞ, হোম ও পূজারূপ দেবযজ্ঞ, অতিথিসৎকাররূপ নৃযজ্ঞ, পশু, বিশেষতঃ গোপালনরূপ ভূতযজ্ঞ সম্পাদন করতঃ অবশিষ্ট দ্রব্যাদি ভোগ করিবে; ঐরূপ করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি হইলে, ব্রহ্ম-সত্তা তাবৎ পদার্থেই অনুস্যূত বলিয়া জ্ঞান হইবে; তখন বুঝিবে, যে উপাস্য অগ্নিদেবে, যে ব্রহ্ম সত্তা অনুস্যূত, সেই ব্রহ্মসত্তা আবার যজমানের মধ্যেও অনুস্যূত এমন কি যজ্ঞীয় উপকরণেও অনুস্যূত। তখন স্পষ্ট প্রতীতি হইবে, যে, এক ব্রহ্মসত্তাই যজ্ঞের উপকরণে, যজ্ঞে, যজ্ঞের উপাস্য দেবতাতে এবং যজ্ঞের উপাসকে অনুপ্রবিষ্ট; তখন ভগবদ্গীতার নিম্নলিখিত শ্লোকটি হৃদয়ঙ্গম হইবে যথা—ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ, ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতং"। এইরূপ প্রতীতি হইলে পর, আমরা যাবতীয় কার্য্য ভগবানের সেবা স্বরূপে সম্পাদন করিতে সক্ষম হইব, তখন আমরা আমাদের যথাসর্ব্বস্ব—আমাদের ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, বুদ্ধি, ভগবানের সেবা পূজাদি কার্য্যে ও তাঁহার সৃষ্ট জীব জগতের মঙ্গলার্থে নিয়োজিত করিতে সমর্থ হইব। তদন্যথায় অর্থাৎ এইরূপ অধিকার না জন্মিলে ও শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইতে বিরত হইলে, "ইতঃ ভ্রষ্ট স্ততো নষ্টঃ" হইতে হয়। এতএব বৈদিকযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে না পারিলেও, স্মৃত্যুক্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইতে বিরত হইও না। কেবল ভোগলালসা চরিতার্থ করিবার জন্ম জীবন নষ্ট করিও না। বলা বাহুল্য, কেবল ভোগ লালসা চরিতার্থ জন্য জীবন যাপনকে শাস্ত্র তীব্রস্বরে নিন্দা করিয়াছেন; বলিয়াছেন :—

"অঘং স কেবলং ভুঙ্‌ক্তে, যঃ পচত্যাত্মকারণাৎ"

অর্থাৎ, যিনি কেবল নিজের ভোগের জন্য পাকের আয়োজন করেন, তিনি "পাপ" ভক্ষণ করেন, অতএব কদাচ যজ্ঞানুষ্ঠানে বিরত হইবেন না। যাঁহার যেরূপ অধিকার তিনি সেই যজ্ঞই করিবেন; দ্রব্যত্যাগরূপ যজ্ঞ, যথা অগ্নিতে হবিদানরূপ, কি আতুরে অন্ন বস্ত্র দানরূপ যজ্ঞ কিম্বা তপঃস্বরূপ যজ্ঞ বা চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যজ্ঞ, বা বেদপাঠ ও বিদ্যাদান রূপ যজ্ঞ বা ইন্দ্রিয়সংযমরূপ যজ্ঞ বা অতিথি সেবারূপ যজ্ঞ ও পশু, বিশেষতঃ গোপালনরূপ

যজ্ঞ কিম্বা জপ-যজ্ঞ যাহাতে যাঁহার অধিকার তিনি তাহাই ঈশ্বর তৃপ্ত্যর্থ সম্পাদন করুন, তাস পাশা খেলিয়া, বায়স্কোপাদি দেখিয়া বা পরচর্চা পরনিন্দায় বা বৃথা গল্পগুজবে অমূল্য জীবন নষ্ট করিবেন না। পশুর ন্যায় খাইয়া, ঘুমাইয়া ও নাকাইয়া ফুঁকিয়া জীবন শেষ করিবেন না। ভগবান্ আমাদিগকে বিবেক, বিচার বুদ্ধি ও শাস্ত্র দিয়াছেন; তাহার সদ্-ব্যবহার করতঃ মনুষ্যনামের সার্থকতা করিবেন।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে ভগবান্ গীতা শাস্ত্রে যজ্ঞকে নিন্দা করিয়াছেন ও কর্ম্ম-কাণ্ডকে লোপ করিবার জন্য বেদের উপনিষদোক্ত জ্ঞানকাণ্ডের প্রচার করা হইয়াছিল। ইহা বাজে কথা। ভগবান্ গীতা শাস্ত্রে বলিয়াছেন :—

সহ-যজ্ঞা প্রজাঃ সৃষ্টাঃ পুরোবাচ প্রজাপতিঃ
অনেন প্রসবিষ্যধ্বং এষো বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥

অর্থাৎ প্রজাপতি যজ্ঞের সঙ্গে প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন ও বলিয়া দিয়াছেন এই যজ্ঞ দ্বারাই তোমরা বৃদ্ধি পাইবে ও তোমাদের কামনা পূরণ হইবে "যজ্ঞ শিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ। যাঁহারা যজ্ঞের হবিঃশেষরূপ অবশিষ্ট যাহা ভোগ্যদ্রব্য থাকে তাহাই ভক্ষণ করেন, তাঁহারা সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হন।

"যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম-সনাতনম্"।

অর্থাৎ যজ্ঞের হবিঃশেষই অমৃত, ঐ অমৃত ভোজনে ব্রহ্মলাভ হয় ইত্যাদি বহুশ্লোক ভগবদ্গীতায় আছে, যাহাতে ভগবান্ যজ্ঞ সম্পাদনের প্রশংসাই করিয়াছেন। যজ্ঞকে পশুকরা দূরে থাক বেদের জ্ঞানকাণ্ড জীবনের যাবতীয় কার্য্যকে যজ্ঞস্বরূপে সম্পাদন করিবার উপদেশ দিয়া যজ্ঞের প্রসারই করিয়াছেন। অতএব ঐরূপ উক্তিতে কান দিও না। জীবনের যাবতীয় কার্য্য যজ্ঞাঙ্গ ভাবিয়া পবিত্রভাবে সকল কার্য্য সম্পাদন কর। আহার বিহার সঙ্গে ধর্ম্মের সম্বন্ধ নাই এইরূপ বিদেশী মত ত্যাগ কর। তোমার জীবনযাত্রা যেমন জীবনব্যাপী যজ্ঞস্বরূপে যাপন হয় ঐদিকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখ। উপনিষদে এইরূপই উপদেশ দিয়াছেন যথা "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ, এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে। অর্থাৎ যাবজ্জীবন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন কর ও শতবর্ষ জীবিত থাকিতে ইচ্ছা কর; এবংপ্রকারে যাবজ্জীবন কর্ত্তব্য করিলে কর্ম্মবন্ধন আসিবে না। সংসার ত্যাগের সোয়াস্তি হইতে কর্ত্তব্য সম্পাদন জাত আনন্দ শতগুণে শ্রেয়ঃ। সংসার ত্যাগের সোয়াস্তি অপেক্ষা ইহা শতগুণে কর্ত্তব্য; ইহা হইতেই ক্রমশঃ দেবত্ব জন্মায়। অতএব যাবজ্জীবন জীবনের যাবতীয় কর্ম্ম যজ্ঞস্বরূপে, পূজাস্বরূপে সম্পাদন কর।

শ্রীহট্ট বৈদিকসমিতির সভাপতিমহাশয়ের অভিভাষণ।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এল,)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের অন্বেষণ করাই ব্রাহ্মণের একমাত্র কর্ত্তব্য। অসত্য অনিত্য বস্তু পরিহারপূর্ব্বক নিত্যবস্তুর অনুধাবন করাই যথার্থ ব্রাহ্মণ-প্রকৃতি। যাহাতে শাশ্বত আনন্দ ও শান্তি আছে, সেই ভগবদ্ধ্যানে নিত্যনিযুক্ত থাকাই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম।

সচ্চিদানন্দে আসক্তি-মহিমা অতি সহজেই অনুমিত হইতে পারে। অনিত্য স্ত্রীপুত্র বিষয়াদিতে আসক্তি, যে আনন্দ উৎপাদন করে তাহাতে নানাবিধ পঙ্কিলতা আছে। শরীর ব্যাধিমন্দির ও বিলীনশীল হওয়াতে সংসারমমতায় নিত্য মনস্তাপ ও অশান্তি আছে। বিষয়সম্পত্তি রক্ষার জন্য নিত্যই ব্যস্ত থাকিতে হয়। সংসারাসক্তি ত্রিতাপের একমাত্র জনয়িত্রী। যাঁহার সংসারাসক্তি নাই, তাঁহার রোগও নাই, শোকও নাই, দারিদ্র্যও নাই। তাঁহার রোগ নাই, কারণ তিনি নিত্য সত্বভাবাপন্ন; সংযত পবিত্র আহারাদিতে তাঁহার দেহ চিরপবিত্র থাকে। তাঁহার শোক নাই, কারণ তিনি কাহাকেও "আমার" বলিয়া জানেন না; সুতরাং কাহারও বিরহে তাঁহার কাতর হইবার কারণ নাই। তাঁহার দারিদ্র্য নাই কারণ তিনি ভগবচ্চিন্তাসম্ভূত পরমানন্দস্বরূপ ঐশ্বর্য্যের নিত্য অধীশ্বর। সুতরাং তাঁহার ত অভাব নাই। অতএব নিত্যবস্তু ভগবান্ ও ব্রাহ্মণানুসৃত ধর্ম্ম যে মানবের আসক্তির পক্ষে পরমস্থানের অধিকারী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য জটিল শাস্ত্রবিচারের প্রয়োজন হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের জীবনের অনুভব হইতে এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন। হে পুণ্যময়! ব্রহ্মোপাসক! আবার তোমার আসন গ্রহণ কর। আবার ব্রহ্মানুশীলন করিয়া পরমানন্দলাভ কর, আত্মার উদ্ধারসাধন কর জগৎকে মুক্ত কর।

"ধর্ম্মানুষ্ঠানায় দেশকালপাত্রাদীনাং পবিত্রতা অনুষ্ঠানদ্রব্যাদীনাঞ্চ বিশুদ্ধতা সম্পাদনীয়া।"

ধর্ম্মসাধনের জন্য তদুপযুক্ত পবিত্র স্থানের প্রয়োজন। পুরীষাদি কলুষিত স্থানে ধর্ম্মানুষ্ঠান করা যায় না। অপবিত্রাচার ব্যক্তিরা যে স্থানে বাস করে, সেই স্থানেও আরাধনা হয় না। নির্জ্জন বনে পবিত্রতা আছে। সেই জন্যই মুনি ঋষিরা বনে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া তথায় তপস্যা করিতেন। মানবের বাস যেখানে আছে, সেইখানেই কিছু না কিছু অপবিত্রতা আছে। কোন স্থানে বা বিষ্ঠা নিক্ষেপ করা হইয়াছে, কোন স্থানে উচ্ছিষ্টের সংস্পর্শ আছে, কোন স্থান বা অন্যভাবে কলুষিত আছে। মানবের বসতি স্থান কলুষিত বলিয়া দেবারাধনার্থ মন্দির সৃষ্টি হইয়াছে। মন্দিরে দেবারাধনা, ভগবচ্চিন্তা ও ভগবদালাপছাড়া অন্য ক্রিয়া নিষিদ্ধ। আমাদের দেশে দেবগৃহে বিষয়ালাপ, ধূমপান ইত্যাদি প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু

ইহাতে দেবালয়ের বিশুদ্ধতা লঙ্ঘনের পাপ হয়। অপবিত্র বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া দেবগৃহে প্রবেশ করিলেও মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট হয়। নিয়মিত স্নান করতঃ বিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া দেবমন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়।

কিন্তু দেশ ও কালের পরিধিবর্দ্ধন করা এই ব্যাপারে ব্রাহ্মণদের কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ যে কেবল দেবমন্দিরের পবিত্রতা রক্ষা করিবেন তাহা নয়। ভগবৎসাধনবলে সমস্ত ভারতবর্ষকে ও সমস্ত পৃথিবীকে দেবমন্দিরের পবিত্রতা দান করিবেন। আর কালের কথা? এই কলিকাল পাপের লীলাযুগ। এই কলিকলুষে সমস্ত জগৎ এমন কি ধর্ম্মভূমি ভারতবর্ষও কলুষিত। ব্রাহ্মণের ঈদৃশ কঠোর সাধনা প্রয়োজন, যেন সর্ব্বগ্রাসী কলিকলুষ আর জীবের অনিষ্ট না করিতে পারে। সাধন চাই, সাধনেই সিদ্ধি হয়। এই সাধনই ব্রাহ্মণের সাধন। এই সাধন যিনি করেন তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ।

উপাসকের দেহশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি না থাকিলে উপাসনা সিদ্ধি হয় না। উপাসকের দেহ-শুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধির প্রথম সোপান অসৎসঙ্গ পরিহার ও সৎসঙ্গে বিহার। অসৎসঙ্গে থাকিলে অসদাচার দ্বারা দেহ অপবিত্র হয়। অসচ্চিন্তা দ্বারা মন অপবিত্র হয়। সুতরাং অসৎসংসর্গ সম্যক্ পরিহার করিতে হইবে। সাধুসংসর্গের মহিমা অপার। সাধুজনের দৃষ্টিতে নয়ন পবিত্র হয়, সংস্পর্শে দেহ পবিত্র হয়। সেই জন্যই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মহাপুরুষেরা সাধুসঙ্গকে এত উচ্চে অধিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতি রেকা।
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥

বৈষ্ণবশাস্ত্রকারেরাও সাধুসঙ্গের অশেষ গুণকীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে একসময়ে সাধুসঙ্গ সুলভ ছিল। সমস্ত ভারতবাসীই সত্যনিষ্ঠ, ধর্ম্মপরায়ণ ও সচ্চরিত্র ছিল। কিন্তু কলির প্রভাবে ও ম্লেচ্ছজাতির পাপ সংস্পর্শে আজ ভারতবর্ষে সাধু-সঙ্গ দুর্লভ বস্তু। যাঁহারা ভগবানে আসক্ত সদ্‌ব্রাহ্মণ কি সাধুসজ্জন, তাঁহারা সকলেই অসাধুর অত্যাচারের ভয়ে নির্জ্জনে আত্মগোপন করিয়া পাপের লীলাখেলা সন্দর্শন করিতেছেন। কি ভয়ঙ্কর জিনিস! মনুষ্যত্ব নিষ্পেষিত হইতে বসিয়াছে। একসময়ে মানুষ সাধু-সংসর্গের জন্য পাগল হইত; আজ সেই মানুষ পাপ ছাড়া কিছুই জানে না। হে ব্রাহ্মণ! এই পাপ প্রবৃত্তির উত্থানের জন্য তুমি দায়ী। তুমি যদি তোমার স্থানে থাকিয়া মানব জাতিকে পবিত্র করিতে চাও, কাহার সাধ্য, তোমার গতিরোধ করে? আর তুমিও যদি আপাতমধুর পাপলালসার প্রশ্রয় দাও, তাহা হইলে আর ভারতবর্ষের উদ্ধার নাই। যে ভারত ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, সেই ব্রাহ্মণ না দাঁড়াইলে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতে পারে, এমন কোন শক্তি এই পৃথিবীতে নাই।

"বহিঃশুদ্ধিমন্তঃশুদ্ধিঞ্চ কৃত্বা অর্চ্চনাদীনমুতিষ্ঠেৎ।"

দেহশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধিকেই শাস্ত্রকারেরা বহিঃশুদ্ধি ও অন্তঃশুদ্ধি নাম দিয়াছেন। বহিঃশুদ্ধি

ও অন্তঃশুদ্ধির জন্য আহ্নিকাদি যে সমস্ত নিত্যক্রিয়ার বিধান রহিয়াছে, তাহা যথাযথভাবে সম্পন্ন করিতে হইবে। ত্রিসন্ধ্যাপূত ব্রাহ্মণের দেহে ও চিত্তে মলিনতা থাকে না। এই বহিঃশুদ্ধিও অন্তঃশুদ্ধি সাধনের ফলে দেহে ও মনে রোগাদি উৎপন্ন হয় না। অপবিত্র, অপরিচ্ছন্ন ও নিত্যক্রিয়াবিহীন হইলে যে দেহ রোগাক্রান্ত হয়, তাহা অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। সেইরূপে চিত্ত দুঃশ্চিন্তা বা কুচিন্তা দ্বারা প্রবলভাবে আক্রান্ত হইলে উন্মাদ প্রভৃতি রোগের উৎপত্তি হয়। যে নিত্য মদ্যপানের চিন্তা করিয়া থাকে, সে যদি দুই দিন মদ্য ক্রয়ার্থ অর্থ না পায়, সে নিশ্চয়ই উন্মাদরোগে আক্রান্ত হইবে। সাধনভজনে বহিঃশুদ্ধি ও অন্তঃশুদ্ধির প্রভাব এত বেশী যে, ইহা ছাড়া সাধনভজন হয়ই না।

আদর্শ সাধকগণের বহিঃশুদ্ধি ও অন্তঃশুদ্ধি প্রণালীতে অনেক জটিলতা আছে বটে। সকলে সেই ভাবে বহিঃশুদ্ধি ও অন্তঃশুদ্ধি করিতে হয়ত পারিবেন না। কিন্তু সাধারণভাবে বহিঃশুদ্ধি ও অন্তঃশুদ্ধি সাধন সকলেরই উচিত। তজ্জন্য নিত্যস্নান ও পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে। ত্রিসন্ধ্যায় আহ্নিক করিতে হইবে। বিশুদ্ধ বস্তু আহার করিতে হইবে। বিশুদ্ধ পানীয় পান করিতে হইবে। শয্যাদি পরিষ্কার রাখিতে হইবে। মন্দ সংসর্গ কুৎসিত সাহিত্যাদিপাঠ ও কুচিন্তা পরিহার করিতে হইবে। এই সমস্ত কার্য্য করিলেই বহিঃশুদ্ধি ও অন্তঃশুদ্ধি হইবে। কঠিন প্রাণায়ামেরও প্রয়োজন নাই। সাধকের শীতাতপ-সহিষ্ণুতারও প্রয়োজন নাই। কেবল দৈনিক আহারবিহারাদিতে পরিচ্ছন্নতার দরকার।

যজ্ঞশীল ব্রাহ্মণের অন্তঃশুদ্ধি ও বহিঃশুদ্ধি যেরূপ প্রয়োজনীয় যজ্ঞের দ্রব্যাদির পবিত্রতা ও তাদৃশ প্রয়োজনীয়। পবিত্র ঘৃত, দুগ্ধ, মধু ইত্যাদি প্রয়োজন। আজকাল ম্লেচ্ছরাজার অনুগ্রহে ভারতবর্ষে অবাধে গোহত্যা ও চর্ম্মের বাণিজ্য চলিতেছে। গোপালন নাই। যজ্ঞের উপযুক্ত বিশুদ্ধ ঘৃতাদি পাওয়া যায় না। এই অভাব দূর করিতে হইলে প্রতি গৃহে গোপালনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রাচীন প্রথানুযায়ী সর্ব্বত্র গোপ্রচারার্থ ভূমি রাখিতে হইবে। এই গোপালন ও গোসেবা অতীব পুণ্যাত্মক। পবিত্র দুগ্ধ ঘৃতাদি গ্রহণেই সেই পুণ্যের আভাস পাওয়া যায়। প্রত্যেক ব্রাহ্মণ ও প্রত্যেক হিন্দুর ইহা নিত্য স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যে গৃহে গো ও তুলসী নাই, সেই আবাস অপবিত্র; তাহাতে ব্রাহ্মণ কি কোন হিন্দুর বাস করা উচিত নয়।

কিরূপভাবে সমস্ত বিষয়ে ব্রাহ্মণাচার রক্ষা করিতে হয়, তাহা শাস্ত্রকারেরা বিশেষভাবে লিখিয়া গিয়াছেন। এই ব্রাহ্মণাচার রক্ষা জগতে যত বর্দ্ধিত হইবে, ততই জগতের মঙ্গল। ততই জগৎ মুক্তির দিকে অগ্রসর হইবে। এই ব্রাহ্মণাচার প্রতিপালনে চিত্ত শান্ত ও নিবৃত্তিমুখ হয়। যদি কেহ জানে যে, আতপতণ্ডুলের অন্ন ও বিশুদ্ধ ঘৃতই শ্রেষ্ঠ খাদ্য, সেই ব্যক্তি কখনও মদ্যমাংসাদির অন্বেষণ করিবে না। যদি কেহ জানে যে শীতাতপ সহিষ্ণু না হইলে সাধন হয় না, সে কখনও বেশভূষার জন্য লালায়িত হইবে না। ব্রাহ্মণাচার প্রতি-পালনই নিবৃত্তিমার্গে গমনের প্রথম সোপান। সকলের পক্ষেই ব্রাহ্মণাচার অবলম্বন কর্ত্তব্য।

ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণগণ শিক্ষা, নীতি ও ধর্ম্মের কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহাদের শিক্ষায় যথার্থ ও মনুষ্যত্বের উদয় হইত। ম্লেচ্ছজাতির প্রবর্ত্তিত শিক্ষায় অজ্ঞানতা ও মোহ দিন দিন বাড়িতেছে। মানুষকে পশুত্বের দিকে আকর্ষণ করিয়া, তাঁহার জীবন ব্যর্থ করিতেছে। ম্লেচ্ছদেশে নীতি বলিয়া কোন বস্তু নাই। "পরকে প্রবঞ্চনা করিতে পার, কেবল দেখিও যেন ধরা না পড়" ইহা ম্লেচ্ছনীতি। আদালতে উপস্থিত হইয়া যত ইচ্ছা মিথ্যা কথা বলিতে পার; কেবল আইন বাঁচাইয়া কাজ করিবে" ইহা ম্লেচ্ছনীতি। "বলে হউক, কৌশলে হউক, প্রজার অহিত সাধন করিয়াই হউক, রাজস্ব বৃদ্ধি করা চাই। রাজকর্ম্মচারীদের মদ্যমাংসাদি চাই" ইহা ম্লেচ্ছনীতি। "জীবনে আর কিছু হউক আর নাই হউক ভোগ চাই, বিলাস চাই, অর্থ চাই" ইহা ম্লেচ্ছনীতি।

এই ভারতে যাহারা ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম পরিহারপূর্ব্বক অনাচারী হইয়াছে, তাহারা নাই; নষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে। যাঁহারা আজও পিতৃপিতামহের ধর্ম্মরক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা আজও সুখে আছেন, শান্তিতে আছেন। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অধঃপতন স্বধর্ম্ম, পরিত্যাগের পরিণাম। ভারতবর্ষের উদ্ধারের জন্য ব্রাহ্মণ চাই, ব্রাহ্মণের আশ্রয় চাই ব্রাহ্মণের শিক্ষা, দীক্ষা ও ত্যাগ চাই।

ব্রাহ্মণের শিক্ষা, দীক্ষা, ধর্ম্ম ও নীতির পুনর্ব্বার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যেক স্থানে টোল স্থাপন করিয়া তাহাতে জ্ঞানী ও শিক্ষিত অধ্যাপক নিযুক্ত করিতে হইবে। দেশে নিয়মিত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানের জন্য গোপালন করিতে হইবে। পূজোপকরণ তুলসীবৃক্ষাদি রক্ষা করিতে হইবে। ম্লেচ্ছ দেশাগত বা ম্লেচ্ছানুকরণে প্রস্তুত খাদ্যপানীয়াদির প্রচলন দেশে বন্ধ করিতে হইবে। মদ্যমাংসাদির ব্যবসা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। স্ত্রীলোকের বেশ্যাবৃত্তি বন্ধ করিতে হইবে। ম্লেচ্ছের মিথ্যাচারক্ষেত্রে আইন আদালত অমান্য করিতে হইবে। সম্পূর্ণ ভাবে ভোগবিলাসেচ্ছা পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাচীন ভারতানুসৃত নির্ম্মল ও শান্ত নিবৃত্তি পথে আসিতে হইবে। তাহা হইলে আর প্রচুর অর্থেরও প্রয়োজন হইবে না। অর্থ অর্থ করিয়া সমস্ত জীবন ব্যয়িত করিতে হইবে না। মানসিক উন্নতি ও আত্মার উন্নতি করিবার যথেষ্ট সময় থাকিবে। ভগবদারাধনার জন্য যথেষ্ট সময় থাকিবে জীবনের সার্থকতা হইবে। যথার্থ ভারত সন্তান বলিয়া জগৎ চিনিতে পারিবে। এইপুণ্যধাম হিন্দুস্থানের গৌরব রক্ষা হইবে।

গুরুর পদ বড় দায়িত্বের পদ বটে। ব্রাহ্মণ যখন বর্ণের গুরু তখন তাঁহার আদর্শেই অন্যান্য বর্ণেরা পরিচালিত হইবে। ব্রাহ্মণ যেভাবে কার্য্য করিবেন বা যেরূপ উপদেশ দিবেন অন্য বর্ণেরা তদনুযায়ী কার্য্য করিবে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, আজকাল ব্রাহ্মণের উপদেশানুসারে কেহ কার্য্য করে না। এইরূপ কথার কোন মূল্য নাই। কারণ ব্রাহ্মণের শাস্ত্রাদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর সত্য ঈদৃশ শক্তিসম্পন্ন যে, একবার মানবের তাহাতে আকৃষ্ট করিতে পারিলে, আর মানব সত্য বিসর্জ্জন দেয় না। চিরকাল

সেই সত্যেরই উপাসনা করিয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্থলে নিষ্ঠাবান্ হিন্দুদের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। "যবনের অন্নাদি অপবিত্র" এই সত্য নিষ্ঠাবান হিন্দুর পরিজ্ঞাত আছে বলিয়া, নিষ্ঠাবান হিন্দুরা কখনও যবনান্ন গ্রহণ করেন না। এই ক্ষুদ্র সত্যটী লোককে বুঝাইবার জন্য অতি জ্ঞানী উপদেশকের প্রয়োজন। অপবিত্র স্পর্শাদি দ্বারা কিরূপে অন্নেতে অবিত্রতা সঞ্জাত হয়, তৎসম্বন্ধে বিশেষভাবে উপদেশ না দিলে, অনাচারী হিন্দুরা খানসামার হাতে খাওয়া ছাড়িবে না। হে ব্রাহ্মণসন্তানগণ! দীনদরিদ্র বৈষ্ণব যেমন প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত জগতে অমূল্য হরিনাম বিতরণ করিয়া বেড়ায়, আপনাদেরও সেইরূপভাবে ঘরে ঘরে গিয়া, মান অভিমান ত্যাগ করিয়া, সদুপদেশ প্রদানপূর্ব্বক পতিত হিন্দুদের উদ্ধারসাধন করিতে হইবে, পতিত জগদ্বাসীর উদ্ধারসাধন করিতে হইবে। এই কর্ত্তব্য সাধনে আপনাদের মানঅপমানে, সুখদুঃখে, কৃতকার্য্যতায় ও অকৃতকার্য্যতায় সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া কার্য্য করিতে হইবে। বিলাতপ্রত্যাগত স্বধর্ম্মত্যাগী ইণ্ডিয়ান সিভিলসার্ভিসধারী হিন্দু-যখন বলিবেন,"গোমাংস ও ছাগমাংসে বৈজ্ঞানিকমতে কোন প্রভেদ নাই; কেন গোক খাওয়া নিষিদ্ধ হইবে?" তখন তাহাকে উপদেশ দিতে গেলে, তিনি হয় ত আপনাদের উপর চর্ম্ম-পাদুকা নিক্ষেপ করিবেন। কিন্তু মনে রাখিবেন ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য বড় পবিত্র জিনিষ। যে ব্রাহ্মণ সেই পবিত্র কর্ত্তব্যসাধনে নিযুক্ত তাঁহার দেহস্পর্শে ম্লেচ্ছকল্প হিন্দুর নিক্ষিপ্ত সেই চর্ম্মপাদুকা স্বর্গের পবিত্রতা প্রাপ্ত হইবে। ব্রাহ্মণ যদি নিজে পবিত্র থাকেন, জগতের কোন অত্যাচার তাঁহাকে অপবিত্র করিতে পারে না। সুতরাং বৃক্ষবৎ সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া নিজের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবেন। অত্যাচার অপমান যেন কখনও আপনাদিগকে কর্ত্তব্য সম্পাদন হইতে বিরত না করে। এই কর্ত্তব্যসাধনে আর একটি বিঘ্ন আছে। অর্থের লোভ; বড় কঠিন জিনিষ। এই ব্যাপারে অর্থের লোভ আপনাদের একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে। অর্থলোভ বিষয়ত্যাগী ব্রাহ্মণকে আকর্ষণ করিতে পারে না। আপনারা বিষয়ী, সেই জন্য এইকথা বলিতে বাধ্য হইয়াছি। আপনাদের কর্ত্তব্য জগতের উদ্ধারসাধন। ইহা যদি না করেন, তবে আপনাদের জীবন নিষ্ফল।

এখন সমিতি কি কি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন এই বিষয়ের বিচার করিতে চাই। ধর্ম্মাধিকরণে দেখা যায়, যে আদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার শক্তি বিচারপতির নাই, বিচারপতিরা সে আদেশ দেন না। কারণ সেইরূপ আদেশ দিলে ধর্ম্মাধিকরণের গৌরব নষ্ট হয়। দৃষ্টান্তস্থলে দায়াবদ্ধ ভূমির উল্লেখ করা যাইতে পারে। যদি কেহ দায়াবদ্ধ ভূমি বিক্রয় করিয়া ফেলে ও দায়ধারী ব্যক্তি বিক্রয়-মূল্য ক্রোক করিবার জন্য ধর্ম্মাধিকরণে আবেদন করেন, বিচারপতি কখনও তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য করিবেন না ও ক্রোকের আদেশ দিবেন না। কারণ দায়গ্রস্ত ব্যক্তি ভূমি বিক্রয় করিয়া টাকা হয় ত খরচ করিয়া ফেলিয়াছে, কিম্বা কোন অজ্ঞাত স্থানে স্থানান্তরিত করিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় বিচারপতি টাকা ক্রোকের আদেশ দিলে, সেই আদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার কোন উপায়

নাই। সুতরাং সেরূপ আদেশ দেওয়া নিষ্ফল। সমিতি বা সম্প্রদায় সম্বন্ধেও এই বিধিই অবলম্বন করিতে হইবে। সমিতি সভ্যগণের উপর সেইবিষয়ে আদেশ করিবেন, যাহা কার্য্যে পরিণত করিবার শক্তি সমিতির আছে, অন্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া, সমিতি ব্যর্থাদেশ হইলে, সমিতির গৌরব নষ্ট হইবে। এই নিয়মটী যথাযথভাবে প্রতিপালন করিয়া সমিতির কার্য্য করিতে হইবে।

বৈদিক সমিতির প্রধান কর্ত্তব্য বৈদিক ধর্ম্মানুশীলন ও সামাজিক সদাচারের উপর দৃষ্টি রাখা। শাস্ত্রালোচনা, বেদপাঠ, বৈদিক ক্রিয়ানুষ্ঠান, সমাজের ব্রাহ্মণ-বালকগণের শাস্ত্রানুযায়ী শিক্ষা, ইত্যাদি বিষয়ে বৈদিকসমিতি বিধান করিবেন। হিন্দুসমাজে যদি কেহ ধর্ম্মবিরুদ্ধ আচার করে, তাহার যথোপযুক্ত বিধান করিবেন। কোন বিষয়ে যাহাতে ব্রাহ্মণশাস্ত্রের উল্লঙ্ঘন না হয়, তাহার বিধান করিবেন। দারিদ্র্যবশতঃ যে সকল ব্রাহ্মণ কি হিন্দু অসদ্বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতেছে, তাহাদের যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করিবেন। সংক্ষেপতঃ হিন্দুসমাজে যাহাতে কেহ স্বধর্ম্মত্যাগ করিয়া পতিত না হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন।

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তি স্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্॥

বৈদিকসমিতিতে কতিপয় সভ্য, সর্ব্বদাই দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, অপর কতিপয় সভ্য যদিও সম্পূর্ণ কুললক্ষণ বর্জ্জিত, তথাপি কৃত্রিমকৌলিন্য বলে, তাঁহাদের হস্তদত্ত অন্নগ্রহণ করেন না ও তাঁহাদেরসঙ্গে বিবাহাদি সম্বন্ধ স্থাপন করেন না। যথার্থ কৌলিন্যলক্ষণ উপরে উক্ত হইয়াছে। এই বিষয়ে বৈদিকসমিতি কেবল কুললক্ষণ রক্ষা করিবার জন্য সকলকে উৎসাহ ও উপদেশ দিতে পারেন মাত্র, এতদতিরিক্ত কিছু করিবার শক্তি, বৈদিকসমিতির কেন, প্রবলশক্তিসম্পন্ন কুটিলরাজেরও নাই। কারণ "ভিন্নরুচি র্হি লোকঃ।"

জগতে কাহারও রুচির উপর হাত দিবার কাহারও অধিকার নাই। কেহ কেহ হয়ত সদ্ব্রাহ্মণকে কুলহীন মনে করিয়া তাঁহার হাতের অন্নাদি ভোজন করেন না। আবার নিত্যানাচার কলুষিত ব্রাহ্মণের হাতের অন্নাদি তাঁহারা ভোজন করিয়া থাকেন। ইহা বিকৃত রুচির পরিণাম বলিয়া ধরিলেই আর কোন প্রশ্ন উঠে না। কেহ কেহ অনেক সময় সুপাত্র পরিত্যাগ করিয়া অসৎপাত্রে কন্যাদান করিয়া থাকেন; সুন্দরী সুস্বভাবসম্পন্না পাত্রী পরিত্যাগ করিয়া কুশ্রী অসচ্চরিত্রা পাত্রীর সঙ্গে নিজের পুত্রাদির বিবাহ দিয়া থাকেন। এই সকল সামাজিক কার্য্যের মধ্যে রুচিবিকার ছাড়া অন্যকারণ কিছুই নাই। যে সমস্ত সভ্যেরা এইরূপ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের রুচির সম্বন্ধে বৈদিক সমিতির বলিবার বা করিবার কি আছে? "আমার কন্যা আমি যেখানে ইচ্ছা বিবাহ দিতে পারি। আমি তোমার হাতে খাইব না। আমার রুচি হয় না" এই সমস্ত ব্যক্তিগত প্রবৃত্তির উপর বৈদিক সমিতি হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। সমাজে সুরুচি ও সত্যের

প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে বৈদিক সমিতি উপদেশ ও উৎসাহ প্রদান করিতে পারেন মাত্র। সুতরাং যাঁহারা এই বিষয়ে দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাঁহাদের দুঃখের কোন কারণ নাই। এইরূপ কার্য্যে অসদুদ্দেশ্য কিছুই নাই। প্রাচীনপ্রথা ও সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া অনেকে আহারাদি বিষয়ে এইরূপভাবে কার্য্য করিয়া থাকেন। প্রাচীন সংস্কারানুবর্ত্তী সভ্যদের প্রতি আমার বক্তব্য এই যে, তাঁহারা যেন এই বিষয়ে দেশ কাল পাত্র বিচার করিয়া কার্য্য করেন। যথার্থ সৎকুলোদ্ভব সদাচারনিষ্ঠ কেহ যদি অন্নাদি পরিবেশন করে, সেই অন্নগ্রহণে আপত্তির কারণ না থাকাই উচিত। যাহা হউক, এই সমস্ত অকিঞ্চিৎকর বিষয় নিয়া বৈদিকসমিতি ব্যস্ত থাকিতে পারেন না। আশা করি-সমাজে শিক্ষাবিস্তার ও সদ্ভাববৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত প্রশ্নের আলোচনাও অন্তর্হিত হইবে।

"সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্"
অতো জীবনযাপনে পরাশ্রয়াবলম্বী ন ভূয়াৎ।

এই ম্লেচ্ছাধিকারগ্রস্ত ভারতের জনসাধারণ সমস্তবিষয়ে ম্লেচ্ছজাতির আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। আহার, বিহার, বেশ, ভূষা সর্ব্ববিষয়ে ম্লেচ্ছের অনুকরণ করিতেছে। ম্লেচ্ছোচিত আহার ম্লেচ্ছের নিকটেই প্রাপ্য। সুতরাং তদ্রূপ আহার সংগ্রহের জন্য সকলেই ম্লেচ্ছ-জাতির শরণাপন্ন হইতেছে। সাহেবের পোষাক পরিধান করিতে হইলেই ভাল পোষাকের জন্য সাহেবের বাড়ীতে যাইতে হয়। এইরূপে সমস্ত বিষয়ে ভারতবাসী ম্লেচ্ছের অনুকরণ করতঃ ম্লেচ্ছজাতির অধীন হইতেছে। ভারতবাসী যদি নিজের প্রাচীন সভ্যতা অক্ষুণ্ণ রাখে, কাহার সাধ্য ভারতবাসীকে অধীনতাপাশে আবদ্ধ করে। পুলিশ আর সৈনিকের বলে ম্লেচ্ছজাতিরা ভারতবাসীর যে স্বাধীনতা নষ্ট করিয়াছে, ও যে স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য আজ কাল এত আন্দোলন হইতেছে, সেই স্বাধীতা কখনও মানুষকে যথার্থ স্বাধীন করিতে পারে না। যথার্থ স্বাধীনতার অর্থ সর্ব্ববিষয়ে আত্মাবলম্বী হওয়া। বস্ত্র পরিধান করিব? যদি নিজে প্রস্তুত করিতে পারি ত সর্ব্বোত্তম। ভারতের অন্যলোকের প্রস্তুত বস্ত্র পরিধান করা ইহা অপেক্ষা অধম। বিদেশীয় বস্ত্র পরিধান করা ইহাপেক্ষা আরও অধিকতর অধম। এইরূপে যে যত আত্মাবলম্বী হইতে দূরে যায়, তাহার ততই দুঃখ। সর্ব্ববিষয়ে পরের দ্বারস্থ হওয়াতেই ভারতবাসীর দুর্দ্দশা। ভারতবর্ষে ম্লেচ্ছের রাজত্বের অর্থই সমস্ত বিষয়ে ভারতবাসীকে ম্লেচ্ছানুকরণপ্রিয় করতঃ সমস্তকার্যে ভারতবাসীকে ম্লেচ্ছের দ্বারস্থ করা। পৃথিবীতে যে সমস্ত জাতির জাতীয়তা ও পরিনামদৃষ্টি আছে, তাহারা কখনও পরের সভ্যতা গ্রহণ করে না, পরের অনুকরণ করে না ও কথায় কথায় পরের দ্বারস্থ হয় না। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে অধিকাংশ ভারতবাসীরই সে জ্ঞান নাই। পরাধীনতায় মনের এত অবনতি হইয়াছে, যে পরের সমস্তই তাহারা রমনীয় দেখে, আর নিজের সমস্ত তাহারা কুৎসিত দেখে।

তবে কি এই ভারতে আজ স্বাধীন কেহ নাই? আছেন; স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। তিনি ম্লেচ্ছজাতির আচার-ব্যবহারের অনুকরণ করেন না। সুতরাং বিদেশীয় বস্ত্রাদি বা খাদ্য-পানীয়াদির তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই। শিক্ষাবিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন। নিজের ইচ্ছামত টোলে অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞানার্জ্জন করেন। ম্লেচ্ছ-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভের প্রয়োজন তাঁহার নাই। জীবনধারণ ছাড়া, ভোগবিলাসের জন্য তাঁহার বিত্ত-বৈভবের প্রয়োজন নাই। তিনি সরলপ্রকৃতি ও অল্পেতেই সন্তুষ্ট। সুতরাং সম্পত্তিরক্ষার্থ আদালতে যাওয়ারও তাঁহার প্রয়োজন নাই। যদি কেহ তাঁহার উপর অন্যায় করে, তিনি প্রতিহিংসা নিতে চান না। বরং অন্যায়কারী যাহাতে তজ্জনিত পাপ হইতে মুক্ত হয়, তাহারই চেষ্টা করেন। সুতরাং আদর্শ-ব্রাহ্মণ কাহারও অধীন নন। আদর্শ ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁহারা গৃহী, তাঁহাদের কেবল রাজস্বটী দিতে হয়, এই মাত্রই পরাধীনতা। অনেকে বলিয়া থাকেন দেশে আজকাল আদর্শ ব্রাহ্মণ নাই। খবরের কাগজে আদর্শ-ব্রাহ্মণের নাম পাওয়া যায় না, এই কারণেই বোধ হয়, তাঁহারা এইরূপ বলিয়া থাকেন। নতুবা দেশে এখনও অসংখ্য আদর্শ-ব্রাহ্মণ আছেন, যাহাদের আত্মা এত উন্নত যে পার্থিব কোন শক্তি নাই, যদ্দ্বারা তাঁহাদিগকে অধীনতাপাশে আবদ্ধ করা যাইতে পারে।

আজ ভারতবাসী স্বাধীনতা চায়। যদি প্রত্যেক ভারতবাসীই ব্রাহ্মণের মত আত্মার উন্নতি করে ও সদাচারী হয়, তাহা হইলে ইংরাজ স্বেচ্ছায় অবিলম্বে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিবে। কারণ ইংরাজ ত এই দেশে প্রজাপালন পূর্ব্বক রাজকার্য্য করিতে আসে নাই, ভারতবাসীকে ম্লেচ্ছাচারী করিয়া ইংলণ্ড-প্রস্তুত দ্রব্যাদি ভারতে বিক্রয়পূর্ব্বক লাভ করিতে আসিয়াছে। প্রত্যেকে স্মরণ রাখিবেন ইংরাজ এই দেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছে, প্রজারক্ষণ করিতে আসে নাই, রাজত্ব করিতে আসে নাই। সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া আসিয়া প্রজাপালন ও ভারতের মঙ্গলচিন্তা করিবে, ইংরাজের আত্মা তাদৃশ উন্নত হয় নাই। ভারতবাসী স্বধর্ম্মনিষ্ঠ সদাচারী হইলে আর ইংরাজবণিকদের জিনিষ ক্রয় করিবে কে? আর বাণিজ্যই যদি না চলে, তবে ইংরাজ এদেশে থাকিবে কেন? বাণিজ্য বন্ধ হইলেই ইংরাজ ভারত হইতে প্রস্থান করিবে। সুতরাং স্বাধীনতালাভ করিতে হইলে প্রত্যেক ভারতসন্তানকেই ম্লেচ্ছাচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণাচার অবলম্বন করিতে হইবে। তাহা হইলেই ইংরাজবণিকের বাণিজ্য বন্ধ হইবে। আর সে রাজত্বের ভাণ করিয়া ভারতে থাকিতে ইচ্ছা করিবে না। স্বাধীনতা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ভারতসন্তানের গৃহে আবির্ভূত হইবে।

উপসংহার।

হে বেদব্রত ব্রাহ্মণবৃন্দ! এখন আমি এই অভিভাষণের শেষোক্তি স্থলে উপনীত হইয়াছি। কি বলিয়া, আপনাদের নিকটে আমার শেষ নিবেদন করিব, তদ্বিষয়ে বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি। চিন্তা করিয়া দেখিলাম —"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং ত্যাগ এবহি লক্ষণম্"॥

যে ভারতে মহামুনি দধীচী নিজের অস্থিদান করিয়া পরার্থ সাধন করিয়া গিয়াছেন, যে ভারতে ব্রাহ্মণেরা ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য জগতের সমস্ত বিত্তবৈভব ত্যাগপূর্ব্বক অরণ্যাশ্রমে জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন, যে ভারতে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া পরহিতসম্পাদন করা ব্রাহ্মণের আদর্শ ছিল, যে ভারতে নিত্য নিত্য স্বর্গীয় ত্যাগের অঞ্জলি দিয়া, ব্রাহ্মণেরা ভগবদর্চ্চনা করিয়া গিয়াছেন, সেই ভারতের ব্রাহ্মণ আপনারা। দেখিবেন সেই নির্ম্মল দেববৃত্তি ত্যাগশীলতা যেন আপনাদেরে ত্যাগ না করে। নিজের মুখে অন্নপ্রদান করিবার পূর্ব্বে দেখিবেন জগতের মুখে অন্ন পড়িতেছে কিনা। নিজের মুক্তিচিন্তার সঙ্গে সঙ্গে দেখিবেন, জগৎ মুক্তির পথে চলিয়াছে কি না। নিজের সাধনভজনের সঙ্গে সঙ্গে দেখিবেন জগৎ সাধনরত কিনা। এই ত্যাগই ধর্ম্ম; এই ত্যাগই পরমার্থ; এই ত্যাগেই মোক্ষ; এই ত্যাগই আদর্শ ব্রাহ্মণের একমাত্র শেষ সম্বল।

ইউরোপে ভারতের আদর্শ।

(লেখক—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বেদান্তশাস্ত্রী পঞ্চতীর্থ।)

ইংরেজীশিক্ষার প্রভাবে যে সময়ে পাশ্চাত্য ভাবধারা আমাদের দেশে ধীরে ধীরে সংক্রামিত হইতেছে ঠিক সেই সময়ে ইউরোপের এক মনীষী আমাদের দেশের শিক্ষা ও সভ্যতাকে প্রশংসা করিলেন, চাই কি, তিনি নিজেও আমাদের দেশের শিক্ষাদ্বারা অনুপ্রাণিত হইলেন;—এই কথা যদি আমি প্রমাণ প্রয়োগের অভাবে বলিতে যাই তবে অনেকে হয়ত তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিবেন না, কেহ কেহ হয়ত উপহাস করিতেও ছাড়িবেন না। এই কারণে আমি অদ্য আয়র্ল্যাণ্ডনিবাসী এক বিচক্ষণ বিদ্বানের বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বর্ণনা করিব।

ইনি একাধারে কবি, দার্শনিক, সমালোচক, পত্রিকা-সম্পাদক, চিত্রকর, জাতীয়তার প্রচারক এবং কৃষিক্ষেত্রে সমবায় অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তক। ইঁহার নাম জর্জ রাসেল (George Russel) আয়ার্ল্যাণ্ডের অন্তর্গত ডাব্লিন নগরীর শিক্ষিতসম্প্রদায় ইঁহাকে মানুষের মত মানুষ বলিয়া মনে করেন He is the ablest and most nteristing porsonality in Dablin এই সাহিত্যরথী ও কর্ম্মবীর সম্বন্ধে আমেরিকার এক অধ্যাপক তাঁহার "আয়র্ল্যাণ্ডের নাট্য কাব্য ও নাটক লেখক" Irish plays and play wrigits গ্রন্থে লিখিয়াছেন "বাল্যকালে তিনি ইংরেজী সাহিত্য পড়িতে ভালবাসিতেন না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ইনি প্রাচ্য সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং উপনিষদ্ সমূহ তাঁহার আলোচনার

বিষয় ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের ইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্র আলোচনা করিয়া ভারতের আত্মদর্শনকেই বহুমান প্রদান করিয়াছেন। শুধু তাই নয়, নিজেও ভগবানের রাজ্যে (অর্থাৎ অনন্ত সুখের রাজ্যে) বিচরণ করিতেছেন।

ভারতবাসী এক শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গেলে তিনি বলিয়াছিলেন "মহাশয়! ভারতবর্ষের চিন্তাশীল লোকেরা ইউরোপীয় নাগরিক সভ্যতা ও ফ্যাক্টরী-বিস্তারে মুগ্ধ হইলে বড় ভুল করা হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস পল্লীবাস ব্যতীত মানবের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্ণবিকাশ হইতে পারে না। লম্বা লম্বা বৃহদাকার ব্যারাকে বাস করিয়া নগরের নরনারীগণ মনুষ্যত্বহীন হইয়া পড়িয়াছে। অসংখ্য নর ও নারী দিনের মধ্যে ৮ ঘণ্টা কাল মেসিন ও ফ্যাক্টরী প্রভৃতির দাসরূপে খাটে। হাজার হাজার নারীও তাহাতে কাজ করিতেছে। অধিকাংশই অবিবাহিতা। উনবিংশ শতাব্দীতে যেভাবে নগর সভ্যতা আরব্ধ হইয়াছে তাহার বিষময় ফল বুঝিতে এখন আর কাহারও বাকী নাই।"

চিন্তাশীল রাসেলের মতে ভারতবর্ষে ইংরেজী সাহিত্য শিখাইবার প্রয়োজন নাই। ভাষা হিসাবে ইংরেজী শিক্ষা চলিতে পারে কিন্তু ইংরেজী সাহিত্যে জড়বাদ এত ঘনীভূত হইয়াছে যে তাহা হইতে আত্মার আনন্দ হয় না। এমন কি ভাবুক ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থকেও হিন্দু অধ্যাত্মবাদীরা নাবালক মনে করিবেন। বরং আমেরিকার এমার্সনকে হিন্দুরা স্বজাতিভুক্ত করিয়া লইতে পারেন। মোট কথা ইংরেজী সাহিত্যে আপনাদের শিক্ষণীয় বস্তু নাই।

সেই শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট তিনি আরও বলিলেন "আমি বাল্যকাল হইতে ভারতীয় সাহিত্য ও দর্শনে অনুরাগী হইয়াছি। আমি হিন্দুর চিকিৎসা শাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, তন্ত্র, ব্যাকরণ, বৈষ্ণবসাহিত্য ও উপনিষদের আলোচনায় বহুসময় কাটাইয়াছি, তাহাদ্বারা আমার জীবনেরও উপকার হইয়াছে। আমার চিন্তা ত গঠিত হইয়াছেই, এমন কি আমার জীবনের আদর্শও হিন্দুভাবাপন্ন হইয়াছে। আমি যোগাভ্যাসের অর্থ কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিয়াছি বলিতে পারি। উপযুক্ত গুরুলাভ করি নাই, কিন্তু হিন্দু অধ্যাত্মতত্ত্ব যে লোককে প্রতারণা করিবার জন্য নহে তাহা নিজজীবনে উপলব্ধি করিয়াছি, যোগাসনে বসিয়া আপনাদের কুণ্ডলিনীতত্ত্বের ইঙ্গিত পাইয়াছি। ইহাদ্বারা এই ধারণাও আমার দৃঢ় হইয়াছে যে হিন্দু যোগী ঋষিরা খাঁটি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতেই অধ্যাত্মবিজ্ঞান সৃষ্ট করিয়াছিলেন। জগতের নিগূঢ় বিষয়ে তাঁহাদের যথার্থ জ্ঞান ছিল।"

ইনি বিবেচনা করেন যে হিন্দুর আয়ুর্বেদের অনেক কথাই আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত ইহার উৎসাহে কোন কোন আইরিস চিকিৎসক এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে ব্রতী হইয়াছেন। ইনি নিজেও পাণিনি ব্যাকরণের আলোচনায় নিযুক্ত। তন্ত্রশাস্ত্রের শব্দতত্ত্ব ও সংস্কৃত বর্ণমালার অক্ষর প্রণালী সম্বন্ধে যে গূঢ় ব্যাখ্যা আছে তাহা ইনি বিশ্বাস করেন। দেবদেবীগণের বর্ণবিষয়েও ইনি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিয়াছেন বলিলেন।

প্রাচীন ভারতবর্ষের আবিষ্কারগুলি যথার্থ বৈজ্ঞানিকের প্রণালীতে বুঝিবার জন্ত বেশী লোক অগ্রসর হইতেছেন না এইজন্য ইনি দুঃখিত।

রাসেল তাঁহার Ireland নামক গ্রন্থে আইরিশ জাতির লক্ষ্য ও আদর্শ প্রচার করিতে গিয়া একস্থানে বলিয়াছেন—

We live in the invisible world. If I rightly understand our mission and our destiny, it is this. To restore to other men the sense of that invisible; that world of immortality ... . We shall first learn and then teach, that not with wealth can the sort of man be satisfied; that our enduring interest is not here but there, in the unseen, the hidden, the immortal, for whose purposes exist all the visible beauties of the world. If this be our mission and our purpose, well may our fair mysterious land deserve her name.

ইহার মর্ম্মানুবাদ এই, আমরা অদৃশ্য জগতে বাস করিতেছি। আমার অভিজ্ঞতা যদি যথার্থ হয় তবে বলিতে হইবে যে আমাদের লক্ষ্য এবং আদর্শ, সকলকে ঐ অদৃশ্য জগতের মর্ম্ম বুঝাইয়া দেওয়া। অদৃশ্য জগৎ অর্থে অবিনশ্বর সংসার। আমরা প্রথমতঃ শিক্ষা লাভ করিব, তারপর শিক্ষা দিব এই যে মানবের আত্মা ধনসম্পত্তি দ্বারা পরিতৃপ্ত হইতে পারে না; আমাদের জীবন ধারণ শুধু ইহলোকে নহে, পর লোকেও যাহা চক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত, যাহা সুগুপ্ত অথচ অব্যয় অক্ষর অবিনশ্বর; যাহার ইঙ্গিতে সমস্ত সৌন্দর্য্য ও জ্যোতি বিকসিত হয়। যদি আমরা সেই দুজ্ঞেয় পদার্থের খোঁজ পাই তবেই আমাদের দেশ সার্থক।"

বৈদেশিক দার্শনিকের এই উক্তির সঙ্গে হিন্দুর অধ্যাত্মতত্বের অনেক কথাই পরিস্ফুট হইতেছে। উপনিষদের উক্তি —

১। কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন
ত্যাগেনৈকেনামৃতত্ব মানশুঃ ॥

২। তমেব ভান্ত মনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।

৩। অবাঙ্ মানসগোচরং হি তৎ।

৪। অদৃশ্য মব্যয় মক্ষর মনির্দ্দেশ্যং।

ভারত শিষ্য কবিবর রাসেল নিজের ভাবধারার ভিতরে আদর্শই প্রচার করিতেছেন দেখিতে পাই।

লঘুতা।

চিত্ত স্থৈর্য্যের অভাবই মানুষের লঘুতা। যে মানুষের ভবিষ্যৎ নাই—অর্থাৎ বিপৎপাতে যে মানুষ বিপদ্‌মুক্ত উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা করিতে পারে না, সে লঘুচিত্ত হয়, লঘুচিত্ত মানুষের ধর্ম্ম—সে বিপৎপাতে স্থির চিত্তে বিপৎ প্রতিকারের উপায় চিন্তা করিতে পারে না; কেবল হা হুতাশ করিতে থাকে, বিপদ প্রতিকারের প্রত্যাশায় ব্যক্তি বিচার না করিয়া, সম্ভব অসম্ভব না বুঝিয়া, শত্রু মিত্র নির্ব্বিশেষে যাহাকে সম্মুখে পায় তাহার শরণাগত হয়, বৃথা আশ্বাসে আস্থা স্থাপন করিয়া অনেক সময়ে বিপদ্‌কে আরও ঘনীভূত করিয়া তুলে। ইংরেজী শিক্ষা হিন্দুর অন্তরে লঘুতা আনয়ন করিয়াছে। অতীতের বিস্মৃতি বর্ত্তমানের আত্ম নির্ভরতায় বাধা উপস্থিত করিয়াছে। সুতরাং ভবিষ্যতের জন্য স্বকীয় কোন আলম্বন খুজিয়া পাইতেছে না। অবস্থা এই দাড়াইয়াছে যে, পরের সহায়তা, পরের শিক্ষা, পরের অনুকরণ পরের হস্তাবলম্বন ব্যতীত যে, কোন প্রকারে বিপৎ প্রতিকার সম্ভব এ ধারণাও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ধর্ম্মদ্রোহ, সমাজদ্রোহ, এই ধারণালোপের অবশ্যম্ভাবি ফল।

যদি অতীতের স্মৃতি থাকিত তাহা হইলে বুঝিতে পারিত বর্ত্তমান অপেক্ষা অতীত অধিক বিপৎসঙ্কুল ছিল। জাতীয় ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সমাজ পরিবার সমস্তই নিবিড় বিপজ্জালে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। হিন্দু সে বিপজ্জাল মুক্ত হইতে পারিয়াছিল, হিন্দুর কিছুই যায় নাই। হিন্দুর ধর্ম্ম আছে, সমাজ আছে, পারিবারিক সুখ শান্তি আছে, শিল্প, বাণিজ্য, প্রভাব প্রতিপত্তিও যে না ছিল তাহা বলা যায় না। হিন্দু পরাধীনতা অনেক কাল ভোগ করিতেছে, কিন্তু দুই শত বৎসর পূর্ব্বে পরাধীন হিন্দুর যাহা ছিল তৎকালে অনেক স্বাধীন জাতির তাহা ছিল না। হিন্দু তখন পরের সাহায্যে কিছু রক্ষা করে নাই, পরের শিক্ষা, দীক্ষা, আচার ব্যবহারের অনুসরণ ও অনুকরণ করিয়া জাতীয় দুরবস্থা প্রতিকার করিবে এমন আশাও হিন্দুর হৃদয়ে স্থান পায় নাই। ইহার হেতু হিন্দুর চিত্তের তখনও স্থৈর্য্য ছিল, অতীতের উজ্জ্বলস্মৃতির আলোক তখনও হিন্দুর হৃদয় আলোকিত করিত, সে আলোকে হিন্দু তাহার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখিয়া লইতে পারিত, তাই বিপদের মধ্যে ও সে ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আচার, ব্যবহারে স্বীয় বিশিষ্টতা রক্ষার জন্য প্রাণপাত চেষ্টা করিতে পারিয়াছে।

বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজে কি দেখিতে পাই? ইহাদের অতীতের স্মৃতির ত চিহ্নই নাই। বর্ত্তমানে যাহা প্রত্যক্ষ গোচর তাহাও দেখিতে পাইতেছে না। এত বিহ্বল,—এত উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, যে ইহারা দেশের স্থিরতর শান্তি ও স্বজাতির অপরাজেয় শক্তিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া পরের নিকট শান্তি ও শক্তি কামনা করিতেছে। নীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলিয়াছেন

"নিয়তা লঘুতা নিরায়ত্তে রগরীয়ান্ ন পদং নৃপশ্রিয়ঃ। যাহাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় তাহারাই লঘুচিত্ত হইয়া থাকে,-লঘুচিত্ত ব্যক্তি কখনও সম্পদ লাভ করিতে পারে না।

হিন্দু সমাজের মত দৃঢ়বদ্ধ সমাজ, জগতে আর কোন জাতির নাই; প্রতিকূল রাষ্ট্র শক্তি যখন তাহার জাতীয় ভাবধারা ও জাতীয় বিশিষ্টতা হিন্দু সমাজে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া হিন্দুর বিশিষ্টতাকে বিধ্বস্ত করিতে প্রয়াস করিয়াছে তখনই দৃঢ়বদ্ধ সমাজ শক্তির সাহায্যে হিন্দু তাহাকে প্রতিহত করিয়াদিয়াছে। প্রতিপক্ষগণ ক্রমে ক্ষীণ শক্তি হইয়া হিন্দু সমাজের আনুগত্য ও হিন্দুর আচার ব্যবহারের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। নানা জাতির অধ্যুষিত বর্ত্তমান ভারতও তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

ইংরেজী শিক্ষার প্রভাব হিন্দু সমাজে বিস্তার লাভ না করা পর্য্যন্ত হিন্দু সমাজে জাতি বিরোধ; ধর্ম্ম বিরোধ, আচার বিরোধ, ব্যবহার বিরোধ, প্রভৃতি কোন বিরোধই ছিল না। ধনী দরিদ্রে. প্রভু ভৃত্যে, গুরু শিষ্যে স্ত্রী পুরুষে, বৃদ্ধ তরুণে যে, কোন বিদ্বেষ বিরাধ তৎকালে ছিল ইহাও কেহ প্রমাণ করিতে পারেন না। আজ হিন্দুসমাজ সর্ব্বপ্রকার বিরোধজালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। কে এ বিরোধের জাল রচনা করিল? এ বিরোধের জাল রচনা করিয়াছে ইংরেজী শিক্ষা জনিত লঘুতা। বিরুদ্ধ রাষ্ট্র শক্তি যে হিন্দু সমাজে এমন বিরোধের জাল রচনা করিতে পারে না, পাঁচ শত বর্ষকালের পরীক্ষায় হিন্দু সমাজ তাহা অবিসম্বাদে প্রমাণ করিয়া দিয়াছে।

লঘুচিত্ত বালকগণ যেমন পরপ্ররোচনায় আত্মকলহে প্রবৃত্ত হয়, ইংরেজী শিক্ষিত বৃদ্ধগণও তেমনি হিন্দু জাতিকে আত্মকলহে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। যখন তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন—চিরন্তন ধর্ম্ম বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে বলিয়াই হিন্দু সমাজে জাতি বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে নাই ও ধর্ম্ম বিশ্বাসের দৃঢ়তার জন্য মুসলমানগণও হিন্দুর ধর্ম্ম বিশ্বাসে আঘাত প্রদানে নিরস্ত হইয়া প্রতিবাসীসুলভ সৌহার্দ্দের সহিত বাস করিতেছে, পরস্পর পরস্পরের সুখদুঃখে সমবেদনা অনুভব করিতেছে; তখন তাঁহারা বুঝিলেন—চিরন্তন ধর্ম্ম বিশ্বাসই ভারতের যত কিছু অনর্থের মূল; আর বিচার বিবেচনা প্রয়োজন হইল না, নিজেরা ধর্ম্ম ছাড়িলেন ও ধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন; ফল হইল—নিজেরা সমাজের ঘৃণার পাত্র হইয়া পরের প্রশংসায় আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে লাগিলেন ও সাধারণ হিন্দু সমাজে দুর্নীতি ও বিদ্বেষের বীজ ছড়াইয়া দিলেন।

যখন দেখিলেন একজন জমীদার, সমাজপতি বা মাতব্বরের আদেশে সহস্র সহস্র লোক নির্ব্বিচারে প্রাণ দান করিতে পারে তখন প্রচার কার্য্য সুরু করিলেন—ভারতে ঐক্য সম্পাদনের জন্য ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের, জমীদারের বিরুদ্ধে প্রজার, সমাজপতির বিরুদ্ধে সামাজিকের, মাতব্বরের বিরুদ্ধে সাধারণ জনগণের অভ্যুত্থান প্রয়োজন। ইত্যাদি প্রকারে ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবলম্বিত যে কোন কর্ম্ম পদ্ধতির দিকে লক্ষ্য করা যাইবে সর্ব্বত্র বালকোচিত লঘুচিত্ততার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

বালকের লঘুতার সহিত সরলতা মিশ্রিত থাকে, সেই সরলতা বালকের লঘুতাকে মধুরতায় সিক্ত করে সুতরাং বালকের লঘুতা অনেক সময়ে স্থিরচিত্ত ব্যক্তিরও চিত্ত আকর্ষণে সমর্থ হয়। ইংরেজী শিক্ষিত বৃদ্ধগণের লঘুতায় সরলতায় সংমিশ্রণ নাই তাহা কপটতা ও চতুরতায় পরিপূর্ণ।

অভিনব গঠন কার্য্যের প্রবর্ত্তন ও তাহাতে সফলতা লাভের জন্য হিন্দুসভা হিন্দু মিসন প্রভৃতি সংস্থাপন, ঐ প্রকার কপটতা ও চতুরতা পূর্ণ লঘুতার ফলরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। গৈরিকবসনপরিহিত স্বামী নামধারী জনকত লঘুচেতা ব্যক্তি পূর্ব্ববঙ্গের পল্লী অঞ্চলে যে পাপ ও দুর্নীতির প্রসার ঘটাইতেছে, তাহার বিষময় ফল পল্লীবাসী ভোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই ফল ক্রমে পরিপক্ক হইয়া উঠিলে দেশের কি ভীষণ দুরবস্থা উপস্থিত হইবে ঐ সকল লঘুচেতা ব্যক্তি তাহা চিন্তা করিতেও পারে না। ইহারা সর্ব্ব শ্রেণীর হিন্দুকে দেবালয়ে প্রবেশ করাইবার জন্য সত্যাগ্রহ নামক এক প্রকার দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে।

সরল বুদ্ধিতে ঐ প্রকৃতির ব্যক্তিগণের আন্তর ভাব বিচার করিলে বলিতে হয় শিক্ষা-জনিত লঘুতায় ইহাদের স্বজাতীর ধর্ম্ম কর্ম্মের গূঢ় মর্ম্ম বুঝিবার শক্তি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, বিজাতীয়শিক্ষায় বিধর্ম্মীর ভাব ইহাদের অন্তরে এত দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, যে, সেই ভাবকেই ইহারা জাতীয় ভাব বলিয়া বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছে। অভিনব বিশ্বাস মানুষের অন্তরে একটা নবীন কর্ম্ম প্রেরণা সৃষ্টি করিয়া থাকে, কারণ এই প্রকার বিশ্বাসবান্ মানুষ বুঝে—যাহা আমার স্বজাতীয়গণ কোন কালে লাভ করিতে পারে নাই আমরা তাহা লাভ করিয়াছি; আমরা যাহা লাভ করিয়াছি তাহা যাহারা শিক্ষার অভাবে লাভ করিতে পারে নাই তাহাদের উহা দান করিতে হইবে।

সাধারণ জনগণের মধ্যে জাতীয়ভাবের নামে ঐ প্রকার বিজাতীয় ভাব অনুপ্রবিষ্ট করিতে অনেক উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব উপায়ের ব্যর্থতা উপায়ন্তর অন্বেষণে নিযুক্ত করিয়াছে, ক্রমে লঘুতার সহিত চতুরতা ও কপটতা প্রকটমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

ইংরেজী শিক্ষা প্রথমে যখন হিন্দুর অন্তরে লঘুতা আনয়ন করিল—ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যখন স্থির চিত্তে হিন্দু-ধর্ম্মের গভীরতা ও গূঢ় রহস্য বোধে অসমর্থ হইলেন—হিন্দুর সমাজ স্থিতির দৃঢ়তার মূল অনুসন্ধানে ও তাহার উপযোগিতা বোধে বুদ্ধির যে স্থিরতা প্রয়োজন তাহাতে যখন বঞ্চিত হইলেন; তখন স্বীয় ও জাতীয় কল্যাণ অনুসন্ধানের জন্য পরের শরণাগত হইলেন। লঘুতা প্রযুক্ত বুঝিতে পারিলেন না—এমন শরণাগতির পরিণাম কি হইতে পারে। পরোপদেশে বুঝিলেন—বিজাতীয়ভাবে জাতিগঠন ব্যতীত হিন্দুর কল্যাণ অসম্ভব। এই ধারণার উপরে প্রথম সৃষ্টি হইল শিক্ষিত হিন্দু মিশনারী।

ফল বিপরীত ফলিল, অঙ্গুলিগণ্য জনকত লোক সমাজের ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন

হইয়া জাতির ঘৃণার পাত্র হইয়া থাকিল। ইহার পর হইতে লঘুতার সহিত কতটতার সংমিশ্রণ আরম্ভ হইল, ক্রমে নানা সম্প্রদায়ের আবির্ভাব আরম্ভ হইল। ইঁহারা বুঝিতে পারিলেন একেবারে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া বিজাতীয় ভাব হিন্দুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করাইতে পারা যাইবে না তাই খৃষ্টের পরিবর্ত্তে ব্রহ্ম ও বাইবেলের পরিবর্ত্তে উপনিষদ্ গ্রহণ করিলেন। ফল প্রায় তুল্য রূপই হইল, হিন্দু সমাজ ব্রাহ্ম নামক খৃষ্টান রূপেই তাঁহাদের গ্রহণ করিল ও খৃষ্টানেরই মত সমাজের সংস্রবমুক্ত রাখিল। আর্য্য সমাজ আর এক সিড়ি উপরে উঠিলেন, তাঁহারা বেদের নামে বিজাতীয় ভাব চালাইতে প্রবৃত্ত হইলেন, তীর্থসেবী দেবপূজক হিন্দুর মধ্যে এ চাতুরীতে বিজাতীয় ভাব প্রবেশ সম্ভব হইল না, তাই ক্রমে গৈরিকপরিহিত স্বামী নামধারী দেবভক্তের আবির্ভাব হইয়াছে। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত মূল প্রকৃতি ঠিক আছে; ছল চাতুরী, মিথ্যা প্রবঞ্চনা যে কোন প্রকারে হউক হিন্দুর মধ্যে খৃষ্টানীভাব প্রবেশ করাইতেই হইবে।

এই প্রকৃতির ব্যক্তিগণের গৈরিক পরিধানে বা স্বামী নাম গ্রহণে শাস্ত্রানুমত বা ন্যায়ানুগত কোন যুক্তি নাই, সাধারণ হিন্দুকে স্বমতে আনয়নের উহা কপটতার কঞ্চুক। শাস্ত্র ইহারা মানে না—দেবতায় ইহারা বিশ্বাস করে না, পরলোকভীতি ইহাদের নাই, ইহা সাধারণ বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণও বুঝিতে পারেন।

অনাদিকাল হইতে হিন্দুর তীর্থ আছে, দেবতা আছে, দেবায়তন দেবমন্দির প্রভৃতি আছে; হিন্দুমাত্রেই এ সকলের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি করিয়া থাকে; অধিকার অনধিকারের কথা লইয়া কোনকালে কোন গোল হয় নাই। ব্রাহ্মণেতর কতজাতির দেবালয় দেবমন্দির রহিয়াছে, কোটি কোটি টাকার দেবোত্তর সম্পত্তি দেবসেবার জন্য দান করা হইয়াছে। আজও দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহারা ঐ সকল দেবমন্দির ও দেবোত্তর সম্পত্তির অধিকারী তাঁহারা দেবমন্দিরে প্রবেশ করেন না, দৈবাৎ প্রবেশ করিলে নিজেকে অপরাধী বলিয়া মনে করেন, অথচ ঐ সকল গৈরিকপরিহিত প্রচ্ছন্ন খ্রীষ্টানগণ বুঝিল দেবমন্দিরে সাধারণের প্রবেশাধিকার না থাকা ঘোর অত্যাচার।

অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিবেন তীর্থ দেবতায় বিশ্বাসবান কোন হিন্দু ইহাদের নিকট অত্যাচার কাহিনী জানায় নাই, অত্যাচারের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে সাহায্য প্রার্থনাও করে নাই, ইহারা কপটবেশে চতুরতা পূর্ণ বাক্জাল বিস্তার করিয়া সরলবুদ্ধি সাধারণ জনগণকে উত্তেজিত করিতেছে।

লঘুতা প্রযুক্ত ইহারা যে শুধু ধর্ম্ম বুঝিতে পারে নাই তাহা নহে লৌকিক হিতাহিতও বুঝিতে পারে নাই। ইহাদের কর্ম্মফলে পল্লীতে পল্লীতে বিদ্বেষের বহ্নি জ্বলিয়া উঠিতেছে, দেশ ক্রমে বিরোধ বিচ্ছেদ পূর্ণ হইয়া যাইতেছে।

ব্রাহ্মণের ফাঁদ।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব লাট সার রেজীনাল্ড ক্রাডক বিলাতের সেণ্ট্রাল এসিয়াটিক্ সোসাইটিতে এক বক্তৃতা দিয়াছেন, সেই বক্তৃতার তিনি ভারতের বর্ত্তমান অবস্থার আলোচনা করিয়াছেন, ঐ আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—"ভারত সরকার ও বিলাতী সরকার উভয়েই কুটিল ব্রাহ্মণদিগের ফাঁদে পতিত হইয়াছেন।" ব্রাহ্মণ বিদ্বেষ এখন ভারত বাসীরও নিত্য কর্ম্মে পরিণত হইয়াছে; তবে রেজীনাল্ড যে ভাবে বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়াছেন, ভারতবাসী সে ভাবে বিদ্বেষ করে না। সার রেজীনাল্ড যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে বুঝায় ব্রাহ্মণেরা কুটিল ও ফাঁদ পাতিতে বা কুটনীতির সাহায্যে অন্যকে বিপন্ন করিতে চতুর। ভারতবাসীরা বলে ব্রাহ্মণেরা সরল, কুটনীতি বিষয়ে অতিশয় অনভিজ্ঞ, তাই কূটনীতির সাহায্যে বিদেশীরা যখন ভারতে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণেরা তখন ধর্ম্ম ও ধর্ম্মশাস্ত্র লইয়া বিবাদে মত্ত হইয়া রহিয়াছে। ব্রাহ্মণের দুর্ভাগ্য অপরিসীম, স্বজাতি, পরজাতি, স্বদেশী বিদেশী, যে, যে কোন প্রকার অসুবিধা ভোগ করিবে তাহার জন্য দায়ী করিবে ব্রাহ্মণকে।

ব্রাহ্মণকে কেহ চিনিতে পারে না, ব্রাহ্মণের ক্রিয়াকলাপও কেহ বুঝিতে পারে না, তাই সকলেই নিজের নিজের কর্ম্মফল ব্রাহ্মণের স্কন্ধে চাপাইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে। সার রেজীনাল্ড যদি ব্রাহ্মণ চিনিতেন তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন তাঁহারা ব্রাহ্মণকে যে সাজে সাজাইয়াছেন, তাহা ব্রাহ্মণের প্রকৃত স্বরূপ নহে, উহা তাঁহাদেরই অনুরূপ রূপ। ব্রাহ্মণের প্রকৃত স্বরূপ বিরল হইলেও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রেণীর মধ্যে সে স্বরূপের একটা আভাস পাওয়া যায়, ব্রাহ্মণ কাহার ও অকল্যাণ কামনা করে না, কূটনীতির সাহায্যে—ধন ঐশ্বর্য্য লিপ্সায় বিরোধ বিপ্লবের মধ্যেও যায় না। ধর্ম্ম তাহার সম্পদ্, দারিদ্র্য তাহার চির সহচর, শাস্ত্র তাহার নিধি। যে তাহার সম্পদে হস্তক্ষেপ না করে, যে তাহার নিধি অপহরণে প্রবৃত্ত না হয়, সে সমগ্র পৃথিবীর ধন ঐশ্বর্য্য ভোগ করিলেও ব্রাহ্মণ বিচলিত হয় না। ব্রাহ্মণ ব্যক্তি বিচার করে না, স্বদেশী বিদেশী দেখে না; যে তাহার সম্পদ্ রক্ষায় সহায়তা করে, যে তাহার নিধি তাহাকে ভোগ করিবার সুযোগ করিয়া দেয়—ব্রাহ্মণ তাহাকে আশীর্ব্বাদ করে, প্রশংসা করে, স্তব করে। ভারতের ব্রাহ্মণই একদিন মুসলমান সম্রাট্ আকবরকে বলিয়াছিল, "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" সম্রাট্ আকবর ব্রাহ্মণের ধর্ম্মস্বরূপ সম্পদ্ রক্ষায় সহায়তা করিয়াছিলেন, নিজে তাহাতে অনুরক্ত হইয়াছিলেন, ব্রাহ্মণের শাস্ত্ররূপনিধিকে তিনি পবিত্র দৃষ্টিতে দেখিতেন তাহার সংরক্ষণে ও পুষ্টিসাধনে সহায়তা করিতেন, তাই তিনি বিদেশী বিধর্ম্মী হইলেও ব্রাহ্মণ মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিল "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" তোমাদের পূর্ব্বজগণের কথা ভাবিয়া দেখ, তাঁহারা প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন "ব্রাহ্মণের সম্পদে হস্তক্ষেপ

করিব না, ব্রাহ্মণের শাস্ত্ররূপ নিধি রক্ষায় সহায়তা করিব," ব্রাহ্মণ সশ্রদ্ধহৃদয়ে তাহাদের আশীর্ব্বাদ করিয়াছিল। বড় বিপদের সময়ে—বড় বিপ্লবের কালে, ব্রাহ্মণ ইংরেজের মুখে ঐ অভয় বাণী শুনিয়াছিল, তাই ব্রাহ্মণ কোন দিকে দৃকৃপাত করে নাই; ধন ঐশ্বর্য্যের ভাবনা, পরাধীনতার যাতনা, শিল্প বাণিজ্যের পরিণাম চিন্তা কিছুই ব্রাহ্মণের হৃদয়ে স্থান পায় নাই। ব্রাহ্মণ অকপটে ইংরাজ-রাজত্বের কল্যাণ কামনা করিয়াছে।

প্রথম আমলের ইংরাজ রাজপুরুষগণও হয়ত তত কুটিল ছিলেন না, তাঁহারাও হয়ত বুঝিয়াছিলেন—ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে বঞ্চিত হওয়া কল্যাণকর নহে।

নীতি সরলতার সহচরী নহে, মায়াবিনী নীতি, এমন ইন্দ্রজাল রচনা করে যাহাতে মানুষ প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করিতে পারে না। তোমাদের অন্তরেও যখন নীতি, চাতুরী দেখাইতে লাগিল তখন তোমরা শিক্ষা দীক্ষার মধ্য দিয়া ভারতবাসীর অন্তরে ব্রাহ্মণ বিদ্বেষ উৎপাদনে প্রয়াস করিলে; নীতির ইন্দ্রজালে মোহিত করিয়া তোমরাই ভারতবাসীকে বুঝাইয়াছ, ভিক্ষোপজীবী নির্ব্বিরোধ ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণগণের সুকঠোর শাসন দণ্ডের তাড়নায় ভারতবাসী দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে; নীতির এমনই মহীয়সী মায়া যে, শিক্ষিত ভারতবাসী তাহাই বুঝিল; এতবড় একটা অত্যাচারের কথা তোমাদের অনুগ্রহে শুনিতে পাইল ও তোমাদের শিক্ষায় বুঝিতে শিখিল, এ মহোপকারের জন্য নির্ব্বিচারে তাঁহারা তোমাদের বাক্য প্রতিপালন করিয়াছে, শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছে এবং ব্রহ্মণ্য প্রভাব মুক্ত হইবার জন্য তোমরা যেমন ভাবে যাহা করিতে বলিয়াছ ঠিক ঠিক্ তাহা করিয়াছে। আজ তাহারাই তোমাদের প্রতি বিরূপ হইয়াছে।

তোমাদের বিপদে ফেলিবার জন্য এ ফাঁদ কি ব্রাহ্মণ রচনা করিয়াছে; না ব্রাহ্মণকে উদ্বাস্ত করিবার জন্য তোমরা এ ফাঁদ রচনা করিয়াছ? ব্রাহ্মণ ফাঁদ রচনা করে না; নির্ব্বোধ বলিয়া নহে—ব্রাহ্মণ জানে ফাঁদ রচনার অর্থই নিজে ফাঁদে জড়াইয়া যাওয়া। মানুষ নিজের ফাঁদে নিজে নাও জড়াইতে পারে কিন্তু অদৃশ্য পুরুষের জগৎ যোড়া এমন এক ফাঁদ পাতা আছে, সরল পথে না চলিলে তাহাতে না জড়াইয়া পরিত্রাণ কেহ পায় না।

যে ফাঁদ পাতে সে তাহা স্বীকার করে না, যাহারা লোভের তাড়নায় ফাঁদে ঝাপাইয়া পড়ে তাহারা ফাঁদ দেখিতে পায় না। ফাঁদ যে পাতে তাহার পক্ষে অস্বীকার দোষের নহে, স্বীকার করিলে ফাঁদ ব্যর্থ হয়; যাহারা ক্ষণিক লোভের তাড়নায় অন্ধের মত ফাঁদে ঝাঁপাইয়া পড়ে তাহারা তিরস্কারের পাত্র, বিশেষতঃ তাহারা যদি স্বজন হয় তাহা হইলে তাহাদের তিরস্কার ও তাড়না করিয়া রক্ষা করিতে চেষ্টা না করা পাপ, তাই তোমাদের কিছু বলি না তিরস্কার করি, স্বজনকে।

এই দুঃসময়ে তুমি যখন মুমূর্ষু ব্রাহ্মণের স্কন্ধে কলঙ্কের বোঝা চাপাইতে কুণ্ঠিত হও নাই তখন তোমাকে দুই চারিটী কথা জিজ্ঞাসা করিব। ভারতে ব্রহ্মণ্য প্রভাব প্রতিষ্ঠিত থাকিলে তোমাদের কি অনিষ্ট হইত? ভারত বাসী বিলাতে যাইত না, কাউন্সিলে যাইত

না, কংগ্রেস করিত না, আহারে বিহারে তোমাদের সরিক হইয়া দাঁড়াইত না, গোলামীর যোগ্যতাও এমন অর্জ্জন করিতে পারিত না—যাহাতে তোমার ভাতে ভাগ বসাইতে পারিত। তবে এমন কেন করিলে? ব্রাহ্মণ যেমন ভাবে তোমাদের সংস্রব মুক্ত করিয়া ভারতবাসীকে রাখিতে চাহে, ও অন্তরে যে ভাব পোষণ করে তাহা তোমাদের রুচিকর নহে এই জন্য? সরল ভাবে একথাটাও বল নাই, বরং ব্রাহ্মণের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়াছ, ব্রাহ্মণের শাস্ত্রানুমত সরল ভাবে আমরা আঘাত করিব না, অথচ শিক্ষা দিবার সময়ে শিখাইলে ব্রহ্মণ্য প্রভাবই ভারতের যত অনিষ্টের মূল। ফাঁদ আর কাহাকে বলে?

তোমরা নীতি চতুর, হয়ত বলিতে পার ফাঁদের মধ্য দিয়াও অনেক সময়ে মানুষকে কল্যাণের পথ দেখাইয়া দিতে হয়। বেশত, প্রমাণ করনা—ব্রহ্মণ্য প্রভাব মুক্ত করিয়া ভারতবাসীকে কোন্ কল্যাণের পথ দেখাইয়া দিয়াছ? তোমরা ব্রহ্মণ্য প্রভাব মুক্ত গুটিকত ভারতবাসীকে বিলাতে সুশিক্ষিত করিয়া ভারতে ছাড়িয়া দিয়াছ, তাহারা কি শিখিয়াছে? তাহারা শিখিয়াছে গোলামী; সাজাইয়া দিয়াছ প্রভুর সাজে, কর্ম্ম উপদেশ করিয়াছ ব্রহ্মণ্য প্রভাবের ধ্বংস সাধন। ইহার ফল কি হইয়াছে? তাহারা তোমাদের কাজ চালাইতেছে, ত্রুটি করিলে চাবুক খাইতেছে, স্বজাতির উপর প্রভুত্ব ফলাইয়া চাবুকের জ্বালা জুড়াইতেছে, আর ব্রহ্মণ্য প্রভাবের বিরুদ্ধে ভারতবাসীকে ক্ষেপাইয়া দিয়া তোমাদের নিকট পুরস্কার চাহিতেছে। পৃথিবীর কোন দেশ এমন জীব সৃষ্টি করিয়া কল্যাণ লাভ করিয়াছে? এত যাহাদের দ্বারা করাইয়াছ, আজ যদি তাহারা বুঝে পুরস্কারের লোভ দেখানটা ও ফাঁকা, তাহা হইলে ক্ষিপ্ত না হইবে কেন?

ব্রাহ্মণ নির্ব্বিকার চিত্তে এমন অনেক খেলা দেখিয়াছে, ফাঁদ কখনও পাতে নাই, আজও পাতিবেনা তবে একটা কথা বলিয়া রাখি ব্রাহ্মণের সম্পদে হস্তক্ষেপ করিও না, করিলে স্বেচ্ছায় অকল্যাণ ডাকিয়া আনিবে।

ধার্ম্মিকের গতি ও ভক্তের কাহিনী।

লেখক পণ্ডিত শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

বর্ত্তমান সময়ে সমাজে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধার হ্রাস হওয়ায় যে, অনিষ্ট সংঘটিত হইয়াছে এবং ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা থাকায় সমাজের যে কি উপকার হইত ঐ বিষয় কিয়ৎ পরিমাণে আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। ধর্ম্মহীনতায় যে, পারলৌকিক অনিষ্ট সাধিত হয়, তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত। ধর্ম্ম, সমাজ, ও নীতি এই তিনটী পৃথক্ সামগ্রী নহে এই

তিনটী পরস্পরের সহিত এরূপ ঘনিষ্ঠসম্বন্ধ যে একের অবনতিতে অপর দুইটীর অবনতি সুনিশ্চয়, সমাজ ও নীতি, ধর্ম্মরূপ সুবিশাল মহীরুহের শাখামাত্র অতএব সহজেই অনুমিত হইতে পারে যে, ধর্ম্মের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ও নীতি উভয়ের অবনতি ঘটিয়াছে। হৃদয়ে ধর্ম্মভাব না থাকায় সুতরাং পরকালে বিশ্বাস না থাকায় সংসারযন্ত্রণা বড়ই ভীষণ বলিয়া বোধ হয়, ইহার ফলে কত আত্মহত্যা সমাজে সংঘটিত হইতেছে, যেহেতু তার মৃত্যুর পর সমাজে একশ্রেণীর লোক ইহার প্রশংসাবাদ করায় এই শ্রেণীর আত্মহত্যা নারীসমাজে বিশেষভাবে আধিপত্য লাভ করিয়াছে। হিন্দু ঈশ্বরের নাম স্মরণ পূর্ব্বক সকল কার্য্যই সম্পন্ন করিত; ইহার অর্থ এই যে ঈশ্বরের নাম করিয়া যদি কার্য্য আরম্ভ করা যায় তবে সে কার্য্যের ফলাফলের দায়িত্ব অনেকটা ঈশ্বরে আরোপিত হয়—শাস্ত্রে আছে :—

প্রাতরুত্থায় সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ
যৎ করোমি জগন্মাত স্তদেব তব পূজনং।

প্রাতরুত্থান পূর্ব্বক সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত ও সন্ধ্যা হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত আমি যাহা কিছু করিয়া থাকি, হে! জগন্মাত সে সমুদয়ই তোমার পূজা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এরূপ ভগবদ্ভাবে আত্ম সমর্পণ পূর্ব্বক প্রণতি সহ স্তুতি করিতে ভারতীয় আর্য্য মহাপুরুষগণ ভিন্ন আর কে পারিয়াছে? শরীররক্ষা পরিবার-প্রতিপালন, সমাজসংরক্ষণ প্রভৃতি সকল কার্য্যই আর্য্য-জাতির ধর্ম্মভাবপ্রসূত। ভূতভাবন ভগবানের প্রীত্যর্থে আর্য্য-জাতির তাবৎ কার্য্যই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই জন্যই আর্য্যকণ্ঠ গাহিয়াছিল :—

"প্রত্যক্ষ ধর্ম্মো ভগবান্ যস্য তুষ্টোহি কর্ম্মভিঃ
সফলং তস্য জন্মাহং মন্যে সদ্ধর্ম্মচারিণঃ॥"

ধর্ম্ম সাক্ষী ভগবান যাঁহার কর্ম্মে পরিতুষ্ট, সেই ধর্ম্মচারী ব্যক্তির জন্মই সফল। ধর্ম্মলাভ করিতে হইলে যদি নানা প্রকার হানি গ্লানি ও ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়, আর্য্যজাতি তাহাতে বিমুখ নহেন। ধর্ম্মের জন্য যাঁহারা সমাজ ত্যাগ করিয়াছেন, পারিবারিক সুখৈশ্বর্য্য সম্ভোগে জলাঞ্জলি দিয়াছেন, ইচ্ছা পূর্ব্বক বিষয়, বিলাসবাসনা বিসর্জ্জন দিয়াছেন, সংসারের সমস্ত সুখকে তৃণবত্তুচ্ছ করিয়াছেন, কঠোর ব্রত নিয়মের অনুষ্ঠানে দেহকে বিশুষ্ক এমন কি সময়ে সময়ে ধর্ম্মের জন্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছেন। অদ্য কার প্রবন্ধে ধর্ম্মের জন্য আত্মনির্ভর শীল হইলে যে তাহাকে জীবনোপায়ের জন্য ভাবনা করিতে হয় না তাহার ২।১টী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত মঙ্গলসিদ্ধ নামক একটী প্রসিদ্ধ পল্লী আছে এই গ্রামে দত্ত চৌধুরী উপাধিধারী জমিদারগণ বাস করিতেন, এখনও তাঁহাদের বংশধরগণ ঐ গ্রামে বাস করিতেছেন। ঐ গ্রামের সন্নিকট বাদেবটতলী নামক পল্লীতে ৺প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী (হারাইল চক্রবর্ত্তী নাম প্রসিদ্ধ) নামে এক সদাচারী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন তিনি কোনও দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, ধর্ম্মবিশ্বাসী ব্রাহ্মণ কোন চিকিৎসার

ব্যবস্থা না করিয়া, বাড়ীতে শ্রীশ্রীনারায়ণ বিগ্রহ ছিলেন, ঐ বিগ্রহের সেবা পূজা নিয়মিত ভাবে আরম্ভ করিলেন। কিছুকাল পর শ্রীশ্রীনারায়ণের কৃপায় তিনি দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ করেন। তাহার পরও বিগ্রহের সেবা পূজা ধ্যান ধারণা নিয়মিত ভাবেই চলিতে থাকে, তখন আর সংসারের কোন কার্য্যে তাঁহার মনোনিবেশ ছিল না। তাঁহার এই ঈশ্বরানুরাগের কথা দেশে রাষ্ট্র হওয়ার ফলে ঐ আশ্রম বিগ্রহ সমীপে নানাস্থান হইতে মানসিক নানাদ্রব্য লইয়া, লোক তাঁহার আশ্রমে আসিত তখন ঐ বাড়ী "বটতলী হারাইল ঠাকুরের আখড়া" নামে এ জেলায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল আমাদের গ্রামের ৺মৃত লোকনাথ দে উক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাড়ীতে চাকুরী করিত,একদিন আখড়ায় অতিথি অনেক উপস্থিত, গৃহে তণ্ডুলাদি পর্য্যন্ত নাই, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পত্নী লোকনাথদেকে ডাকিয়া বলিলেন যে, লোকনাথ ; গৃহে চাউল দাইল কিছুই নাই। ঠাকুর সেবা এবং বাড়ীর লোকের—ইতঃপর অতিথি সেবার আহার্য্য দ্রব্যের কি হইবে এ বিষয় কর্ত্তাকে জানাও। লোকনাথ বহির্ব্বাটিতে আসিয়া দেখিল কর্ত্তা ঠাকুর ঘরে ভাবনিমগ্ন চিত্তে অবস্থিতি করিতেছেন, লোকনাথ ঠাকুর ঘরের দরজায় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বলিল যে, ঘরে অদ্য চাউল দাইল কিছুই নাই উপায় কি হইবে, কিছুকাল পর চক্রবর্ত্তী মহাশয় উত্তর করিলেন, "লোকনাথ এ বিষয় ঠাকুরের নিকট বল, আমি কি করিব" এই বলিয়া পুনরায় ধ্যান নিমগ্ন হইলেন, পরে লোকনাথ বাড়ীর মধ্যে গিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পত্নীর নিকট এ বিষয় বলিল, তিনি আর কি করিবেন কেবল চিন্তা করিতেছেন; এবং মনে মনে—শ্রীভগবানকে ডাকিতেছেন। বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর গত হয় এই সময় এক ব্যক্তি চাউলের পাত্র দুইটী ও অপর একব্যক্তি দাউল দুই পাত্র নিয়া উপস্থিত হইল—৺ঠাকুরের মানসিক আনিয়াছে, তখন সকলেই আনন্দিত হইলেন, এবং চাউল দাইল পাক করিয়া ৺ঠাকুরের ভোগ হইল এবং সকলেই প্রসাদ পাইল। এরূপ ঘটনা তাঁহার জীবনে অনেকই সংঘটিত হইয়াছে তিনি এই ভাবে শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করিয়াই সাংসারিক জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। প্রাণকৃষ্ণ আমাদের স্বগ্রামবাসী জ্ঞাতি ঋষিকল্প স্বর্গীয় হরগোবিন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শিষ্য ছিলেন, উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় অত্যন্ত সদাচারী ব্রাহ্মণ ছিলেন স্বহস্তে পাক করিয়া নিরামিষ আহার করিতেন এবং একাদশী চাতুর্ম্মাস্য প্রভৃতি ব্রত নিয়ম যথাবিধি পালন করিতেন, তন্ত্র শাস্ত্রোক্ত ষটচক্রের গূঢ় তাৎপর্য্য বিশদভাবে বুঝাইতে সক্ষম ছিলেন, তৎকালীন জমিদার বর্গ তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন ; এরূপ সদ্ব্রাহ্মণ বর্ত্তমান যুগে বিরল। প্রাণকৃষ্ণের গুরুর প্রতি অসাধারণ ভক্তি ছিল, ব্যাকরণ জ্যোতিষাদি শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় অধিকার ছিল, প্রাণকৃষ্ণের স্বহস্তলিখিত শ্রীশ্রীকালী পূজাবিধি একখানা দেখিয়াছি হস্তাক্ষরও অতি সুন্দর ছিল,গ্রন্থখানা ১৭৭৩ শকে লিখিয়াছেন, গ্রন্থের শেষে লিখিত আছে :—

প্রাণকৃষ্ণ দ্বিজেনৈব এতত্তৎ প্রীতি কারকং।
লিখ্যতে পুস্তকং শাকে বহ্নি সপ্ত মুনীন্দুকে॥

প্রাণকৃষ্ণ দীর্ঘকাল হইল পরলোকগমন করিয়াছেন, এখন তাঁহার স্বধর্ম্মনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত হরিকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী বিগ্রহের সেবা পূজা শ্রদ্ধার সহিত পরিচালন করিতেছেন। তৎকালে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল ছিল না। কালস্রোতে লোকের মতিগতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যাওয়ায় এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল হইয়াছে।

এ জেলার অন্তর্গত পুর্বধলা গ্রামে ৺পদ্মলোচন বাগছি নামে একজন সদ্-ব্রাহ্মণ ছিলেন। বাড়ীতে অতিথি সেবার বন্দোবস্ত ছিল। অতিথি কোন দিনও বাড়ী হইতে বিমুখ হইয়া যায় নাই। তখন এ দেশে বৈকারিক জ্বরের প্রাদুর্ভাব ছিল, রসায়ন ঔষধ দ্বারা ঐ জ্বরের চিকিৎসা হইত, পদ্মলোচন রসায়নচিকিৎসায় দক্ষ ছিলেন, এ জেলার বিখ্যাত কবিরাজ স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র সেন চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নান্তে উক্ত পদ্মলোচনের নিকট রসায়নচিকিৎসা অভ্যাস করিয়াছিলেন তাঁহার অর্থের প্রতি স্পৃহা মাত্র ছিল না, যে যাহা ইচ্ছা করিয়া দিত তাহাই গ্রাসাচ্ছাদনের সম্বল। তিনি প্রাতঃকালে শ্রীশ্রীনারায়ণ বিগ্রহ সমীপে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া এবং প্রার্থনা করিয়া রোগী দেখিতে বাহির হইতেন। যাহা পাইতেন তাহাই খরচ করিতেন, সম্বল রাখা তাহার রীতি ছিল না, তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন আমার সংসার চালানের কোন ক্ষমতা নাই—শ্রীভগবানের দয়াই নির্ভর, তিনিই চালাইতেছেন ইহাই আমার ধ্রুব বিশ্বাস, তাহা না হইলে বিশ্বম্ভর নামের কোন স্বার্থকতা থাকে না।"

৺বিগ্রহের কৃপায়ই তিনি সামান্য আয় দ্বারা অতিথি সেবা প্রচুরভাবে চালাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্বধর্ম্মনিষ্ঠ পুত্র ৺নীলকমল বাগছী রীতিমত বিগ্রহের সেবা পূজা করিয়া গিয়াছেন, কিছুদিন হয় নীলকমলও পরলোকগমন করিয়াছেন, এখন তাহার একটী পুত্র বর্ত্তমান আছে।

দেও ডোকন নিবাসী স্বধর্ম্মনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত কালী চরণ দে ৺বিগ্রহের জন্য একখানা টিনের ঘর নির্ম্মিত করিয়া দিয়াছেন। পাঠকগণ ভবেই দেখুন হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা এবং শ্রীভগবানের প্রতি অনুরাগ থাকিলে সাংসারিক যন্ত্রণার অনেকটা লাঘব হয় তাহা বেশ বুঝা গেল। শ্রদ্ধাবান হিন্দুর সংসারটা নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া যায়।

নিখিল ভারত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মমহাসভা বোম্বাই।

সভাপতির অভিভাষণের মর্ম্মানুবাদ।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত রাজা কৃষ্ণম্‌ আচারিয়া বাহাদুর)

১৪ই জুন ১৯৩০

সমাগত ভদ্রবৃন্দ ও মহিলাগণ, আপনাদের অনুগ্রহে আমাদের ধর্ম্মজীবনের এই সন্ধিক্ষণে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের রক্ষার উপায় নির্দ্ধারণ ও নির্দ্দেশকল্পে অনুষ্ঠিত এই সভার সভাপতিপদে বৃত হইয়া যদিও আমি গর্ব এবং কৃতজ্ঞতা অনুভব করিতেছি, তথাপি সত্যকথা বলিতে গেলে, ভারতের এই প্রধান নগরীতে এইরূপ প্রতিকূল অবস্থার নিষ্পেষণে যখন ভারতের এবং হিন্দুর যথাসর্ব্বস্ব বিপর্য্যস্ত হইতে বসিয়াছে—এই সময়ে এ সভার সভাপতিত্বের ভার আমা অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তির উপর অর্পণ করাই উচিত ছিল।

গত ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজ সনাতন ধর্ম্ম কন্‌ফারেন্সের, সম্পাদকসমিতির সভাপতি রূপে আমি ভারতীয় রাজ্যের সর্ব্বোচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত একজন বিশিষ্টবন্ধুর নিকট সনাতন ধর্ম্মের প্রচারকেন্দ্র বোম্বাই নগরে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রস্তাব করি। বোম্বাইয়ে সংস্কার পন্থীদিগের প্রবলপ্রভাব হেতু তাঁহার মতে—অন্যস্থানই এই কার্য্যে অধিকতর যোগ্য। আপাত দৃষ্টিতে ঐরূপ মনে হইলেও জনসাধারণের এই অসাধারণ ঔৎসুক্য, সনাতনধর্ম্মের উপর আকস্মিক হস্তক্ষেপে দেশব্যাপী চাঞ্চল্য, এবং অধিকাংশ সভ্য দেশদেশান্তর হইতে আগমনে যে কষ্ট এবং অসুবিধা বরণ করিয়াছেন তাহা লক্ষ্য করিলে ঐ অনুমান যে সর্ব্বতোভাবে অমূলক তাহা নিঃসন্দেহ প্রমাণিত হয়। কারণ অধুনা কোন বিশেষ দলভুক্ত অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তির উচ্চ চীৎকারই প্রধানতঃ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কিন্তু এই বিরাট দেশের সর্ব্বস্তরে যে ধর্ম্মপ্রাণতা, যে সহানুভূতি আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহাই আমাকে এই কষ্ট সাধ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করাইয়াছে। আমি আশা করি বোম্বাই প্রদেশ অন্যান্য কার্য্যে যেরূপ অগ্রগামী, আপনাদের সাহায্যে ধর্ম্মরক্ষায় সে অনুরূপ তৎপরতা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইবে।

আমি আজ আপনাদের নিকট যে দুই একটী কথা বলিব, তাহার মধ্যে কিছুই নূতন নহে, পরন্তু এই পথের পুরাতন নির্দ্দেশ সমূহেরই সার সংগ্রহ,—কিন্তু জনসাধারণের সম্পূর্ণ জ্ঞাত হইলেও পুরাণাদি যে কারণে পুনঃ পুনঃ পঠিত হইলেও পুরাতন হয় না, সেই কারণেই আমি এই সনাতন নির্দ্দেশ সমূহের পুনরুল্লেখ করিতেছি—

ধর্ম্মের প্রতি আক্রমণ।

সভ্যগণ! বর্ত্তমানে আমরা যে দুর্দ্দিন এবং বিপজ্জালের কবলে পতিত হইয়াছি ইহার

তুলনা এই জাতির ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব। অনাদি কাল হইতে কত বার সনাতন ধর্ম্ম, এবং বেদের উপর বিপদের ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে, অসুর দানব কতবার বেদধ্বংস করিতে, সনাতন ধর্ম্মকে নিশ্চিহ্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু সমগ্র জগতের ঈর্ষ্যা এবং বিস্ময়ের নিদান এই সনাতনধর্ম্ম আজিও পূর্ণাঙ্গ এবং অক্ষতমূর্ত্তিতে সেই জগতেরবুকে সসম্ভ্রমে প্রতিষ্ঠিত। সহস্রাধিক বর্ষ যাবৎ আমরা বিদেশীয় আততায়ীর আক্রমণে পুনঃ পুনঃ বিপর্যাস্ত হইয়াছি সত্য কিন্তু এই সকল বৈদেশিক আমাদের ধর্ম্মেকচিৎ হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হইয়াছে। আমাদের ধর্ম, সমাজ বিজাতির প্রতি উপেক্ষার দৃষ্টিপাত করিয়া আপনার মত আপনিই চলিয়া আসিয়াছে যে তাহাকে প্রতিহত করিতে প্রয়াস পাইয়াছে, সেই ধ্বংস হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। তাই বৃটিশ সরকার রাজ্য ভার গ্রহণের পূর্ব্বেই প্রতিশ্রুতি দিয়া ছিলেন "তোমাদের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ হইবে না।" মহারাণীও স্পষ্টাক্ষরে তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়া ছিলেন।

কিন্তু আজ অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত, আজ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ধর্ম্ম, সমাজ, অর্থ একযোগে আক্রান্ত—এ আক্রমণের তুলনা কোন ইতিহাসে নাই।

আজ আমাদের স্বদেশী কতিপয় ব্যক্তি—যাহারা পাশ্চাত্য ভাবেভাবিত, পাশ্চাত্য জীবন ধারায় অভ্যস্ত, আমাদের জাতীয় ভাবধারায় সম্পূর্ণ সম্পর্ক শূন্য পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত,—তাহারাই আমাদের অনাদি কালের সভ্যতা, সমাজ ও ধর্ম্ম, ধ্বংস করিতে উদ্যত। ইহারা ধারণা করিতে পারে না যে ভারতের শিক্ষার মূল প্রকৃতিই পাশ্চাত্য শিক্ষায় সম্পূর্ণ বিরোধী উভয়ের মিলন শুধু অসম্ভব নহে সর্ব্বনাশকর। তাই আজ আপনারা যে অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন তাহা সত্য। ভগবৎ প্রেরণাই আজ আপনাদের সম্মেলন ঘটাইয়াছে, আপনারা কর্ত্তব্যপথ নির্ণয় করিয়া লউন। মনে রাখিবেন শ্রীভগবান বলিয়াছেন "যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানি র্ভবতি ভারত, অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং", যে ভগবান দুঃশাসন নির্য্যাতিত দ্রৌপদীর উদ্ধারে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন তিনি কখনও ধর্ম্মের এই দুর্দ্দিনে অবিচলিত থাকিতে পারেন না—আমাদের সুধু বর্ত্তমানের কর্ত্তব্য সমাধান করিতে হইবে।

ধর্ম্ম ও সমাজ—প্রকৃত বিষয়ে প্রবেশের পূর্ব্বে আমি আর একটা মাত্র কথা বলিব। আজকাল প্রায়ই শুনিতে পাই গোঁড়ার দল শুধু ধর্ম গেল ধর্ম্ম গেল বলিয়া চীৎকার করে এবং "এই অত্যধিক ধর্ম্মাসক্তির জন্যই আজ ভারতের এই অধঃপতন। ইহারা ধারণা করিতে পারে না যে ভারতের সমাজ ও ধর্ম্ম যেরূপ ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত, প্রত্যেক ব্যক্তির দৈনন্দিন সামাজিক এবং পারলৌকিক যে, কর্ত্তব্য সমষ্টি সমাজকে লক্ষ্য পথে পরিচালিত করে সেই সকল কর্ত্তব্যই যথাযথ প্রতিপালিত হইলে প্রত্যেক ব্যক্তির আত্ম বিকাশ পরিপূর্ণ হয়। এই অবস্থায় ধর্ম্ম ও সমাজকে পৃথক ভাবে চিন্তা করা অসম্ভব। এরূপ স্থলে ধর্ম্ম গেল প্রকৃত পক্ষে সমাজ গেল, দেশ গেলরই নামান্তর। সর্ব্বত্র—বিশেষতঃ ভারতবর্ষে ধর্ম্মানুভূতিভিন্ন কোন আন্দোলনই ফলপ্রসূ হইতে পারে না।" ধর্ম্ম ভারতের হৃদয়তন্ত্রী, সেই তন্ত্রীতে যখন আঘাত লাগে। তখনই ভারতের সর্ব্বস্তর হইতে আঘাতের প্রতিধ্বনি

আকাশ বাতাস কম্পিত করে। কালস্রোতে ভাসমান সমাজ কালস্রোতে বিস্মৃতির অতলতলে নিমজ্জিত হয়, কিন্তু হিন্দুসমাজ অনাদি প্রতিষ্ঠ এবং অনন্তকালস্থায়ী। ক্রমশঃ—

দিল্লীর সনাতন ধর্ম্মাবলম্বিগণের পক্ষ হইতে ধর্ম্মবিষয়ে স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ও সর্দ্দাআইন উঠাইয়া দিবার জন্য ভাইসরয়ের নিকট যে আবেদনপত্র প্রেরিত হয় তাহার মর্ম্মানুবাদ।

১। "সনাতনধর্ম্মসমাজ" এবং "ব্রাহ্মণসভার" ও বর্ণাশ্রম-স্বরাজ্য-সংঘের সদস্যগণের পক্ষ হইতে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া আমরা শ্রীমান্ ভাইসরয় মহাশয়ের নিকট সর্দ্দার-আইন সম্বন্ধে জনগণের অভিমত নিবেদন করিতেছি।

২। আমরা সনাতন ধর্ম্মিগণ ঐকমত্যে ইহা স্পষ্ট করিয়া কহিতে চাই যে, যে সর্দ্দা আইন গেজেটের ঘোষণার দ্বারা ১লা এপ্রেল হইতে কার্য্যকর করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে, ঐ সর্দ্দাআইন আমাদিগের সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের সর্ব্বপ্রকারে বিরুদ্ধ। এই জন্য রাজভক্ত ধার্ম্মিক প্রজাগণের মধ্যে বিশেষ উদ্বেগ উপস্থিত হইয়াছে—আমাদিগকে এই আইনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইবে, কি আমাদিগের প্রাণাধিক ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইবে। যাহা হউক, আমরা সনাতনধর্ম্মী হিন্দু, কোন জাতি, সম্প্রদায় বা সংঘের অহিত চিন্তা, আমাদের ধর্ম্ম বিরুদ্ধ, এইজন্য সর্দ্দাআইন রহিত করা অতিসত্বর প্রয়োজন বুঝিলেও শাসিতপ্রজা ও শাসকরাজপুরুষগণের মধ্যে যাহাতে বিরোধ উপস্থিত না হয় তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সর্দ্দাআইনের ধর্ম্মানুমত প্রতিকারের ব্যবস্থা স্বহস্তে গ্রহণ না করিয়া পুনর্ব্বার আপনার নিকট আবেদন করিতেছি, আপনি অবিলম্বে এই আইন রহিত করিয়া দিউন।

আমরা খুব স্থিরচিত্তে বিচার পূর্ব্বক আপনাকে জানাইতেছি এমন কোন বাধা আমাদের মানা সম্ভব নহে, যাহা মানিতে হইলে বেদবিধির অন্যথাচরণ করিতে হয়।

অতীতে বেদবিধি পালনের পক্ষে বহু বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে সনাতন ধর্ম্মীগণ সে সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বেদবিধির পালন করিয়া আসিতেছে, আজ ও আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি সনাতন-ধর্ম্মীহিন্দুগণ কোন প্রকার বিঘ্নের ভয়ে বেদবিধির উল্লঙ্ঘন করিবে না, বেদবিধির মর্য্যাদা রক্ষার জন্য সনাতন ধর্ম্মীগণ জীবনকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকে।

সনাতন ধর্ম্মী-হিন্দু জানে আত্মা অমর, অমর আত্মার উপরে দণ্ড ধারণ করিতে পারে এত বড় শক্তি ত্রিভুবনে কাহারও নাই, কিন্তু বেদ বিধির অন্যথাচরণ করিলে ঐ অমর আত্মার উপরে স্বয়ং দণ্ড ধারণ করা হয়; এই সনাতন-বিশ্বাসবশে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অকুণ্ঠিত চিত্তে জীবন ত্যাগ করিয়াছেন কিন্তু সনাতনবেদবিধি পরিত্যাগ করেন নাই।

সেই পূর্ব্ব পুরুষের রক্তধারা আজও আমাদের ধমনীতে প্রবাহিত হইতেছে। ইহা আপনার স্মরণ করা উচিত।

৩। শ্রীমান্ রাজপ্রতিনিধিকে আমরা অনুরোধ করিতেছি—তিনি যেন এ বিষয়ে বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখেন—যে, সনাতন ধর্ম্ম ভিন্ন পৃথিবীতে এমন দ্বিতীয় ধর্ম্ম নাই যাহাতে রাজাকে ভগবানের অংশ বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। এই ভাব সনাতনধর্ম্মীকে রাজার সম্মান করিতে শিক্ষা দিয়াছে। রাজারও কর্ত্তব্য স্বার্থবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম ও নীতি অনুসারে প্রজার কল্যাণ সম্পাদন করা, ইহাও হিন্দুর শাস্ত্রাদেশ। এই প্রকার তত্ত্বদর্শী মহর্ষিগণের রচিত-শাস্ত্রাদেশে এই বিষয়ে বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে যে, রজঃস্বলা হইবার পূর্ব্বে যে কোন প্রকারে হউক কন্যার বিবাহ দিতেই হইবে। এই দিকে লক্ষ্য করিয়াই অষ্টমবর্ষীয়কন্যার বিবাহ প্রশস্ত বলিয়াছেন। যে হেতু কন্যার ধাতু ও প্রকৃতি ভেদে অপেক্ষা কৃত অল্প ও অধিক বয়সে ঋতু দর্শন হইয়া থাকে। যোগ্য বর লাভ হইলে অষ্টমবর্ষের পূর্ব্বেও কন্যার বিবাহ শাস্ত্রানুমত।

ভারতবর্ষের সতীত্বের বিস্ময়কর ইতিহাস আপনি অবশ্যই অবগত আছেন। হিন্দুর ধর্ম্মানুমত বিবাহ প্রথাই জগতে অতুলনীয় সেই সতীত্বের ইতিহাস রচনা করিয়াছে। আশা করি আজকার অধঃপতিত সনাতনধর্ম্মীহিন্দুও সেই ইতিহাসের ক্ষীণনিদর্শন দেখাইতে পারে—যাহাতে বিশ্ববাসী বিস্ময় বিমোহিত হইয়া যায়। এই সনাতন ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষায় উদাসীনতা আপনার কর্ত্তব্য নহে।

পরিতাপের বিষয়—আজকালকার নেতৃনামধারী ব্যক্তিগণ হিন্দুর বিবাহ পদ্ধতির শাস্ত্রানুমত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে অসমর্থ। ঐ প্রকৃতির ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকে বিবাহে হিন্দুর শাস্ত্রীয় বিধির অনুসরণ করেন না, যাঁহারা কথঞ্চিৎ করেন তাঁহারাও বিবাহের পারলৌকিক ফলে বিশ্বাসবান্ নহে ঐ প্রকৃতির ব্যক্তিগণ বিবাহকে উপভোগ ও সন্তান উৎপাদনের উপায় রূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

নেতৃনামধারী সর্দ্দা আইন সমর্থনকারীগণ শাস্ত্রীয় বিবাহপদ্ধতিকে অকালমৃত্যুর হেতু রূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন কিন্তু তাঁহারা এত অন্ধ যে, যাহা সাধারণজনগনের প্রত্যক্ষের বিষয় তাহাও দেখিতে পান না। বিবাহ ব্যাপারে ধর্ম্মভাব যত ক্ষীণ হইতেছে স্ত্রীপুরুষের অসংযম তত বৃদ্ধি পাইতেছে, অকাল মৃত্যুও সেই অনুপাতে বাড়িয়া চলিয়াছে। যখন শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে বিবাহকার্য্য সম্পাদিত হইত ও ধর্ম্ম বুদ্ধিতে দাম্পত্যব্যবহার প্রচলিত ছিল তখন পর্য্যন্ত হিন্দু সমাজে অকাল মৃত্যু এত প্রবল ভাবে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। সকল দিক বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায় সর্দ্দাবিলের সমর্থনকারী নেতৃ নামধারী হিন্দুগণ নিজের বিকৃত ধারণা ও বিকৃত আচারের পরিপুষ্ট সাধন মাত্র উদ্দেশ্যে এই বিল সমর্থন করিয়াছেন তাঁহাদের প্রদর্শিত যুক্তিতে কোন সার নাই।

৪। সর্দ্দাবিল সমর্থন কালে সরকার পক্ষ ও বেসরকারী ধর্ম্মভ্রষ্ট সদস্যগণ যে ভাবে

আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে সাধারণের এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, সরকারপক্ষ সমাজপরিত্যক্ত ধর্ম্মহীন সদস্যগণের সহিত মিলিত হইয়া হিন্দুর ধর্ম্ম ও সমাজপদ্ধতি ধ্বংস করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছেন। এরূপ ধারণা শাসক শাসিত কাহারও পক্ষে কল্যাণকর নহে। আইন উঠাইয়া দিয়া প্রজার এই প্রকার ধারণার উচ্ছেদ সাধন কর্ত্তব্য।

৫। আমরা আপনাকে আরও একটি বিষয়ে প্রণিধান করিতে অনুরোধ করিতেছি—যাহারা মিত্রের বেশ ধারণ করিয়া ব্যবস্থাপক সভায় সর্দ্দাআইন উপস্থাপন ও সমর্থন করিয়াছেন তাঁহারা বৃটিশ সরকারের মিত্রের কার্য্য না করিয়া প্রকৃত শত্রুর কার্য্যই করিয়াছেন। কারণ যে সনাতন ধর্ম্মীগণ কখন রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেন নাই এবং সরকারের প্রতি কোন বিরুদ্ধ ভাব ও পোষণ করেন নাই, সর্দ্দা আইন পাশ হওয়ায় তাহাদিগকে ও বৃটিশ সরকারের বিরোধী করা হইয়াছে, ও রাজনৈতিক আন্দোলন করিতে বাধ্য করা হইয়াছে।

৬। হিন্দুর শাস্ত্র গ্রন্থের আলোচনা করিলে বুঝিতে পারাযায়, কন্যার বিবাহ বিষয়ে পূর্ণস্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। অভিভাবকগণ স্বেচ্ছায় যে ভাবে যখন ইচ্ছা কন্যার বিবাহ দিতে পারেন। যাঁহারা সর্দ্দাআইন প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী তাঁহারাই কন্যাবিবাহে পরাধীনতা আনয়ন করিতেছেন। এ অবস্থায় বিবেচনা কর্ত্তব্য যে, আমাদের ঋষিগণ স্বাধীনতাবাদী না সর্দ্দা আইন প্রবর্ত্তকগণ স্বাধীনতা বাদী।

৭। এসেমব্লীর সদস্যদের মধ্যে অনেকে নাকি এইরূপ মিথ্যা প্রচার দ্বারা আত্মমত সমর্থনের চেষ্টা করিয়াছেন যে, আট বৎসরে কন্যার বিবাহ মুসলমান শাসন কালে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই বুঝিতে পারেন ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

আমরা এই প্রকার মিথ্যাবাদী এসেমব্লীর সদস্যগণকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—যদি তাঁহাদের কথা সত্যই মানিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে মুসলমানেরা তলোয়ারের জোরে হিন্দুর মধ্যে এই প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল না আইন করিয়া এই প্রথা প্রচলিত করিয়াছিল ?

আইন করিয়া যে করে নাই ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন, (এই প্রথা প্রবর্ত্তনের জন্য যে তলোয়ার ধারণ করিয়াছিল তাহারও প্রমাণ নাই) বৃটিশ সরকার ১৮৫৭ সালে মহারাণীর ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন ভারতবাসীর "ধর্ম্ম ও সমাজের উপর হস্তক্ষেপ করাইবে না"। অথচ সর্দ্দা-আইন করা হইতেছে। ইহার সহিত মুসলমান শাসন কালের দৃষ্টান্তের কি কোন সামঞ্জস্য দেখাইতে পারা যায় ?

ব্রাহ্মণ-সমাজ

উনবিংশ বর্ষ। } ১৮৫১ শক, সন ১৩৩৭ সাল, আষাঢ়। { নবম সংখ্যা।

ব্রাহ্মণ ও স্বদেশী আন্দোলন।

(লেখক—শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এম্, এ,)

আজ চারিদিকে ব্রাহ্মণ বিদ্বেষ শাস্ত্র বিদ্বেষ দেখা যায়, বাবুরা ভাবেন ব্রাহ্মণই যত নষ্টের মূল—ভারতবর্ষকে উন্নতির পথে চলিতে ব্রাহ্মণরাই চিরকাল পরিপন্থী হইয়া আসিয়াছে। অতএব যত পার ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতদের উপর গালিবর্ষণ কর—আর পার ত উহাদিগকে আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরে নিয়া বিসর্জ্জন কর। (ভারত মহাসাগরে ফেলিলে কি জানি ইহারা সাঁতরাইয়া আবার আসিয়া ভারতে শিকড় গাড়ে—তাই আট্‌লাণ্টিকের নির্দ্দেশ বোধ হয়)।

কিন্তু এসব বাবু এটা খেয়াল করেন না, ব্রাহ্মণ কি করিয়া ভারতবর্ষকে নানা বিপ্লবের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে। বৌদ্ধ বিপ্লবের কথা ভাবিয়া দেখ। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের উপর কত বড় আঘাত হইয়াছিল শাস্ত্রের উপর কত অত্যাচার হইয়াছিল। সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে 'পালি' আসিয়া আসর যুড়িয়াছিল তাহার ফলে জিহ্বার জড়তা জন্মিয়াছিল লোকে 'ধর্ম্ম' না বলিয়া বলিতে শিখিল ধম্ম। যাহা হউক সেই বিপদের সময় ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া ভারতবর্ষের পুনরুত্থানের সহায়তা করিলেন—সনাতন ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আবার শাস্ত্র ও দেবভাষার অভ্যুদয় হইল।

তারপর মোসলমান যুগের কথা। "সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ" এই নীতিতে তখন ব্রাহ্মণ সমাজ রক্ষা করিলেন। কোনও ক্রমে যদি কাহারও মোসলমান সম্পর্ক ঘটিল—নির্ম্মমভাবে তাহাকে ছাটিয়া ফেলিয়া সমাজের বিশুদ্ধি রক্ষা করিলেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য নিম্নস্তরের রক্ষার জন্য খোল করতাল যোগে নাম কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়া ধর্ম্মে নূতন আস্বাদ আনিয়া দিলেন তাহাতে নিম্নস্তরের লোকেরা ও মোসলমানের নানা পার্থিব সুবিধায়ও আকৃষ্ট হইল না। 'অনন্তশাস্ত্রং বহুবেদিতব্যং'—লোকে শাস্ত্রমর্ম্মাবধারণে অসমর্থ হইয়া উদ্‌ভ্রান্ত হইল—রঘুনন্দন সংক্ষেপে সমস্তের সার সঙ্কলন করিয়া ধর্ম্মরক্ষা করিলেন।

ইংরেজের আগমনের প্রথম ভাগে ও ব্রাহ্মণ খৃষ্টগন্ধি লোকদের বর্জ্জন করিয়া সমাজের পবিত্রতা রক্ষা করিয়াছিলেন।

অতএব সর্ব্বদাই ব্রাহ্মণ প্রকৃত স্বদেশী ছিলেন, আমাদের দেশের বিশিষ্টতা—ধর্ম্ম, শাস্ত্র, সংস্কৃত ভাষা, বর্ণাশ্রম সমাজ—এসকলই প্রকৃত স্বদেশী জিনিষ—ব্রাহ্মণ তাহা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন বলিয়াই সমগ্র দেশটা বৌদ্ধ বা মোসলমান বা খ্রীষ্টান হইয়া যায় নাই।

পরন্তু এখন ইংরেজ রাজত্বের বর্ত্তমান যুগে ইংরেজী শিক্ষার প্রাবল্যে এবং পূর্ব্বোল্লেখিত ব্রাহ্মণ দ্বেষিগণের প্রচারের ফলে দিন দিনই ব্রাহ্মণ হীনপ্রভ হইয়া পড়িতেছেন সমাজও ধ্বংশের দিকেই চলিয়াছে যদ্বিধের্ম্মনসিস্থিতং।

এখন প্রকৃত বিষয়ের অবতারণা করিব। এই যে স্বদেশী আন্দোলন—বিলেতী বর্জ্জন—ইহারও মূল খুঁজিলে ব্রাহ্মণের প্রভাব দেখা যায়।

"বঙ্গবাসী পত্রিকার প্রবর্ত্তক ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু 'ব্রাহ্মণ' চিনিতেন—তাই ব্রাহ্মণ ভক্ত ছিলেন। তাঁহার "বঙ্গবাসীর সম্পাদকও একজন ব্রাহ্মণ রাখিতেন। তাঁহার এই নীতিতে ফল ধরিয়াছিল—তাই 'বঙ্গবাসী' আফিস্ হইতে শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচার হইয়াছিল। 'বঙ্গবাসী' বঙ্গীয় সমাজে এরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল—যে সংবাদ পত্র মাত্রেরই নাম সাধারণে "বঙ্গবাসী" হইয়াছিল।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি। 'বঙ্গবাসী' তখন স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়৺পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন প্রভৃতির সৎপরামর্শে চালিত হইত—কৃষ্ণবাবু সম্পাদক ছিলেন। স্কোবল্ সাহেব সহবাস সম্মতি আইনের পাণ্ডুলিপি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় পেস্ করিলেন। সেই প্রথম ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ। "বঙ্গবাসী" তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিলেন—সমগ্র দেশ পাড়া গাঁও পর্য্যন্ত সেই আন্দোলনে যোগ দিল—প্রতিবাদের দরখাস্তে লাট সাহেবের দফ্তর ভরিয়া গেল।

এখানে একটা কথা বলিয়ারাখি। ৺সুরেন্দ্র নাথের "বেঙ্গলী' ৺নরেন্দ্র সেনের ইণ্ডিয়ান মিরর" এমন কি শম্ভু মুখুজ্যের "রেইস্ এণ্ড রায়ৎ" এইসব ইংরেজী পত্র—"সঞ্জীবণী" 'সময়' প্রভৃতি বাঙ্গালা সংবাদপত্র বিলের সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু জনসাধারণ উহাতে

কর্ণপাত ও করে নাই। বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত প্রায় সমস্ত ব্যক্তি নানা সভা সমিতিতে ঐ বিলের বিপক্ষে অভিমত প্রকাশ করিয়া দরখাস্ত পাঠাইয়াছিলেন।

বিল্ পাস্ হইল, কিন্তু ডেড্ লেটার হইয়া থাকিল।

'বঙ্গবাসীর' দল তখন ইংরেজ সরকারের এইরূপ লোকমত দলন—তথা শাস্ত্র বিধির অমর্য্যাদা বিধান—দেখিয়া গরম প্রবন্ধাবলী লিখিলেন—সরকার কর্ত্তৃক অভিযুক্ত হইলেন—কিন্তু ব্যারিষ্টার শার্দ্দূল জেকসন্ সাহেবের প্রখর বক্তৃতায় ফলে কথমপি অব্যাহতি লাভ করিলেন।

অতঃপর তাঁহারা সরকারের নীতির প্রতিবাদ স্বরূপ বিলাতী লবণ বিলাতী কাপড় ইত্যাদি বর্জ্জনের নিমিত্ত আন্দোলন চালাইলেন।

তখন, বাবুর দল মজা দেখিতেছিলেন—মোটেই ঐ আন্দোলনে যোগ দেন নাই। প্রায় ১০ বৎসর পরে কলিকাতায় কংগ্রেসের এক অধিবেশনে স্বদেশী জিনিষ ব্যবহারের অনুকূলে একটা মন্তব্য গৃহীত হইয়াছিল।

"বঙ্গবাসীর" ব্রাহ্মণ পরিচালিত স্বদেশী আন্দোলন তথাপি বিফল হয় নাই—অনেকের চক্ষু ফুটিয়াছিল বিদেশী বস্ত্র ও বিলাতী লবণ অনেকেই বর্জ্জন করিয়াছিলেন।

তখনকার একটা কথা (একটু অবান্তর হইলেও) বলিব। শ্রীহট্ট সহরে একজন প্রাচীন ডেপুটী ছিলেন নাম ৺চন্দ্রনাথ নন্দী। সরকারী কাজে তিনি কলেক্টারের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ দিলেন। সেই ডেপুটী মহাশয় প্রকাশ্যে বিলাতী লবণ ও বিলাতী কাপড় বর্জ্জনের জন্য সাধারণকে উপদেশ দিতেন। স্থানীয় জমিদার গোলোকনাথ চক্রবর্ত্তী তাঁহার অনুরোধে বন্দর বাজারে স্থিত একটা কোটা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন—তাহাতে সম্বর লবণ আনিয়া রাখা হইল। লোকে ঐ লবণে অসুবিধা বোধ করিলে—উক্ত ডেপুটি বাবু, কিরূপে সম্বর লবণ ব্যবহার করিতে হয় তদ্বিষয়ে উপদেশ দিতেন। পল্লীগ্রাম হইতে যুগীজাতীয় কতিপয় ব্যক্তিকে আনাইয়া বস্ত্রবয়ন বিষয়ে উৎসাহ দিতেন—এবং স্বয়ং ও তৎসহযোগী অনেক হাকিম (যথা ৺ঈশানচন্দ্র পত্রনবিশ প্রভৃতি) উহাদের প্রস্তুত মোটা কাপড় অকুণ্ঠিত চিত্তে ব্যবহার করিতেন। আজ কালকার হাকিমগণের এইরূপ সৎসাহস হইবে কি ? বরং সাবেক হাকিমরা কদাচিৎ হেট-কোট ব্যবহার করিতেন—এখন তো যে—সে—এমন কি স্কুল কলেজের শিক্ষকগণ পর্য্যন্ত হেট্-কোট্ ধরিয়াছেন।

এই গেল প্রথম স্বদেশী আন্দোলনের কথা। যখন বঙ্গভঙ্গের পর প্রবলবেগে "স্বদেশী" আন্দোলন চলিল—তখন ব্রাহ্মণগণ বিশেষতঃ পণ্ডিতবর্গ—ইহার প্রসারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহারা ব্যবস্থা দিলেন—যাহাতে পূজায় বা শ্রাদ্ধে কেহ বিদেশী কাপড় লবণ ইত্যাদির ব্যবহার না করে দেবীর অঙ্গে বিলাতী সাজ যাহাতে পরান না হয় সেই জন্যও তাঁহারাই ব্যবস্থা দিয়া ছিলেন।

বলা আবশ্যক যে তখন স্বদেশী বাবুরা পণ্ডিত সমাজে সহায়তা প্রার্থী হইয়া

ছিলেন—এবং তাঁহারাও সানন্দে এই ব্যাপারে যোগদান করিয়াছিলেন। তখন ব্রাহ্মণের প্রভাব কতটা ছিল, প্রমাণার্থ ইহাও বলিতে হইল যে, ৺সুরেন্দ্র বাবু সাধারণ্যে বক্তৃতার সময় স্বীয় উপবীত দেখাইয়া 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া নিজকে ঘোষিত করিয়াছিলেন।

এখন—এই বর্ত্তমান সময়ে যে আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে—তাহাতে ব্রাহ্মণগণের তেমন উৎসাহ দেখা যাইতেছে না; তজ্জন্য কেহ কেহ যে অভিযোগ না করিতেছেন এমনও নহে। কিন্তু সেই নিমিত্ত দায়ী এই আন্দোলনের প্রবর্ত্তয়িতাদের সুবুদ্ধি সদ্বিবেচনার অভাব এবং তাঁহাদের প্রকটিত ভাব-স্বভাব।

কংগ্রেস যখন প্রথম সংস্থাপিত হয়, তখন রাজনীতির সঙ্গে সমাজনীতির সংস্রব থাকিবে না—ইহাই স্থিরীকৃত হয়—এবং ইহাতে বিলাতফেরতরা ও খ্রীষ্টান পার্সী মোসলমান, শিখ প্রভৃতির সহিত হিন্দু সাধারণ সকলেই যোগদান করিবেন—কাহারও ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধে ইহাতে কোনও আলোচনা হইবে না ইহাই তখন নেতৃবর্গের অভিমত ছিল। একদল সমাজ সংস্কারক কংগ্রেসের অধিবেশনের সময়ে মজলিস করিতেন—কিন্তু মূল কংগ্রেসের সঙ্গে এই মজলিসের কোনও সম্পর্ক ছিল না।

তারপর ক্রমশঃ উগ্রপন্থীদের প্রাবল্যে কংগ্রেস্ হইতে প্রাচীন ধীরপন্থীদল "লিবারেল্ ফেডারেশন" করিয়া স্বতন্ত্র হইয়া গেলেন; তখন কংগ্রেসের ঐ নীতি পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল, "অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন" কংগ্রেসের ক্রোড় মধ্যে লব্ধ প্রবেশ হইল—তখন হইতেই ব্রাহ্মণ এবং শাস্ত্রবিশ্বাসী হিন্দু ইহার প্রতি বিরাগের ভাব পোষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। 'অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন শব্দটার মধ্যে সমাজধ্বংসের বীজ নিগূঢ়ভাবে নিহিত রহিয়াছে—ইহাতে নিম্নস্তরের ও উচ্চস্তরের হিন্দুদের মধ্যে বিরোধ—যাহা কখনও ছিল না বাঁধাইবার হেতু রহিয়াছে। ফলে একতার মধ্যে অনৈক্যের কারণ ঘটিয়াছে—অথচ এই সময়ে একতাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ছিল।

সে যাহা হউক, প্রত্যেক প্রদেশে, জেলায় জেলায় কংগ্রেসের দল গঠিত হইতে লাগিল। ইহারা কাউন্সিলে গিয়া এক যোগে সরকারের বিরোধিতা করিয়া কোনও কোনও বিষয়ে সরকারী পক্ষকে হারাইতে ও সমর্থ হইলেন এভাবে দেশের মধ্যে ইঁহাদের একটু প্রতিপত্তি ও হইল।

কুক্ষণে, সর্দ্দারবিল্ গৌড়বিল প্রভৃতি সমাজ সংস্কারের আইনের পাণ্ডুলিপি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় পেশ্ হইল। কংগ্রেসের দল এই সকল বিধানের সমর্থক হইলেন। কেবল সমর্থক হইলেও বরং সহ্যকরা যাইত; পরন্তু রীতিমত ইহারা ঐ সব আইনের বিরোধী পক্ষকে নানাভাবে দমন ও নির্য্যাতন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখা গেল (১) সহবাস সম্মতির বয়োনির্দ্ধারণ বিষয়ে লোকমত সংগ্রহের জন্য কমিটি একটা হইল ইহাতে বাছিয়া বাছিয়া সংস্কারকদিগকেই মেম্বর করা হইল;—ইহারা কোথায় নিরপেক্ষ ভাবে জনমত অবগত হইবেন—তাহা না করিয়া সংস্কারের পক্ষে প্রচার করিতে লাগিয়া গেলেন।

এমন কি ইঁহারা রিপোর্টে ও অধিকাংশ সাক্ষীর মতের বিরুদ্ধে সংস্কারের পক্ষে, সুপারিশ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। (২) ঐ দলের মুখপত্রগুলি সংস্কার সমর্থক সভাসমিতির কথা প্রচারিত করিতে লাগিলেন—কিন্তু কোথাও বিপক্ষে সভাসমিতি হইলে তাহা চাপিয়া রাখিতে লাগিলেন।

(৩) কোথাও বিলের প্রতিবাদে সভাধিবেশন হইলে এই দলের নায়কেরা (এবং নায়িকারাও) গিয়া সভাভঙ্গ করিবার জন্য গুণ্ডামির আশ্রয় গ্রহণ করিতে ও ইতস্ততঃ করিলেন না—সর্ব্বজনমান্য ধীরপ্রকৃতি ৺মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর পর্য্যন্ত ইঁহাদের ঐরূপ গুণ্ডামির কথা গভর্ণমেণ্টে জ্ঞাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

(৪) এসেম্ব্লিতে কংগ্রেসদলভুক্ত সভাপতি সর্দ্দারবিলের সমর্থকদিগের বক্তৃতায় কদাপি কোনও বাধা দিলেন না—পরন্তু প্রতিপক্ষের প্রতি নিগ্রহ প্রয়োগে সঙ্কোচ বোধ করিলেন না।

(৫) যিনি ঐ দলের নিকট দেবতার ন্যায় পূজিত সেই মহাত্মা, ঐ বিল্ যখন বিচারাধীন ছিল তখন সিমলায় তার করিয়া জানাইলেন—কন্যার বিবাহের বয়স চৌদ্দ কেন আঠার বৎসর করা হউক।

(৬) এদিকে ইঁহারা গবর্ণমেণ্টের অসহযোগিতায় বদ্ধপরিকর, পরন্তু এই বিল পাস্ করিবার সময়ে সরকারী পক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে দ্বিধাবোধ করিলেন না।

(৭) ঐ দলের যিনি প্রধান—তিনি স্পষ্ট বলিলেন যে, তিনি শাস্ত্রবিধির কোনও ধার ধারেন না লোক মতও গ্রাহ্য করেন না।

এই ব্যাপার দেখিয়া সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী শাস্ত্র বিশ্বাসী ব্রাহ্মণাদি জনগণ ঐ দলের উপর কি ভাব পোষণ করিলেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। তাঁহারা দেখিলেন যে একদল ক্ষমতা হাতে পাইলে, ইংরেজের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ করা হয়,—তাহাতো করিবেনই উপরন্তু সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মও সমাজের ধ্বংশ সাধন করিয়া সমস্ত একাকার করিবেন। ইংরেজ ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন—তাই ঐ প্রতিশ্রুতি রক্ষার অন্ততঃ একটা ভাণও করিতেছেন। সর্দ্দার আইন পাস্ কবিতেছেন—কিন্তু বলিতেছেন তোমাদের লোকেরাই উহা চায়, এসেম্ব্লিতেও কাউন্সিল্ অব্ ষ্টেট অধিকাংশের ভোটে ইহা পাস্ হইয়াছে—আমরা সম্মতি না দিয়া কি করিব?" পরন্তু ঐ দল ক্ষমতা পাইলে এরূপ ভাণও করিবেন না—বেপরোয়া আইন প্রচনের জন্য অত্যাচার করিবেন। তাই ইঁহাদের প্রবর্ত্তিত বর্ত্তমান আন্দোলনের অনেক বিষয় ব্রাহ্মণাদি সনাতন পান্থীর অভীপ্সিত হইলেও (যথা লবণ কর রহিত করা, মাদকদ্রব্য নিবারণ করা স্বদেশী বস্ত্র প্রচলন করা ইত্যাদি), ঐ ভয়ে সঙ্কোচিত হইয়া এই আন্দোলনে সর্ব্বান্তঃকরণে যোগদান করিতে চাহিতেছেন না।

আমরা রাজনীতির ধার ধারি না; তথাপি এইটুকু বলিতে পারি যে এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে যখন ইঁহারা ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন তখন সমাজ

সংহারক ঐ সব আইন কানুন শিকায় তুলিয়া রাখাই উচিত ছিল ইহাদের বরং এসেম্লিতে বলা উচিত ছিল—"আমরা চাই একতা—এখন এই অনৈক্যের বীজ—সামাজিক আইন কানুনে প্রশ্রয় দিবার সময় নহে। যখন ভারত স্বাধীন হইবে—তখন লোকমত যদি এসব সংস্কারের অনুকুল হয় তাহা করা যাইবে।" ফলতঃ সম্প্রতি নাকি মহাত্মাজীও লোকের নিকট বলিতেছেন যে, আইন করিয়া সমাজ সংস্কার তাঁহার অভিপ্রেত নহে—এই সুবুদ্ধিটুকু আগে হইলে শিমূলায় টেলিগ্রাম করিয়া মেয়ের বিবাহ বয়স ১৮ করিবার জন্য ফতোয়া দিতেন না।

সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণাদি হিন্দুগণ চিরদিনই স্বদেশী—বরং প্রকৃত স্বদেশ ভক্ত ইহারাই। বাবুর দলই বিলাতী জিনিষ এমন কি বিলাতী মেম পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছেন—এখনও পূর্ণমাত্রায় বিদেশী ভাবে বিভোর। শ্রীকৃষ্ণ বিল্বমঙ্গলের হাত ছুড়িয়া ফেলিয়া চলিয়া গেলে বিল্বমঙ্গল বলিয়াছিলেন—

"হস্ত মাকৃষ্য যাতোসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতম।
হৃদয়াৎ যদি নির্য্যাসি পৌরুষংগণয়ামিতে ॥

বিলাতি বর্জ্জনাদি বিষয়েও বাবুদিগকে সেইরূপ বলা যায়—"বিদেশী কাপড় ফেলিয়া স্বদেশী খদ্দর পরিলে কি হইবে? হৃদয়ে যে বিদেশী ভাব রহিয়াছে—তাহা যদি পরিত্যাগ করিতে পার—তবেই তোমাদের পৌরুষং গণয়ামি।" হে বাবুর দল, নিষ্ঠাবান্ হিন্দু স্বদেশকে যে ভাবে দেখেন তোমরা কি সেভাবে দেশটিকে দেখিতেছ—বা দেখিতে পারিবে? মা ভারতভূমি, নিষ্ঠাবান হিন্দুর নিকট কর্ম্মভূমি বহু ভাগ্যে ইহাতে মানুষরূপে জন্ম হইয়াছে ইহার প্রতি ধূলিকণা তাঁহার নিকট পবিত্র—নদ নদী জলাশয় পর্ব্বত অরণ্য সমস্ত তাঁহার নিকট পুণ্যাবহ তীর্থ। ভারতের বেদ দর্শন পুরাণ তন্ত্র সমস্ত তাঁহার নিকট ভগবদ্‌বাণী অথবা ষড়ৈশ্বর্য্য সম্পন্ন মহর্ষিগণের ভ্রমপ্রমাদ বিপ্রলিপ্সশূন্য উপদেশ। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ যুগযুগান্তর হইতে এই সকল মাথায় রাখিয়া শত বিপ্লবের মধ্যে টিকিয়া রহিয়াছিলেন তিনিও ঐ সব মানিয়া চলিলে টিকিয়া থাকিবেন এই বিশ্বাস পোষণ করেন।

আর বাবুর দল, তোমরা ঠিক ঐ সকল উড়াইয়া দিয়া পাশ্চাত্য আসুরভাব আমদানী করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর। 'স্বদেশী' মুখে বলিতে বড়ই সহজ কিন্তু প্রাণের ভিতর স্বদেশীর আভা পড়িয়াছে কি? তোমরা বাবুর দল তো ইংরেজী সভ্যতার ফেরিওয়ালা, প্রকৃত স্বদেশীর মর্ম্ম তোমরা কি বুঝিবে?

তবে এখন এই সঙ্কট কালে ব্রাহ্মণের তথা অপর সনাতন বর্ণাশ্রমধর্ম্মীর কর্ত্তব্য কি? সরলভাবে বাবুর দলের সঙ্গে যোগ দেওয়া নানা কারণেই অসম্ভব। বাবুর দল পূর্ব্বে কেবল ছেলেদের ক্ষেপাইয়া তুলিতেন এখন আবার মেয়েদেরও ঘরের বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এরূপ ব্যাপারে, সনাতন সমাজ হিতৈষী প্রশ্রয় দিতে পারেন না। তবে তাঁহারা কি করিবেন?

তাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বদেশের কল্যাণ কামনা করিবেন বাবুদের সহিত সহানুভূতি না থাকিলেও তাঁহাদের অবলম্বিত উপায়ের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী হইলেও বর্ণাশ্রমী হিন্দু কদাপি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবেন না। বিদেশী লবণ বিদেশী কাপড় ও অন্যান্য বস্তু মাদক দ্রব্য প্রভৃতি বর্জ্জন, যেমন পূর্ব্বাবধি করিয়াছেন এখনও করিবেন। রাজবিদ্রোহ অবশ্যই পরিহার্য্য তথাপি পারতপক্ষে রাজপুরুষের ক্ষণিক প্রীত্যর্থ এমন কিছু করিবেন না যাহাতে দেশের ও সমাজের অকল্যাণ হয়। যাহাতে ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ না হয় ইহা সর্ব্বদাই রাজ-পুরুষদের গোচরে আনিতে হইবে তথাপি যদি ধর্ম্মবিরুদ্ধ আইন-কানুন কিছু বিধিবদ্ধ হয় তাহা কখনও মানিয়া নেওয়া উচিত নহে—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয় ঃ—"ইহা যেন স্মরণ থাকে।

সর্ব্বশেষে সকলকেই ব্রাহ্মণ শূদ্র স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সতত উপরের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সর্ব্বদা উপাসনার সময়ে স্বীয় ইষ্টদেবতার নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে ধর্ম্মের অভ্যুদয় হউক ভারত ভূমির কল্যাণ হউক, বাবুর দলের সুমতি হউক রাজপুরুষদের কল্যাণ বুদ্ধি জাগ্রত হউক। শ্রীভগবানের কৃপা হইলে সমস্ত অমঙ্গল দূরীভূত হইবে। শ্রীকৃষ্ণরূপে তিনি বলিয়াছেন—

ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে—

আবার শ্রীভগবতীরূপেও আশ্বাস দিয়াছেন।

—যথাপৎসু স্মৃতাখিলাঃ।
ভবতাং নাশয়িষ্যামি তৎক্ষণাৎ পরমাপদঃ॥

অতএব ইষ্টদেবতার শরণ গ্রহণ করাই এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার একমাত্র উপায়—কায়মনোবাক্যে ইহাই কর্ত্তব্য।

ব্রাহ্মণত্বের দাবী।

লেখক রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর কবিরঞ্জন॥

আজ এক বিরাট রাজনৈতিক আন্দোলনে সমগ্র ভারতবর্ষ মাতিয়াছে। ইহা দ্বারা চট্টগ্রাম হইতে পেশোয়ার এবং লাখ্‌নো হইতে মাদ্রাজ ও বোম্বাই এই সমগ্র ভারতবর্ষে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সমস্ত ভারতবাসিদিগের মধ্যে এক প্রাণতার প্রবল তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়াছে। অনেক স্থলে মুসলমানেরা ও এই আন্দোলনে যোগদান করিয়াছেন। এই একপ্রাণতার মূল কোথায়? ব্রিটিশ শাসনের প্রতি ঘোরতর অসন্তোষ এবং স্বাধীনতা লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষাই এই একতাবন্ধনের মূল সূত্র। মহাত্মা গান্ধী এখন বোধ হয়

বুঝিতে পারিতেছেন, তাঁহার স্পর্শদোষ বর্জ্জন ও শুদ্ধি আন্দোলনের দ্বারা এই সমগ্র দেশময় একপ্রাণতা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। যদি বলা যায়, সেই আন্দোলনের দ্বারা হিন্দুজাতির মধ্যে এই একপ্রাণতার ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা কখনও সত্য নহে। এই আন্দোলনের সূত্রপাতে দেশের অনেক স্থানে হিন্দুসভা, হিন্দু মহাসভা ইত্যাদি নামধারী অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু যে সকল হিন্দুনামধারী সমাজ সংস্কারকগণ সেই সকল প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা অনেকেই হিন্দু সমাজের নেতা বলিয়া স্বীকৃত হন নাই, তাঁহারা অনেকেই হিন্দুর ধর্ম্ম, হিন্দুর সদাচার, হিন্দুরশাস্ত্রের কোন ধার ধারেন না। এই বিশাল হিন্দুসমাজের জনসাধারণ এখন ও শাস্ত্র মানিয়া চলে, এখন ও দেবতা ও ব্রাহ্মণকে ভক্তি করে, এখন ও তাহাদের মনে পরকালে বিশ্বাস ও ধর্ম্মভয় আছে। কাজেই এই বিশাল হিন্দুসমাজ সেই সকল হিন্দুসভার নেতৃবর্গের কথায় বিচলিত হয় নাই এবং কতিপয় মুষ্টিমেয় ইংরেজীশিক্ষিত সহরবাসী লোক ভিন্ন, তাঁহাদের কথায় জাতি ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে অগ্রসর হয় নাই। অতএব মহাত্মা গান্ধি প্রবর্ত্তিত শুদ্ধি ও স্পর্থদোষ নিবারণ আন্দোলনের ঢেউ সমাজে কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়া আবার মিলাইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান ভারতব্যাপী রাজনৈতিক জাগরণের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই।

ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে, এই বিশাল ভারতবর্ষে জাতিভেদ, বর্ণভেদ, ধর্ম্মভেদ ও ভাষাভেদ সত্বেও রাজনৈতিক অধিকার লাভের নিমিত্ত জাতীয়তার জাগরণ (National awakening) সম্ভব পর হইতে পারে, এবং সেই জাতীয়তা লাভের জন্য হিন্দুর বর্ণভেদাদি বিশিষ্টতা বিসর্জ্জন দিয়া সকলে একাকার হওয়ার কোন আবশ্যকতা নাই।

ভারতের জাতি বর্ণ ভাষা ও ধর্ম্মের বিভিন্নতার অন্তস্তলে যে একটি সূক্ষ্ম মানসিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহা সাইমন কমিসনের (Simon commission) রিপোর্টে ও স্বীকৃত হইয়াছে। সেই রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে :—

"It would be a profound error to allow Geographical dimention or statistics of population or complexities of religion and caste and language to beliffle the significanne of what is called the Indian Natronalist movement." অর্থাৎ ভারতবর্ষ একটি মহাদেশ বিশেষ, ইহার মধ্যে ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক প্রদেশ আছে, ইহার জনসংখ্যা অনেক ও নানা জাতীয়, তাহার মধ্যে আবার বিভিন্ন ধর্ম্ম, বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ভাষা থাকায় একটা জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা সত্বেও সমগ্র দেশব্যাপী যে একটা বিশাল রাজনৈতিক জাতীয়তার উদ্ভব হইয়াছে, ইহার গুরুত্ব যাহারা না বুঝিবেন তাঁহারা নিতান্ত ভ্রমে পতিত হইবেন।

এই জাতীয় জাগরণের বন্যা কিরূপ প্রবল বেগে ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া প্রবাহিত

হইতেছে, তাহা আর একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ, পার্লেমেন্টের মেম্বর মিঃ ব্রকওয়ে (Mr. A. Fenner Brockway. M. P.) এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন,—

"But even here (in villages) the change is taking place on a speed which is astonishing not only British of observers, but the Indian Nationalists themselves. Vast districts, Muslem and Hindu alike, are being shaken from their traditional inertia by present campaign. So far the expression of this uprising has been confined largely to the north, but those who are in touch with British residents and Indians (even those of moderate opinions) in such, places know how strongly the ferment of Nationalism is waking among the more slowly-moving populations of the Madras Presidency as well. The truth is that the Miracle is happening before our eyes of the trimph of a sentiment so geunine and general that it is conquaring the complexity and coma of India."*

* The Amrita bazar Patrika, of July 8. 1930, page 11.

ইহার ভাবার্থ এই :—এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন, সহরের ত কথাই নাই, পল্লীগ্রাম সমূহেও এত দ্রুতবেগে সংঘটিত হইতেছে, যে তাহা দেখিয়া কেবল ইংরেজেরা নহে ভারতবর্ষীয় নেতৃবৃন্দ ও স্তম্ভিত হইয়াছেন। এই জাতীয় যুদ্ধযাত্রা দ্বারা অনেক বড় বড় জেলার হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসীবৃন্দ তাহাদের বহুকালের সঞ্চিত জড়তা হইতে জাগ্রত হইয়া উত্থিত হইতেছে। এত দিন এই জাগরণ ভারতের উত্তর খণ্ডে আবদ্ধ ছিল, কিন্তু এখন তাহা মাদ্রাজ প্রদেশের অপেক্ষাকৃত জড়প্রকৃতি লোকসমূহের মধ্যে ও ব্যাপ্ত হইয়াছে। আসল কথা এই, আমাদের চোখের সামনেই এই সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত আন্তরিক জাতীয়ভাব আশ্চর্য্যরূপে ভারতের বিবিধ বৈষম্য ও জড়তা পরাভব করিয়া এতদূর জয়যুক্ত হইয়াছে যে ইহাকে ঐশ্বরিক ঘটনা ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না।"

ইতিপূর্ব্বে আমরা শুনিয়াছিলাম, জাতিভেদ ও স্পর্শদোষের কঠোরতা মাদ্রাজ প্রদেশে অত্যন্ত অধিক, সেখানে ব্রাহ্মণগণের একাধিপত্য এবং তাঁহারা ব্রাহ্মণেতর জাতিকে নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে দেখেন ও তাহাদের উপর নানা প্রকার উৎপীড়ন করেন। সেই মাদ্রাজ প্রদেশের ও এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনের কথা আমরা শুনিলাম। সেখানে গান্ধীজীর স্পর্শদোষ নিবারণের আন্দোলন বিশেষরূপে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল বলিয়া আমরা শুনি নাই।

এই রাজনৈতিক জাতীয়তা লাভের জন্য আমাদের বঙ্গদেশের হিন্দুমহাসভা সকল জাতিভেদ বর্জ্জন ও ব্রাহ্মণ জাতির প্রাধান্য লোপের জন্য ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত

করিয়াছিলেন। বিগত ১৩৩৫ সাল ৺কাশী ধামে যে বিরাট ব্রাহ্মণ মহা সম্মিলনী হইয়াছিল, তাহার অব্যবহিত পরে কলিকাতা নগরীতে বঙ্গীয় হিন্দুমহাসভার এক বিরাট অধিবেশন হইয়াছিল, ইহা বোধ হয় সকলেরই স্মরণ আছে। সেই মহাসভায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথতর্কভূষণ মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই সভায় যখন একটি প্রস্তাব উপস্থিত করা হইল যে "হিন্দুমাত্রেই ব্রাহ্মণ এবং যজ্ঞোপবীতধারণের অধিকারী," তখন সভাপতি শ্রীযুক্ত তর্কভূষণ মহাশয় সভা হইতে পলায়ন করিবার পথ পাইলেন না। পরে তাঁহার স্থানে কোন এক জন "স্বামীজী"কে সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়া সভার কার্য্য শেষ করা হইল।

৫০ বৎসর পূর্ব্বে যখন ৺কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ ব্রাহ্মগণ সমাজ সংস্কারে ব্রতী হইয়াছিলেন, তখন ব্রাহ্মণ জাতির উপবীত ত্যাগ দ্বারা তাঁহারা সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং ইহা বড়ই কৌতুকের বিষয় যে, বর্ত্তমান কালের সংস্কারকগণ সকল জাতির গলায় সেই পৈতা ঝুলাইয়া সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বলা বাহুল্য এই উভয় শ্রেণীর সংস্কারকই নিতান্ত ভ্রান্ত। হিন্দু সমাজে উচ্চনীচ বর্ণভেদ লুপ্ত হইতে পারে না। এই বর্ণভেদ জন্মগত গুণ ও কর্ম্মানুসারে হইয়া থাকে, ইহাতে মানুষের কোন হাত নাই।

মহাভারত বনপর্ব্বে মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ব্রাহ্মণের লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"যো বদেদিহ সত্যানি গুরুং সন্তোষয়েত যঃ।
হিংসিতশ্চ ন হিংসেত তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥
জিতেন্দ্রিয়ো ধর্ম্মপরঃ স্বাধ্যায় নিরতঃ শুচিঃ।
কাম ক্রোধৌ বশে যস্য তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥
যস্য চাত্ম সমো লোকো ধর্ম্মজ্ঞস্য মনস্বিনঃ।
সর্ব্বধর্ম্মেষু চরত স্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥
যোঽধ্যাপয়েদধীয়ীত যজেদ্বা যাজয়ীত বা।
দদ্যাদ্ বাঽপি যথাশক্তি তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥" ইত্যাদি।

অর্থাৎ যিনি সত্য বাক্য বলেন, গুরুকে সন্তুষ্ট করেন, অন্যের দ্বারা হিংসিত হইয়া ও তাহাকে হিংসা করেন না দেবগণ তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন। যিনি জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ, বেদাধ্যয়ন নিরত ও শুচি যিনি কাম ক্রোধ বশ করিয়াছেন, দেবগণ তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন। যে ধর্ম্মজ্ঞ মনস্বী ব্যক্তি আত্মবৎ সকল লোককে দেখেন, যিনি সর্ব্ব ধর্ম্মে রত, দেবগণ তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন। যিনি অধ্যয়ন অধ্যাপনা, যজন যাজন এবং যথাশক্তি দান করেন, দেবগণ তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির মধ্যে কোন মহাত্মা যদি উক্তরূপ ব্রাহ্মণের

লক্ষণ বিশিষ্ট হন, তবে তিনি ব্রাহ্মণোচিত সম্মান পাইবার অধিকারী একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি।* কিন্তু তাহা হইলে ও তিনি ব্রাহ্মণ পদবাচ্য হইবেন না। ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ না করিলে কেহ ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না, একথা মহাভারতের অন্যস্থানে উক্ত হইয়াছে।

"তপঃ শ্রুতঞ্চ যোনিশ্চ এতদ্ ব্রাহ্মণ কারণম্।
ত্রিভি র্গুণৈঃ সমুদিত স্ততো ভবতি বৈ দ্বিজঃ॥
তপঃ শ্রুতঞ্চ যোনিশ্চ এতদ্ ব্রাহ্মণ কারণম্।
তপঃ শ্রুতাভ্যাং যো হীনো জাতি ব্রাহ্মণ এব সঃ॥"

—অনুশাসন পর্ব্ব।

অর্থাৎ—তপস্যা, বিদ্যা এবং জন্ম এই তিনটি ব্রাহ্মণত্বের কারণ, যাঁহার এই তিনটি গুণ বর্ত্তমান তিনিই ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইবেন। যাঁহার তপস্যা এবং শ্রুত বিদ্যা নাই তিনি জাতি ব্রাহ্মণ, অর্থাৎ তাঁহার পূর্ণ ব্রাহ্মণত্বের অধিকার নাই।

এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে, যাঁহার ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম হয় নাই, তিনি বিদ্যা ও তপস্যাদি ব্রাহ্মণোচিত গুণগ্রামে ভূষিত হইলেও ব্রাহ্মণ হইবেন না।

তবে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ যে বলিয়াছেন :—
"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া স্পষ্টং গুণকর্ম্মাবিভাগশ" :—

অর্থাৎ আমি গুণ কর্ম্ম বিভাগানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি, ইহার তাৎপর্য্য কি? যাঁহার ব্রাহ্মণোচিত গুণগ্রাম আছে, তিনি যদি ব্রাহ্মণের ব্যবসায় অবলম্বন করেন তবে তিনি ব্রাহ্মণ হইবেন না কেন?

এখানে "গুণ" অর্থ qualification (পারদর্শিতা), আর "কর্ম্ম" অর্থ occupation (ব্যবসায়) বুঝিতে হইবে না। গীতায় ভাষ্যকার শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য গুণকর্ম্ম কি তাহা এইরূপে বুঝাইয়াছেন,—

"গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ গুণবিভাগশঃ কর্ম্ম বিভাগশ্চ গুণাঃ সত্ত্বরজস্তমাংসি, তত্র সাত্ত্বিকস্য সত্ত্বপ্রধানস্য ব্রাহ্মণস্য শমোদমোস্তপ ইত্যাদীনি কর্ম্মাণি, সত্ত্বোপসর্জ্জন রজঃ প্রধানস্য ক্ষত্রিয়স্য শৌর্য্যতেজঃ প্রভৃতীনি কর্ম্মাণি, তম উপসর্জ্জন রজঃ প্রধানস্য বৈশ্যস্য কৃষ্যাদীনি কর্ম্মাণি,

* ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, চিত্তসংযম, এবং অহিংসা, সত্য, অস্তেয় প্রভৃতি গুণ থাকিলে ব্রাহ্মণেতর সৎপুরুষগণ ব্রাহ্মণোচিত সম্মান ও পারলৌকি সদ্গতি লাভ করেন সন্দেহ নাই কিন্তু অধ্যাপান যাজন প্রতিগ্রহ প্রভৃতি যাহা ব্রাহ্মণের পক্ষেই বিহিত সে সকল কর্ম্ম করিলে ব্রাহ্মণেতর কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণোচিত সম্মান বা সদ্গতি লাভ করিতে পারেন না। সম্পাদক

রজঃ উপসর্জ্জন তমঃ প্রধানস্য শূদ্রস্য শুশ্রূষৈব কর্ম্মেত্যেবং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টমিত্যর্থঃ।"

শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী এবং মধুসূদন সরস্বতী ও এই ভাষ্যের অনুযায়ী টীকা করিয়াছেন। ৺পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি উক্ত ভাষ্যের এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন,—

"সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ আদি গুণ বিভাগ দ্বারা এবং চেষ্টা বা ক্রিয়া বিভাগ দ্বারা আমি ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি। সত্ত্বগুণের আধিক্য এবং শম দম তপস্যাদির প্রবৃত্তি বা চেষ্টা বা ক্রিয়া দ্বারা সংযুক্ত করিয়া ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিয়াছি। সত্ত্বগুণের অপ্রধান্য এবং রজো গুণের প্রাধান্য দ্বারা, আর শৌর্য্যতেজঃ প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করিয়াছি। তমো গুণের অপ্রাধান্য এবং রজোগুণের প্রাধান্য দ্বারা, আর কৃষিবাণিজ্যাদি বিষয়ক প্রবৃত্তি বা চেষ্টা বা ক্রিয়া দ্বারা বৈশ্য সৃষ্টি করিয়াছি, এবং রজো গুণের অপ্রধান্য ও তমো গুণের প্রধানতার দ্বারা আর শুশ্রূষা প্রকৃতি বা ক্রিয়া দ্বারা শূদ্রদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি।"

উক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি, কোন ব্যক্তির গর্ভ হইবার পূর্ব্বেই তাহার মধ্যে গুণ বিশেষের প্রাধান্য এবং কর্ম্ম প্রবৃত্তি দ্বারা তাহার জাতি নির্নীত হয়। এ সকল তাহার পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত আত্মার গুণ, তাহা ইহ জন্মে অর্জ্জিত গুণ বা ব্যবসায় নহে। এই প্রকার গুণ ও কর্ম্ম দ্বারাই লোকের জাতি নির্নীত হয়, ইহাই গীতাব অভিপ্রায়।

তবে একথা অবশ্য স্বীকার্য্য, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত গুণ ও কর্ম্ম প্রবৃত্তির বলে কেহ ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া, পরে নিজ কর্ম্ম দোষে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইতে পারেন। যে ব্রাহ্মণ বিদ্যা ও তপঃ অর্জ্জন করেন নাই, তিনি কেবল জাতি ব্রাহ্মণ বলিয়াই গণ্য হইবেন। আবার নানাবিধ পাপাচরণ দ্বারা এই জন্মেই তাঁহার নানাপ্রকার অধোগতি ঘটিতে পারে। এই জন্য অত্রিসংহিতায় দশ প্রকার ব্রাহ্মণের লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে, যথা,—

"দেবো মুনির্দ্বিজো রাজা বৈশ্যঃ শূদ্রো নিষাদকঃ।
পশুর্ম্লেচ্ছোঽপি চাণ্ডালো বিপ্রা দশবিধাঃ স্মৃতাঃ॥"

ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও নিজ নিজ কর্ম্মের জন্য ব্রাহ্মণগণ দেব, মুনি, দ্বিজ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, নিষাদ, পশু, ম্লেচ্ছ ও চণ্ডাল এই সকল আখ্যা প্রাপ্ত হইতে পারেন। ইহাদের মধ্যে দুই একটির লক্ষণ দেওয়া যাইতেছে।

"সন্ধ্যাং স্নানং জপং হোমং দেবতা নিত্যপূজনম্।
অতিথিং বৈশ্বদেবঞ্চ দেব ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥"

যে ব্রাহ্মণ প্রত্যহ স্নান সন্ধ্যাপূজা জপ হোম দেবতার পূজা করেন, অতিথি ও বৈশ্বদেবের সেবা করেন তিনি দেব ব্রাহ্মণ।

"ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥

যিনি ব্রহ্মতত্ত্ব জানেন না অথচ যজ্ঞোপবীত ধারণের বলে ব্রাহ্মণ বলিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করেন, সেই পাপে তিনি পশু ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হন।

"ক্রিয়া হীনশ্চ মূর্খশ্চ সর্ব্বকর্ম্ম বিবর্জ্জিতঃ।
নির্দ্দয়ঃ সর্ব্বভূতেষু বিপ্রশ্চাণ্ডাল উচ্যতে॥"

যিনি কর্ম্মহীন, মূর্খ ও সর্ব্বকর্ম্ম বিবর্জ্জিত, যিনি সকল প্রাণীর প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করেন, তিনি চণ্ডাল ব্রাহ্মণ।

বলা বাহুল্য এই সকল ব্রাহ্মণ ইহা জন্মে উপার্জ্জিত নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে পরবর্ত্তী জন্মে ঐ সকল যোনিতে জন্মগ্রহণ করিবেন।

ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও যাঁহারা নিজ নিজ কর্ম্ম দ্বারা অধঃপতিত হইয়াছেন, এই কলিযুগে তাঁহাদের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই সকল অধঃপতিত ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণের সম্মান যদি না দিতে চাও, তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু, যেহেতু এই সকল অধঃপতিত ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইতেছেন, সুতরাং সেই সেই গুণাবলম্বী অন্য জাতি ও ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইবেন, ইহা কোন্ যুক্তিবলে সিদ্ধ হয়? ব্রাহ্মণ অধঃ-পতিত হইলেও তাঁহার মধ্যে ব্রাহ্মণের একটা লক্ষণ আছে, অর্থাৎ তিনি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু হিন্দু মহাসভা যাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বানাইতে চান, তাঁহাদের ত ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম হয় নাই, অধিকন্তু তাঁহাদের অনেকের মধ্যেই শূদ্রের লক্ষণ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

"সর্ব্বভক্ষ্যরতির্নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মকরোঽশুচিঃ।
ত্যক্তবেদগুণাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ॥

মহাভারত, মোক্ষ ধর্ম্মকর্ম্ম ১৮৯ অধ্যায়।

অর্থাৎ যাঁহার ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার নাই, যিনি সকল প্রকার কর্ম্মই করেন, যিনি অশুচি, যিনি সর্ব্বপ্রকার বেদ বিহিত গুণ ও আচার পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই শূদ্র।

মহাত্মা বিদুর শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও ব্রাহ্মণ গুণসম্পন্ন ছিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ দুর্য্যোধনের দ্বারা ভোজনের জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার আলয়ের রাজভোগ পরিত্যাগ করিয়া বিদুরের গৃহে শাকান্ন ভক্ষণ করিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই বিদুর কখনও ব্রাহ্মণত্ব, এমন কি ক্ষত্রিয়ত্ব, দাবী করেন নাই। মহাভারত উদ্যোগ পর্ব্বান্তর্গত সনৎসুজাত পর্ব্বাধ্যায়ে আছে, ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া বিদুর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"শূদ্র যোনাবহং জাতো নাতোঽন্যদ্বক্তুমুৎসহে আমি শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ক কিছু বলিতে উৎসাহিত হইতেছি না।

যাহা হউক, পরিশেষে আমার বক্তব্য এই, যাঁহারা রাজনৈতিক সুবিধা লাভের প্রত্যাশায় সমাজে বিপ্লব ঘটাইতে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদিগের স্মরণ রাখা উচিত এই সকল রাজনৈতিক উত্থান পতনের মূলে ঐশীশক্তি বিদ্যমান। ভগবানের কৃপা হইলে তিনি মূককে বাচাল করিতে পারেন আবার পঙ্গুধারা ও গিরিলঙ্ঘন করাইতে পারেন। বর্ত্তমান ভারতব্যাপী রাজনৈতিক জাগরণকে ব্রকওয়ে সাহেব যে miracle (অদ্ভুত ঘটনা) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার অন্তরালে ভগবানের হাত দেদীপ্যমান রহিয়াছে। একমাত্র তাঁহার ইচ্ছায়ই অঘটন সংঘটিত হইতে পারে। তোমার আমার ন্যায় ক্ষুদ্র পিপীলিকার বিপ্লব চেষ্টা বাতুলতা মাত্র।

দুটি প্রাণের কথা

শ্রীরামসহায় বেদান্ত শাস্ত্রী।

শুনিতে পাই দেশ জাগিয়াছে। দেশের কার্য্যে যুবকদের একটি প্রাণের সাড়া আসিয়াছে। দেশ জাগুক ইহা চাহে সকলেই। কেহই চাহেনা, দেশ নিঃসাড়ে ঘুমাইয়াই থাকুক্। ২০।২২ বৎসর পূর্ব্বেও লর্ড কার্জ্জনের বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে বাঙ্গালী একবার জাগিয়া বিদেশীবর্জ্জন ব্রত গ্রহণ করিয়াছিল। তখনও যুবকদের প্রাণে দেশাত্মবোধের সাড়া আসিয়াছিল, তখনও বালকেরা স্বদেশী জিনিষপত্র বহিয়া পাঁচ সাতখানি গ্রামে ফেরি করিয়া বেড়াইত।

মনে আছে, বিলাতী লবণ উঠিয়া গেল, দেশী চিনি খাইব বলিয়া কেহ কেহ প্রতিজ্ঞা করিল, সিগারেটের সঙ্গে বিড়ির প্রচলনও দেখা গেল। ভদ্রলোকদের মধ্যে অনেকেই স্বদেশী কাপড় কিনিতে লাগিলেন।

বঙ্গভঙ্গ জন্য আন্দোলন। বঙ্গদেশ জোড়া লাগিল আন্দোলনও ক্রমশঃ কমিয়া আসিল, স্বদেশী যজ্ঞের অগ্নি ধীরে ধীরে নির্ব্বাপিত হইতে লাগিল। সেবারকার আন্দোলন একেবারে ব্যর্থ হইল বলা যায় না, কেননা তাহাই অসহযোগ আকারে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, বর্ত্তমান আন্দোলনের মূলেও উহাই।

এ বিষয়ে আমাদের দুই একটি কথা বলিবার আছে। আমরাও ত দেশের লোক। বিদেশী এবং বিলাতীবর্জ্জন হইতেছে, ভালই? স্বদেশী বস্ত্র উৎপন্ন করিব, ক্রয় করিব, ইহা আরও ভাল। কিন্তু বিদেশী ভাব—বিলাতী ভাবে যে দেশ আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

উপন্যাসের চরিত্রে দেখ বিদেশী ভাব। গ্রীষ্মপ্রধান দেশ—জামা পোষাকের বাহুল্যে দেখ বিদেশী ভাব। আচার ব্যবহারে ত স্বদেশী ভাব ক্রমশই হতাদর হইতেছে।

আমাদের দেশ যখন প্রকৃত আমাদের ছিল, তখন কি এত উকিল ব্যারিষ্টার ছিল? দৈনিক একশত হইতে একহাজার টাকা ফি কেহ কি কল্পনা করিয়াছিল? বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত চিকিৎসকেরা দেশীয় গাছগাছড়া ফেলিয়া বিদেশীর ঔষধ ব্যবহার করিবেন, ইহা কি কেহ মনে করিয়াছিল? অধ্যাপকেরা বেতনগ্রাহী হইবেন, ধনী ব্যক্তিরা নিজের নিজের স্থান ত্যাগ করিয়া সহরে মোটর চড়িয়া বেড়াইবেন, ইহাই কি কেহ অনুধাবন করিয়াছিল? এক একখানি মোটর গাড়ী কিনিতে কত টাকা না বিদেশে চলিয়া যাইতেছে।

আসল কথা স্বদেশী ভাব নষ্ট হইয়াছে, বিদেশী ভাবেই লোকে অণুপ্রাণিত হইতেছে। ভারতীয় বিশিষ্টতা বজায় রাখিয়াই দেশের কার্য্য করিব, সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য নাই। ধর্ম্মভাব কমিতেছে, উপাসনা কর্ম্মানুষ্ঠানে মতিগতি ক্রমশই হ্রাস পাইতেছে। স্বার্থপরতা হিংসা দ্বেষ বাড়িয়াই চলিয়াছে। যুবকদের প্রাণে দেশাত্মবোধের সাড়া আসিয়াছে সত্য কিন্তু সে সাড়ার মধ্যে ধর্ম্মভাব নাই, বিদেশী শিক্ষা দীক্ষা হইতেই সে সাড়া আসিয়াছে, পাশ্চাত্য হাবভাব এবং মন প্রাণ লইয়া দেশের যুবকেরা দেশের কার্য্যে ছুটিতেছে।

সাধারণ লোকে অসহায় জীব মারিয়া রসনার তৃপ্তি করিতেছে, রাজপুরুষগণ আইন অমান্যকারী বলিয়া অহিংস প্রজাদের হত, আহত এবং প্রহার করিয়া জ্বালা মিটাইতেছে। দেশ হইতে সাত্ত্বিক ভাব অন্তর্হিতই হইতেছে।

ভারত ধর্ম্মপ্রাণ দেশ। ধর্ম্মের নামেই এখানে লোকের প্রাণে সাড়া আইসে তাই আহারে বিহারে সর্ব্বত্রই বিধি নিষেধ। পাশ্চাত্যভাবে মন ক্রমশই বিকৃত হইয়া গিয়াছে, তাহারই তখনকার সভ্য নাম অচলায়তনের বেড়া। সংযম—যাহা পশুত্ব হইতে মানবত্বকে পৃথক্ করিয়াছে, তাহাই এখন গোড়ামি, কুসংস্কার নামে অভিহিত। ইহা কোন্ ভাব? এই ভাব লইয়াই লোকে স্বদেশ যজ্ঞে আহুতি দিতে অগ্রসর।

পাশ্চাত্যের আমদানী নকল জিনিসে আমাদের সাহিত্য পর্য্যন্ত ভরিয়া উঠিল। বিলাতী প্রাণ লইয়া বঙ্গবধু ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাষানুবাদ এবং আক্ষেপিক অনুবাদ লইয়াই আমাদের গর্ব্ব গৌরব। যে যতখানি বেশী পাশ্চাত্য ভাব আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে সেই ততখানি বড়। সংস্কৃত ভাষা, সংস্কৃত সাহিত্য, সংস্কৃত পুরাণ সংহিতা, এবং সংস্কৃত দর্শন কয়জন যুবক পড়েন? গীতার দুই চারিটি শ্লোক পড়িলেই ত সে সব পড়া হইল না।

আমাদের দেশের মাথার মণি বলিয়া যাঁহারা অভিহিত হন, তাঁহারা কি স্বদেশী ভাবান্বিত? দেশীয় উপাসনা, ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারে অভ্যস্ত, মুর্গীর ডিম, ও মুসলমান পাচকের রান্না খাওয়ার কথা লিখিতে ও শুনিতে কুণ্ঠিত হন না।

এই বিদেশী ভাব দূর করিয়া প্রকৃত স্বদেশী ভাব আনিতে হইবে। বিদেশী ভাব দিয়াই বিদেশী ভাব দূর করার ব্যবস্থা ভাল নহে। স্বদেশী ভাব—ভারতীয় ভাব। ভারতীয় ভাবের মধ্যে শাস্ত্রসম্মত উপাসনা, সংযম ও সাত্ত্বিকতা প্রভৃতি বিদ্যমান। পথে বট অশ্বত্থের প্রতিষ্ঠা নাই, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠার কথা বড় শোনা যায় না, সন্ধ্যাহ্নিকের প্রতি আনুরক্তিও বড় দেখি না। এই যে সোনার চাঁদ ছেলেরা জেলে যাইতেছেন, তাহাদের মধ্যে কয়জন জেলে যাইয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতেছে। ব্রাহ্মণের ছেলে সন্ধ্যাহ্নিক করে না, ইহাই কি স্বদেশী ভাব? ইহাই কি ভারতের দেশাত্মবোধ।

বর্ত্তমানে দেশের লোকের মনে স্বদেশী ভাব আসিয়াছে, সত্য কিন্তু ইহা ভারতীয় সাধনা দ্বারা পরিপুষ্ট না হইলে সম্যক্ ফললাভ হইবে না। ইহাই আমাদের বিশ্বাস। সে সাধনার নির্দ্দেশ করিবেন কাহারা? পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার অভ্যস্ত যাঁহারা তাহারাই ত?

পিতৃযজ্ঞ (প্রতিবাদ)।

লেখক—শ্রীনিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ।

গত অগ্রহায়ণ সংখ্যার "ভারতবর্ষে" খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীশশধর রায় এম এ, বি এল, পিতৃযজ্ঞশীর্ষক একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধটী গবেষণামূলক জ্ঞানে পৌষের প্রবাসী পত্রেও উদ্ধৃত হইয়াছে। লেখকের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তাহা অনুমানে অবশ্য ঠিক বলা যায় না। তবে ঐ প্রবন্ধে "ভারতীয়দেব বৌদ্ধকৃত্যের অনুকরণ অতিশোক মোহ স্নেহ প্রভৃতি কারণে, ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতগণের নিরঙ্কুশ আধিপত্যে, অর্ব্বাচীন প্রথা, সনাতন নহে," এই কথাগুলি সশরীরে বিরাজমান থাকায় তিনি শ্রাদ্ধটিকে যে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন না, উহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। একজন অশাস্ত্রদর্শীর ভ্রান্ত আলোচনার ফলে যদি কোন নিরীহ আস্তিক হিন্দুসন্তান ভ্রমে পতিত হন, তজ্জন্য আমরা ঐ প্রবন্ধের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

প্রথমতঃ তিনি পঞ্চযজ্ঞের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ভূতযজ্ঞের অর্থ "বলিবৈশ্বদেবকর্ম্ম" ইত্যাদি যাহা লিখিয়াছেন, উহাতে বলি (ভূতবলি) এবং বৈশ্বদেব কর্ম্ম বিশ্বদেবের উদ্দেশ্যে হোম, এই দুইটী কর্ম্মকে এক মনে করিয়া প্রমাদে পড়িয়াছেন। মনুসংহিতায় ৩ অ।৭০। "হোমোদৈবোবলির্ভৌতো" ইত্যাদি প্রমাণ যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাহারাই এই ভ্রমের পরিচয় পাইবেন। গরুড়পুরাণ, আহ্নিক তত্ত্ব প্রভৃতি নিবন্ধে বিবৃত বৈশ্বদেবের অনুষ্ঠান পদ্ধতিটি চাক্ষুষ করিলেই এই ভ্রম আপনোদিত হইবে।

দ্বিতীয়তঃ "আমরা কিন্তু মৃত পিতামাতা প্রভৃতির শ্রাদ্ধ বৎসরে একদিন মাত্র করিয়া থাকি, প্রতিদিন শ্রাদ্ধ করি না" ইত্যাদি লিখিয়া মনুস্মৃতির বিধান কেবল পুঁথিগত, কার্য্যতঃ উহা পালিত হয় না, বোধ হয় এইরূপ একটা ইঙ্গিত করিয়াছেন। "শাকমূলফলৈশ্চৈব কেবলেন জলেন বা" ইত্যাদি স্মার্ত্ত প্রমাণে কেবল জল দিয়াও (তর্পণ) যে নিত্য শ্রাদ্ধ করা যায়, এবং আস্থাবান্ হিন্দুমাত্রেই অদ্যাপি যে ঐরূপ নিত্য শ্রাদ্ধের অনুকল্প-তর্পণ করেন, ইহা লেখকের দৃষ্টিগোচর ত হয়ই নাই, শ্রুতিগোচর হইয়াছে কিনা সন্দেহ! বিখ্যাত অমরকোষ অভিধানে "মাসেনস্যাদহোরাত্রঃ পৈত্রো বর্ষেণ দৈবতঃ।" অর্থাৎ সাধারণ মানবের একমাসে পিতৃলোকের একদিবস হয়, বলা হইয়াছে; এ হিসাবে প্রতি চান্দ্রমাসের শেষদিন অমাবস্যায় যাঁহারা পার্ব্বণশ্রাদ্ধ করেন, তাঁহারা প্রতিদিনই শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। ঐরূপ প্রতিবর্ষে যাঁহারা একোদ্দিষ্ট বিধিক সাংবৎসরিকশ্রাদ্ধ করেন, তাঁহারাও দৈবদিন হিসাবে প্রতিদিন দৈবপিত্রাদির শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন।

তৃতীয়তঃ; মৃতপিত্রাদির শ্রাদ্ধ করিয়া তৃপ্তির পরিবর্ত্তে লজ্জায় অধোবদন হওয়াই উচিত, বিচারক লেখক এইরূপ রায় দিয়াছেন। এই অদ্ভুত মত সমর্থনেব জন্য তিনি মহাভারতের দোহাই দিয়াছেন; তাঁহার যুক্তির সারমর্ম্ম;—"পুরাকালে তপোধন নিমি মৃতপুত্র শ্রীমানের (নাম) শ্রাদ্ধ করিয়া 'অনুতপ্ত' এবং 'অনার্য্যসেবিত স্বর্গপ্রাপ্তির বিঘ্নকর দুষ্কর্ম্ম করিয়া বসিয়াছেন' বলিয়া 'মাতর্বসুধে বিবরং দেহি' বলিতেছেন।" লেখকের এই প্রবল নজীরের বলাবল কত, নিরপেক্ষ পাঠক তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন। আমরা মহাভারত অনুশাসন পর্ব্বের ৯১ অধ্যায় হইতে ঐ শ্রাদ্ধকল্পপ্রস্তাব, উহার নীলকণ্ঠকৃত টীকা স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহকৃত অনুবাদ পড়িয়া বুঝিলাম, অসাধারণ গবেষণার আলোকে লেখক যেটীকে তাঁহার ইষ্টসিদ্ধ রাজপথ বিবেচনা করিয়াছেন, ঐটী একটী কাণা গলিও নহে। প্রস্তাবটী সুদীর্ঘ, উহা হইতে আমরা মাত্র এই প্রবন্ধোপযোগী তিনটী শ্লোক তুলিয়া উহার সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিলাম। সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠক মূল, টীকা অনুবাদ ও উভয়প্রবন্ধের-আলোচনা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবেন, মূলপ্রবন্ধ লেখক কিরূপ চাতুরী অথবা ভ্রান্তির ধাঁধায় পড়িয়া ঐরূপ আজগুবি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

'তৎকৃত্বা স মুনিশ্রেষ্ঠঃ ধর্ম্মসঙ্করমাত্মনঃ।
পশ্চাত্তাপেন মহতা তপ্যমানোঽভ্যচিন্তয়ৎ॥

'সেই মুনিবর (নিমি) পুত্রের শ্রাদ্ধ করিয়া স্বকৃত ধর্ম্মসঙ্কর সম্বন্ধে সন্ধিহান হইয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে চিন্তা করিয়াছিলেন।' এই স্থলে ধর্ম্মসঙ্কর শব্দের ব্যাখ্যায় পণ্ডিত প্রবর নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন, "শ্রৌতপিত্রাদ্যুদ্দেশেন সৃষ্টো ধর্ম্মো লোকে পুত্রোদ্দেশেনাপি স্বেচ্ছয়া কল্পিতঃ ইতিসঙ্করঃ।" অর্থাৎ শ্রুতি (বেদ) উক্ত পিতৃপিতামহাদির উদ্দেশে বিহিত (শ্রাদ্ধ) সংসারে নিজের ইচ্ছামত পুত্রের উদ্দেশে কল্পিত হওয়ায় ঐ শ্রাদ্ধকে ধর্ম্মসঙ্কর বলা হইয়াছে।

"মুনিরা পূর্ব্বে যাহা করেন নাই (আমি মুনি হইয়া) সেইরূপ কার্য্য করিয়া অন্যায় করিলাম কিনা ?' এইরূপ ঘোর সন্দেহে যখন নিমির চিত্ত দোদুল্যমান, তখন তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ মহর্ষি অত্রি তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন।—

"তথা খ্যাস্যামি তে পুত্র শ্রাদ্ধেয়ং বিধিমুত্তমং ॥

সোঽয়ং স্বয়ম্ভুবিহিতো ধর্ম্মঃ সংকল্পিতস্ত্বয়া। স্বয়ম্ভুবিহিতং ইত্যাদি।" 'মহাভা, অনুশা, ৯১ অধ্যায়') 'তুমি যে পিতৃযজ্ঞের (শ্রাদ্ধের) অনুষ্ঠান করিয়াছ, ইহাতে ভীত হইবার প্রয়োজন নাই। ব্রহ্মা স্বয়ং এই বিধান করিয়াছেন। ব্রহ্মা ভিন্ন আর কোন ব্যক্তি শ্রাদ্ধবিধি প্রবর্ত্তিত করিতে সমর্থ নহেন। এক্ষণে আমি তোমার নিকট ব্রহ্মবিহিত অতি উৎকৃষ্ট শ্রাদ্ধবিধি কহিতেছি। তুমি উহা শ্রবণ করিয়া নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে উহার অনুষ্ঠান কর।,' এখন পাঠক দেখুন, উদ্ধৃত সন্দর্ভাংশে মুনি নিমির কেবল স্বকৃতকর্ম্মের বৈধাবৈধতা-বিষয়ে সংশয় ও তজ্জন্য ভয়ের উদ্রেক হইয়াছিল। একথা মহর্ষি অত্রির উত্তরস্থিত "ভীত হইবার প্রয়োজন নাই, নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে উহার (শ্রাদ্ধের) অনুষ্ঠান কর' ইত্যাদি নিমিকৃত শ্রাদ্ধের অনুমোদনবাক্যে সুপ্রকাশ। অথচ মহাভাষ্যকার লেখক বলিতেছেন, 'তিনি ঈদৃশ অনার্য্যসেবিত স্বর্গপ্রাপ্তির বিঘ্নকর দুষ্কর্ম্ম করিয়া বসিয়াছেন।' ঐমূল শ্লোক হইতে তিনি এই অদ্ভুত তথ্য কিরূপে আবিষ্কার করিলেন ?

লেখকের সকল কথার প্রতিবাদের মত স্থান পত্রিকায় নাই। অবশ্য যদি প্রয়োজন হয়, ক্রমিক প্রস্তাবে সকল কথারই উত্তর দিতে প্রস্তুত। আপাতত কেবল অতিস্থূল বিষয়েরই উত্তর দেওয়া যাইতেছে।

চতুর্থতঃ, লেখক পুত্রাদিকৃত শ্রাদ্ধই মৃতের স্বর্গাদিলাভের উপায় হইলে উহার স্বকৃত পুণ্যের নিষ্ফলতা এবং অসাধুব্যক্তির পুত্রকৃত শ্রাদ্ধাদির ফলে স্বর্গলাভ হইলে স্বকৃতপাপের ফলভোগ হয় না বলিয়া যে আপত্তি তুলিয়াছেন, তদুত্তরে বক্তব্য এই যে শ্রাদ্ধাদিঅনুষ্ঠান মৃতব্যক্তির উত্তমগতিলাভের সাহায্য করে মাত্র। সাধু বা অসাধু কর্ত্তার কৃতকর্ম্মের ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী, ঐ কর্ত্তাকে স্বকর্ম্ম ফলে যে মাত্রায় সুখদুঃখ ভোগ করিতে হইত, পুত্র কৃত শ্রাদ্ধাদি পুণ্যানুষ্ঠানের মহিমায় ঐ সুখ বৃদ্ধি বা দুঃখ হ্রাস ঘটে। নিষ্পাপ ব্যক্তি পাপ ধ্বংসের সম্ভাবনায় গঙ্গাস্নানাদি পুণ্যকার্য্য করিলে উহার পাপ ধ্বংস হয় না বলিয়া যেমন গঙ্গাস্নানাদির বিধিবোধিতত্ব নিরর্থক হয় না ; ঠিক তেমনি স্বপুণ্য ফলে মৃতের স্বর্গলাভ ঘটিলে উহাতে পুত্রকৃত শ্রাদ্ধের নিষ্ফলতা ঘটিলেও ইষ্টাসিদ্ধি বিধায় প্রত্যবায়ের কোন আশঙ্কা থাকে না। পক্ষান্তরে পুত্রাদির কর্ম্মফলে মৃতপাপীর পাপের কথঞ্চিৎ লাঘব হইলে উহাতে আপত্তির কি কারণ থাকিতে পারে, সেনাপতির কৃতকার্য্যতা ও অকৃতকার্য্যতার ফলে রাজার জয় পরাজয় যেমন প্রত্যক্ষদৃষ্ট ; পিতাপুত্রের পরস্পরের অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলে পরস্পরের সুখদুঃখ ভোগও তেমনি শাস্ত্র ও লোকপ্রসিদ্ধ। জীবিতকালের ন্যায় মৃত্যুর পরেও সৎপুত্র পিতার সুখের নিদান, একথা ভারতের অমর কবি

কালিদাসও তাহার প্রখ্যাত রঘুবংশে শিক্ষা দিয়াছেন। "তপস্যা ও দানজনিত পুণ্য, কর্ত্তাকে পরলোকে সুখী করে, কিন্তু বিশুদ্ধ বংশের সন্তান কি পরলোকে, কি ইহলোকে, উভয়লোকেই পিতার সুখের কারণ হয়।" ১।৬৯ এই শ্লোকের বিখ্যাত টীকাকার মল্লিনাথ লিখিয়াছেন; "নমু তপোদানাদিসম্পন্নস্য কিমপত্যৈঃ ?" তপস্যা ও দানাদি ধর্ম্মকর্ম্মকারীর পুত্রে প্রয়োজন কি? ফলিতার্থে অপুত্রক ধার্ম্মিকগৃহীর জীবনে সুখশান্তি কত, তাহা বোধহয় প্রবীণ লেখকের অজ্ঞাত নহে। জীবনে যাহারা সুখের মূলাধার, মরণে তাহাদের নিকট পারলৌকিক সুখাশা কি বকাণ্ড প্রত্যাশা? শাস্ত্রে অপুত্রক ব্যক্তির শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক উপকারার্থে পোষ্যপুত্র গ্রহণের বিধান থাকায় আবহমানকাল দেশে পোষ্যপুত্র গ্রহণ প্রথা প্রচলিত আছে। ব্যবহারাজীবী সনাতনী লেখক কি ঐ প্রথাকেও অর্ব্বাচীন বলিতে পারেন? মৃতব্যক্তির শ্রাদ্ধে তুষ্টি পুষ্টি হয় কিনা, পিতৃভক্ত আস্তিক পুত্রের মনে এ সংশয় হওয়া ত দূরের কথা, বিষ্ণুপুরাণ চতুর্থাংশ স্যমন্তক উপাখ্যানে জাম্ববানের সহিত যুদ্ধার্থ পাতাল প্রবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের বহির্গমনে বিলম্ব ঘটায় মৃতবোধে তাহার শ্রাদ্ধ করিলে উহাতে অনাহার ক্লিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের বলপুষ্টি ও যুদ্ধে বিজয় লাভ হইয়াছিল, এতথ্য বোধ হয় লেখকের অকর্ণ্যগোচর নহে।

৫ মতঃ—লেখক পিণ্ডদান শব্দের অর্থে অসঙ্গতি লিখিয়াছেন। তাঁহার মতে দাতার স্বত্ব ধ্বংস হইয়া গ্র (গৃ) হীতার স্বত্ব উৎপত্তি হওয়া পর্য্যন্ত দান শব্দের অর্থ। আমরা শাস্ত্রে দান শব্দের ঐরূপ অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা পাই না। বিধিমতে বস্তু ত্যাগের নামই দান। ঐরূপ বৈধত্যাগই অন্যের স্বত্বোৎপত্তির হেতু। দানের এরূপ লক্ষণ স্বীকার করিলে যে স্থলে মুমূর্ষু পিতা অসন্নিহিত কন্যাদিগকে কিছু দান করিয়া যান, উহা অসিদ্ধ হয়; পণ্ডিত কেশরী রঘুনন্দন তৎকৃত উদ্বাহতত্ত্বে নমু "প্রদানং স্বাম্যকরণং" ইত্যন্ত বচনটী তুলিয়া প্রতি-গৃহীতার স্বীকার নিরপেক্ষ কেবল দানকেই স্বত্ব-স্বামিত্বের কারণ বলিয়াছেন। শ্রাদ্ধবিবেক দায়ভাগপ্রমুখ প্রামাণিক গ্রন্থে এই মতেরই সমর্থন আছে। সুতরাং প্রতিগৃহীতা মৃতব্যক্তির প্রত্যক্ষতঃ পিণ্ডস্বীকাব না থাকিলেও উহার দানত্ব শাস্ত্রসিদ্ধ। ব্যাকরণের অনিরাকর্ত্তৃক সম্প্রদান শব্দটী কি লেখকের শ্রুতিগোচর হয় নাই; তিনি ঐ শব্দে কিরূপ দান বুঝিয়াছেন?

অবশ্য আস্তিকপন্থী আমাদের জ্ঞান বিশ্বাস মৃতপিত্রাদি পিণ্ডগ্রহণ করেন। শ্রাদ্ধের পর যাঁহারা শ্রাদ্ধোদ্দিষ্ট পিতৃপুরুষকে ভাস্বরমূর্ত্তি ধ্যান করিয়া রশ্মিসহযোগে পিণ্ড গ্রহণ করিতে চিন্তা করেন, তাঁহাদের নিকট এ সব কথা অতি পুরাতন।

৬ষ্ঠতঃ—জন্মান্তর বাদের প্রসঙ্গ। এ বিষয়ে বাদানুবাদ অনাদিকাল হইতে চলিতেছে এবং অনন্তকাল চলিবে। সংক্ষেপে এইমাত্র বক্তব্য যে 'ধান ভাঙ্গিতে শিবের গীতের মত লেখক এখানে যে আত্মাকে টানিয়া আনিয়া 'রামরতন, মহেশভদ্র' সাজাইয়াছেন, শ্রাদ্ধের মূলনিবন্ধ গৃহ্যসূত্র ও স্মৃতিগুলির সহিত উহার তিলার্দ্ধমাত্র সম্পর্ক নাই। শাস্ত্রে যে যে স্থলে শ্রাদ্ধাদির বিধান আছে, সেই সেই স্থলেই সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহাত্মক জীবাত্মার

ঔর্দ্ধদেহিক উপকার বুঝিতে হইবে। স্মৃতিশাস্ত্রে প্রেতের দেহকেই আতিবাহিক দেহ বলা হইয়াছে। এ মতে রাম মরিয়াই সঙ্গে সঙ্গে মহেশ ভদ্র হইতে পারে না। উহার সম্বৎসরকাল প্রেতদেহ ও তৎপরে সপিণ্ডীকরণের পর ভোগ দেহ হয়। অনন্তর সে পূর্ব্ব কর্ম্ম ফলে স্বর্গে বা নরকে যায়। "ততঃ স নরকে যাতি স্বর্গে বা স্বেন কর্ম্মণা॥' আদ্যৈকোদ্দিষ্টাদি সপিণ্ডী করনণান্ত ষোড়শ শ্রাদ্ধের ফলে মৃতের প্রেতত্ব মোচন হইয়া ভোগ দেহলাভ ঘটে। গীতার 'বাসাংসিজীর্ণানি' ইত্যাদি শ্লোকে ভাবনাময় ভাবী সূক্ষ্মদেহের চিত্রই অঙ্কিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চাগ্নিবিদ্যা, বৃহদারণ্যকের জীবের সঙ্কর জাতি প্রস্তাবে প্রদর্শিত জন্মমরণের অন্তরাল অবস্থাটীর ভালরূপ পর্য্যালোচনা করিলে এ তত্ত্ব সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। দার্শনিক লেখক 'আত্মা স্থূলদেহ ধারণ করিয়া রামরতনু হইয়া' ইত্যাদি যাহা লিখিয়াছেন উহাতে আত্মার স্থূলদেহ ধারণের অর্থ কি? বাসাংসি ইত্যাদি শ্লোকের দেহী শব্দের অর্থ জীব, তাহা কি তিনি ভাবিয়া দেখিয়াছেন? 'প্রকৃষ্ট ধর্ম্মানুষ্ঠাতৃদেহবান্ ভীষ্মাদিঃ' পূজ্যপাদ মধুসূদন সরস্বতীকৃত দেহী শব্দের ঐ ব্যাখ্যায় জীব না পরমাত্মা বুঝায়? মহাভারত শান্তিপর্ব্বে ঠিক এই কথাই দেখিতে পাই, 'মানুষ যেমন নূতন গৃহে প্রবিষ্ট হয়, জীবও তেমনি নূতন শরীরে প্রবিষ্ট হয়॥ 'এবং জীবঃ শরীরাণি তানি তানি প্রপদ্যতে॥' বেদান্তদর্শন ৩।১।১ সূত্রের ভাষ্য ও টীকায় এই মতই বিশেষ ভাবে আলোচিত ও সমর্থিত হইয়াছে। শাস্ত্রমতে আত্মার শ্রাদ্ধাদি নাই। উহা কর্ম্মফলভোগী জীবাত্মার কল্যাণার্থ বিহিত। সূক্ষ্মদেহী ব্যবহারিক জীবাত্মা শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধের অধীন, মুক্তাত্মা ঐরূপ বিধিনিষেধের অতীত; এই সুসিদ্ধান্ত বেদান্ত দর্শনে সুপ্রতিষ্ঠিত। সুতরাং সংসারী জীবের শ্রাদ্ধ চিরকাল আছে ও চিরকাল থাকিবে। উহার অর্ব্বাচীনতার প্রতিপাদন চেষ্টা স্বীয় অর্ব্বাচীনতার পরিচায়ক। শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম স্কন্ধ ৪৪—৪৭ শ্লোকে আমরা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধে সাযুজ্যমুক্তিলব্ধ ভীষ্মের উদকাদিদান করিতে দেখি। মহনীয় শাস্ত্রকর্ত্তৃগণ পরম ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠিরের মুক্তের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ করার উদ্দেশ্য শাস্ত্র মর্যাদা রক্ষা ও লোকশিক্ষা বলিয়াছেন। এখনও এই পতিত ভারতে ভীষ্মাষ্টমী তিথিতে ব্রাহ্মণগণ পর্য্যন্ত মুক্ত ক্ষত্রিয় ভীষ্মের উদ্দেশে ভক্তিভরে তর্পণ করিয়া থাকেন। আর্যাশোণিত পূত বিদ্বান্ লেখকও বোধ হয় ভ্রম ক্রমে কোনও দিন এই তর্পণ করিয়া থাকিবেন।

৭ মতঃ—কয়েকখানি পুরাণে শ্রাদ্ধের উল্লেখ না থাকায় লেখকের মতে শ্রাদ্ধ অর্ব্বাচীন প্রথামাত্র। যে শ্রাদ্ধ শ্রুতি, স্মৃতি পুরাণ, পঞ্চমবেদ মহাভারত, রামায়ণ প্রমুখ মহাপ্রামাণিক আর্য্যশাস্ত্রে এমন কি স্মরণাতীত কালের ব্যাকরণ পাণিনি, বার্ত্তিক প্রভৃতিতে পর্য্যন্ত ব্যুৎপাদিত হইয়াছে, আজ সেই অতি পুরাতন আর্য্যজাতির সুপ্রাচীন পুণ্য অনুষ্ঠানটিকে অসনাতন প্রথা বলিয়া কু ব্যাখ্যা করার তাৎপর্য্য কি? রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ১০৪ অধ্যায়ে ২৯।৩০। "ঐঙ্গুদং বদরোন্মিশ্রং" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীরামচন্দ্রকৃত ও তৎপূর্ব্বে ভরতকৃত দশরথের শ্রাদ্ধ সম্পর্কে পণ্ডিত লেখকের ধারণা কিরূপ।'

৮মত ঃ—লেখক "তাঁহারা……বুদ্ধগয়াদিস্থানে মৃতের শ্রাদ্ধ তর্পণ করিলে ভারতীয়গণ সেই অনুষ্ঠানের অনুকরণ করিতে আরম্ভ করেন, লিখিয়া যে অতিবুদ্ধিমানের অভিমান করিয়াছেন, উহা নিতান্ত অসার-চর্ব্বিতচর্ব্বণ মাত্র ; ৺গয়াধামে বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভের পূর্ব্বেও যে শ্রাদ্ধাদি করা হইত, ইহার প্রমাণ মহাভারতের অনুশাসন পূর্ব্বে তীর্থযাত্রা প্রস্তাবে "এষ্টব্যাঃ বহবঃ পুত্রা যদ্যেকোঽপি গয়াং ব্রজেৎ।" ইত্যাদি শ্লোকে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে। এই প্রমাণটী মৎস্যপুরাণ ও সুবহুস্মৃতি নিবন্ধে প্রমাণ্যরূপে গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং লেখকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত "চীনাগণের অনুকরণ করার স্বাভাবিকতা টা সমীচীন কি অতি অর্ব্বাচীন সে বিষয় বিবেচনার ভার সুধী (ধি ?) পাঠকগণের উপর সবিনয়ে অর্পিত হইল গয়াশ্রাদ্ধের অব্যবহিত পরেই কত গৃহস্থের গৃহের বীভৎস ভৌতিক কাণ্ড চিরতরে উপশান্ত হইয়াছে, প্রবীণ লেখক কি কখন একথা শুনেন নাই ? এই প্রত্যক্ষদৃষ্ট ব্যাপারে শ্রাদ্ধের উপকারিতা বিষয়ে সন্দেহের অবসর কোথায় ?

আমার শেষ কথা, শ্রদ্ধা হইতে শ্রাদ্ধের জন্ম। শ্রদ্ধার নাম অস্তিক্য বুদ্ধি বা পরকালে বিশ্বাস। আস্তিক্য বুদ্ধিভ্রষ্ট ব্যক্তিদের নিকট এ সকল প্রসঙ্গ অরণ্যে রোদন তুল্য। শাস্ত্রবলেন ;—

"প্রত্যয়ো ধর্ম্মকার্য্যেষু তথা শ্রদ্ধেত্যুদাহৃতা।
নাস্তিহ্ শ্রদ্ধধানস্য ধর্ম্ম কৃত্যে প্রয়োজনং ॥"

অভিভাষণ *

শ্রীরামসহায় বেদান্ত শাস্ত্রী।

"শৃণ্বন্তরে অমৃতস্য পুত্রাঃ" অমৃত অভয়ের সন্তান, শোন ! সর্ব্বজীব হিতৈষিণী শ্রুতি মায়ের মত ডাকিয়া ডাকিয়া বলিতেছেন—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য 'বরান্ নিবোধত" উঠ, মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া জাগ, অভিপ্রেত সিদ্ধিলাভ করিয়া কৃতকৃত্য হও ! পুণ্য পাপের সমবায়ে এই মনুষ্যলোক, মনুষ্যজাতি, মনুষ্য মন। সে মন যদি শ্রদ্ধাশূন্য হয়, তবে তাহা মরুভূর মত নীরস জানিও। জল নাই, ছায়া নাই, ফুল ফল নাই ; কেবল দুঃখ অশান্তির বালুরাশি, হাহাকারের তপ্ত নিশ্বাস। সেই মরুভূকে শ্যামশস্পময় সুক্ষেত্রে পরিণত করিতে হইলে প্রথমে শ্রদ্ধা চাই। পিতৃপুরুষের নিকট আমরা প্রার্থনা করি "শ্রদ্ধয়া মাব্যাপাগমৎ" শ্রদ্ধা আমাদের যেন নষ্ট না হয়। "শ্রদ্ধয়া কেশবো গম্যঃ" শ্রদ্ধা দ্বারাই ঈশ্বর লাভ।

* বাংলা মুজন সাহা হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার জন্য লিখিত।

"তপসা শ্রদ্ধয়া বা"তপস্যা—উপাসনা, শ্রদ্ধা—অধ্যাত্মতত্বে দৃঢ় প্রত্যয়, এ ছুইটী চাই, গীতায় ভগবান্ বলেছেন শ্রদ্ধা ব্যতীত জ্ঞান লাভ হয় না। তার পরই ভক্তি প্রেমের বীজ বপনের কাল। কোথায় ? ঐ শ্রদ্ধাপূর্ণ মনে, ঐ শ্রদ্ধাবারি নিষিক্ত রসময় এই হৃদয়ে। সে হৃদয় তখন আরমরুভূ নহে, যে বীজ নষ্ট হইবে। ভক্তি প্রেম দয়া এই হৃদয়েরই বৃত্তি। সৎ শাস্ত্র পাঠ, সৎসঙ্গ, ভগন্নাম কীর্ত্তন ; ভগবানে কর্ম্মফল সমর্পণে ঐ বৃত্তিরই বিকাশ, পরিপুষ্টি ও পরিণতি লাভ।

এই শ্রদ্ধা, ভক্তিপ্রেম এই দয়া হৃদয়ে জাগিলেই তাহা সর্ব্বমনুষ্যে, সর্ব্বজীবে জড়াইয়া দিতে হইবে। ইহা যে সংক্রামক গুণ ; পুণ্যবান্ সেই ব্যক্তি তখন পুণ্যশ্লোক হয়, যখন সে আপনাকে রাখিয়া সকলকে তরাইবার জন্যই ব্যগ্র হয়। সেই জন্যই দেবাদিদেব শ্মশানে ঘোরেন, জগদম্বা অভয় বরদারূপে প্রাদুর্ভূতা হন, নন্দদুলান গোপাল হইয়া বৃন্দাবনে গোরু চরান, বাঁশী বাজান। বুদ্ধ ধ্যানস্থযোগী হইয়াছিলেন, যীশু ক্রুশে প্রাণ দিয়াছিলেন, শঙ্করাচার্য্য দেশে দেশে বেদান্ত প্রচার করিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্য সব ছাড়িয়া আচণ্ডাল সকলকে হরিণামামৃত বিতরণ করিয়াছিলেন। সবচেয়ে বড় আদর্শ দেখাইয়াছেন আচার্য্য রামানুজ, গুরু আজ্ঞালঙ্ঘন ও বিশ্বাসঘাতকতায় কুণ্ঠিত হন নাই। গুরুকে বলেন, "প্রভূ, এরা ত উদ্ধার হইবে, আমি না হয় ইহাদের পাপ ভার বহন করিয়া আকল্প নরক বাসই করিব।

আপামর সকলের হৃদয়ে শ্রদ্ধা এবং ভক্তিপ্রেম সঞ্চারিত করিতে হইলে সত্ত্বগুণের মত রজোগুণের ও আশ্রয় গ্রহণ করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। তাই আমাদের সভার অনুষ্ঠান, পূজায় ঢাক ঢোলের ব্যবস্থা, দল বাঁধিয়া সঙ্কীর্ত্তনের আয়োজন করিতে হয়, নিদ্রিত, মোহাচ্ছন্নকে জাগাইবার জন্য বক্তৃতার ভেরীধ্বনিত করিতে হয়, ক্ষুধাতুর দরিদ্র ব্যক্তিদের আকর্ষণ করিবার জন্য দরিদ্র নারায়ণের সেবা ও আবশ্যক হইয়া থাকে ; বধির বিষয় মুগ্ধ ব্যক্তিদের শুনাইবার জন্য কথকতা, কীর্ত্তনও ধর্ম্মোপদেশের রসায়ন প্রয়োগ বড়ই সুফল প্রদান করে।

আমরা সংসারে শ্রেষ্ঠ জন্ম মানব জন্ম লাভ করিয়াছি। কর্ম্মক্ষয় করার সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চয় করার অধিকার ও আমরা লইয়া অসিয়াছি। ক্রিয়মাণ কর্ম্মে মানবের অধিকার আছে, ইহা দার্শনিক সিদ্ধান্ত। কর্ম্মফল অর্জ্জন করিয়া ভগবানের নিকটে ও পৌছিতে পারি, বারংবার জন্ম জরা মৃত্যু সঙ্কুল সংসারে ও আসিতে পারি ; স্বর্গলোকে সুখ, নরকে অসীম যাতনা ভোগ ও করিতে পারি। এস, ভাই সকল। নচিকেতার মত আমরা বলি "ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ" বিত্তদ্বারা মানবের প্রকৃত তৃপ্তি নাই। প্রকৃত তৃপ্তি পাওয়া চাই। প্রকৃত তৃপ্তি যে ভূমানন্দ—তাই আমাদের পাওয়া চাই। মর্ত্ত্যের নশ্বর কামনার পূর্ত্তি চাই না, স্বর্গের অচিরস্থায়ী ভোগও চাই না। যাহা সত্য, শাশ্বত, আনন্দরূপ তাহাই চাই। অন্ধের মত অন্ধকারে ঘুরিতে আর পারি না। যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে চালিত করিতেছেন, সেই পরম দেবতার পরম পদই আমরা আকাঙ্ক্ষা করি। তাহা "বিদ্মহে"

লাভ করিতে হইলে কি করিতে হইবে, সেই পদ "ধীমহি" ধ্যান করিতে হইবে। এক মনে তাঁহাকে ভাবিতে হইবে, ডাকিতে হইবে, ডাকিতে ডাকিতে আত্মহারা হইয়া সব ভুলিয়া যাইতে হইবে, সে পরম পদ সূর্য্যের বরণীয় তেজ হউক, বৃন্দাবনবিহারী শ্যামসুন্দর হউক বরাভয় করা জননী হউক, শ্মশানচারী দেবাদিদেব আশুতোষ হউক, একই কথা। তিনি সর্ব্বময় সর্ব্বরূপ, সর্ব্বরস সর্ব্বভাবাত্মক।

সংসারে ও থাকিতে হইবে, সংসার যাত্রা নির্ব্বাহও করিতে হইবে! কিরূপে?

অন্তঃ সংত্যক্ত সর্ব্বাশো বিতরাগো বিবাসনঃ।
বহিঃ সর্ব্বসমাচারো লোকে বিহর রাঘব॥

রামচন্দ্রের প্রতি বশিষ্টদেবের উপদেশ—

অন্তরের সব আশা, সব আসক্তি সব বাসনা দূরে রাখিয়া অথবা চাপিয়া রাখিয়া বাহিরে সমস্ত কার্য্যই করিয়া যাইতে হইবে। সে কেমন? এই যেমন, তিনি পুত্র দিয়াছেন গচ্ছিত ধনটীর রক্ষা এবং ভাল মত পালন করিয়া যাইতে হইবে। আবার তাঁহার বস্তু তিনি কাড়িয়া লইলেন; তাঁর গচ্ছিত তিনি লইলেন, তোমার দায়িত্ব ত কাটিয়াই গেল। ইহাতে তোমার দুঃখ কি? নিশ্চিন্ত হইলে, ন্যস্ত ধনরক্ষা পালনের দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইলে, তবে ব্যাকুতা কিসের?

বহিঃ কৃত্রিম সংরম্ভো হৃদি সংরম্ভ বর্জ্জিতঃ।
কর্ত্তা বহিরকর্ত্তান্তর্লোকে বিহর রাঘব॥

বাহিরে লোক দেখান আবেগ থাকে থাকুক, ভিতরটি কিন্তু আবেগ শূন্য করা চাই। বাহিরেই কর্ত্তা, ভিতরে কিন্তু অকর্ত্তা, কর্ত্তৃত্বের ভাণ, বিষয়ীর মত আচরণ মাত্র, বাহিরে ভোগীর ভাব, নিষ্কাম।

ত্যক্তা হংকৃতি রাশ্বস্ত মাতরাকাশ শোভনঃ।
অগৃহীত ফলাকাঙ্ক্ষো লোকে বিহর রাঘব॥

আমি করি আমার আমার এ অভিমান ত্যাগ করিয়া কর্ম্মফলে উদাসীন থাকিয়া সংসারে বিচরণ করিতে হইবে। প্রশান্ত চিত্তে—শোভন আকাশ যেমন শোভা পায়, তেমনি হইয়া অবস্থান করিতে হইবে। অকুণ্ঠিত মনে যেমন নির্ম্মল জল তকৃতক্ করিয়া বহিয়া যায় তেমনি সর্ব্ব কর্ম্ম করিয়া যাইতে হইবে।

শত সহস্র কামনার তরঙ্গে নিয়ত চঞ্চল সংসারসাগরে কাষ্ঠখণ্ডের মত ভাসিয়া যাইবার জন্য মানব জীবন নহে। অলীক ইন্দ্রিয়-বাহুর আবেষ্টনে বিষয় লতাটি আলিঙ্গন করিয়া অসাড়ে পড়িয়া থাকিবার জন্য সংসারে আমাদের আগমন হয় নাই। "সংসরন্তি" সংসারঃ, ঐ সংসরণের মধ্যে স্থির হইয়া নিত্যবস্তুর সন্ধানে মন দিতে হইবে, বিষয়বিষ—ঔষধে পরিণত করিয়া লইতে হইবে ইহাই কর্ম্মকৌশল, "যোগঃ" কর্ম্মসু কৌশলং

গীতোপদেশ, হৃদয়ে মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে হইলে রসস্বরূপ সচ্চিদানন্দে প্রাণ মন সমর্পণ করিতে হইবে।

অমৃত অভয়ের সন্তান অসুর হইলে চলে না। "অসূন্ প্রাণান্ রাতি ক্লিশ্নাতি অসুরঃ আপনাদের প্রাণ যাহারা ক্লিষ্ট করে, তাহারাই অসুর। দেহাত্মবাদী ভোগসর্ব্বস্ব কামপরায়ণ ব্যক্তিই অসুর। যাহারা অসুর, তাহারাই আত্মঘাতী, অন্ধতম নরক, এবং অন্ধতম সংসার কারা তাহাদের জন্যই।

"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ।"

শরীর ঘাতী যে, সেই আত্মঘাতী, ইহা উপনিষেদের কথা। কামে যাহারা মজ্জমান, ক্রোধে উন্মত্ত, লোভে আকুল, অহঙ্কারে মত্ত, মাৎসর্য্যে অন্ধ, সেই আত্মঘাতী ধর্ম্মদ্বেষীরাই অসুর। দেবতা ও অসুরেরা একই পিতার সন্তান। প্রথমে একই প্রজাপতির শিষ্য ছিল, পরে বিষম পার্থক্য জন্য পৃথক গুরুর শিষ্য হয়।—উপনিষদের গুরু একই প্রজাপতি। পুরাণেই বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্য পৃথক গুরুর উল্লেখ দেখা যায়। "দিব্যতে দেবঃ" জ্ঞানবান্ই দেবতা। দেহাতিরিক্ত আত্মজ্ঞানের অধিকারী স্বতঃ প্রকাশ জ্ঞানালোকোদ্ভাসিত আদিতেয়েরাই দেবতা। লোকপালক বলিয়া দেবতা লোকপাল। দেবতারা স্বর্গে থাকেন। মর্ত্ত্য কিন্তু দেহাত্মবাদী অসুরে সারা পৃথিবী ছাইয়া গেল। তাহাদের পদভরে আজ ধরণী কম্পমানা। ধনী দরিদ্র পণ্ডিত মূর্খ রাজা প্রজা—সর্ব্বত্রই এখন দেখি অসুর ভাবের প্রাবল্য। কোথাও স্বরূপে, কোথাও বা দেবতার ছদ্মবেশে ইহাদেরই গতিবিধি। "বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা" দিগ্বিজয়। "Surirval of the pittest"—Pristige" এমন কি দেশ শাসন, দেশরক্ষা ও আত্মরক্ষার ভিতরেও ঐ অসুর ভাব।

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যম মন্দিরং।
শেষাঃ স্থিরত্ব মিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্য মতঃ পরং॥

সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বের আশ্চর্য্যের বিষয়—প্রতিনিয়ত প্রাণিবর্গ কালকবলিত হইতেছে, তথাপি অবশিষ্ট যাহারা থাকে, তাহারা ভাবে আমরা বুঝি থাকিব। কাম ক্রোধের আধিপত্য ঈর্ষ্যা দ্বেষও হিংসা লোভের প্রভুত্ব দেখিলে কে বলিবে, মানব আপনার মরণের কথা মনে করে। যদি করিত তাহা হইলে ধরা স্বর্গরাজ্য এমন কি বৈকুণ্ঠবৎ হইত সন্দেহ নাই।

শ্রদ্ধা কর, বিশ্বাস কর, মতি আপনিই জন্মিবে; সে মতি তর্কের দ্বারা জন্মিবে না তর্কের দ্বারা নাশও পাইবে না। মতি থাকিলেই ভাব আসিবে। ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন ভাবটি রক্ষা করিবেন।

"যথৈবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মাবৃণুতে তনুং স্বাং॥

মনে প্রাণে আকাঙ্ক্ষা থাকিলে তিনিই আপন স্বরূপ, আপন জ্যোতি প্রকাশিত

করিবেন। তিনি আত্মা, ব্রহ্ম, শ্রীভগবান্ ও আদ্যাশক্তি; সকলই। চিত্তকে শুদ্ধ, স্বচ্ছ কর, প্রতি বিম্বপাত হইবেই।

আর্য্য ঋষিগণের ভাব আমাদের বেদ উপনিষদে পুরাণে, সংহিতায় তন্ত্রে, সাহিত্যে সর্ব্বত্রই আছে। হৃদয়ে অন্তঃপুরে নদীস্রোতে, বনে, পর্ব্বতে সেই ভাব লুকান আছে। তিনি দূরে থাকিয়াও যে সমীপে বৈকুণ্ঠে থাকিয়াও হৃদয়ে, তিনি নিরাকার হইয়াও যে আকার ধারী।

অভ্যাস, অনুশীল, সাধনা চাই! সত্য প্রতিষ্ঠা উপাসনা, কর্ম্মানুষ্ঠান; সদ্‌গ্রন্থ পাঠ চাই। এক জন্মে সিদ্ধি লাভ না হয়, জন্মান্তর আছে; হতাশ্বাস হইবার প্রয়োজন নাই। ধনের অহমিকায়, প্রভুত্বের অহঙ্কারে, আভিজাত্যের গর্ব্বে এবং বলবানের অনাচার অত্যাচারে বিষাদ যেন না আইসে। চক্রের মত বিধাতার চক্র ও ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে। আজ যে ধনী, ইহ জন্মে বা জন্মান্তরে হয়ত সেই দরিদ্র। আজ যে প্রভু, কাল বা পরজন্মে সেই দাস। যে অর্থ পাপের পথে লইয়া যায়, কামনার জালে অষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধিতে চায়, সেই অর্থই অনর্থ। জন্ম—সেও ত দৈবায়ত্ত, তাহাতে গর্ব্বের কিছু নাই? ব্রাহ্মণকেই উচ্চাসন দেওয়া হইয়াছিল, কেন? উপনিষৎ ব্রাহ্মণের সংজ্ঞা দিয়াছেন।

"যো বৈ গার্গি বিদিত্বা অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ" আত্মতত্ব জানিয়া যাঁহারা ইহলোকের কর্ত্তব্য শেষ করিয়া যান্ তাঁহারাই ব্রাহ্মণ। আত্মতত্ত্বানুশীলন করার জন্যই ব্রাহ্মণ "ব্রাহ্মজানাতি"—ব্রহ্ম অর্থে বেদ। ইহাই যদি মানা যায়, তবে ব্রাহ্মণ এখন কেবল অসার পদবী মাত্র হইয়া দাড়াইয়াছে নাকি? ভগবত্তত্বানুশীলন না করিয়া যে মানবেরা কেবল ভোগকেই বরণ করিয়া ইহলোক ত্যাগ করে, তাহারা কৃপণ—ক্ষুদ্র তাহাদের গতি কি? উপনিষৎ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন—

যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেহনু সংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতং॥

স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপই মানব জন্ম—ইহাই উপনিষদের উপদেশ। মানব মায়ামোহে এমনই আবদ্ধ, মানিক মাকি ভ্রমে তুচ্ছ কাচ খণ্ডকেই আদর করে; কামনা তরুর নিকট শান্তিফল চাহে; সুখ মনে করিয়া দুঃখকেই আলিঙ্গন করে, মানব জানে না বা জানিয়া ধারণা করে না যে, জ্ঞান সূর্য্য দূরে থাকে বলিয়াই অশান্তি ও দুঃখের ছায়া সম্মুখে আসিয়া দেখা দেয়, সে সূর্য্য মাথার উপর আসিলেই ছায়া পদতলে লুকাইয়া পড়ে। ভক্তি, উপাসনা, ধ্যান, যোগ, কর্ম্মানুষ্ঠান ও স্বাধ্যায় দ্বারাই মানব জন্ম সার্থক হয়। ভগবানের প্রতি নির্ভর করিয়া কায়মন বাক্যে তাঁহার উপাসনায় ইহলোকে শান্তি, পরিনামে ও মুক্তিলাভ পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। ভগবানে, পরম, আনুরক্তিই ভক্তি। ভজনাই ভক্তি। প্রত্যগাত্মাকে অন্তরঙ্গরূপে উপলব্ধি করাই উপাসনা। "তদ্‌গতচিন্তনং উপাসনমিতি।' মনোবৃত্তির ধ্যেয় বস্তুতে একতান করাই ধ্যান। আত্মপ্রত্যগাত্মার মিলনই যোগ। চিত্তবৃত্তিনিরোধ

যোগ পশুগুলির মত। ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম্ম করাই কর্ম্মানুষ্ঠান। স্বাধ্যায়, বেদোপনিষৎ পাঠ। অধ্যাত্মশাস্ত্রালোচনাও স্বাধ্যায়। শাস্ত্রীয় ব্রহ্মচর্য্য পালন, সত্যাশ্রয়, সন্ধ্যাহ্নিকাদিও নিত্যকর্ম্ম উপাসনা মধ্যেই পরিগণিত।

রামানুজ স্বামী "ভক্তিরিত্যুচ্যতে জ্ঞানং" বলিয়া ভক্তি এবং জ্ঞান কে এককোঠায় স্থান দিয়া, উপাসনা, ও ধ্যান, যোগ ও নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানকে এক পর্য্যায়ে ফেলিয়া শেষে সকলকে একই সামগ্রী বলিয়া প্রমাণিত করিয়া গিয়াছেন।

আমরা জীবন ভোর সংসারের কথা ভাবিয়া থাকি ঐহিক সুখ দুঃখের আলোচনা করি, অর্থ সম্বন্ধীয় লাভ লোকসান খতাইয়া থাকি, কিন্তু একবার ভাবি কি, শেষের সম্বল, পরলোকের পাথেয় কি লইয়া চলিলাম! কাব্য, উপন্যাস, নাটক ইতিহাস রাজনীতি অর্থ নীতি লইয়াই দিন কাটাইতেছি, লোক সেবা দেশোন্নতি, বিদ্যাচর্চ্চা করিতেছি মুখে বলিয়া অন্তরে যশোলিপ্সাই চরিতার্থ করিতেছি, মনে প্রাণে ভাবি কি, যে নামের গুণে পাষাণে উৎস ছুটে, গহন বনে ফুল ফুটে, আকাশে সূর্য্য উঠে, তাঁকে কতটুকু উপলব্ধি করিলাম বা সেজন্য কতটুকু চেষ্টা পাইলাম? যেনাম বীজ একবার হৃদয়ক্ষেত্রে উপ্ত হইলে ভক্তি ফুল ফুটে, জ্ঞান-ফল পাকিয়া উঠে; তাহার কি সাধনা করিলাম? এস সকলে কবির সঙ্গে একসুরে গাহি—

"কে যেন বলছে মোর কানে।
ঐ দেখ্ প্রেমের পসারা ল'য়ে মাথায় ক'রে
প্রেমের ঠাকুর আস্‌ছে রে ঐ আস্‌ছে।
কেটে যাক্ মোদের নয়নের ঘোর,
খুলে যাক্ কঠিন পাষাণ মনের দোর,
সব ছেড়ে আয় মোরা সব হরির স্মরণ লই।
জ্ঞানের গর্ব্ব কভু না কর্ব্ব হ'ক মোদের আসক্তি খর্ব্ব,
আয় সকলে দুবাহু তুলে তাঁর চরণে পড়িগে।

আজি কালিকার সাহিত্যে ভগবৎ প্রসঙ্গ নাই বলিলেই হয়, জয়দেব, বিদ্যাপতি, চন্দীদাস, গোবিন্দদাসের ভাব কোথাও নাই। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক ইতিহাস, জড় বিজ্ঞান ইহলোকে প্রেয়ই আনিয়া দিতে পারে, মানব জন্মের কিন্তু সার্থকতা একমাত্র শ্রেয়ের সাধনা। এ কথা কি কেহ এখন শুনিবেন? গল্প কবিতায় ও রাজনীতিতে মসগুল নরনারী কি এ অধ্যাত্ম কথা প্রাণের মধ্যে গ্রহণ করিবেন? কি জানি, তথাপি যাহা সত্য শাশ্বত তাহার আলোচনাও পুণ্য জানি "শ্রবণায়াপি বহুভির্ন লভ্যঃ।
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ॥

তথাপি, শ্রুতি উপনিষৎ পুরাণ তন্ত্র একই কথা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কত ভাবেই না বলিয়া আসিতেছেন। প্রেমের ঠাকুর বৈকুণ্ঠের আসন ত্যাগ করিয়া কত বারই

না আমাদের সম্মুখে বাঁশী বাজাইলেন। অবশ্য একেবারে বৃথা হয় নাই, বৃথা হইবেও না, ফিরিতেই হইবে; চলিতে চলিতে একবার দাঁড়াইয়া সেই বাঁশীর রব শুনিতেই হইবে। "ঐ শুন বাঁশী বাজে বন মাঝে কি মনোমাঝে ঐ বাঁশী বাজে।" গীতার উপদেশ মনে রাখিও—

"সর্ব্ব ধর্ম্মং পরিত্যজ্য মামেক শরণং ব্রজ।"
"সর্ব্ব কর্ম্মফলং শ্রীভগবচ্চরণে সমর্পিতমস্তু॥

একখানি পত্র

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কস্যচিৎতত্ত্বদর্শিনঃ।

অধম লেখক ও উহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিষয়ে কিঞ্চিৎ অবগত আছে। আমার জনৈক পরিচিত বন্ধু প্রথম বয়সে এই পথের পথিক ছিলেন। ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময়ে একদম গৃহত্যাগ করিয়া ৺কাশীধামে বাস করতঃ শাস্ত্রাদি অধ্যয়নে নিযুক্ত ছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন যোগাঙ্গের ও কিছু কিছু অনুষ্ঠান করিতেন। তাঁহার প্রাণের বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, এই ভাবে তপশ্চরণ করিয়াই সারাটী জীবন কর্ত্তন করিবেন, আর কখনও দার পরিগ্রহ করিয়া সংসারে আবদ্ধ হইবেন না। ইহা প্রায় ২৫।৩০ বৎসরের কথা।

কিন্তু বিধি-লিপি অখণ্ডনীয়। হটাৎ কোন কারণ বশতঃ একবার তাঁহাকে বাটী আসিতে হয়। এই সুযোগে তাঁহার আত্মীয় স্বজন সকলে মিলিত হইয়া তাঁহার অতিশয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্ব্বক ঘরে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়া বিবাহ দেন। এ সব কথা অবশ্য তাঁহারই মুখে শুনা। সেই হইতে তিনি পূর্ব্ব জীবনের নিয়মাদি সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যান্যের ন্যায় বংসারের "ঘুঘু" সাজিতে বাধ্য হন। তজ্জন্য সততই তিনি আমাদের নিকট কতই অনুতাপ করিতেন।

যাহা হউক তিনি যোগের কোন কোন অঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, এবং অলৌকিক ব্যাপার সকল দর্শন করিতেন। তাঁহার মুখে ঐরূপ শুনিয়াছি এবং তাহার সত্যতায় প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও পাইয়াছি।

সৌভাগ্য ক্রমে খুলনা থাকা কালে আমি তাঁহার পবিত্র সংসর্গ লাভ করতঃ অনেক বিষয়ে উপদেশ পাইয়াছি। আমি ও তখন কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে অধিষ্ঠিত ছিলাম। তাই তিনি আমাকে খুব শ্রদ্ধা করিতেন ও ভাল বাসিতেন, বলা বাহুল্য আমি এখনও সেই ব্রহ্মচর্য্যেই অবস্থিত আছি।

যাহা হউক তাঁহার উপদেশ মত আমিও কোন কোন যোগাঙ্গের কিছু কিছু অনুষ্ঠান করিয়াছি এবং তাহাতে তাঁহার কথার সত্যতার প্রত্যক্ষ প্রকৃষ্ট প্রমাণ লাভ করতঃ প্রাণে অপার আনন্দ লাভ করিয়াছি। এটুকু বেশ বুঝিয়াছি যে শাস্ত্র বাক্য সব সত্য, কিছুই মিথ্যা নহে। আমরা মিথ্যা হইয়াছি, তাই সব মিথ্যা—দোষ। আমরা কিছুই অনুষ্ঠান করি না, তাই শাস্ত্রবাক্য সব মিথ্যা বলি। বস্তুতঃ শাস্ত্রবাক্য কিছুই মিথ্যা নহে, সব সত্য, অভ্রান্ত সত্য, ইহা বেশ বুঝিয়াছি।

কিন্তু দারুণ দুঃখের বিষয় এই যে, বুঝিয়া কোন ফল হইল না। কিছুই করিতে পারিলাম না। কারণ—অভাবের তীব্র তাড়না। ক্রমশঃ ধর্ম্মের বা ধর্ম্ম প্রবৃত্তির উন্মেষ ক্রমে চাকরী শ্ব বৃত্তি—শূদ্র বৃত্তি ব্রাহ্মণের বৃত্তি নহে বোধে চাকরী পরিত্যাগ করতঃ ব্রাহ্মণের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভীষণ দারিদ্রকে স্বেচ্ছায় চির সহচর রূপে বরণ করিয়া লইয়াছি এবং কাজে কাজেই সর্ব্বদাই অন্ন-চিন্তায় চমৎকার থাকিতে হয় বলিয়া ঐ সমস্ত কার্য্যে কোনই উন্নতি লাভ করিতে পারিলাম না। তাই একদিন অভাবের বিষম তাড়নায় ব্রহ্মময়ী মাকে লক্ষ্য করিয়া বড় দুঃখে গাহিয়াছিলাম—

(প্রসাদী সুর)

এই কি মা মায়ের ধারা।
ওমা তারা নামে বহে ধারা॥
যে জন অহরহ বলে তারা, তারই বহে অশ্রুধারা।
(ওমা) তারা নামে এমন ধারা, জান্‌লে আগে কে বল্‌ত তারা॥
না জানিয়ে ব'লে তারা, ওমা তারা হ'লেম সারা।
এখন তারা তারায় দিশাহারা, ছাড়্‌তে চাইলেও না যায় ছাড়া॥
বলে তারা দুঃখ হরা, হেরি তারা দুঃখের ভরা।
তবুও বলি তারা তারা, এ কি বিপদ ওমা তারা॥
বৃক্ষতলে শূন্যোদরে, দিগম্বরে ও নাই কুল কিনারা।
আর ও কি তোর আছে মা সাধ, তুই-ই জানিস্‌ পোড়ামুখী তারা॥
যা-হবার তা হয়েছে মা, কাজ কি করে ঘোরা-ফেরা।
পাগল বলে করিস্‌ মা ইহাই, (যেন) তারা বলে খসে জীব তারা।

আরও একদিন মায়ে পোয়ে কোন্দল করিয়া ঠিক বালকের ন্যায় বলিয়াছিলাম—

(প্রসাদী সুর)

মা; আমার কিছুই হ'ল না।
না-সংসার, না—সাধন ॥
(এখন) দু'নৌকায় দিয়ে পা, হ'লেম-যে-মা! দু'খানা।
আদর করে পাঠাইলে, দিয়ে সংসারের প্রেরণা ॥
কার্য্যক্ষেত্রে এসে দেখি, আমার শুধুই তা-না-না।
বসিবারও নাইক-স্থান, সামান্য সেই কুটীর খানা ॥
অন্ন-বস্ত্রের ত কথাই নাই, তাহা মুখে আন্‌তেও পারি না।
অন্য যা' কিছু দরকারী মা, চুলায় না হয় যাক্‌ না ॥
যা' বিনে জীবন না রয়, তা'ও কি মা দিতে নাই, দিবে না।
করাচ্ছ মা বেশ সংসার! এমন সংসার কেউ করে না ॥
এত নয় সংসার মা! সং—সার, সংসারের বিড়ম্বনা।
(যদি) সুভালে করাও, কর্‌তে রাজি, নইলে তুরুক্‌ জবাব—কর্‌ব না ॥
(তাতে) শূলে, শালে, যা' খুসি দাও, তাহাতে মা, আর ডরাই না।
কেন ডরাব কোন্‌ ভয়ে মা, উভয়েই আছে মরণ জানা ॥
তথাপি শ্রেয়ঃ বীর মরণ, কাপুরুষের কদাপি না।
আপোষে তবুও কয় পাগলা, লয়ে শিরে দোষ সব আপনা ॥
(এখন) ক্ষম মা তারে দয়া করে, দাও পদাশ্রয় এই প্রার্থনা।

ঐরূপ মাঝে মাঝে অনেক হইয়া থাকে। কিন্তু সে কথায় প্রয়োজন নাই। কথা হইতেছে অভাবের ভীষণ তাড়নায়, দারিদ্রের বিষম কযাঘাতে কিছুই করিতে পারিলাম না। জানিয়া শুনিয়া বুঝিয়া এবং সেই পথে দাঁড়াইয়া—আসরে নামিয়া ও কিছুই করিতে পারিলাম না। কেবল ভান মাত্রই সাব হইল। জীবন বৃথায় গেল! আমার দারুন দুর্ভাগ্য সন্দেহ নাই!

অবশ্য উহা শুধু আমারই দুভাগ্য নহে, দেশের ও দুর্ভাগ্য বলিতে পারি। কেন না কোথায় ও কোন সহানুভূতি নাই, সাহায্য নাই। সেদিকে কাহারও এতটুকুও লক্ষ্য নাই। তবে আমিও অবশ্য ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লইয়া নিরুষ্টের ন্যায়—সাধারণ ভিক্ষুকের ন্যায় দ্বারে দ্বারে খুব ঘুরি নাই। তথাপি ঘটনা চক্রে খুঁব উচ্চশ্রেণীর দুই এক স্থানের পরিচয় পাইয়াছি একদম নিবৃত্ত হইয়াছি। কাবণ প্রাণ থাকিলে ত সাহায্য মিলিবে? সকলেই যে প্রাণহীন অসাড় হইয়া পড়িয়াছে? সুতরাং আশা কোথায়? বিশেষ এই কার্য্যে? অসম্ভব; কালস্য কুটিলা গতিঃ। আর সে রাম নাই, অযোধ্যা নাই। সুতরাং ব্রাহ্মণের আশাও নাই।

একবার ব্রাহ্মণ সভার নিকট আবেদন করিবার খুব ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু তাহা করি নাই। শুনিতে পাই তথায় "চাচা আপন প্রাণ বাঁচা"—নীতি বর্ত্তমান। অর্থাৎ কর্ত্তৃপক্ষগণ আপন আপন স্বার্থ লইয়াই ব্যতিব্যস্ত, অন্যদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার অবসর খুব কম। তারপর আমি খুব গুণী লোক ও নহি, সেরূপ খুব বড় চাপরাস নাই, বিদ্যা বুদ্ধি ও নাই;—আবার কোন সুপারিস ও নাই। সুতরাং সেখানে আমার মত অধমের আশা কোথায়? কাজেই একদম নীরব আছি। ভগবানের পাদপদ্মই একমাত্র ভরসা। দেখা যাক্ তিনিই কি করেন। তিনি প্রসন্ন হইলেই জগৎ প্রসন্ন হয়। অতএব তাঁহাকেই একান্ত মনে প্রসন্ন করিবার জন্য চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তাহাই করিতেছি। কিন্তু সম্যকরূপে পারিতেছি কৈ? অভাবই যে তাহার ঘোর অন্তরায়রূপে দণ্ডায় মান। আমার দুরদৃষ্ট॥

যাক্ ঐ কথা। তাই বলিতেছিলাম তপস্যাবিহীন হইয়াই সব হারাইয়াছি। আবার তপস্যাপরায়ণ হইলেই সব হয়। যেমন ছিলাম ঠিক তাহাই হইতে পারি ইহার এতটুকুও মিথ্যা নহে সব সত্য। আমাদের অতিশয় সুখের বিষয় এই যে, আমাদের সে বিশ্বাস এখনও আছে, আমরা একেবারে বিশ্বাস হারা হই নাই।

কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় এতদূর দুর্ভাগ্যবান যে, তিনি সেই পরম ধন বিশ্বাসটুকু পর্য্যন্ত হারাইয়াছেন। শুধু বিশ্বাস হারান নয়, একবারে বিপরীত বুদ্ধির উদয় হইয়াছে। এতদূর অবনত হইয়াছেন। তারপর, তিনি আজকাল উল্টাদিকে যেরূপ উগ্র তপস্যা আরম্ভ করিয়াছেন, যথা—খাদ্যাখাদ্য-বিচার-ত্যাগ, জাতি-কুল-ত্যাগ, নীচ সংসর্গ অর্থাৎ মেথর-মুচি-হাড়ি-ডোম-চণ্ডাল সংসর্গ নেড়া-নেড়ী-ভজা,—ইত্যাদি ভাবে যেরূপ ঘোর তপস্যা করিতেছেন, তাহাতে অচিরাৎ স্থাবরত্বে ও বৃক্ষত্বে ও পশুত্বে অনায়াসে পরিণত হইতে পারিবেন—ইহা অতীব সুনিশ্চিত। সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র ও নাই। কারণ কার্য্যের দ্বারা দেহের পরমাণুর পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয় ও ক্রমশঃ ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। ইহা অকাট্য বিজ্ঞান সম্মত সত্য। এ বিজ্ঞান—এ সকল তত্ত্ব কথা কেবল ভারতের হিন্দুগণই জানেন জগতের আর কেহই জানেন না। এবং তাঁহাদের পক্ষে উহা জানা ও অসম্ভব। যেহেতু সে সব "মাল মশলা" তাঁহাদের নাই, ভগবান দেন নাই, কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষের, তথা ভারতের হিন্দুগণের ইহা গুরুতর বিশেষত্ব। ইহা সহজ ব্যাপার নহে।

আধ্যাত্মিকতাই মনুষ্যত্বের বীজ। সুতরাং; আধ্যাত্মিকতায় যে, যে পরিমাণ বঞ্চিত, মনুষ্যত্বের হিসাবে ও সে সেই পরিমাণ দূরে অবস্থিত। হিন্দু আধ্যাত্মিক রাজ্যে সম্রাট। সুতরাং মনুষ্যত্বের হিসাবে ও হিন্দু পূর্ণ মানুষ। এ পূর্ণত্বের অধিকায় হিন্দুরই বর্ত্তমান। ইহা ভগবদিচ্ছা, ও প্রকৃতির বিধান। আর সকলেই আধ্যাত্মিক রাজ্য হইতে বহু দূরে অবস্থিত, সুতরাং মনুষ্যত্বের হিসাবে ও তাঁহারা অপূর্ণ বা আংশিক মানুষ।

ইহা গায়ের জোরের কথা নহে, অভ্রান্ত সত্য খ্যাপন। কেমন করিয়া তাহা পরে দেখান যাইবে।

কিন্তু সে অনেক কথা। অতএব সে কথায় এখন প্রয়োজন নাই বারান্তরে হইবে। এখন সূত্র মাত্র উল্লিখিত হইল। পণ্ডিত মহাশয় এ হেন আধ্যাত্মিক রাজ্যের অধিকার ভাগ্য-বশতঃ লাভ করিয়া ও কর্ম্ম দোষে তাহা হইতে দ্রুত অপসারিত হইতেছেন। তাঁহার দৈহিক পরমাণুর এতই দ্রুত পরিবর্ত্তন হইতেছে যে, অদূর ভবিষ্যতেই হয়ত পশুত্বে, স্থাবরত্বে বা বৃক্ষত্বে পরিণত হইয়া যাওয়া অসম্ভব নহে। বহু পূর্ব্বে একবার খবরের কাগজে দেখিয়াছিলাম স্কট্‌লণ্ডের একটী লোক হঠাৎ একেবারে পাষাণে পরিণত হইয়া যায়। এবং গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তাহা গ্লাবনোর প্রসিদ্ধ মিউজিয়মে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে।

এইরূপ হওয়া অসম্ভব নহে। উহা উৎকট দুষ্ক্রিয়ার ফল। পণ্ডিত মহাশয়ের পরিণাম কি তাহা ভগবান জানেন। তবে উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে জন্ম লাভ করিয়া এইরূপ দুর্ম্মতি প্রাপ্ত হওয়া অতিশয় পরিতাপের বিষয়। যাক্ সে আলোচনায় প্রয়োজন নাই। যাহা বলিতেছিলাম—

বলিতেছিলাম গ্রহ ও আছে, গ্রহের প্রভাবও আছে। তাহা দেখিতে ও বুঝিতে তপোবল আবশ্যক। তপোবলে দিব্য চক্ষু ও দিব্য জ্ঞান লাভ হইলে তাহা দেখা যায় ও জানা যায়। আমাদের তাহা নাই বলিয়া আমরা তাহা দেখিও না এবং তাহা বুঝিও না। আবার দেখি না ও বুঝিনা বলিয়াই তাহা গ্রাহ্যও করি না, অবিশ্বাস করি ও শতমুখে নিন্দা ও করিয়া থাকি। কিন্তু তথাপি দেখিবার ও বুঝিবার সে শক্তি আহরণের চেষ্টা করি না। অধঃপতন আর কাহাকে বলে!

যাহা হউক শাস্ত্রবাক্য কিছুই মিথ্যা নহে, সব সত্য। তুমি আমি মিথ্যা হইয়া গিয়াছি, তাই সব মিথ্যা হইয়াছে। নইলে গ্রহ ও আছে গ্রহের প্রভাব ও আছে। তাঁহারা সকলেই বিশ্বরাজ ভগবানের কর্ম্মচারী, তাঁহার সৃষ্টি রক্ষার্থ তাঁহারা সকলেই নিয়মিতরূপে এক এক কার্য্যের ভার গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার আদেশ পালনে নিযুক্ত। সুতরাং তাঁহাদিগকে অগ্রাহ্য করা কর্ত্তব্য নহে। আমরা বুঝি না তাহা আমাদের দোষ. তাঁহাদের নহে। তাই বলিয়া সব মিথ্যা, সত্য নহে, তাহা নহে। সব অভ্রান্ত সত্য কথা।

এক কথা বলিবেন ইংরাজ, মুশলমান বা অন্য জাতির মধ্যে ত উহা নাই, তাহারা কি করিবে। তাহারা ত কিছু মানে না, তাহাদের কি হয়?

ঠিক কথা। ইহার উত্তর হিন্দু ভিন্ন অহিন্দু বুঝিবে না, আস্তিক ভিন্ন নাস্তিক ও বুঝিবে না। সুতরাং আমরও তাহা দিবার প্রয়াস পাওয়া বৃথা। তবে সাধারণ ভাবে এই টুকু মাত্র বলিব যে না জানিলে সাপের বিষ ও নাই, এক প্রচলিত কথাই আছে। কথা ও একেবারে মিথ্যা নহে। একটী গল্প বলি। বহুকালের কথা। একদা আমার সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ আহারে বসিয়াছেন। মাতা পরিবেশন করিতেছেন। ওলের ডাল্‌না রাঁধা

হইয়াছিল। উত্তম রান্না হইয়াছে ; দাদা খাইয়া খুব তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। সর্ব্বশেষে যখন দুধ দিয়া খাইবেন সেই সময় মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন "ডাল্‌না খাইলে কেমন ?" দাদা "বেশ খাইলাম, উত্তম রান্না হইয়াছে।" তারপর দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন "ইহা কিসের ডাল্‌না ?" মাতা বলিলেন "ওলের, ডালনা।" "তাহা কি বুঝিতে পার নাই।" দাদা ওলের ডালনা শুনিয়াই একেবারে চমকাইয়া উঠিলেন ও বলিলেন শীঘ্র তেঁতুল দাও, বড় গলা ধরে। তিনি আলুর ডাল্‌না ভাবিয়া খাইয়াছেন। তাঁহার কথা শুনিয়া সকলেরই উচ্চ হাস্য করিল। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার ! যতক্ষণ না জানিয়াছিলেন ততক্ষণ গলা ধরে নাই। যেই শুনা অমনি গলা ধরা। ইহা প্রত্যক্ষ দেখা।

সুতরাং না জানিলে সাপের বিষও নাই কথাটী একবারে মিথ্যা নহে। ফল কথা জ্ঞানীর ব্যবস্থা একরূপ, অজ্ঞানীর ব্যবস্থা অন্যরূপ ; অজ্ঞানকৃত অপরাধের শাস্তি এক প্রকার, জ্ঞানকৃত অপরাধের শাস্তি অন্য প্রকার ; ইতরের ব্যবস্থা একরূপ, ভদ্রের ব্যবস্থা অন্যরূপ ; বড়লোকের ব্যবস্থা একরূপ, দরিদ্রের ব্যবস্থা অন্যরূপ ; ধনীর কথায় কথায় ডাক্তার ও ঔষধের প্রয়োজন, গরীবের ঔষধই প্রায় দরকার হয় না ; জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্মাণুভূতি হয়, অজ্ঞানের হয় না ; আবার, যত সূক্ষ্মাণুভূতি ততই ফল শ্রুতি,—ততই অপরাধের গুরুত্ব বৃদ্ধি, ততই শাস্তি ও গুরুতর, ইহাই রীতি।

তথাপি অতি বড় স্থূল অর্থাৎ গুরুতর অপরাধের ফল একবারে জ্ঞানী অজ্ঞানী নির্ব্বিশেষে সদ্যই প্রসব করে। তাহার হাত হইতে আর কাহারও অব্যাহতি নাই। যেমন গো হত্যা, নর হত্যা প্রভৃতি অপরাধের শাস্তি সদ্যই পাইতে দেখা যায়। আমাদের গ্রামের এক ভদ্রলোক নরহত্যা করিয়া প্রমাণাভাবে খালাস পাইলেন বটে কিন্তু ভগবানের নিকট আর মুক্তি পাইলেন না। এক বৎসর উৎকট রোগে ভুগিয়া একবারে পচিয়া খসিয়া মৃত্যু মুখে পতিত হইলেন। ভগবান যেন সদ্য দেখাইলেন যে এ পাপের ইহাই শাস্তি !

একটী তিথি নক্ষত্র মাহাত্ম্য সূচক গল্পও বলি। বহু পূর্ব্বে খুলনা জেলায় সহরের ঠিক নিম্নস্থ নদীর অপর পারে রেণী সাহেবের এক কুঠী ছিল। চিনির কারবার ছিল। নৌকায় চিনি কলিকাতা চালান যাইত। একদা কয়েকখানা নৌকা চিনি বোঝাই হইয়াছে। যে দিবস চালান যাইবে সে দিবস মঘা নক্ষত্র ছিল। সাহেবের হিন্দু কর্ম্মচারী সাহেবকে পঞ্জিকা দেখিয়া বলিল—"অদ্য মঘা নক্ষত্র, যাত্রার দিন ভাল নহে। সাহেবকে মঘা কি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইল। সাহেব তদুত্তরে বলিল "ড্যাম্ বাঙ্গালী, আমরা ঐ সব মানি না। নৌকা ছাড় ইত্যাদি, নৌকা ছাড়িল। বহুদূরে বড় নদীর ভিতর যাইলে ভয়ঙ্কর ঝড় উত্থিত হইয়া সুন্দর বনের মধ্যে সব নৌকা ডুবিল। চিনি সরবৎ হইল। সেই খবর পাইয়া একটু দুঃখিত হইল। পরক্ষণেই বলিল "কুচপরোয়া নাই, আর এক চালান পাঠাও। নৌকা প্রস্তুত হইল। কিন্তু সে দিবস নৌকা ছাড়িবার পূর্ব্বে সাহেব সেই হিন্দু

কর্ম্মচারীকে বলিল "দেখত তোমরা মঘা কাঁহা? ইত্যাদি। সেই হইতে সাহেব পঞ্জিকা না দেখিয়া আর চালান দিত না।

এই রূপ সকল বিষয়েই। না জানিলে আর কথা কি? তথাপি ফলভোগ কতকটা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তাহা ও জ্ঞানে ও অজ্ঞানে অনেক ইতর বিশেষ আছে। তাই বলিতেছিলাম নাস্তিক অনেক থাকে কিন্তু এত বড় ঘোর নাস্তিক আর দেখা যায় না—যে প্রত্যক্ষ বিষয়ও মানিতে চাহে না। এ সব লোকের সহিত বাক্যালাপ করা ও পাপ। তবে গায়ের জ্বালায় একটু বলিতে হইতেছে।

নইলে এমন উন্মত্ত পাগল কে কোথায় আছে বা দেখিয়াছেন যে, জিনিষের বৈশিষ্ট্য বাদ দিয়া জিনিষের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারে? অম্লের অম্লত্ব বাদ দিলে কি অম্ল জিনিষের অস্তিত্ব থাকে? গুড়ের মিষ্টত্ব বাদ দিলে কি তাহা গুড় থাকে? তিক্ত পদার্থের তিক্ত রস বাদ দিলে কি আর তাহা তিক্ত পদার্থ থাকে? কখনই নহে। তাহা থাকা অসম্ভব। জিনিষের যাহা বৈশিষ্ট্য তাই বাদ দিলে জিনিষের অস্তিত্ব কখনই থাকিতে পারে না। বৈশিষ্ট্যই হইল মূল উপাদান গুণ। মূল গেলে আর কি থাকে? কিছুই নহে। ইহা অতি বড় সত্য কথা।

তেমনি হিন্দু ধর্ম্মের ও বৈশিষ্ট্য হইল বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। সেই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বাদ দিলে হিন্দু ধর্ম্মের অস্তিত্ব কেমন করিয়া থাকে? এবং হিন্দু জাতির অস্থিত্বই বা কেমন করিয়া থাকিতে পারে? অসম্ভব, কিছুতেই তাহা থাকিতে পারে না। ইহা অতি বড় ফল কথা। ইহা বুঝাইবার জন্য অধিক প্রয়াস নিষ্প্রয়োজন। যাঁহাদের মাথায় ইহা প্রবেশ করে না তাঁহারাই আবার বুদ্ধিমান বলিয়া পরিচয় দেন। তাঁহাদের বুদ্ধিতেও শতবার ধন্যবাদ!

স্বতরাং ঐরূপ কার্য্যের যাঁহারা চেষ্টা করেন, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিতে বিধিমতে সচেষ্ট, তাঁহারাই প্রকৃত ধর্ম্মদ্রোহী, জাতিদ্রোহী এবং কাজে কাজেই স্বদেশ দ্রোহী। স্বতরাং ইহারা দেশের নিকট কতখানি অপরাধী তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। দেশে আজ হিন্দু রাজা থাকিলে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইত। সমাজশক্তি ও তেমন প্রবল থাকিলে কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইত।

দুঃখের বিষয় সে সব কিছুই নাই। আজ অবাধ বাণিজ্যের কাল। কাজে কাজেই বেওয়ারিশ মালের ন্যায় যাহার যাহা খুসী তাহাই বলিয়া যাইতেছেন ও তাহাই শোভা পাইতেছে।

তবে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে ইহা একেবারেই বে-ওয়ারিস মাল নহে। হিন্দু এখন ও মরে নাই, মরিতে পারে না যে হেতু হিন্দু ধর্ম্মই প্রকৃত মানব ধর্ম্ম ও পরিপূর্ণ মানব ধর্ম্ম। কখন ও অপ্রকৃত ও অপূর্ণ মানবধর্ম্মে মিশিতে পারে না বরং ইহারই সুবিশাল কুক্ষিতে সকলেই বিলয় প্রাপ্ত হইতে পারে, তথাপি অপরের ক্ষুদ্র কুক্ষিতে ইহার সামাই খাওয়া কঠিন।

এরূপ ক্ষেত্রে ঐরূপ চেষ্টাকে বিপরীত বা অস্বাভাবিক চেষ্টা বলে। অস্বাভাবিক চেষ্টা অস্বাস্থ্যকর। সুতরাং তাহা মঙ্গলজনক নহে। প্রত্যুত অতীব অমঙ্গল জনক। উহাকে উন্নতি বলে না; প্রকৃত অবনতি বলে। তুমি উহার প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ে ধারণা করিতে পারিতেছ না বলিয়াই তোমার এই অস্বাভাবিক চেষ্টা। কোন বিষয়ের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ে ধারণা করিতে না পারিলেই তাহা মন্দ হইবে এমন কোন কথা নাই। উহাকে প্রলাপোক্তি বলে। আজ তুমি দেশের যে আদি কবির মুখ নিঃসৃত বাণী—"এতদ্দেশ প্রসূতস্য ইত্যাদি শ্লোক দেখিয়া তোমার প্রাণে আনন্দের উদয় হইয়াছে ও হৃদয়ে মস্ত বল পাইয়া কার্য্যকরী শক্তি সঞ্চয়ের জন্য ভীষণ চেষ্টা করিতেছ, সেই দেশেরই প্রকৃত যুগাবতার পূর্ণ ব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান শ্রীমুখে যে বাণী প্রকাশ করিয়াছেন—"চাতুর্ব্বর্ণাং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ ইত্যাদি শ্লোকের মস্তকে পদাঘাত করিয়া সর্ব্বনাশ ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছ কেন। বলিবে উহার অর্থ ঐরূপ নহে। এইরূপ হইবে। তাহা ত বটেই। তাহা না বলিবে কেন! তাহা না বলিলে কার্য্যোদ্ধার হইবে কিরূপে। আজ ভগবান শঙ্করের অবতার স্বরূপ শঙ্করাচার্য্যের টীকা, ভক্ত প্রবর শ্রীধর স্বামীর টীকা সব মিথ্যা। শ্রীধর সম্বন্ধে স্বয়ং গৌরাঙ্গদেব—যাঁহার দোহাই দিয়া তুমি নেড়া-নেড়ীর দল সৃজনের চেষ্টা করিতেছ—স্বয়ং তিনিই সার্টিফিকেট দিয়াছেন তাহা জান কি? তিনি বলিয়াছেন "যে স্বামী মানে না সে কুলটা। অর্থাৎ যে শ্রীধর স্বামীর টীকা মানে না, তাহার অর্থ অর্থই নহে।' আর কি শুনিতে চাও? যে শ্রীধর সম্বন্ধে দেবাদিদেব মহাদেব পর্য্যন্ত বলিয়াছেন—"অহং বেত্তি, শুকো বেত্তি, ব্যাসো বেত্তি নবেত্তি বা। শ্রীধরঃ সকলং বেত্তি নৃসিংহস্য প্রসাদতঃ॥ আরও কি শুনিতে চাও আর শুনা উচিত নহে।

সুতরাং ঐ সব ব্যাখ্যাই ঠিক ব্যাখ্যা। শুধু ঠিক নহে; ঠিকের উপর ঠিক। উহার নিকট তোমার মথি গোসাইর তথা কথিত ব্যাখ্যা ঠিক নহে। ঠিকত নহেই,—অতীব অ-ঠিক বা অপব্যাখ্যা। ইহা এক বারে মুক্ত কণ্ঠে বলা যাইতে পারে।

এ সব কথা বলা ও বৃথা। কারণ যিনি জ্ঞান-পিপাসু হন, তাঁহার নিকট জ্ঞানের কথা বলা চলে। অন্যথা অরণ্যে রোদন। উঁহারা জ্ঞানপিপাসু নহেন, স্বার্থপিপাসু, কাজেই একটু জবরদস্তি পিপাসু। সুতরাং উঁহাদের নিকট জ্ঞানের কথা বলা "বেণা-বনে মুক্তা ছড়ান।" তবুও একটু বলিতে হয় যদিই হটাৎ সুমতিটা আসিয়া পড়ে। কিন্তু ভবি ভুলিবার নহে। তথাপি কর্ত্তব্য পালন অবশ্য কর্ত্তব্য।

তাই বলি যাঁহারা ভারতবর্ষকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন ছাঁচে ঢালিবার চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদের এ চেষ্টা সম্পূর্ণ বাতুলতা। ইহাতে শিব গড়িতে বানর গঠিত হইবে। যে হেতু ভারতের উহা ছাঁচ নহে। ভারতের ছাঁচ ভারতেই বর্ত্তমান, অন্যত্র নাই। ইংলণ্ডের ছাঁচ, সমগ্র ইউরোপের ছাঁচ, আমেরিকার ছাঁচ, আফ্রিকার ছাঁচ, প্রভৃতি অপর দেশের ছাঁচ কদাপি ভারতের ছাঁচ নহে। ভারতের ছাঁচ ভারত নিজে। ভারতের

সেই ছাঁচে ভারতকে গড়িলেই প্রকৃত ভারত গঠিত হইবে এবং তাহা হইলেই প্রকৃত উন্নতি হইবে। অন্যথা বানরের অধম হইয়া অধোগতির চরম দশা প্রাপ্ত হইবে।

কেমন করিয়া তাহা হইবে তাহা বুঝাইয়া বলা প্রয়োজন। কিন্তু তাহা বুঝাইবার এ স্থান নহে। কেন না সে এক মহাভারত,—অনেক কথা। "ভারতের বৈশিষ্ট্য" শীর্ষক স্বতন্ত্র প্রবন্ধে তাহা লিখিবার ইচ্ছা রহিল। যদি সুস্থ থাকি ও ভগবান অবকাশ দেন তাহা হইবে। নইলে এই পর্য্যন্তই শেষ।

সুতরাং মহাত্মাগণের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ তাঁহারা যেন যাহা তাহা ভারতে খাটাইবার চেষ্টা না করেন।—ঠিক উল্টা ফল ফলিবে। অন্য দেশে যাহা খাটিবে ভারতে তাহা খাটিবে না। অন্য দেশ ভারতের আদর্শ নহে। ভারতের আদর্শ ভারতবর্ষ, এবং ভারতই ভারতের তুলনা। ইহা গায়ের জোরের কথা নহে, ইহা ভগবানের অপূর্ব্ব সৃষ্টি তত্ত্বের কথা।

তোমাদের চক্ষে ভারত অতি মলিন ও শ্রীহীন বলিয়া বোধ হইতেছে এবং অন্য দেশ অতি উজ্জ্বল দেখাইতেছে। তাহা ঠিক। বাহ্য দৃষ্টিতে কতকটা ঐরূপই দেখায় বটে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঠিক তাহা নহে। কিছু কিছু কোন কোন বিষয়ে হইলেও সম্পূর্ণই তাহা নহে। উহা তোমার দৃষ্টি শক্তির অভাবের ফল। বিদেশীগণ কুশিক্ষা রূপ জলের প্রক্ষেপ দ্বারা তোমার চক্ষের অঞ্জন ধুইয়া দিয়াছেন, তাই ঐরূপ দেখিতেছ। নতুবা প্রকৃতই বিষয়টী ঠিক ঐরূপ নহে। তুমি যদি আবার সুশিক্ষা পাইয়া প্রকৃতিস্থ হইতে পার তাহা হইলে ইহাই আবার ঠিক বিপরীত দেখিবে। আপনাকেই উচ্চ দেখিবে, এবং বিদেশীকেই মলিন দেখিবে। লোকে কথায় বলে "ভাঙ্গা বড় নৌকার তলি ও ক্ষুদ্র আস্ত নৌকা অপেক্ষা মূল্যবান" এবং "মরা হাতির ও মূল্য লক্ষ টাকা।' এ সব কথা অতি বড় সত্য কথা এবং কাজে কাজেই অতিশয় মূল্যবান্ কথা। ইহা একটু বিশেষ ভাবে তলাইয়া চিন্তা করিও এবং তৎপর কার্য্য করিও।

যাক্ ঐ কথায় আর প্রয়োজন নাই। এক্ষণে মোটের উপর তোমাদিগকে দুটী চারীটী অতীব হিতকর নীতিবাক্য যাহা স্বতঃ সিদ্ধ রূপে সত্য,—তাহাই বলিয়া ইহার উপসংহার করিব।

প্রথম—ভারতকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া অন্য দেশের অনুকরণে একটা নূতন কিছু গড়িবার চেষ্টা করিও না। উহাতে সুফল ফলিবে না কুফল ফলিবে। একটী আস্ত বানর সৃষ্টি হইবে। ভারতকে যিনি সৃজন করিয়াছেন তিনিই তাহার গঠন প্রণালী ও নির্দ্ধারিত করিয়া তাহা স্বমুখে ও ঋষি মুখে প্রকাশ করিয়াছেন। সেইভাবেই ইহাকে গড়িতে হইবে। গঠিত ত আছেই, একটু শিথিলাঙ্গ হইয়াছে মাত্র। পুনরায় তাহাকে সেইভাবে গঠন করিতে পারিলেই উন্নতি লাভ করিতে পারিবে। অন্যথায় সুদারুণ অধোগতি জানিবে।

দ্বিতীয়—কোন জিনিষের বৈশিষ্ট্য বাদ দিয়া তাহার অস্তিত্ব বজায় রাখিবার ব্যর্থ

চেষ্টা করিও না। কারণ উহা অসম্ভব ও বাতুলের কার্য্য তাহা পূর্ব্বেই বিস্তারিত বলা হইয়াছে।

তৃতীয়—বৃক্ষের মূল বা গোড়া বাদ দিয়া আগায় উঠা যায় না। অতএব বৃক্ষকে সমূলে উৎপাটন পূর্ব্বক বিপরীত ভাবে বপন করতঃ আগায় উঠিবার সাধ মিটাইবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। উহাতে বৃক্ষই আদৌ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে, সাধ মিটাত বহুদূরের কথা। তেমনি তোমরা ব্রহ্মজ্ঞানের কয়েকটী বুলি আওড়াইয়া যে এক নূতন ধর্ম্ম সৃজনের চেষ্টা করিতেছ, উহা ও ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ন্যায় আকাশ কুসুমে পরিণত হইবে। সাধের নেড়া নেড়ী সৃজনত হইয়া গিয়াছে, এবং তাহা তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোক দ্বারা উৎকৃষ্ট ভাবেই হইয়াছে, কিন্তু তাহা ও ত অধিক বিস্তার লাভ করে নাই। কেন করিবে? মূল অপেক্ষা শাখায় প্রশাখায় আর কতই পুষ্টি বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকিতে পারে? সম্ভাবনার অতিরিক্ত অসম্ভব।

তবে তোমরা এবার এ যুগের প্রধানব্যক্তি বিবেকানন্দের সিদ্ধ মন্ত্র দ্বারা অভিষিক্ত বা অভিমন্ত্রিত করিয়া এক অপূর্ব্ব নারায়ণী সেনা (?) প্রস্তুত করিবে ইহাই একটু নূতন তত্ত্ব বটে! কিন্তু স্মরণ রাখিও বিবেকানন্দ গৌরাঙ্গদেবের পদ ধুলির ও সমকক্ষ নহে।

এইখানে একটী কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন। তোমরা হিন্দু ধর্ম্মটাকে লইয়া যে এত "টানা হ্যাছ্ড়া" কর এবং কাট ছাঁট দিয়া নূতন করিয়া এক তথা কথিত উদার, সভ্য ও সুখ কর ধর্ম্ম সৃজনের চেষ্টা কর—ইহার মূলীভূত কারণ হইতেছে তোমাদের অতিমাত্রায় বিষম উৎকট ভ্রম। তোমরা হিন্দু ধর্ম্মের মর্ম্ম সম্যক অবগত হইতে পার না বলিয়া ঐরূপ কর। ইহার অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক সুদৃঢ় ও সক্ত গঠন প্রণালী তোমরা বুঝনা বলিয়া ঐরূপ কর। মূল লক্ষ্য স্থান ভেদ করিতে হইলে ইহার যে অব্যর্থ বাণ তাহা জান না বলিয়া ঐরূপ কর। বিশ্বরাজ ভগবানের রাজবাড়ীতে বা তাঁহার নিকটে যাইতে হইলে ইহাই যে সরল, সহজ ও সত্য গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের ন্যায় সুবিস্তৃত পথ তাহা তোমরা অবগত না বলিয়া ঐরূপ কর! ইহা আমরা যেমন বুঝিতেছি কিন্তু তোমরা তাহা কিছুই বুঝ না।

তোমরা বুঝ না বলিয়াই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের নামে শিহরিয়া উঠিতেছ, বুঝ না বলিয়াই জাতিভেদের কথায় লজ্জায় ম্রিয়মান হইতেছ; বুঝ না বলিয়াই পুতুল পূজায় নাসিকা কুঞ্চিত করিতেছ; বুঝ না বলিয়াই অন্যান্য অনেক শাস্ত্রীয় বিবিধি নিষেধ মানিলে তোমরা তথা-কথিত সভ্য সমাজে মুখ দেখাইতে পারিতেছ না, সঙ্কোচ বোধ করিতেছ, সমস্তই তোমাদের অজ্ঞতার ফল।

তোমাদের এ বিষয়ে কোনই জ্ঞান নাই তাই ঐরূপ কর অর্থাৎ ঐ সমস্ত নিয়ম তোমাদের হিসাবে কুৎসিৎ বলিয়া উঠাইয়া দিতে চাহিতেছ, এবং ঐ সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একটা নূতন কিছু গড়িতে চাহিতেছ। পক্ষান্তরে আমাদের এ বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান আছে বলিয়া আমরা উহা আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে চাহিতেছি। তোমরা কি মনে ভাব তোমাদের

বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে, জ্ঞান আছে, আর কাহারও নাই ? অর্থাৎ আমাদের ঐ বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান নাই ? উহা তোমাদের সম্পূর্ণ ভুল। তোমাদের যে বিদ্যা, যে বুদ্ধি' যে জ্ঞান ও যে মস্তিষ্ক আছে। আমাদেরও সে বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, মস্তিষ্ক আছে। বরং কিছু কিছু বেশিই আছে বলিতে পারি। অধিকন্তু তপঃশুদ্ধ বুদ্ধি ও কিছু আছে, আধ্যাত্মিকতা ও কিছু আছে, এবং অনুকুল শিক্ষা ও আছে। তোমাদের তাহা—অর্থাৎ তপঃ শুদ্ধ বুদ্ধি, অধ্যাত্মিকতা ও অনুকুল শিক্ষা ইত্যাদি নাই, অধিকন্তু ঘোর প্রতিকূল বা বিরুদ্ধ শিক্ষা আছে। সেই জন্যই তোমরা বিপরীত বুদ্ধিসম্পন্ন এবং তাই তোমরা এ সব বুঝ না, এমন কি বুঝিবার শক্তি পর্য্যন্ত হারাইয়াছ। তোমাদের এতদূর অবনতি হইয়াছে।

নইলে আমরা কি বুঝি না ব্রহ্মময় জগৎ ? সুতরাং আবার জাতিভেদ কেন ? আমরা কি বুঝি না একমেবাদ্বিতীয়ং ; ব্রহ্ম ? সুতরাং আবার পুতুল পূজা কেন ? আমরা তাহা বুঝি। তোমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক বুঝি। তুমি শুধু তোমার কথাই বুঝ, আমার কথা বুঝ না, কিন্তু আমি তোমার কথা ও বুঝি আমার কথাও বুঝি। সুতরাং অনেক বেশী বুঝি। তোমরা মাত্র মানুষ মাত্রে প্রেম বুঝ, এবং উহাই তোমাদের স্বভাব মহান্ ভাব। কিন্তু আমরা তাহার ও উপরে বুঝি, আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তে প্রেম বুঝি, আমাদের ভাব এতই মহান।

একটী গল্প বলি। একদা কেশব সেন রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট বসিয়া আছেন এমন সময় পরমহংস দেব উঃ উঃ করিয়া বেদনার যাতনায় অস্থির হইলেন। তাহাতে কেশব সেন অবাক্ হইয়া বলিলেন— আপনার কি হইয়াছে ? পরমহংস দেব বলিলেন "দেখ না ঐ লোকটী একটী বৃক্ষের শাখা কাটিয়া ফেলিল, উহাতে আমার মনে হইল যেন আমার ব্রহ্মময়ী মায়ের হাতখানা কাটলে। তাই বড়ই ব্যথা পাইলাম, তাইতে ঐরূপ করিলাম" ইত্যাদি।" তাহাতে কেশব সেন বলিলেন—"আপনার মা কি এত বড় ? পরমহংস দেব উত্তর করিলেন—"আমার মা যে কত বড় তাহার ঠিকানাই নাই ! সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আমার মায়ের মূর্ত্তি ইত্যাদি, সেই হইতে কেশব সেনের পুতুলে ভ্রম ঘুচিয়া গেল ও পরে নিজে নির্জ্জনে কালী দুর্গা হরি কৃষ্ণ প্রভৃতি বলিতেন তাহাতে আবার দলের লোক চটিল।

সুতরাং আমাদের মহান ভাব তোমাদের ধারণার অতীত বিষয় কিন্তু আমাদের ভাব যে কত মহান, আমরা যে নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্ম বুঝি, আমরা যে "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং স্মরণং ব্রজ" কথাটী বুঝি, সব মিথ্যা, ব্রহ্মই সত্য ইহাও বুঝি, আবার তোমাদের ঐ বক্তৃতার ক্ষুদ্র বিষয় গুলির মর্ম্ম ও খুব বুঝি। উহা যে অতি আবশ্যকীয় তাহা ও বুঝি। ঐ ক্ষুদ্রকে আশ্রয় না করিলে যে বৃহতে যাওয়াযায় না তাহা ও আমরা বেশ বুঝি ; এবং বুঝি বলিয়াই অত আদর করিয়া উহা রাখিতে চাই।

কেন চাই ? এই "কেন" র মর্ম্ম তোমরা বুঝ না। তোমরা বুঝ না, বুঝিবার

প্রবৃত্তি ও নাই, শক্তি ও নাই ইহাই তোমাদের ক্রটি বা দোষ। "কেন"র মর্ম্ম এক কথায়, শাস্ত্রে আছে—চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ। সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা॥ এক কথায় উহাই কেন"র মর্ম্ম, ব্যাখ্যা এক মহাভারত। তাহার স্থান নহে।

উহা কি অন্যায় কারণ? অন্যায় ত নহেই, প্রত্যুত অতীব ন্যায় সঙ্গত কারণ। পাঠশালার ছাত্রকে পাঠশালা দিয়াই ক্রমশঃ উপরে উঠিতে হয়। নইলে পাঠশালার ছাত্র এম্, এ, ক্লাশে ভর্ত্তি হইবার চেষ্টা করা বাতুলতা। কিন্তু তাহা যে বাতুলতা তাহা ও তোমরা বুঝ না ও বুঝিবার শক্তি নাই। তোমরা এতই অধঃপতিত।

একটী বৃক্ষের ক্ষুদ্র চারা রোপন করিলেই তাহা বেড়া দিয়া ঘিরিয়া রাখা কর্ত্তব্য, নইলে ছাগল গরুতে খায়। কিন্তু চারা বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হইলে আর বেড়ার প্রয়োজন হয় না—ইহা আমরা বুঝি; বৃক্ষের ত্বক শুষ্ক হইলে আপনিই খসিয়া পড়ে, কিন্তু কাঁচায় তুলিতে গেলে উহা উঠে না, বলপূর্ব্বক উঠাইলেও বৃক্ষ মরিয়া যায়, ইহা আমরা বুঝি; বৃক্ষের অগ্রভাগে উঠিতে হইলে আগে গোড়ায় উঠিতে হয়, তারপর ক্রমে আগায়, তাহা ও আমরা বুঝি; কিন্তু তোমরা এসব কিছুই বুঝ না।

জাতিভেদ, পুতুল-পূজা বৃক্ষের গোড়ায় উঠা—তাই উহা অতি দরকারী অতি উপাদেয়। তাহা আমরা বুঝি, তোমরা কিছুই বুঝ না। জাতিভেদ, স্পৃশ্যাস্পৃশ্য, আচার বিচার—ইত্যাদি আত্মরক্ষার সুদৃঢ় বর্ম্ম বিশেষ, এবং পুতুল-পূজা ও বৃক্ষের গোড়ায় উঠা—ইত্যাদি আত্মোন্নতি লাভের অতি উৎকৃষ্ট ও সুগম উপায়। আধ্যাত্ম্য রাজ্যে আমরা সকলেই ভয়ঙ্কর রোগী বিশেষ। সুতরাং উহাই উৎকৃষ্ট ঔষধ ও পথ্য। আমরা তাহা বিশেষরূপে বুঝি বলিয়া অতি যত্নের সহিত উহা রক্ষা করিতে চাচ্ছি। তোমরা বুঝনা বলিয়া উহা কুসংস্কার বলিয়া মনে কর এবং কাজে কাজেই সর্ব্বপ্রযত্নে উহা তুলিয়া দিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর।

তোমরা বুঝ না আমরা বুঝি—ইহার অর্থ উহা বুঝিতে যে জিনিষের প্রয়োজন তাহা তোমাদের আদৌ নাই, আমাদেরও প্রায় তথৈবচ তথাপি যৎকিঞ্চিৎ আছে। উহা বুঝিতে তপঃশুদ্ধ বুদ্ধি ও আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজন। তোমাদের তাহা মোটেও নাই আমাদের ও প্রায় সেইরূপ তথাপিও কিঞ্চিৎ আছে একেবারে শূন্য নহি। তাই তোমরা কিছুই বুঝ না, আমরা কিছু বুঝি। তোমাদের যে তাহা নাই; তাহা "শুধু নাই" নহে, অধিকন্তু বিপরীত জিনিষ আছে। তাই তোমাদের বুদ্ধি সম্পূর্ণ বিপরীত। যেন একেবারে আকাশ পাতাল—প্রভেদ। তাইতেই তোমরা কোন উন্নতিশীল পার্ব্বতীয় জঙ্গলি জাতির অনুকরণে আমাদিগকে গড়িতে যাইতেছ। মনে রাখিও পার্ব্বতীয় জঙ্গলি জাতিরা মাত্র উন্নতির সাধক, কিন্তু অত্যুন্নত হিন্দুর পক্ষে, বহুকালের সুসভ্য হিন্দুর পক্ষে উহা ঘোর অবনতির সাধক। একটী এম, এ, পাশ ছাত্রকে না বুঝিয়া পুনঃ "আঁজি ক, খ"র ক্লাশে ভর্ত্তি করিয়া দিবার ন্যায় ঐ চেষ্টা। এম, এ, পাশকে এম, এ, পাশ বলিয়া তোমার জ্ঞান নাই, তুমি নিরক্ষর ভাবিতেছ, তাই তাহাকে লিখা পড়া শিখাইবার নিমিত্ত "আঁজি ক, খ"র

ক্লাশে ভর্ত্তি করিতে চাহিতেছে। তোমার চেষ্টা সাধু হইলে ও ঐ এম, এ, পাশের পক্ষে ঐ চেষ্টা ঘোর অবনতির সূচক।

এ সম্বন্ধে বলিবার অনেক কথাই আছে কিন্তু সে সমস্ত বলিবার এস্থান নহে। তাই ঈঙ্গিত মাত্র সংক্ষেপে করিয়া যাইলাম।

(ক্রমশঃ)

কর্ম্মীর-কর্ম্মফল।

বৈধ অবৈধ কর্ম্মের ফল অনেক স্থলেই পরলোক মাত্র ভোগ্য। তবে :—

অত্যুৎকটৈঃ পাপপুণ্যৈ
রিহৈব ফলমশ্নুতে।"

অতি উৎকট পাপপুণ্যের ফলভোগ ইহকালেও হইয়া থাকে। আমাদের আত্মদৃষ্টি থাকিলে ইহার দৃষ্টান্ত খুজিতে হয় না, ইহাতে সংশয়ও উপস্থিত হয় না।

আমরা স্বয়ং ইহার উজ্জল দৃষ্টান্ত ও সত্যতার প্রমাণ।

এ কলিযুগ। ম্লেচ্ছের শাসন, ম্লেচ্ছের শিক্ষা, ম্লেচ্ছের সংসর্গ। এযুগে উৎকট পুণ্যফলের দৃষ্টান্ত বিল আমরা স্বয়ং দৃষ্টান্ত উৎকট পাপফলের॥

মানবের যাহা থাকা উচিত্ত তাহার কিছুই আমাদের নাই। মানবের কি থাকা উচিত সে জ্ঞানও আমাদের নাই। আমাদের ধন নাই, ঐশ্বর্য্য নাই, প্রভাব নাই, প্রতিপত্তি নাই। এসকল আমরা চাই। যাহারা পাপপুণ্যের ধার ধারে না, বিধি নিষেধের মর্ম্ম বুঝে না, বুঝা সম্ভবও নহে, তাহারাও এ সকল চায়। এ সকল পাপের ফলে পাওয়া যায়, পুণ্যের ফলেও পাওয়া যায়, পাপপুণ্যের অনধিকারী-মানবের প্রার্থিব কর্ম্মফলেও পাওয়া যায়। এ সকল না পাওয়ার দিকেও ঐ কথা খাটে, অর্থাৎ এ সকল না পাওয়াও পাপের ফল, পুণ্যের ফল, ও প্রার্থিব কর্ম্মের ফল হইতে পারে। সুতরাং এ সকলের ভাব অভাব বা প্রাপ্তি প্রাপ্তির দ্বারা পাপপুণ্যের ফল নির্ণয় হয় না; পাপপুণ্যের ফল নির্ণয় হয় শান্তি অশান্তি, সুখ দুঃখ, আনন্দ নিরানন্দ দ্বারা।

আমাদের দেশে শান্তি নাই, অন্তরে সুখ নাই, সমাজে পরিবারে আনন্দ নাই, চারিদিকে হাহাকার, ও অশান্তি, অন্তরে দুঃখের দাব দাহ। ইহা উৎকট পাপের ফল।

যাহারা বৈধ অবৈধ কর্ম্ম মানেনা, পাপপুণ্যের ফল বুঝে না তাহারা বলে—আমাদের ধন নাই, ঐশ্বর্য্য নাই, প্রভাব নাই, প্রতিপত্তি নাই। আমরা লাঞ্ছিত নিপীড়িত তাই আমাদের অশান্তি দুঃখ ও নিরানন্দ। তাহারা বুঝে না—যাহারা শান্তির জন্য, সুখের জন্য কল্পবৃক্ষের মূলে বসিয়া বায়ুভক্ষণে কাল কাটাইত, হীরকের গুহার মধ্যে নগ্ন নিশ্চল

দেহে ধ্যান করিত; তাহাদের চরণরেণুপূত দেশে—তাহাদের সন্তান সন্ততি কি ধন ঐশ্বর্য্য প্রভাব প্রতিপত্তির অভাবে দুঃখ ভোগ করে—না অশান্তির তীব্র তাড়নায় হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়? তাহা নয়, ইহা পাপের ফল—উৎকট পাপের ফল।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—
"বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি"

বুদ্ধিনাশ হইলেই মানুষ বিনষ্ট হয়। বুদ্ধিনাশের অর্থ কি? চণ্ডীতে আছে।

জ্ঞানিনো মনুজাঃ সত্যং
কিন্তু তে নহি কেবলং।
যতো হি জ্ঞানিনঃ সর্ব্বে
পশু পক্ষি মৃগাদয়ঃ॥"

কেবল যে মানুষেরই বুদ্ধি আছে তাহা নহে, পশু পক্ষি মৃগাদিরও বুদ্ধি আছে। তবে আর মানুষের বুদ্ধিনাশের সম্ভাবনা কোথায়? অতএব বুদ্ধিনাশ অর্থে বুঝিতে হইবে—মানুষের বুদ্ধিনাশ। এখন ভাবিতে হয় মানুষের নিজস্ব বুদ্ধি কোনটুকু। শাস্ত্র এমন দর্পণ যে যদি কেহ চক্ষু মুদ্রিত না করে, তাহা হইলে ষোলআনা জগৎটা তাহার সাহায্যে দেখিয়া লইতে পারে; যাহা জগৎ ছাড়া তাহাও দেখিতে পারে স্নুতরাং শাস্ত্র ভাবনার অবকাশ কাহাকেও দেন নাই। বলিয়া দিয়াছেন—

"আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরানাং।
ধর্ম্মোহি তেষামধিকো বিশেষো ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ"

আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনের জ্ঞান, অর্থাৎ বহির্ব্বিষক বুদ্ধি মানুষেও আছে পশুতেও আছে, মানুষের বিশেষ বুদ্ধি ধর্ম্মবুদ্ধি। ইহা মানুষ ছাড়া কাহারও নাই। তাহাই যদি হয়; তাহা হইলে একটা অব্যাভিচারি মানুষের লক্ষণ ও ইহার দ্বারা স্থির হইয়া যায়। মানুষ ছাড়া অন্যত্র যাহা থাকেনা, এবং যাহা না থাকিলে মানুষের সাম্য না থাকিয়া থাকে পশুর সাম্য। তাহা মানুষের লক্ষণ; তবেই বুঝা গেল—বেদপ্রমাণ ধর্ম্ম যাহার নাই সে নরাকার পশু। ভগবদ্বাক্যের তাৎপর্য্য ও তাহাই। ধর্ম্মবুদ্ধি বিনষ্ট হইলেই মানুষ নষ্ট হইয়া যায় অর্থাৎ ইহজন্মে নরাকার পশুতে পরিণত হয়, পরজন্মে প্রকৃত পশ্বাকার ধারণ করে।

এ সকল কথা বুঝিবার মত বা বিশ্বাস করিবার মত লোকেরও ক্রমে অভাব হইতেছে। নতুবা এমন দুর্দ্দশা হিন্দু সমাজের কি হইতে পারে যে, হাজার হাজার হিন্দু সন্তানের মধ্যে দাড়াইয়া সগর্ব্বে বক্তৃতা শুনায়—ধর্ম্মই যত অনর্থের মূল আর ঐ বক্তা পরিচয় দেয় হিন্দুর নেতা বলিয়া ও হিন্দুর জয়ধ্বনি ও করতালি লইয়া প্রফুল্লমুখে—সুস্থদেহে নিজের বিলাস মন্দিরে ফিরিয়া যায়।

ব্রাহ্মণ-সমাজ

উনবিংশ বর্ষ। } ১৮৫১ শক, সন ১৩৩৭ সাল, শ্রাবণ। { একাদশ সংখ্যা।

সন্ধ্যা তাৎপর্য্য।

• (পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

গায়ত্রী উপাসনা, শক্তি উপাসনা।

লেখক শ্রীশরৎকমল ন্যায়স্মৃতিতীর্থ।

—•:•:•—

(১)

ইহার পূর্ব্বসন্দর্ভে সন্ধ্যায় "গায়ত্রী-উপাসনা" যে, "শক্তি উপাসনা" এ বিষয়ে বহু আলোচনা করা হইয়াছে। আপোমার্জ্জন, অঘমর্ষণ, সূর্য্যোপস্থান, গায়ত্রীআহ্বান, গায়ত্রী ধ্যান, অঙ্গন্যাস, গায়ত্রীজপ, ইত্যাদি সাধনাও যে শক্তি-ভাব প্রধান তাহার যুক্তি প্রমাণের কথা আলোচিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে গায়ত্রী আহ্বান, গায়ত্রীধ্যান, গায়ত্রীজপ, এবং গায়ত্রীজপ বিসর্জ্জন এই কার্য্য সমূহে শক্তিভাব অতিশয় প্রকট, অন্য সাধনসমূহে শক্তিভাব গূঢ়ভাবে বিদ্যমান ইহা প্রণিধান করিলেই বুঝা যায়। ফলতঃ বেদসার মাতা গায়ত্রীই সন্ধ্যাতে নানাভাবে উপাসিতা হইয়াছেন ইহা সুধীগণ ভাবনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। সর্ব্বদেবতার মূলশক্তিকেই গায়ত্রী বলা হইয়াছে এ বিষয়ে প্রমাণ এবং অনুভবের কথাও

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি। ঐ সব প্রমাণ পরম্পরা এবং সাধকসম্মত অনুভবকে ভিত্তি করিয়া সাধনা করিলে মাতা গায়ত্রী যে শক্তিরূপা ইহা অবশ্যই বুঝা যাইবে। বেদে মাতা গায়ত্রীকে শক্তিরূপেই বর্ণনা করা হইয়াছে ইহা বহুশঃ আলোচিত হইলেও পুনশ্চ অন্যভাবে ঐ কথা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

(২)

যজুর্ব্বেদীয় মাধ্যন্দিন শাখায় মাতা গায়ত্রীর কথা।

—•:•:•—

সন্ধ্যা প্রোক্ত মন্ত্র সাহায্যে মাতা গায়ত্রী যে শক্তিরূপা ইহা বলিয়াছি। বর্ত্তমানে বেদে গায়ত্রীকে শক্তিরূপেই যে স্তব করা হইয়াছে তাহা বুঝিব। নিম্নে যজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিন শাখা হইতে গায়ত্রীর একটি স্তব উদ্ধৃত হইল। এই স্তব "সাবিত্রীস্তোত্র" নামে প্রসিদ্ধ। "সাবিত্রী" মাতা গায়ত্রীরই মূর্ত্তি বিশেষ ইহা বলা বাহুল্য। যদিও এই স্তব "সাবিত্রী স্তোত্র" নামে প্রসিদ্ধ, তথাপি এই স্তবে গায়ত্রীর সমগ্রতত্ত্বই ব্যাখ্যাত হইয়াছে সন্দেহ নাই। জ্ঞানী ভক্ত এই স্তবে সাধনার সকল রহস্যই দেখিতে পাইবেন। মূল স্তবটি এই—

(১)

"সচ্চিদানন্দরূপে! ত্বম্
মূল প্রকৃতি রূপিণী।
হিরণ্য গর্ভরূপে! ত্বম্
প্রসন্না ভব সুন্দরি!

(২)

তেজঃ স্বরূপে! পরমে!
পরমানন্দ রূপিণি!
দ্বিজাতীনাং জাতিরূপে!
প্রসন্না ভব সুন্দরি!

(৩)

নিত্যে! নিত্য প্রিয়ে। দেবি
নিত্যানন্দ স্বরূপিণি!
সর্ব্বমঙ্গলরূপে চ
প্রসন্না ভব সুন্দরি!

(৪)

সর্ব্ব স্বরূপে ! বিপ্রাণাম্
মন্ত্র সারে ! পরাৎ পরে !
সুখদে ! মোক্ষদে ! দেবি !
প্রসন্না ভব সুন্দরি !

(৫)

বিপ্রপাপেন্ধদাহায়
জ্বলদগ্নিশিখোপমে !
ব্রহ্মতেজঃ প্রদে দেবি !
প্রসন্না ভব সুন্দরি ।

(৬)

কায়েন মনসা বাচা
যৎ পাপং কুরুতে নরঃ ।
তৎ ত্বৎস্মরণমাত্রেণ
ভস্মীভূতং ভবিষ্যতি ॥

(৭)

স্তবরাজ মিমং পুণ্যম্
সন্ধ্যাং কৃত্বা তু যঃ পঠেৎ ।
পাঠে চতুর্ণাং বেদানাং
যৎ ফলং, লভতে চ তৎ ॥”

---

(৩)

উদ্ধৃত স্তবের সম্যক্ আলোচনা ।

উদ্ধৃত স্তবে মাতা গায়ত্রী যে শক্তিরূপেই স্তুত হইয়াছেন ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন। ইহার অনুবাদ ও বাহুল্য মাত্র। এই স্তবে মাতা গায়ত্রীর স্বরূপতত্ত্ব কি ভাবে বলা হইয়াছে তাহাই যথামতি বুঝিতে চেষ্টা করিব। বেদ গায়ত্রীর স্বরূপ ব্যাখ্যায় স্বয়ং বলিয়াছেন।

“সচ্চিদানন্দরূপে ত্বম্”

“মাতর্গায়ত্রি ! তুমি “সৎ” (১) “চিৎ” (২) “আনন্দ” (৩) স্বরূপা”। বেদ বহু স্থানেই পরমেশ্বরকে সৎ চিৎ আনন্দ রূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তাই আমি মাতা গায়ত্রীকে সৎ চিৎ আনন্দরূপে প্রত্যক্ষ করতঃ “সচ্চিদানন্দ রূপে ! ত্বম্”—বলিয়া স্তব করিতেছি।

ইহা আরোপিত গুণের বর্ণনা নহে, ইহা স্ব-রূপেরই বর্ণনা। এই সৎ-স্ব-রূপের বর্ণনা বেদের মন্ত্রভাগে বহু স্থানেই দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে একটি মন্ত্র এই—

"তম' আসীৎ তম'সা গূঢ়হমগ্রে
অপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদম্।
তুচ্ছ্যেনাভ্য পিহিতং যদাসীৎ
তপ'স স্ত'ন্মহিনা জ'ায়তৈকম্।

নিরুক্ত ধৃত মন্ত্র দৈবতকাণ্ড দ্রষ্টব্য।

উদ্ধৃত মন্ত্রে পরমেশ্বরের সৎ স্বরূপের ব্যাখ্যা করা হইতেছে, উহার তাৎপর্য্য এই যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে সমস্তই গাঢ় অন্ধকারে আবৃত ছিল; কিছুরই জ্ঞান ছিল না সকলই অপ্রজ্ঞাত ছিল। ভগবান মনু এই অবস্থারই স্মরণ করিয়াছেন যে—

"আসীদিদং তমোভূত'মপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্'
অপ্রতর্ক্য মিদং সর্ব্বং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥"

মনুসংহিতা সৃষ্টি প্রকরণ—

অভিপ্রায় এই যে সেই সময়ে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে দ্রষ্টা দর্শন দৃশ্য পদার্থ এ সব কিছুই ছিল না। এই সমগ্র জগৎ তখন সৎ মাত্র ভাব পদার্থের উপরেই লীন ছিল। এই সৎ মাত্র ভাব পদার্থ তত্ত্বতঃ পরমেশ্বর। ঋগ্‌বেদ অন্য মন্ত্রেও ইহাকেই "একং সৎ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই সমগ্র জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে এই একমাত্র বস্তু সৎ পরমকারণ পরমেশ্বরে বিলীন ছিল এই তত্ত্বই বেদমন্ত্র এই ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন—"ইদং সর্ব্বং সলিলম্ আসীৎ।"*

---

* "তমঃ আসীৎ"—অন্ধেনৈব তমসা "গূঢ়্‌হম্" নিগূঢ়ম্ অবিশিষ্টম্ "অপ্রকেতম্" অপ্রজ্ঞাতম্, "অগ্রে" প্রাক্ সৃষ্টে রিত্যর্থঃ। তদাহি ন দ্রষ্টা ন দর্শনং নাপিদৃশ্যোঽর্থ আসীদিত্যভিপ্রায়ঃ......"সলিলং"—সদ্ভাবে লীন্ সর্ব্বমিদং জগৎ সন্মাত্রস্যৈব ভাবস্য উপরি লীনমাসীৎ।"

পূর্ব্ব উদ্ধৃত মন্ত্রের নিরুক্ত ভাষ্য। নিরুক্ত দৈবকাণ্ড, "কস্যচিদ্ ভাবস্যাচিখ্যাসা" এই যাস্কপঙ্‌ক্তির ব্যাখ্যা প্রকরণ দ্রষ্টব্য॥

১। "সন্মাত্রাবগতিনিষ্টৈব ষষ্ঠপ্রপাঠক পরিসমাপ্তির্দৃশ্যতে"।

বেদান্ত দর্শন।১।১।৮ সূত্রের শাঙ্কর ভাষ্য।

উদ্ধৃত মন্ত্র, এবং তাহার নিরুক্ত ভাষ্য, সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠপ্রপাঠক ও তাহার শাঙ্কর ভাষ্য, প্রণিধান পূর্ব্বক পাঠ করিলে পরমেশ্বরের সৎস্বরূপের যথার্থ মর্ম্ম বুঝা যাইবে। শাস্ত্রে বহুস্থানে জগৎকে "সন্মূল" "সৎপ্রতিষ্ঠ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।" যথা প্রদীপ্তাৎপাবকাদ্ বিস্ফুলিঙ্গাঃ......তথাক্ষরাদ্ বিবিধাঃ সৌম্য! ভাবাঃ প্রজায়ন্তে যত্রচৈবাপি যন্তি।"...এই সব উপনিষদ বাক্যেও জগতের সন্মূলত্ব এবং সৎপ্রতিষ্ঠত্বের ব্যাখ্যায় পর্য্যবসিত কিনা তাহা প্রণিধান যোগ্য।

সেইরূপ ছান্দোগ্য উপনিষদে ও বলা হইতেছে যে সেই সৎ স্বরূপ দেবতা সৃষ্টির জন্য ঈক্ষণ করিলেন—"সেয়ং দেবতা ঐক্ষত", তাঁহার সেই ঈক্ষণের বর্ণনা এইরূপ—"আমিই (মদ্ স্বরূপ দেবতা) জীবাত্মা রূপে অনু প্রবেশ করিয়া নাম রূপ সৃষ্টি করিব—"অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" ।১

পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রভাগ এবং এই উপনিষদ্ ভাগ যে ফলতঃ একই সিদ্ধান্ত বলিতেছেন ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি অদ্বৈত বাদি বৈদান্তিকগণ "এক পরব্রহ্ম ভিন্ন আর কাহারও বাস্তব সত্তা নাই জন্য তিনিই বস্তু সৎ পদার্থ" ইহাই বলেন। পূর্ব্ব উদ্ধৃত ঋক্ এবং তাহার নিরুক্তভাষ্যেও সেই ঈঙ্গিত পাওয়া যায় সুধীগণ তাহা বিচার করিবেন। এখানে মূল কথা এই যে যজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিন শাখায় কথিত পূর্ব্বোক্ত স্তবে এই সৎ স্বরূপ পরব্রহ্ম পদার্থকেই গায়ত্রী বলা হইয়াছে ইহাই তত্ত্বতঃ প্রণিধান করা আবশ্যক। ব্যাস প্রভৃতি

---

* "তুচ্ছেন"—তুচ্ছ্যেন সূক্ষ্মীভূতেন পটমণ্ডপস্থানীয়েন কর্ম্মণা। যৎ অপিহিত মেব জগৎ আসীৎ সর্গ কালাপেক্ষি তদিদ মনাদিমাৎ সংসারস্য, "তপসঃ" তস্যৈব কর্ম্মণঃ, "মহিনা"—মহিম্না মাহাভাগ্যেন কারণাবস্থায়া "মেক" মপি সৎ অনেকধা উপস্থিতে সর্গকালে প্রতিনিয়ত কর্ম্মোপভোগার্থ মজায়ত ইতি ।।

নিরুক্ত উদ্ধৃত পূর্ব্বোক্ত ঋগ্ মন্ত্রের দুর্গাচার্য্য কৃত ভাষ্যব্যাখ্যা।

উদ্ধৃত মন্ত্রভাষ্যের তাৎপর্য্য এই যে—"পরব্রহ্মই এক মাত্র সদ্ বস্তু, তিনিই জগৎ কারণ, আবার এই দৃশ্যমান বিচিত্র বিশ্বও তিনিই; এই দৃশ্যজগৎ তাঁহার কার্য্য অবস্থা। পরব্রহ্ম যখন সদ্রূপে অবস্থিত, তখন এই নিখিল জগৎ অপ্রকট অবস্থায় তাঁহাতেই লীন। পরে অনাদি জীবপ্রবাহের বিচিত্র নানা অদৃষ্ট বশতঃ সেই সৎ এবং কারণস্বরূপ ব্রহ্ম পদার্থই এই দৃশ্যমান বিচিত্র নানা জগৎ আকারে প্রকট হইয়াছেন, এই জগৎ আকার অবস্থাই তাঁহার কার্য্য অবস্থা; সদ্বস্তু ভাব তাঁহার কারণ অবস্থা। অসংখ্য জীবকুলের বিচিত্র কর্ম্মফল উপভোগের জন্যই এই সদ্ বস্তু কারণ ও একরূপ হইলেও, সৃষ্টি সময়ে কার্য্য ও বহুরূপে প্রতিভাত হয়েন, নতুবা অনাদি সৃষ্টির জীবসমূহের এই প্রতিনিয়ত কর্ম্মফল ভোগ হইতেই পারে না। এখন মূল আলোচ্য এই যে, সাধক গায়ত্রীকে "সচ্চিদানন্দরূপে"—বলিয়া আহ্বান পূর্ব্বক তাহার সৎ অংশের দ্বারা ইহাই বলিতেছেন যে—"মাতঃ! সাবিত্রি! গায়ত্রি! তুমিই এই সৎ স্বরূপ ব্রহ্মবস্তু, সুতরাং তুমিই নিখিল জগৎকারণ ও একরূপা হইয়া মূলতঃ বিদ্যমানা, আবার তুমি জগৎকারণরূপা বস্তুতঃ পরব্রহ্মরূপিণী হইলেও, এই নিখিল জীবকুলের বিচিত্র কর্ম্মফল দানের জন্য বিবিধ কার্য্য জগৎ আকারে প্রকটিতা, তাই আমি জপ কালে ভাবনা করিতেছি যে, এই ভূরাদি সমগ্র বিশ্বজগৎ তোমা হইতে অভিন্ন ভর্গঃ অর্থাৎ জ্যোতিঃ পদার্থ।"

১। "সেয়ং দেবতা ঐক্ষত...অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি"।
ছান্দোগ্য উপনিষৎ।৬।৩।২।

মহর্ষিগণও "ন ভিন্নাং প্রতিপদ্যেত গায়ত্রীং ব্রহ্মণা সহ"—ইত্যাদি বাক্যদ্বারা ব্রহ্ম এবং গায়ত্রী একই পদার্থ বলিয়াছেন; পরন্তু মাতা গায়ত্রীর আহ্বান মন্ত্রেও "ব্রহ্ম-যোনি"—বলিয়া স্পষ্টতঃ আহ্বান থাকায় জগৎকারণ ব্রহ্মবস্তুই যে মাতা গায়ত্রী ইহাতে সংশয় থাকে না। সেই পরব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণ—সদরূপে উক্ত স্তবে গায়ত্রী মাতাকে ডাকা হইয়াছে ইহাই মূলতত্ত্ব।

পরমেশ্বরের সদ্রূপের শাস্ত্রানুসারে যথামতি আলোচনা করা হইল, এখন চিদ্রূপের স্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি। গায়ত্রীকে "সচ্চিদানন্দরূপে! ত্বম্"—বলিয়া যেমন সদ্রূপা বুঝিয়াছি, তেমনি তিনি চিদ্রূপা এবং আনন্দরূপাও বটে; তাই সাধক বলিতেছেন "মাতঃ! সাবিত্রি! গায়ত্রি! তুমি "চিদ্রূপা"—অর্থাৎ নিখিল জীব চৈতন্য রূপিণী। মা! তুমি জ্ঞানরূপে সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান রহিয়াছ তাই দেবতাগণ তোমাকে "সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে! নমস্তস্যৈ"—বলিয়া চৈতন্যরূপিণী তোমাকে প্রণাম করিয়াছেন, বেদ তোমার এই "চিৎ" অর্থাৎ চৈতন্য স্বভাবের কত ভাবেই বর্ণনা করিতেছেন।

"যন্মনসা ন মনুতে যেনাহু র্মনো মতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি, নেদং যদিদ মুপাসতে॥
যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষুংষি পশ্যন্তি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি, নেদং যদিদ মুপাসতে॥

সেই একা অদ্বিতীয়া সৎস্বরূপা দেবতার ইচ্ছা হইল—"বহু স্যাং প্রজায়েয়"—"এক আমি বহু হইব, প্রজা সৃষ্টি করিব।" সেই দেবতা তাদৃশ ইচ্ছা করতঃ জীবাত্মরূপে নিখিলভূতপ্রবিষ্ট হইয়া নামরূপবিশিষ্ট এই অনন্ত জগৎ আকারে প্রকট হইলেন। যিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে কারণরূপে সৎস্বরূপ এক পদার্থ ছিলেন, তিনিই সৃষ্টিকালে তাদৃশ ইচ্ছাপূর্ব্বক বহু কার্য্য জগদ্রূপে প্রকাশিত হইলেন। বেদের ব্রাহ্মণভাগও বলিতেছেন যে—"আত্মা বা ইদমগ্রআসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ। স ঐক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি! স ইমান্ লোকান্ অসৃজত।" ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।১।১।১ "সৃষ্টির পূর্ব্বে আত্মা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না, আত্মা ইচ্ছা করিলেন "লোক সকল সৃষ্টি করিব", তাদৃশ ইচ্ছা পূর্ব্বক তিনি লোক সকল সৃষ্টি করিলেন—"ইহাই উক্ত ব্রাহ্মণভাগের তাৎপর্য্য। বেদের ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ ভাগে ঈশ্বরের সৎস্বরূপ কেমন, তাহার সার কথা বলা হইল; এখন মূলকথা এই যে সাধক বলিতেছেন" মাতঃ! সাবিত্রি! গায়ত্রি! "সৃষ্টির প্রাক্‌কালে কেবল তুমিই সদ্রূপে অর্থাৎ জগৎ আত্ম-রূপে বিদ্যমান ছিলে, আত্মস্বরূপিণী তুমি এই ভূরাদি নিখিল লোক সৃষ্টি করতঃ তাহাদের আত্মরূপে দীপ্যমান রহিয়াছ, ইহাই তোমার সৎরূপতা, তাই তোমাকে "সৎ—চিৎ—আনন্দরূপে! বলিয়া ডাকিতেছি।

যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি, নেদং যদিদ মুপাসতে ॥
যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি, নেদং যদিদ মুপাসতে ॥
সামবেদীয় কেন উপনিষৎ। ১ম খণ্ড।৪—৮।

মা! "চিৎস্বরূপে!" চৈতন্যরূপিণি! তুমি চেতন বলিয়াই জগৎ চেতন। চেতনরূপে তুমি সর্ব্বভূতে অনুস্যূত বলিয়াই মা! ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রি! জীবকুলের ইন্দ্রিয়কুল সচেতন এবং স্ব স্ব কার্য্যের উপযোগী ও সক্ষম; তুমি মা! চেতনারূপে তাহাদের মধ্যে আছ বলিয়াই আজ আমি চক্ষে দেখিতেছি, কানে শুনিতেছি, নাসিকায় আঘ্রাণ পাইতেছি, জিহ্বায় আস্বাদ পাইতেছি, ত্বক্ ইন্দ্রিয়ে স্পর্শানুভূতি করিতেছি। মা! তুমি চেতনারূপে তাহাদের চালয়ত্রী না হইলে, আমি আজ বাক্ইন্দ্রিয়দ্বারা কথা বলিতে পারিতাম না, হস্তদ্বারা গ্রহণ করিতেও পাদদ্বারা চলিতে পারিতাম না, এবং মনে মনে ও কিছু ভাবিতে পারিতাম না। তুমিই মা! ঐ ইন্দ্রিয়গণ মধ্যে চেতনারূপে চালয়িত্রী তাই দেবগণ তোমাকে—

"ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী! ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা।
ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমো নমঃ ॥"

বলিয়া বার বার প্রণাম করিতেছেন। তাই আমিও আজ তোমাকে "সচ্চিদানন্দরূপে!" বলিয়া ডাকিয়া তোমার চিদ্‌স্বভাব—চৈতন্যরূপতাকে সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ করতঃ, "প্রসন্নাভব সুন্দরি"! বলিয়া নিখিল সৌন্দর্য্য আধার ভূতা মাতা তোমারই প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতেছি।

মা সাবিত্রি! গায়ত্রি! তুমি যেমন চিৎস্বরূপা চেতনস্বভাবা, আবার তেমনি "আনন্দরূপা"ও বটে। মা! "নিত্যানন্দ স্বরূপিণি"! তোমার আনন্দের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা—অংশ লইয়াই আজ জগতে আনন্দের হাট লাগিয়াছে! মাতঃ! ব্রহ্মানন্দস্বরূপিণি! তোমার আনন্দের দ্যোতনাতেই সন্তানমুখে মাতৃস্তন্য ক্ষরিত হইতেছে! পতিদেবতা-সতী তাহার দয়িত উদ্দেশ্যে প্রেম পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছে! আরও কত কি আনন্দের বিচিত্র মনোহর অভিনয় চলিতেছে! তাই বেদ বর্ণনা করিতেছেন।

আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি।

আহা! এই যে নিখিলজগৎ আজ প্রিয়তা-আনন্দরূপতায় মুগ্ধ "পরমানন্দরূপিণি'! পরমাত্ম স্বরূপিণি! মাতঃ! সাবিত্রি! তোমার প্রিয়তা আনন্দরূপতাই ইহার মূল। মা! তোমার এই আনন্দের তুলনা নাই, সীমা নাই! তাই বেদ নিখিল আনন্দের সমালোচনা পূর্ব্বক বলিতেছেন যে —"তুমি আনন্দের পরাকাষ্ঠা"—

এষঃ…………পরম আনন্দঃ।
এতস্যৈব আনন্দস্য অন্যানি ভূতানি
মাত্রা মুপজীবন্তি" ॥ শুক্লযজুর্ব্বেদীয় শতপথব্রাহ্মণান্তর্গত বৃহদারণ্যক
উপনিষৎ।৪।৩।৩২

সকল আনন্দের খনি ব্রহ্মানন্দ স্বরূপিণী তোমার আনন্দকণা সর্ব্বভূতে কি ভাবে অভিব্যক্ত হইতেছে বেদ তাহাও বলিতেছেন—

"মনুষ্যগণের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্ব্ব-অবয়ব সম্পন্ন, সমৃদ্ধিশালী, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ এবং সর্ব্বপ্রকারে ভোগ উপকরণ সমন্বিত ও লোকাধিপতি হয়, তাহার যে আনন্দ তাহাই মনুষ্যগণের পক্ষে পরম আনন্দ। (যুধিষ্ঠিরাদি রাজা ঈদৃশ আনন্দ ভোগীর উদাহরণ। যাঁহারা শ্রাদ্ধাদি কার্য্যদ্বারা পিতৃলোক প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহাদের আনন্দ পূর্ব্ব কথিত মনুষ্যগণের আনন্দ অপেক্ষা শতগুণ। ঐ পিতৃলোক প্রাপ্ত মনুষ্যগণের যে আনন্দ, সেই আনন্দের শতগুণ আনন্দ গন্ধর্ব্ব লোকে বর্ত্তমান। যাঁহারা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মদ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারা ঐ গন্ধর্ব্বলোকের আনন্দ অপেক্ষা শতগুণ আনন্দ ভোগ করেন। যাঁহারা কর্ম্মদ্বারা দেবতা হয়েন নাই, কিন্তু প্রথমেই জন্মতঃ দেবতা হইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন তাঁহারা, এবং যাঁহারা নিষ্পাপ ও নিষ্কাম বেদবিদ্ তাঁহারা পুর্ব্বোক্ত কর্ম্ম দেবতাগণের আনন্দ অপেক্ষা শতগুণ আনন্দ ভোগ করেন। পূর্ব্ব কথিত বেদিবদ্ ও দেবতাগণ-ভোগ্য আনন্দ অপেক্ষা শতগুণ আনন্দ প্রজাপতি লোকে বিরাট শরীরে বিদ্যমান। স্থুল সৃষ্টির চালক ঈশ্বর চৈতন্যই বিরাট পুরুষ এই বিরাট পুরুষীয় তথাকথিত আনন্দ অপেক্ষা শতগুণ আনন্দ, সূক্ষ্ম সৃষ্টির চালক ঈশ্বর চৈতন্যরূপী হিরণ গর্ভ নামক ব্রহ্ম-লোকে দীপ্যমান রহিয়াছে।

এই যে মনুষ্য লোক হইতে আরম্ভ করতঃ—ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত উচ্চাবচ নিখিল সৃষ্টির আনন্দ সমূহ ইহারা সকলেই সেই পরম-আনন্দ-রূপ পরব্রহ্মের ক্ষুদ্র বৃহৎ অংশমাত্র, যেমন ঐ অপার অসীম মহাসিন্ধুর সুবিশাল বক্ষে ইতঃস্ততঃ ভ্রাম্যমান ক্ষুদ্র বৃহৎ তরঙ্গ ভঙ্গ রাশি। এইভাবে উত্তর উত্তর শতগুণ ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত আনন্দরাশি যেখানে যাইয়া একত্ব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ এক হইয়া যায়, এবং পূর্ব্বোক্ত নিষ্পাপ নিষ্কাম শোত্রিয় বেদবিদ্গণের প্রত্যক্ষ সিদ্ধ তাহাই সম্প্রসাদরূপ পরাম আনন্দ; এই আনন্দে শ্রবণ দর্শনাদি নিবৃত্তি হয় এই জন্য ইহা ভূমা-মহান্, এই পরব্রহ্মরূপ আনন্দ, ভূমা-মহান্, বলিয়া "অমৃত" অর্থাৎ অবিনশ্বর-নিত্য।" *

---

* স যো মনুষ্যাণাং রাদ্ধঃ সমৃদ্ধোভবতি-অন্যেষামধিপতিঃ সর্ব্বৈমানুষ্যকৈর্ভোগৈঃ সম্পন্নতমঃ স মনুষ্যাণাং পরম আনন্দঃ। অথ যে শতং মনুষ্যাণামানন্দাঃ স একঃ পিতৃণাং জিতলোকানা মানন্দঃ। অথ যে শতং পিতৃণাং জিতলোকানামানন্দাঃ স একো গন্ধর্ব্ব লোকে আনন্দঃ। অথ যে শতং গন্ধর্ব্ব লোকে আনন্দাঃ স একঃ কর্ম্ম দেবানামানন্দঃ, যে কর্ম্মণা দেবত্বমভিসম্পদ্যন্তে। অথ যে শতং কর্ম্ম দেবামানন্দাঃ স এক আজানদেবনা-মানন্দঃ যশ্চ শ্রোত্রিয়ঃ অবৃজিনঃ অকামহতঃ। অথ যে অজান দেবনামন্দাঃ স একঃ প্রজাপতি লোকে আনন্দঃ,

শ্রীহট্ট বৈদিক সমিতির সভাপতি

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম, বি-এল, মহাশয়ের

অভিভাষণ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ইদানীং সমস্ত দেশের রাজকার্য্য পরিচালনেই একটী বিশেষ দোষ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। রাজা ও শাসকগণ ভোগাসক্ত। প্রজার নিত্য প্রয়োজনীয় আহারাদির সংস্থান হউক বা না হউক, শাসনকর্ত্তার বেশভূষা যান বাহন ঠিক চাই। রাজ্যশাসন করা দেবভাবাপন্ন ত্যাগীর কার্য্য। ভোগাসক্ত পশুবৃত্তিশীল ব্যক্তিরা তাহা কি করিতে পারে? পরিণামে প্রজার জীবন, প্রজার রক্ত রাজার ও রাজপ্রতিনিধিগণের ভোগচরিতার্থের জন্য, এই সম্বন্ধ রাজা প্রজার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু হিন্দুর রাজত্বে ত্যাগী ব্রাহ্মণেরা যখন মন্ত্রিত্ব করিতেন, তখন এই ভাব ছিল না। তখন রাজা ও রাজপ্রতিনিধিগণ কখনও প্রজার রক্তশোষণ করিয়া আত্মপুষ্টির চেষ্টা করিতেন না। আজকাল প্রজা উপবাস করুক, কিন্তু রাজস্ব, টেক্স ইত্যাদি তাহার দেওয়া চাই। না দিলে শাসন বিভাগের খরচ চলিবে না। শাসকগণ বেতন পাইবেন না। হায়! রে বিধাতঃ! যাহাদের জন্য শাসন বিভাগ, সেই প্রজাদের উদরে অন্ন পড়ে না, আর তাহাদের রক্তেই শাসন বিভাগের কর্ম্মচারীর পুষ্টি লাভ করিতেছে। রাজ প্রতিনিধিগণের যান বাহন ও সাজ সজ্জা চলিতেছে। ইহাকে রাজ্যশাসন বলা যাইতে পারে না। ইহা রাজ্যশাসনের অতি বিকৃত অবস্থা।

এই ভাব প্রতীচ্য দেশাগত। পাশ্চাত্যজাতিরা আত্মদেহ সুখ ছাড়া অন্য কিছু জানে না। সুতরাং সমস্ত কার্য্যেই তাহারা পরস্বহরণ করিয়া আত্ম সুখ বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়া থাকে। তাহারা প্রজাপালন কাহাকে বলে, জানে না। অনশনক্লিষ্ট প্রজার অর্থে নিজের মদ্যাদির পিপাসা চরিতার্থ করিতে জানে। পশুভাব যতদিন পাশ্চাত্য জাতির ভিতর হইতে অন্তর্হিত না হইবে, ততদিন বৃটিশরাজ ভারতের মঙ্গলের জন্য কিছু করিতে পারিবেন না। কারণ পশুসুলভ ভোগ লালসা ও স্বার্থপরতায় ইংরাজজাতি উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের হৃদয়ে ত্যাগের স্থান কোথায়? তাহা হইলে কি ইংরাজ ভারতে স্বায়ত্তশাসন দিবে না। ইংরাজ ত্যাগী পরহিতরত হওয়ার পূর্ব্বে কখনও দিবে না। তাহা হইলে কি আমরা স্বায়ত্তশাসন পাব না! কেন পাব না? সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের বিধানে ভারতে এইরূপ ধর্ম্মবলের সৃষ্টি হইবে যে, তদ্দ্বারা দেখিতে দেখিতে পশুভাব ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। তবে পশুর প্রকৃতি হইতেছে—"যে কটা দিন পারি আমোদ করিয়া নেই, পরে যাহা হয় হইবে।" এই প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া ইংরাজ আজ ভারতবাসীর সমস্ত প্রার্থনা অগ্রাহ্য

করিতেছে। মহাপাপ সঞ্চয় করিতেছে। নিজের বিনাশের পথ পরিষ্কার করিতেছে।

হে ইংরাজ! এই দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণের উপদেশ শ্রবণ কর। আমরা ব্রাহ্মণজাতি স্বায়ত্তশাসন বলিয়া কিছু জানি না। আমরা জানি সংশাসন, ধর্ম্মরাজ্য, প্রজানুরঞ্জন। যদি তুমি ত্যাগী হওতঃ ভারতে সংশাসন প্রবর্ত্তিত করিতে পার, ভারতে যথার্থ ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিতে পার, প্রজারা তোমার শাসনে সুখে থাকে, তোমার রাজত্বে আমাদের কোন আপত্তি নাই। আমরা তোমার রাজত্বের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা তপস্যাদি করিব। আর যদি ভারতবাসীদের হাতেও তুমি শাসনকার্য্যের ভার অর্পণ কর এবং আমরা দেখি যে ভারতবাসী রাজ্যশাসকগণ তোমার মত পাপাশয়; নিশ্চয় জানিও আমরা ভারতের তাদৃশ স্বায়ত্ত শাসন ধ্বংস করিব। সেই জন্যই বলিতেছিলাম আমরা স্বায়ত্তশাসন বলিয়া কিছু জানি না। রাজা ও রাজপ্রতিনিধিগণ স্বয়ং ভগবানের অবতার। হিন্দু হউন, মুসলমান হউন, খ্রীষ্টান হউন, যদি সেই দেবপ্রকৃতি—শাসকের অন্তরে থাকে, তাহা হইলে যে কেহ ভারতে রাজত্ব করিতে পারেন. আমাদের ব্রাহ্মণজাতির কোন আপত্তি নাই।

ভারতের রাজকার্য্যে মন্ত্রিত্ব যথার্থ ব্রাহ্মণাচার সম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া কাহারও হাতে সমর্পিত হওয়া উচিত নয়। ত্যাগী ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ মন্ত্রিত্বে উপবিষ্ট হইলে প্রজার মঙ্গলের জন্য তিনি সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিবেন। প্রজারা স্বতই তাহাকে ভক্তি করিবে। রাজ্যেরও মঙ্গল হইবে। আর—একপশু রাজপ্রতিনিধি, একপশু তাঁহার মন্ত্রী, এইরূপ রাজত্ব কখনও স্থায়ী হইতে পারে না। ভারতবর্ষ ত্যাগ ও ধর্ম্মের দেশ। এই দেশে যথার্থ স্থায়ী রাজত্ব স্থাপন করিতে হইলেই ব্রাহ্মণের উপদেশে কার্য্য করিতে হইবে। সুতরাং ভারতের শাসনে মন্ত্রিত্ব করিবার শক্তি ব্রাহ্মণ ছাড়া কাহারও নাই। 'ব্রাহ্মণ' বলিতে পাশ্চাত্যচারানুগত ব্রাহ্মণজাতির অন্তর্গত ব্যক্তি বুঝিবেন না। যথার্থ ত্যাগী ও ও ধর্ম্মরত ব্রাহ্মণ" বুঝিবেন।

মন্ত্রিত্ব ছাড়া অন্য সমস্ত রাজকর্ম্মচারিনিয়োগে ও চরিত্র ও ধর্ম্মকেই প্রথমস্থান দিতে হইবে। চরিত্রহীন অধার্ম্মিক গৃহস্থ কেবল নিজের গৃহেরই অনিষ্টসাধন করিতে সক্ষম। কিন্তু চরিত্রহীন অধার্ম্মিক রাজকর্ম্মচারী নিজের অসৎকর্ম্ম দ্বারা সমস্ত রাজ্যের অনিষ্টসাধন করিয়া থাকে। ভারতবর্ষে চরিত্রহীন রাজপ্রতিনিধি ও রাজকর্ম্মচারীরাই ইংরাজের রাজত্ব বিনাশ করিতে বসিয়াছে। যদি প্রকৃত ধার্ম্মিক, চরিত্রবান ও ন্যায়বান ব্যক্তি শাসনকার্য্য সম্পন্ন করে, তাহা হইলে সেই রাজত্ব তখন ও নষ্ট হয় না।

ভারতের আইন সভাগুলিতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে সাম্প্রদায়িক অধিকার নিয়া যে বিবাদ চলিতেছে, সেই বিবাদ অতি অসার, সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি যদি ধার্ম্মিক ও ন্যায়বান না হন, তাহা হইলে তিনি কখনও অর্থাদির লোভ সম্বরণ করিয়া সম্প্রদায়ের উপকার করিতে

পারিবেন না। আজ পর্য্যন্ত আইন সভায় যে সমস্ত প্রতিনিধি গিয়াছেন, তন্মধ্যে জন কতক প্রতিনিধিকে আজ এই দলে, দুইদিন পরে অন্য দলে, এই ভাবে কার্য্য করিতে দেখা যায়। কারণ তাঁহারা চরিত্রহীন। নিজের নীচ স্বার্থছাড়া কিছুই জানেন না। তাঁহারা একটী কর্ম্মপ্রাপ্তি কি দুইচারি হাজার টাকা ঘুষের লোভেই সম্প্রদায়ের মাথায় কুঠারাঘাত করিতে কুণ্ঠিত হন না। সেই জন্যই বলিতেছি সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি বলিয়া কিছু থাকা উচিত নয়। হিন্দুগণ ধার্ম্মিক ন্যায়বান মুশলমান ভ্রাতাকে অকাতরে আইনসভা মিউনিসিপালিটি প্রভৃতিতে প্রেরণ করিবেন। মুশলমানগণ অসঙ্কোচে ধার্ম্মিক ও ন্যায়বান হিন্দুভ্রাতাকে নির্ব্বাচিত করিবেন। ন্যায় ও ধর্ম্মের কাছে হিন্দু মুশলমান ইত্যাদি প্রভেদ নাই। হিন্দুপ্রতিনিধি হিন্দু ও মুশলমান উভয়ের মঙ্গলকারক আইনের বিধানে যত্নশীল হইবেন। ন্যায়বান মুশলমান প্রতিনিধিও তাহাই করিবেন। ধর্ম্মরত ন্যায়বান ব্যক্তি ছাড়া কেহ প্রতিনিধি হইবার যোগ্য নয়।

হিন্দুনির্ব্বাচকদিগকেও প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের বিষয় কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি! হিন্দুসমাজের বিবাহপ্রথা পরিবর্ত্তন করিবার জন্য বড়লাটের আইন-সভায় যে আইন প্রণয়নের চেষ্টা হইতেছিল, তদ্বিষয়ে সকলেই অবগত আছেন। যে সমস্ত আচার ভ্রষ্ট প্রতীচ্যকর্ম্মপ্রিয় পাষণ্ড এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিল, তাহাদিগকে কে আইনসভায় পাঠাইয়াছেন? হিন্দু নির্ব্বাচকগণই পাঠাইয়াছেন। উদাসীন ভাবে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের এই ফল। হে সনাতনধর্ম্মরত ব্রাহ্মণবৃন্দ! আমি সমস্ত হিন্দুসমাজকে বিশেষতঃ আপনাদিগকে বলিতেছি, আপনারা কখনও স্বধর্ম্মে ভক্তিহীন আচার ভ্রষ্ট ব্যক্তিকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিবেন না। নির্ব্বাচনের জন্য কেহ প্রার্থী হইলেই আপনারা সর্ব্বপ্রথমেই বিচার করিয়া দেখিবেন, সেই ব্যক্তির পিতৃপিতামহের ধর্ম্ম ও সামাজিক আচারে নিষ্ঠা আছে কি না; সেই ব্যক্তি কখনও স্বধর্ম্ম বিগর্হিত ও আচার বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন কিনা। যদি স্বধর্ম্ম ও আচার প্রতিপালনের পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন, তাহা হইলে তাঁহার নির্ব্বাচন প্রার্থনা শুনিয়া আপনারা তাঁহার যোগ্যতা বিচার করিবেন! কিন্তু যদি দেখেন সেই ব্যক্তি ধর্ম্মভ্রষ্ট ও আচারভ্রষ্ট, তাহা হইলে, তাহার বিদ্যাবুদ্ধি থাকা সত্বেও তৎক্ষণাৎ তাহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন। স্বধর্ম্মপরিত্যাগী আচারহীন ব্যক্তিকে আপনারা কখনও প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবেন না। হিন্দুর সন্তান হইয়া যে হিন্দুর সনাতন ধর্ম্ম ও সমাজের উপর হাত দেয়, তাহার জাতীয়তা কোথায়! নিজের পিতৃপিতামহের বুদ্ধি ও জ্ঞানের উপর যাহার শ্রদ্ধা নাই, তাহার দ্বারা মাতৃভূমির মঙ্গল কিছুই সাধিত হইতে পারে না। ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদের প্রবর্ত্তিত প্রথা যে পরিবর্ত্তন করিতে চায়, তাহার নিশ্চয়ই পাশ্চাত্যশিক্ষারূপ বিষপানে মস্তিষ্কবিকার উপস্থিত হইয়াছে। সে ভারতবাসীর প্রতিনিধি হইয়া কোন সাধারণ কার্য্য করিবার যোগ্য নয়।

মুশলমান খৃষ্টান প্রভৃতি অন্যান্য সম্প্রদায়ের নিকটেও আমার এই প্রার্থনা যে তাঁহারা যেন কখনও স্বধর্মত্যাগী ও আচারভ্রষ্ট ব্যক্তিকে প্রতিনিধিনির্ব্বাচন না করেন। হিন্দু দেখিবেন হিন্দু নির্ব্বাচনপ্রার্থী ব্যক্তির হিন্দুধর্ম্ম ও আচারে নিষ্ঠা আছে কি না। মুশলমান দেখিবেন মুশলমান-নির্ব্বাচনপ্রার্থীর মুশলমানধর্ম্মে আস্থা আছে কি না এই জাতীয়তার পরীক্ষা উত্তমরূপে করিয়া আপনারা প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবেন।

আর একটী বিষয়ে এই জাতীয়তার পরীক্ষা আপনারা করিবেন। যাঁহার জাতীয়তা নাই, তাঁহাকে কখনও আপনারা আপনার নেতৃত্বে বরণ করিবেন না। আজকাল আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব করেন কাহারা? যাঁহারা স্বজাতির দেবীকল্পা পরমাসুন্দরী কন্যার পাণিগ্রহণ না করিয়া, ইংলণ্ডের মেথর কন্যা কি দাসীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা যাঁহারা নিজের আরাধ্য জননী ও প্রিয়তমা পত্নীর প্রস্তুত আহার পরিত্যাগ করিয়া গ্রেট্‌ হোটেল অখাদ্য আহার করেন, যাঁহারা নিজের গৃহে স্নেহময় শিশু ও প্রিয়তমা সহধর্ম্মিনীর মধুর সংসর্গ পরিহার করিয়া বারাঙ্গনালয়ে নৃত্য করেন তাঁহারা। কত বলিব অন্তরের বেদনা অন্তরেই আছে। কেবল অন্তর্যামী ভগবানই জানেন, কতদিনে ভারতবাসী পাশ্চাত্য দেশাগত পাপসংসর্গ হইতে মুক্ত হইবে। নেতৃত্বের কথা বলিতেছিলাম। ঈদৃশ পাপাসক্ত ব্যক্তিগণকে আপনারা কখনও নেতা বলিয়া স্বীকার করিবেন না। এই ক্ষেত্রেও যথার্থ ত্যাগী, ধার্ম্মিক ও ন্যায়বান ব্যক্তিকেই নেতৃত্বে বরণ করিবেন। যিনি আপনাদের নেতৃত্ব করিবেন তিনি ধর্ম্মশীল ও সদাচার সম্পন্ন কিনা দেখিয়া লইবেন।

ভারতে ইংরাজরাজত্বে অনেক পাপের ব্যবসা প্রশ্রয় পাইয়াছে। বড় বড় সহরের প্রত্যেক রাজপথেই মদের দোকান, মাংসের দোকান, বেশ্যালয় প্রভৃতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। কয়েক বৎসর যাবৎ আর একটী ব্যবসারও খুব বাড়াবাড়ি দেখা যাইতেছে। প্রত্যেক রাস্তায়ই 'রেষ্টুরেণ্ট'' নামক এক রকম নরক দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে হীনজাতীয় ঘৃণ্য জাতীয় জঘণ্য চরিত্র লোকেরা অতি অপরিচ্ছন্ন ভাবে মাংসাদি রন্ধন করিয়া দিতেছে। আর নররূপী অসংখ্য কৃমি সেই খানে বসিয়া সেই ঘৃণিত খাদ্যাদি ভোজন করিতেছে। এক প্রকার কৃমি নানারূপ ঘৃণিত ব্যাধিতে ব্যাধিগ্রস্ত হওয়া সত্বেও সেইখানে বসিয়া ভোজন করিতেছে। আর অন্যান্য কৃমিগণ তৎসংসর্গে সেই সমস্ত ব্যাধি সংগ্রহ করিয়া নিজের জীবনকে বিষময় করিয়া দিতেছে। এই সমস্ত পাপ গ্রহের বিনাশ সাধন করা প্রত্যেক ভারত বাসীর কর্ত্তব্য। ইংরাজ সরকারকে এই সমস্ত উঠাইয়া দিবার জন্য অনেক বলা হইয়াছে। কিন্তু ইংরাজ সেই সব কথায় কর্ণপাত করে নাই। ভারতে মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, ও বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়া "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" এই মহৎ সত্য ভারত বাসীকে ও সমস্ত জগৎকে দান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আজ ম্লেচ্ছের রাজত্বে অসংখ্য জীব

হত্যা করিয়া মাংসের ব্যবসা ও চর্ম্মের ব্যবসা করিতে কোন বাধা নাই। ভারতবাসীর মনে রাখিতে হইবে, ইংরাজ ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতে আসে নাই, বাণিজ্য করিতে আসিয়াছে। বাণিজ্য ও রাজত্বে অনেক প্রভেদ। বাণিজ্যে বণিক নিজের লাভ ও মঙ্গল দেখে। রাজত্বে আদর্শ রাজা প্রজার লাভ ও মঙ্গল দেখেন। সুতরাং ভারতের মঙ্গল সাধন না করিয়া, ভারতে পাপের রাজ্য স্থাপন করিয়া নিজের বানিজ্যের উন্নতি করাই ইংরাজের উদ্দেশ্য। মদের দোকানের সংখ্যা যত বাড়িবে, ততই বিলাতি মদের বিক্রয় বাড়িবে, ততই ইংরাজ বণিকের লাভ হইবে। মাংসের দোকান যতই বাড়িবে, ততই বেশী চামড়া ভারত হইতে বিলাতে রপ্তানী হইবে, ততই ইংরাজের জুতার ব্যবসা উন্নতি হইবে।

কিন্তু এই নীচ স্বার্থানুসরণ ইংরাজের বিনাশ সাধন করিবে। এই ভারতবর্ষ সমস্ত জগতের গুরুস্থান। এই পুণ্য স্থানের জ্ঞান ও সভ্যতা নষ্ট করিয়া যে পাপের আশ্রম স্থাপিত করে, তাহার কি আর রক্ষা আছে?

ইংরাজ এই দেশে আর একটী বিষাক্ত জিনিষ আনয়ন করিয়াছে। তাহার নাম পাশ্চাত্য বিদ্যা: ইহার ফলেও দেশে ঘোর তমোগুনের সৃষ্টি হইতেছে। এই শিক্ষায় নীতি ধর্ম্মের লেশ মাত্রও নাই। আছে, কেবল ভোগ বিলাস শিক্ষা। এই শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরাই ভারতে ইংরাজের উপরে বোমা নিক্ষেপ করিয়া থাকে। এই শিক্ষিত ব্যক্তিরাই দেশের সমস্ত উৎপাতের মূল, এই শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরাই ইংরাজের যথার্থ শত্রু। এই বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, কলেজ ইত্যাদি সমস্তই ইংরাজের অশান্তির কেন্দ্রস্থল। এক কথায় বলিতে গেলে, ইংরাজ নিজস্ব যাহা কিছু এই দেশে প্রচলিত করিতেছে, বা করিয়াছে তৎসমস্তই যে, তাহার ধ্বংসের পথ পরিষ্কার করিতেছে, ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এই পাশ্চাত্য বিদ্যা ভারতবাসীর সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে। তাহা না হইলে মঙ্গল নাই।

সম্প্রতি ভারতবর্ষে স্বায়ত্তশাসন প্রদান বিষয়ে অনুসন্ধান সমিতি বসিয়াছিল। এই অনুসন্ধানের ফলে ভারতে স্বায়ত্ত শাসন হইতে পারে। ইহা বেশ উত্তম কথা। নিজের কার্য্য নিজের হাতে সম্পন্ন করা শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি বটে। কিন্তু সেই স্বায়ত্ত শাসন যদি বর্ত্তমান ইংরাজ শাসনের মত ধর্ম্ম ও নীতি বিগর্হিত হয়, তাহা হইলে তাদৃশ স্বায়ত্ত শাসনেও ভারতবাসী সুখী হইবে না। শাসন স্বায়ত্তই হউক আর পরায়ত্তই হউক, মূল কথা হইতেছে, সৎশাসন, ধর্ম্মান্বিত শাসন। যতদিন রাজ্য শাসন ধর্ম্মানুসারী থাকে, ততদিন রাজার জাতি কি সম্প্রদায় বিচার করিবার প্রয়োজন হয় না। আর প্রকৃত রাজার জাতি কি সম্প্রদায় কিছু নাই। তিনি ভগবানের অবতার। তিনি পিতার মত সমস্ত প্রজাকে প্রতিপালন করিবেন। প্রজার মঙ্গল ছাড়া অন্য চিন্তা তাঁহার থাকিবে না। ভারতের সেই পুণ্যময় প্রাচীন নৃপতিগণের আদর্শ অনুসরণ করিয়া যে কেহ ভারতে আদর্শ

রাজশক্তি পরিচালন করিতে পারেন, তাহাতে ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ জাতির কোন আপত্তি নাই। কারণ ব্রাহ্মণের কার্য্য অধর্ম্মের বিনাশ সাধন পূর্ব্বক ধর্ম্ম স্থাপন। আর যদি কাহাকেও ভারতে যথার্থ ন্যায় ও ধর্ম্মের সহিত রাজশক্তি পরিচালন করিতে হয়, তাঁহাকে ভারতের সমস্ত প্রাচীন আদর্শের অনুসরণ করিতে হইবে। কারণ, ন্যায়, ধর্ম্ম নীতি ও সভ্যতার জন্য জগতে ভারতবর্ষই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই স্থানেই ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণের আবির্ভাব হইয়াছিল। এই দেশই পৃথিবীর সমস্ত মহাপুরুষের জন্মস্থান। এই দেশ পৃথিবীর গুরুস্থান।

ম্লেচ্ছ ইংরাজ জাতি ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া পবিত্র হইয়াছিল। ভারতের জ্ঞান, সভ্যতা ও জনগণের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু কলির কি প্রভাব! সেই শ্রদ্ধা বিসর্জ্জন দিয়া এখন তাহারা ইংলণ্ড প্রচলিত পাপ প্রথার প্রচলনে পুণ্যময় ভারতের পবিত্রতা নষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছে। নানারূপ পাপের প্রশ্রয় দিয়া এই শান্তিময় ভারতবর্ষে অশান্তি আনয়ন করিতেছে। ম্লেচ্ছের অত্যাচারে সমস্ত ভারতবর্ষে হাহাকার উঠিয়াছে।

কিন্তু ইংরাজের জানা উচিত যে ভারতের জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সভ্যতা বিনাশ করিবার শক্তি স্বয়ং ভগবানেরও নাই। ভারতে পাপের বিস্তার করিয়া তাঁহারা ব্যক্তিগত অনিষ্ট করিতে পারে, নিজের ধ্বংস সাধন করিতে পারে, ইহা ছাড়া অন্য কিছুই করিতে পারিবে না।

এই দুঃসময়েও ইংরাজের রাজত্ব ভারতে অনন্তকাল স্থায়ী করিবার উপায় আছে। সেই উপায় সর্ব্ববিষয়ে ভারতের প্রাচীন ঋষিদের অনুমত প্রথা অবলম্বন। শিক্ষার প্রয়োজন। তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, কলেজ রাখিও না। ভারতের যে টোলে যথার্থ জ্ঞান শিক্ষা হইত, সেই টোল স্থাপন কর। টোলে ছাত্রেরা অধ্যাপককে গুরু বলিয়া জানে, প্রণাম করিয়া অধ্যাপকের পদধূলি গ্রহণ করে। আর তোমাদের স্কুল কলেজের ছাত্রেরা কি করে? অধ্যাপককে চর্ম্মপাদুকাদ্বারা প্রহার করে। এই ত প্রভেদ। স্কুল কলেজের অধ্যাপক পয়সার চাকর। আর টোলের অধ্যাপক নিঃস্বার্থ জ্ঞানদাতা পিতা। হে! মহারাজ এইবার বাছিয়া লও কোন শিক্ষাপদ্ধতি তোমার মঙ্গলের জন্য ও ভারতের মঙ্গলের জন্য, তোমার অবলম্বন করা উচিত।

তোমার বিচার পদ্ধতি? ভারতের পক্ষে, মানব সমাজের পক্ষে এই বিচারপদ্ধতি সর্ব্বথা অনিষ্টকারী। এই বিচারে মিথ্যাচার, মিথ্যাভাষণ না করিলে হয় না। যে মিথ্যা কথা বলিতে নিপুন, সেই তোমার আদালতে প্রমাণ দিতে পারে। কারণ তোমার আইন এত অস্পষ্ট ও জটীল, যে, মিথ্যাচার না করিলে এই আইন সংরক্ষণ পূর্ব্বক বিচারে জয় লাভ করা যায় না। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, তোমার আইন ও তোমার বিচার এ দেশের অনুপযুক্ত। তোমার বিচারকের মধ্যে অনেকে আছেন, যাহারা জাতিনির্ব্বিশেষে বিচার করেন না। স্বজাতীয় কেহ বিচারার্থী হইলে, তাহার উপরে পক্ষপাতিত্ব করিয়া থাকেন। সুতরাং এই দেশে অনেক ইংরেজ বিচারকের উপর ভারতবাসীর শ্রদ্ধা নাই, বিচারকের

যদি পবিত্রতা না থাকে, তাহা হইলে সেই বিচার কিছুই নয়। বিচারক ধর্ম্মের অবতার। ইংরাজ বিচারকেরা অনেকেই অধর্ম্মশীল ও পক্ষপাতপরতন্ত্র সুতরাং তোমার বিচার পদ্ধতি সম্পূর্ণ কলুষিত। সুন্দর বিচার পদ্ধতিতে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন হইয়া থাকে। কিন্তু তোমার বিচারে দুষ্টের জয় ও শিষ্টের উপর অত্যাচারও হইতেছে।

হে মহারাজ। তোমার প্রবর্ত্তিত কলকারখানায় ভারতবাসীর জীবনীশক্তি কিভাবে হ্রাস হইতেছে, তাহা বলিব। ভারতবর্ষের লোকে পূর্ব্বে তৈল, ময়দা ইত্যাদি পবিত্রভাবে নিজের গৃহে প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিত। এখন কলের তৈল, ময়দা ইত্যাদিতে নানা রূপ বিষাক্ত দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া পাশ্চাত্যবাসীরা তোমার দয়ায় অর্থলাভ করিতেছে। আর দেশের লোকে বিষাক্ত তৈলাদি আহার করিয়া রোগগ্রস্থ হইতেছে ও অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। তোমার রাজত্বে পবিত্র ঘৃতও দুর্লভ হইয়াছে। কারণ তোমার প্রশ্রয়ে গো বিনাশ হইতেছে, গো পালন হইতেছে না। তজ্জন্য সর্পের দেহতৈল ও বিষাক্ত ভিজিটেবেল ঘৃতের ব্যবহার দেশে প্রচলিত হইয়া দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছে। হে ইংরাজ। তুমি পাপাচার দ্বারা ভারতের যে অনিষ্টসাধন করিতেছ, তাহাতে নরকেও তোমার স্থান হয় কি না সন্দেহ।

হে মহারাজ! তুমি পাপের সহায়। যে ঔষধের উপর লোকের জীবন নির্ভর করে, সেই ঔষধ পর্য্যন্ত তোমার রাজত্বে খাইতে ভয় করে। বাজারে অসংখ্য বিষাক্ত ও রোগ সঞ্চারী ঔষধের আমদানী হইয়াছে। কৃত্রিম ঔষধ, কৃত্রিম নাম। এই সমস্ত ঔষধ গ্রহণ করাতে রোগের নিবারণ হওয়া দূরের কথা, লোকেরা চিরকালের জন্য রোগগ্রস্ত হইতেছে। অধিকন্তু পাপাসক্ত অর্থলোভী চিকিৎসকেরা নানাবিধ প্রক্রিয়া দ্বারা লোকের রোগবৃদ্ধি করিতেছে। সেইজন্যই হিন্দুর শাস্ত্রে বিধান আছে যে, চিকিৎসকের অর্থ গ্রহণ করা উচিত নয়।

হে মহারাজ! এইভাবে সমস্ত বিষয়ে তুমি ভারতের অনিষ্টসাধন করিতেছ। রাজা যদি প্রজার মঙ্গলেচ্ছু হয়, তাহা হইলে কি কখনও প্রজার দুঃখ থাকিতে পারে? তবে এই অনিষ্ট সমস্তই যে তোমার ইচ্ছাকৃত, তাহা আমি বলিতে চাই না। কতকটা বোধ হয়, তোমার ম্লেচ্ছস্বভাবমূলক। দেখ, এই ম্লেচ্ছাচার, এই পাপ অর্থপিপাসা, এই পাপ ভোগ লালসা, ইহাতে ভারতের কেন, সমস্ত পাশ্চাত্য জগতের অনিষ্টসাধন করিতেছে। যদি পার ত পাশ্চাত্যদেশকে এই পঙ্কিল বিষয় ভোগ প্রবৃত্তি হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা কর। আর যদি ভারতে রাজত্ব স্থায়ী করিতে চাও, তবে সমস্ত বিষয়ে ভারতের প্রাচীন আদর্শ অবলম্বন কর।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কেবল ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণাচার রক্ষা দ্বারাই ভারতবর্ষের মুক্তি হইতে পারে, ম্লেচ্ছজাতির অনুকরণ দ্বারা হইবে না। যাহারা ম্লেচ্ছজাতির আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়াছে, তাহারাই অধঃপাতে গিয়াছে। ম্লেচ্ছভাবান্বিত বাঙ্গালীরা তাহার

প্রমাণ। তাহারা নিজের স্ত্রীকে নিয়া ম্লেচ্ছজাতির হোটেলে অখাদ্য কুখাদ্য আহার করেন পিতামাতাকে অজ্ঞ ও নির্ব্বোধ মনে করেন। স্ত্রীকে ম্লেচ্ছের সঙ্গে বলনাচে পাঠাইয়া দিয়া আনন্দিত হন। নাচঘরে প্রবেশাধিকার না থাকিলে খবরের কাগজে লিখিয়া, সেই উচ্চ অধিকারলাভ করিবার চেষ্টা করেন। পিতৃপিতামহের ধর্ম্ম ও আচার, তাহারা ব্রাহ্মণের স্বার্থপরতায় সৃষ্টি করিয়া মনে করেন। ব্রাহ্মণের পৌরহিত্য ও গুরুত্ব বিনাশ করিবার জন্য তাহারা সর্ব্বদাই ব্যস্ত। ভারতীয় সনাতন বিবাহপ্রথার পরিবর্ত্তে তাহারা পাশ্চাত্যদেশের কলুষিত প্রথার প্রবর্ত্তন করিতে চান। তাহারা স্ত্রীস্বাধীনতা চান। কারণ তাহা হইলে ব্যাভিচারের বিশেষ সুবিধা হইবে। তাহারা জাতিভেদ উঠাইয়া দিতে চান। কারণ ইহাতে তাহাদের যথেচ্ছ ভোগবিলাসের অত্যন্ত অনিষ্ট করিয়া থাকে। হায়রে অদৃষ্ট! এই সমস্ত লোককে বাঙ্গালীর সন্তান বলিয়া স্বীকার করিলেও যে পাপ হয়।

আরও পরিতাপের বিষয় এই যে, এই সমস্ত জাতীয়তাবিহীন জীবের সঙ্গে অনেকতক মহিলাও যোগ দিতেছেন। এই সমস্ত মহিলা অন্তঃপুরবাসিনী নন। তাহারা অসভ্যাবস্থা হইতে সভ্যা হইয়াছেন। তাহাদের মধ্যে, কেহ বা ডাক্তার, কেহ বা ধাত্রী, কেহ বা বড়বাজারে দালাল, কেহ বা শিক্ষয়িত্রী। আমাদের পাদরী সাহেবদের মতে তাঁহারা অন্ধকার হইতে আলোকে আসিয়াছেন! এই সমস্ত নারীও সম্পূর্ণ জাতীয়তাবিহীন। তজ্জন্যই তাহারা পরের দেশের আদর্শ এইদেশে প্রবর্ত্তিত করিতে চান।

জাতিভেদ প্রথা নিয়া দেশে অনেক বাদ বিসম্বাদ চলিতেছে। অনেকই বলিতেছে জাতিভেদ উঠাইয়া দাও। কিন্তু জাতিভেদ করা হইয়াছিল সমাজের উন্নতির জন্য। প্রত্যেক জাতির ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসা নির্দ্দিষ্ট আছে। পুরুষানুক্রমে প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ ব্যবসা পরিচালন করিলে, সেই ব্যবসার যেমন উন্নতি হয়, অন্য কিছুতেই সেইরূপ হওয়া সম্ভব নয়। আমি অধম হইলাম কিসে? আর ব্রাহ্মণাদিই বা উত্তম কেন? ঈদৃশ সঙ্কীর্ণভাব হইতে জাতিভেদের উৎপত্তি হয় নাই। কর্ম্মের তারতম্যানুসারে দেহের প্রকৃতি বিভিন্ন হয় বলিয়া, একজাতি অন্যজাতির অন্নাদি গ্রহণ করেন না। বা এক জাতি অন্য জাতির সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করেন না। তবে অন্নাদি গ্রহণ ইত্যাদি আদর্শ ব্রাহ্মণাচারমূলক। যাঁহারা আদর্শ ব্রাহ্মণাচার হইতে নিম্নে অবতরণ করিতে চান, তাঁহারা এই বিধানানুসারে না চলিলেও পারেন। কিন্তু তাহা করিলে এই অসুবিধা আছে যে আদর্শ ব্রাহ্মণাচার সম্পন্ন ব্যক্তি তাহাদের হাতের অন্নাদি গ্রহণ করিবেন না। কেবল স্ব স্ব ব্যবসা রক্ষা করিলেই জাতিভেদের সামাজিক প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ হয়। কিন্তু দেহের পবিত্রতা কতক রক্ষা করিতে হইলে অন্নপানাদি সম্বন্ধীয় বিধান ও রক্ষা করা উচিত। যে সমস্ত লোকেরা 'কে বড়' 'কে ছোট' ইত্যাদি বাদ বিসম্বাদে জীবন যাপন করেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণের শাস্ত্রের সার মর্ম্ম জানেন না। তাঁহারা জানেন না যে যথার্থ ব্রাহ্মণের পক্ষে অবস্থা বিশেষে নিজের পত্নীর হাতের অন্নাদি গ্রহণ ও নিষিদ্ধ। কিন্তু ব্রাহ্মণপত্নী কি কখনও

ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করেন 'তুমিবড় কিসে? আর আমি ছোট হইলাম কিসে? সেইখানে এই সমস্ত প্রশ্ন উঠে না। কারণ সেইখানে আত্মভাব আছে। আমি যদি অন্য লোককে আত্মীয় বলিয়া ভাবি, তাহা হইলে তাঁহাদের সমস্ত কার্য্যেই আমি সদুদ্দেশ্যে আরোপ করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে সৌহার্দ্দ্য রক্ষা করিতে পারিব। আর যদি আমি তাহাদিগকে পর ভাবি তাহা হইলে তাঁহাদের সমস্ত কার্য্যেই আমি অসদুদ্দেশ্য আরোপ করিয়া উৎপাতের সৃষ্টি করিব। জাতি ভেদ বিষয়ে বিবাদের কারণও সদৃশ। একজাতি যতদিন অন্যজাতীকে আত্মীয় ও হিতকারী মনে করেন, ততদিন বড় ছোট ইত্যাদি কথা উঠে না। আর যখন এক জাতি অন্য জাতিকে আত্মীয় জ্ঞান না করেন, তখনই উৎপাতের সৃষ্টি হয়। হে ভারতবাসিগণ! সকলেই বলিতেছে ভারতে জাতীয়তার উত্থান হইতেছে। কিন্তু এখনও তাহা হয় নাই। প্রত্যেক ভারতবাসীর প্রত্যেককে আত্মীয় বলিয়া জানিতে হইবে। তাহা হইলেই সহস্র সামাজিক প্রভেদের মধ্যেও এক অপূর্ব্ব জাতীয়তার সৃষ্টি হইবে, যাহার শক্তিতে ম্লেচ্ছশক্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে ও ভারত তাঁহার স্থানে অধিষ্ঠিত হইবে। এই জাতীয়তা যাঁহারা অনুভব করে না, তাঁহারা জাতীয় উত্থানের চেষ্টা করিবার যোগ্য নয়।

বিবাহ প্রথার পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন? ম্লেচ্ছজাতিরা চিরকালই বস্তুর খোসা চর্ব্বণ করিয়া থাকে। অন্তরে প্রবেশ করিবার মস্তিষ্ক ও শক্তি তাহাদের নাই। তাহা সভ্য জগতে বালকের মত মানবকৃত সামান্য যন্ত্রাদি দ্বারা পরীক্ষা করতঃ বস্তুর গুণাধিকার করিয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে তাহারা কিছুই করিতে পারে না। এই ব্যাপারেও তাহাদের পদ্ধতি একই।' তাহারা মনে করে অল্পবয়সে বিবাহ না দিলে, দুর্ব্বল সন্তানাদি উৎপন্ন হইবে না আর স্ত্রীলোকের ও শরীর ভাল থাকিবে। বাহিরের কথাটা তাহারা ঠিকই ধরিয়াছে। কিন্তু ভারতবাসীর সনাতন ধর্ম্মের বিধান রক্ষা করিয়া কিরূপে এই কার্য্য সম্পন্ন করা যাইতে পারে তাহা তাহাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে নাই। আমাদের দেশেও যাঁহারা বিবাহ প্রথার পরিবর্ত্তনের জন্য আইন প্রণয়নে ব্যস্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের ও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না।

বাল্যবিবাহ জনিত অনিষ্ট দূর করিতে হইলে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর সনাতনধর্ম্ম রক্ষা করিয়া কার্য্য করিতে হইবে। ইহা অতি সহজ উপায়েই করা যাইতে পারে। বিবাহ পঞ্চবর্ষেই হউক, আর দশমবর্ষেই হউক, ক্ষতি নাই, পরিণত বয়স্ক না হওয়া পর্য্যন্ত যদি স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে না থাকেন, তাহা হইলেই আর এই অনিষ্ট হইবে না। কন্যার পিতারা যদি তাহাদের অল্পবয়সে পরিণীতা কন্যাগণকে পরিণত বয়স্ক না হওয়া পর্য্যন্ত স্বামীর গৃহে প্রেরণ না করেন, তাহা হইলেই এই কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে। আমাদের আইন প্রণেতারা এই সম্বন্ধে ফৌজদারি আইনের একটী দফা করিয়া দিতে পারেন যে, "যে কন্যার পিতা রজোযোগ না হওয়ার পূর্ব্বে, কন্যাকে স্বামীর গৃহে পাঠাইবেন অথবা কন্যাকে স্বামি সহবাস করিতে দিবেন, তাঁহার হাজার টাকা জরিমানা ও ছয় মাসের কারাদণ্ড

৩

হইবে"। এই কার্য্য সম্পন্ন করিবার ইহাই উৎকৃষ্ট উপায়। আশা করি আপনাদের আইন প্রণেতারা তাঁহাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবিত আইন পরিত্যাগ পূর্ব্বক এইভাবে কার্য্য করিতে চেষ্টা করিবেন।

ভারতের রাজনৈতিক উন্নতির সম্বন্ধে ভারতবাসীগণের প্রতি আমার শেষ উক্তি করিয়া এই আলোচনা সমাপ্ত করিব। ভারতে স্বায়ত্তশাসন হইলেও ভারতের মঙ্গল হইবে না যদি নিম্নোক্ত কার্য্যাবলি যথাযথভাবে না করা হয়। ভারতে গো, ব্রাহ্মণ ও তুলসী রক্ষা করিতে হইবে। যাগ যজ্ঞাদির জন্য বিশেষ ভাবে ক্রিয়াশীল ব্রাহ্মণের প্রতিপালনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। মদ্যের ব্যবসা, মাংসের ব্যবসা ও স্ত্রী লোকের বেশ্যাবৃত্তি বন্ধ করিতে হইবে। পাশ্চাত্যজাতির পার্থিবোন্নতি সম্বন্ধীয় বিদ্যা শিক্ষা করা যাইতে পারে। তবে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইত্যাদি পরিবর্ত্তে ভারতের সনাতন টোল প্রথা অবলম্বন করিতে হইবে। ইংরাজের আদালত তুলিয়া দিতে হইবে। প্রত্যেক স্থানে একটী করিয়া উকিল সমিতি থাকিবে। তাঁহাদের উপরেই সেই স্থানের বিচারের ভার অর্পিত হইবে। সব্‌ডিভিসনের উকিল সমিতির বিচারের বিরুদ্ধে জেলার উকিল সমিতিতে আপীল চলিবে। জেলার উকিল সমিতির বিচারের-বিরুদ্ধে রাজধানীর উকিল সমিতিতে আপীল চলিবে। উকিল সমিতির বিচার সিদ্ধান্ত রাজসিদ্ধান্ত বলিয়া স্থির করিবার জন্য ও তাহা জারি বা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য প্রত্যেক স্থানে একজন মাত্র রাজ কর্ম্মচারী থাকিবেন। মোকদ্দমার গুরুত্বানুসারে উকিল সমিতি তাঁহাদের মধ্যে বিচারক স্থির করিবেন। ভারতজাত দ্রব্যের রপ্তানীর বিষয়ে ভারতে ব্যবহারার্থ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি রাখিয়া অবশিষ্ট দ্রব্যাদি রপ্তানী করিতে দেওয়া হইবে। আমদানীর বিষয়ে ঈদৃশ কঠোর আইন রাখিতে হইবে যে, যে বস্তুর আমদানীতে ভারতের আর্থিক লাভ ও স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে হিত না হয়, সেই বস্তু যেন ভারতে প্রবেশ না করে। কৃত্রিম ঔষধের ব্যবসা বন্ধ করিতে হইবে। বিদেশীগত ও দেশে প্রস্তুত অনেক কৃত্রিম ঔষধ ভারতের অশেষ অহিত সাধন করিতেছে। অধ্যাপক বৈদ্য ও ব্যবহারাজীবের পক্ষে অর্থ গ্রহণ নিষিদ্ধ হইবে। ছাত্র রোগী ও বিচারার্থী রাজকোষে সাধ্যানুসারে কিঞ্চিৎ অর্থ জমা দিবেন। অশক্ত হইলে জমা না দিলে ও তিনি শিক্ষা, চিকিৎসা, বিচার প্রাপ্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবেন না। সফল হইলে অধ্যাপক, বৈদ্য ও ব্যবহারাজীব রাজসরকার হইতে যথাবিহিত পুরস্কার পাইবেন। এই বিধানে অজ্ঞব্যক্তি অধ্যাপকের আসনে বসিতে পারিবে না। চিকিৎসাতত্ত্ব জ্ঞান বর্জ্জিত ব্যক্তি, হাড়ি ও বড়ি, বা শিশি বোতল নিয়া চিকিৎসক সাজিয়া বসিতে পারিবে না ও লোকের জীবনাশ করিতে পারিবে না। প্রবঞ্চক ব্যবহারাজীবেরা অর্থলোভে লোককে মন্দ পরামর্শ দিয়া বিপদগ্রস্ত করিতে পারিবে না। তৈল ময়দা ও অন্যান্য প্রস্তুত করিবার কল কারখানা উঠাইয়া দিতে হইবে। কলের প্রস্তুত তৈল ইত্যাদিতে স্বাস্থ্যের যথেষ্ট অনিষ্ট হইতেছে। আহার পানীয় প্রভৃতি সম্বন্ধে সর্ব্বদা হিন্দুর

শাস্ত্র কেবল হিন্দুর হিতের জন্য নয়, সমস্ত জগতের হিতের জন্য। জগতে যে কেহ হিন্দুর শাস্ত্র মানিয়া চলিবে, সেই অশেষ মঙ্গলের অধিকারী হইবে। সংক্ষেপও ভারতের মঙ্গলের জন্য ভারতবাসীর মঙ্গলের জন্য, সর্ব্ববিষয়ে হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত ভারতের প্রাচীন আদর্শ অবলম্বন করিতে হইবে। প্রত্যেক বিষয়ে সেই প্রাচীন আদর্শ অন্বেষণ করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবে। ইহাই ভারতের যথার্থ মঙ্গলের একমাত্র উপায়, দ্বিতীয় উপায় নাই।

একখানি পত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্তী)

কস্যচিৎ তত্ত্বদর্শিনঃ।

তবে আরও একটী কথা অবশ্য বলিতে হইবে। হিন্দুকে যে অপরে বুঝে না বা বুঝিতে পারে না তাহার মূল কারণ লক্ষ্যের বিভিন্নতা। অপরের লক্ষ্য এক, হিন্দুর লক্ষ্য অন্য। অপরের লক্ষ্য স্থূল, হিন্দুর লক্ষ্য সূক্ষ্ম। অপরের লক্ষ্য জড়োপাসনা হিন্দুর লক্ষ্য ব্রহ্মোপাসনা। জড়োপাসনার ফলপার্থিব উন্নতি, ব্রহ্মোপাসনার ফল মুক্তি। পার্থিব উন্নতি ক্ষণভঙ্গুর ও তাহার পরিণাম চির দুঃখ ও বিনাশ, মুক্তি দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইয়া অক্ষয় নিত্যানন্দ লাভ।

সুতরাং স্থূলের সেবা দুঃখের নিদান বা বিনাশের হেতু, সূক্ষ্মের সেবা আনন্দের নিদান বা সুখময় চিরজীবন লাভ। সূক্ষ্মই স্থূলের ভিত্তি। সূক্ষ্ম মোটে না থাকিলে স্থূলও আদৌ টেকে না। 'যেমন মাথা না থাকিলে দেহ থাকে না। সুতরাং উভয়ের সামঞ্জস্য উন্নতিই প্রকৃত উন্নতি। হিন্দুর উন্নতি তাহাই এবং তদনুযায়ী তাহার শিক্ষা ও দীক্ষা। কিন্তু অপরের উন্নতি তাহা নহে; অপরের উন্নতি শুধুই স্থূলাভিমুখী এবং তাহাদের শিক্ষা ও দীক্ষা তদনুযায়ী কাজেই তাহারা বিপরীত ভাবাপন্ন। কাজে কাজেই তাহারা হিন্দুকে বুঝে না বা বুঝিতে পারে না। তাহাদের দেহ মনের উপর এমন এক মোহাবরণ পড়িয়া যায় যে; তাহা ভেদ করিয়া উপরে আর দৃষ্টি চলে না, কাজে কাজেই হিন্দুকে বুঝিতে পারে না। সবই একরূপ দেখে ও একরূপ ভাবে। হিন্দু তাহা বেশ বুঝে কিন্তু তাহারা তাহা কিছুই বুঝে না। হিন্দু তাহা বুঝে বলিয়াই, আত্মরক্ষার জন্য বিধিমত চেষ্টা করিয়া থাকে। তাহারা তাহা বুঝে না বলিয়া সব "এক সা করিবার চেষ্টা করিতেছে। হিন্দুর ইহাই পরম দুঃখ। তাই নিবেদন এ দুঃখ প্রদানের আর চেষ্টা করিও না।

তোমাদের মতে তোমরা থাক, হিন্দুকে আর টানিও না। ভগবানের নিকটও একটু খালাস থাকা কর্ত্তব্য। নিজে গোল্লায় যাইতেছ, তাহাই ভাল, অপরকে গোল্লায় দিবার আর চেষ্টা করিও না।

চতুর্থ—নিয়ম প্রণয়নের অধিকার সকলের ক্ষমতাধীন নহে। গান্ধী এমন একটা অমানুষিক শক্তিসম্পন্ন লোক নহেন যে তাঁহা দ্বারা অভ্রান্ত সত্যরূপে কোন নিয়ম প্রণীত হইতে পারে। চক্ষের উপর একখানা পর্দ্দা ঝুলাইয়া দিলে যাঁহার দৃষ্টিশক্তি ব্যাহত হয়, আর দৃষ্টি চলে না, তিনি আর কতটুকু দেখিবেন? অতি অল্প মাত্র। বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের পর কি ঘটিবে তাহা যিনি বলিতে পারেন না, তাঁহার জ্ঞানই বা কতটুকু? অতি সামান্য মাত্র। এক কথায় যিনি ভূত ভবিষ্যৎ বেত্তা নহেন, সর্ব্বজ্ঞ নহেন, সর্ব্বদর্শী নহেন, অন্তর্য্যামিত্বশক্তি সম্পন্ন নহেন, অনিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন নহেন, তিনি অতি সাধারণ লোক। সেই সাধারণ লোকের ন্যায় শক্তি লইয়া নিয়ম প্রণয়নের অর্থাৎ নূতন একটা কিছু গড়িবার দাবী করা অতীব ধৃষ্টতা। তাহার মত ধৃষ্ট দাম্ভিক লোক জগতে নাই। তাহার নিয়ম করা ধৃষ্টতা, সেই নিয়ম পালন করা ধৃষ্টতা, ফলও মূর্ত্তিমান ধৃষ্টতা বা বিনাশ। পাপের ফল আর কি হইবে?

এই সমস্ত সাধারণ লোককৃত নিয়ম হইতেছে ঠেকিয়া শিক্ষা, নিয়ম। আজ এক নিয়ম করিলাম, কালই তাহার ভুল বুঝিলাম; পরে তাহা ভাঙ্গিয়া আর একটী নিয়ম করিলাম, আবার তাহার ভুল ধরা পড়িল; আবার তাহা ভাঙ্গিয়া আর একটী গড়িলাম, আবার ভাঙ্গিলাম;—এইরূপ ভাঙ্গা ও গড়া, ভাঙ্গা ও গড়া—ইত্যাদি ভাবে তাহার নিয়ম প্রণয়ন কার্য্য চলিতে থাকে। উহা হইল মূর্খের বা অল্পবুদ্ধির নিয়ম প্রণয়ন রীতি। এ রীতি পাশ্চাত্যদেশের রীতি। ইহা ক্রমোন্নতিপরায়ণ—তন্ত্রমূলক রীতি। ইহাকে "Survibal of the fittest" বলে। উহা আমাদের রীতি নহে। আমরা প্রধানতঃ ক্রমাবনতি পরায়ণ তন্ত্র লোক। তবে ক্রমোন্নতি পরায়ণতা মতও আছে। তাহা আমাদের অর্থাৎ বিশুদ্ধ আর্য্যগণের পক্ষে নহে, তাহা অনাচার্য্যের পক্ষে। ব্রহ্মের বিবর্ত্তন ক্রমে অংশ, অংশাংশ, কল, কলাংশ, তাহার অংশ—ইত্যাদি ক্রমে আমাদের অর্থাৎ বিশুদ্ধ আর্য্যগণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও উচ্চ শ্রেণীর সৎ শূদ্রগণের সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং আমরা ব্রহ্ম হইতে অবনত হইতে কর্ম্মসূত্রে এইখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। ইহাই ক্রমাবনতি। আবার তপস্যা দ্বারা পুনরায় সেইখানে যাওয়া অর্থাৎ ব্রহ্মে লীন হওয়াই আমাদের মূল লক্ষ্য। তাহাই মুক্তি। এবং ইহাই হইল ক্রমাবনতিপরায়ণতা।

আবার ক্রমোন্নতি পরায়ণতা ও আছে। তাহা আর্য্যগণের পক্ষে নহে, অনার্য্যগণের পক্ষে। অনার্য্য অর্থাৎ যত সব নিম্নশ্রেণীর শূদ্র, জঙ্গলি ও পার্ব্বতীয় জাতীয় লোক তাহারা সেই ভাবে সৃষ্ট। অর্থাৎ ক্রমোন্নতি ক্রমে—উদ্ভিজ্জ স্থাবর ও পশু হইতে ক্রমশঃ মানুষাকারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এবং কেহ কেহ ক্রমশঃ খুব উন্নতিলাভ করত কোন কোন বিষয়ে

একটু শ্রেষ্ঠতাও লাভ করিয়াছে। তাহারাই হইল ক্রমোন্নতি পরায়ণতন্ত্র লোক। ইহাই হইল আমাদের শাস্ত্রসম্মত মত। নইলে পাশ্চাত্য রীতি আমাদের রীতি নহে। অতএব সেই অতীন্দ্রিয় শক্তিসম্পন্ন ঋষি-প্রণীত নিয়ম তাহা নহে। ঋষিদিগের নিয়ম অভ্রান্ত সত্য তাঁহারা দিব্য চক্ষে ও দিব্য জ্ঞানে ভূত বিষ্যৎ বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ দেখিয়া ও জানিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহাই সত্য হইবে, না এ সব সাধারণ লোককৃত নিয়ম সত্য হইবে?

শুধু দিব্য চক্ষে দেখা ও দিব্য জ্ঞানে জানাই বা বলি কেন। তাঁহারা অনেকেই বহু বৎসরজীবী ছিলেন। সুতরাং তাঁহারা এই চর্ম্ম চক্ষেই সব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। মহর্ষি মার্কণ্ডেয় কল্পজীবী। সুতরাং তিনি বহু সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন। তাই যুধিষ্ঠিরের বনবাসকালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—ভগবন্! আপনি ত বহুবর্ষজীবী; সুতরাং যুগ চতুষ্টয় বহুবার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আমাকে কলিতেও কিছুদিন থাকিতে হইবে। অতএব কলিযুগের বিষয় আমার নিকট বর্ণনা করুন।" তাই যুধিষ্ঠিরের নিকট তিনি কলির হাল সব বর্ণনা করিয়াছিলেন। যেরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন তাহা এক্ষণে অক্ষরে অক্ষরে বলিতেছে। মহাভারতে সব আছে।

অতএব ঋষিবাক্য অবহেলা করিয়া ঐ সব বর্ব্বরের বাধ্য হইয়া চলিও না। উহার ফল অকাল মৃত্যু জানিবে। ঋষিগণ কলিযুগোপযোগী নিয়ম প্রণয়ন করিতেও ভুলেন নাই। তোমরা যে কতকগুলি ক্রমশঃ এইরূপ জন্মিবে তাহাও তাঁহারা জানিতেন। তোমাদের মত তাঁহারা অল্পজ্ঞানবিশিষ্ট ছিলেন না। তাঁহারা অতীন্দ্রিয় শক্তিসম্পন্ন, ভূত ভবিষ্যৎ বেত্তা সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ ছিলেন। সুদূর ভবিষ্যতে কলিতে লোক কেমন হইবে, তাহাদের নিয়ম কিরূপ প্রণয়ন করা কর্ত্তব্য, তাহারা দিব্য চক্ষে সব দেখিতেন ও দিব্য জ্ঞানে সব জানিতেন। তদনুসারে কলির লোকের পক্ষে যাহা মঙ্গলজনক নিয়ম তাহাই তাঁহারা প্রণয়ন করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহাই শুধু পালন করিয়া যাইলেই তোমাদের অশেষ কল্যাণসাধন হইবে। তোমাদিগকে খুব মাথা ঘামাইয়া আর নূতন নিয়ম আবিষ্কার করিতে হইবে না। তাহা করিলে ঘোর অকল্যাণই হইবে। ঋষিনির্দ্দিষ্ট পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজের আবিষ্কৃত পথে চলিলেই একবারে সদ্য অকাল মৃত্যু জানিবে।

তোমাদের কৃত নিয়ম যে কিছু নহে, উহা ঠেকিয়া শিখা নিয়ম তাহা একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দ্বারা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখান কর্ত্তব্য। নইলে তোমরা বুঝিবে কেন? তোমাদের গুরুদেব গান্ধী প্রবর Civil disobi dience (আইন অমান্য) প্রথমে তাঁহার স্বগ্রামে করিবেন বলিয়া প্রচার করেন। তাহার ফলে চৌরা চৌরাতে খুব দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়, খুন জখমও হয়। তাহাই শুনিয়া তোমাদের গুরু ধরাসনে পতিত হইয়া উপবাসের দ্বারা স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন ও আইন অমান্যের কল্পনা পরিত্যাগ করেন। স্মরণ হয় কি? কিন্তু ঋষি প্রণীত নিয়ম তাহা নহে। তাহা ভ্রম প্রমাদশূন্য।

একটা কিছু নিয়ম করিলেই হয় না, তাহার ফলাফল বুঝিবার শক্তি চাই। তোমাদের কাহারও তাহা নাই। সে শক্তি সকলের থাকে না। তপস্যালব্ধ অতীন্দ্রিয় জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির তাহা থাকে। অন্যের থাকে না। ঋষিগণ সেই শ্রেণীর লোক। সুতরাং তাঁহাদের বাক্য অভ্রান্ত সত্য। যদি মঙ্গল কামনা কর, তাহা হইলে সেই সত্য পথ ধরিয়া চল, উন্নতি হইবে, অন্যথা সুদারুণ অধোগতি ইহা সুনিশ্চিত জানিবে।

বলিবে হিন্দুর এমন উৎকৃষ্ট নীতি সত্বেও আজ এ দুর্দ্দশা কেন? এ ঘোর অবনতি কেন? ঠিক কথা উত্তর প্রভুদেরই কল্যাণে। প্রভুরা দিন দিন ঐ নীতিমার্গ ত্যাগ করিয়া নূতন নীতিমার্গ ধরিয়াছেন বলিয়াই ত এই দুর্দ্দশা। আবার সুমতি ধর, সুপথে চল, যবন ম্লেচ্ছ মার্গ ত্যাগ পূর্ব্বক আবার হিন্দুনীতি মার্গে চল, আবার ঠিক উন্নতি হইবে, যাহা ছিলে তাহাই হইবে।

পঞ্চম মিথ্যা দ্বারা ভিত্তি স্থাপন করিলে তাহা মিথ্যা হইয়া যায়, অর্থাৎ তাহা টেকসই হয় না; পক্ষান্তরে সত্য দ্বারা ভিত্তি স্থাপন করিলে তাহা সত্য হয় অর্থাৎ টেকসই হয়। ইহা একটী স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত। ধর্ম্মই সত্য, অধর্ম্ম মিথ্যা। সুতরাং ধর্ম্মের দ্বারা ভিত্তি গড়িলে তাহা সুদৃঢ় ও অক্ষয় হয়, পক্ষান্তরে অধর্ম্মের দ্বারা ভিত্তি প্রস্তুত করিলে তাহা ক্ষণভঙ্গুর হয়, বালির বাঁধের ন্যায় ভাসিয়া যায়।

তোমরা non Co-opertion বা অসহযোগ নীতির উপর স্বরাজের ভিত্তি স্থাপন করিতে চাহিতেছ। বেশ! এক্ষণে অসহযোগ জিনিষটী কি তাহা বোধ হয় দেখা অন্যায় নহে। অসহযোগের দুইটী মূর্ত্তি আছে। একটী ধর্ম্মজনিত মূর্ত্তি অপরটী অধর্ম্ম জনিত মূর্ত্তির। ধর্ম্ম জনিত মূর্ত্তির মূল বৈরাগ্য। বৈরাগীর উদয় হইলেই অসহযোগ হয়, অসহযোগ অর্থাৎ কিছুরই সহিত যোগ অর্থাৎ সঙ্গ বা আসক্তি থাকে না সংসারের যাবতীয় পদার্থের সহিত মনের কোনরূপ সংস্রব না রাখা অর্থাৎ একদম সব ত্যাগ করিয়া ভগবানের পাদপদ্মে মনো-নিবেশ করা। সুতরাং ইহাকে তীব্র বৈরাগ্য বলে। এই তীব্র বৈরাগ্য জনিত যে অসহযোগ ইহা অ-সহযোগের ধর্ম্ম জনিত মূর্ত্তি। ইহা অতি উত্তম। ইহা কচিৎ কোন ভাগ্যবানের অদৃষ্টে ঘটে। সারা বাঙ্গালায় পাঁচশত বৎসরের মধ্যে একমাত্র গৌরাঙ্গ দেবের এই তীব্র বৈরাগ্য হইয়াছিল। সুতরাং উহা যে সে ধন নহে।

কিন্তু এ অ-সহযোগে পার্থিব কিছুই নাই। রাজ্য নাই. ঐশ্বর্য্য নাই, ঘর বাড়ী স্ত্রী পুত্র আত্মীয়-স্বজন কিছুই নাই। বরং ঐ সব ত্যাগই এই অসহযোগের ভিত্তি। সুতরাং এই জাতীয় অসহযোগ তোমাদের অসহযোগ নহে—ইহা ঠিক। কেন না তোমাদের কামনাই হইল রাজ্যৈশ্বর্য্য ইত্যাদি।

তোমাদের অ-সহযোগ ব্যক্তি বিশেষের প্রতি বিদ্বেষ প্রসূত। কাহারও নিকট কিছু চাহিয়া বিশেষ গরজ করিয়া চাহিয়াও না পাইলে তাহার উপর ক্রোধ হয়, বিদ্বেষ হয়, ক্ষমতায়

কুলাইলে তাহাকে "এক ঘরে" করিতে ও ইচ্ছা হয়। তোমাদের এ অ-সহযোগ ঐ এক ঘরে' করা।

তোমরা গভর্ণমেণ্টের নিকট স্বরাজ চাহিয়া পাও নাই তাই অভিমানে এই অ-সহযোগ। ইহার জনক হইতেছে বিদ্বেষ। বিদ্বেষ অধর্ম্মের প্রকট মূর্ত্তি। সুতরাং এ অ-সহযোগ ও অধর্ম্ম জনিত। যাহা অধর্ম্ম জনিত তাহাও অবশ্যই অধর্ম্ম। যাহা অধর্ম্ম তাহা মিথ্যা। সুতরাং তোমার এ অ-সহযোগ নীতি ও মিথ্যা। এই মিথ্যানীতির উপর যে অট্টালিকা স্থাপন করিতে যাইবে তাহা ও মিথ্যা হইবে। বালির বাঁধের ন্যায় ধ্বংশ প্রাপ্ত হইবে। অধিকন্তু দেশে অন্য প্রকার বহু অনিষ্ট সাধন করিবে।

একটী অনিষ্ট জনক ফল প্রত্যক্ষ করিতেছি। তোমাদের ঐ নন্‌কো অপারেসনের ফলে আজকাল অনেক ঘরেই নন্‌কো-অপারেশন হইতেছে। কথায় কথায় পিতা-পুত্রে নন্‌-কো অপারেশন, ভাই ভাইয়ে নন্‌-কো-অপারেশন, স্বামীস্ত্রীতে নন্‌-কো-অপরাশেন, পাড়াপড়শীর ভিতর নন্‌-কো-অপারেশন,—এইরূপে নন্‌-কো-অপারেশন রূপ বিষবৃক্ষের ফল সর্ব্বত্রই কিছু কিছু অনুভূত হইতেছে। সুতরাং যাহা হইবার তাহা ঠিক ঠিকই হইতেছে এবং যাহা হইবার নহে তাহা কদাচিৎ ও হইবে না। ইহা সুনিশ্চিত, যে জিনিষ যেরূপ তাহার ফলও ত তদ্রূপই হইবে। যেমন বৃক্ষ, তেমনি ফল॥ বিষ বৃক্ষের ফল ও উগ্র হলাহল। উহা খাইলে সদ্য মৃত্যু। সুতরাং সর্ব্বথা পরিত্যজ্য।

তারপর তোমরা non-Co-opertion বা অ-সহযোগ নীতি আবিষ্কার করিয়া মনে ভাবিতেছে উহা এক আনকোরা নুতন কিছু আবিষ্কার করিলে। কিন্তু তাহা নহে। আমরা উহা বহুপূর্ব্ব হইতেই জ্ঞাত আছি। আমরা সামাজিক শাসন ঐ নীতি অর্থাৎ এক-ঘরে করিয়া রাখা নীতি অবলম্বন করিয়া থাকি। সুতরাং উহা আমাদের অজ্ঞাত বিষয় নহে। সুতরাং নুতন কিছু কর নাই, গর্ব্বেরও কিছু নাই। "যা নাই ভারতে, তা' নাই ভারতে' কথাটী স্মরণ রাখিও।

কিন্তু সামাজিক ব্যাপার ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপার এক নহে। দুইটী বিভিন্ন পদার্থ। সমাজ নিরীহ, কিন্তু রাষ্ট্র প্রবল পরাক্রান্ত ভীষণ পদার্থ। সমাজ নিরীহ, তাই শাসন নীতিও অতি নিরীহ নীতি। কাজেকাজেই ঐ একঘরে করিয়া রাখা নীতি দ্বারাই নিয়ম মত উত্তমরূপে সামাজিক শাসন কার্য্য চলিতেছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যাপার তাহা নহে। কাজেই উহার নীতিও অতি ভয়ঙ্কর। উহাতে মারামারি, কাটাকাটি আছে, রক্তারক্তি আছে, শাল শূল ফাঁসি আছে, জেল আছে জবরদস্তি আছে আরও কত কি আছে। অতএব উহা নিরীহ ব্যাপার নহে। সুতরাং উহাতে ঐ নীতি (নিরীহ নীতি) খাটিবে কেন? রাষ্ট্রীয় ব্যাপারই হইল হিংস, তোমার নীতি হইল অ-হিংস। সুতরাং সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব। কাজেকাজেই লাভ ও হইবে অশ্ব ডিম্ব। যাহা পরাক্রম প্রকাশ ব্যতীত, বীরত্ব প্রকাশ ব্যতীত লাভ করা যায় না, তাহা যদি "কত রবি জ্বলে, কেবা আঁখি মেলে"র দ্বারাই লাভ হইত, মিঞা

ভাই, চাচা মিঞা বলিলেই পাওয়া যাইত, তাহা হইলে আর জগতে যুদ্ধ বিগ্রহ বলিয়া কোন কথাই থাকিত না।

ভাল, না হয় তথাপি ও মানিলাম তোমার দুর্জ্জয় অ-সহযোগ নীতির প্রবল প্রতাপে গভর্ণমেণ্ট পঙ্গুই হইলেন, এবং পাততাড়া গুটাইয়া সাগর পারেই যাইলেন, সব স্বীকার করিলাম। বলি তখন তোমার 'ম্যাও" ধরিবে কে? তুমি কি মনে ভাব ইংরাজ রাজ তক্তা ছাড়িলেন, তুমি তাহার উপর চাপিলেন আর অমনি কলের মত তোমার রাজ্য চলিতে থাকিল? 'কেমন" কিন্তু তাহা নহে। তুমি যে ঢাল তরবারি বিহীন নিধিরাম সর্দ্দার। তাহার উপায় কি? রাজ্য কি ক্ষণকাল ও শাসন বিহীন থাকিতে পারে? কখনও নহে। তাহা হইলে দেশে যে ঘোর অরাজকতা হইবে, সকলেই স্ব-স্ব-প্রধান হইবে, সবলে দুর্ব্বলের উপর উৎপীড়ন করিবে, চুরি ডাকাতি হইবে, খুন জখম হইবে ইত্যাদি ভাবে সে এক বিভৎস কাণ্ড উপস্থিত হইবে। তাহার উপর চারিদিকে যে বাজ ও চীল উড়িয়া বেড়াইতেছে তাহারা যে আবার ছোবল মারিয়া তোমার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইবে না তাহাই বা কে বলিল? যদি বল দৃষ্টি দাতা আছে, পার্শ্বরক্ষক আছে সুতরাং ভয় নাই। বুঝিলাম কিন্তু তিনি যে "খাল কাটিয়া আনিত কুমীর" হইবেন না তাহাই বা কে বলিল? রক্ষক ভক্ষক হইবে না কে বলিল? তুমি ত স্বয়ং তাহার ভুক্তভোগীই সুতরাং সব জ্ঞাত আছ। তারপর দেশের মধ্যে ও ছোটখাট চিল আছে; দাঁড়কাক আছে, জাতি কাক আছে; তাহারাও যে তোমার মাংসখণ্ডের জন্য লোলুপ না হইবেন তাহাই বা কে বলিল? সুতরাং আগেই হৈ-চৈ, নাচা নাচি করিলেই হয় না। আগে ম্যাও ধরার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য, তারপর অন্য কথা।

চারিদিকে বিবেচনা করিয়া দেখিলে তোমার পক্ষে গভর্ণমেণ্টের কৃপা ভিক্ষাই শ্রেয়ঃ। বোধ হয় নিরীহ good boy সুবোধ হইয়া থাকিতে পারিলে একদিন অবশ্যই উদার গবর্ণমেণ্টের দয়া ও হইত। গভর্ণমেণ্ট দয়া করিয়া তোমাকে স্বরাজ দিলেও যথারীতি তোমাকে গদিতে বসাইলেও তোমাকে হাতে ধরিয়া কাজ করাইলে ও অভিভাবকরূপে তোমার নিকট কিছুদিন বর্ত্তমান থাকিলে, তুমি হয় ত আপনার পায়ের উপর দাঁড়াইতে পারিতে। অন্যথা সব পণ্ড হইবে। মনে রাখিও ইহা ছেলে খেলা নহে।

স্রষ্ঠা—স্বরাজ লাভের পন্থা উহা নহে। সে পথ স্বতন্ত্র। স্বাধীনতা ধনকে লাভ করিতে হইলে স্বাধীন হইয়া লাভ করিতে হয়। যেমন ভগবানকে লাভ করিতে হইলে ভগবান হইয়া লাভ করিতে হয়, উহাও ঠিক তেমনি। ভগবান তপস্যালব্ধ সামগ্রী। বিনা তপস্যায় ভগবৎ সন্দর্শন লাভ হয় না। তপস্যা দ্বারা ক্রমশঃ অসৎভাব বিদূরিত হইয়া সদ্ভাব বা সৎশক্তি বা ভগবৎ শক্তি দ্বারা দেহ পরিপূর্ণ হয়। এইরূপে দেহ মন সম্পূর্ণরূপে ভগবদ্ভাবে পরিপূর্ণ হইলেই সাধক ভগবৎ সদৃশ হয় এবং তখনই তাহার সিদ্ধি এবং তখনই তাহার ভগবাদ্দর্শন লাভ ঘটে।

অতএব ভগবান হইয়া ভগবানকে লাভ করিতে হয় অন্যথা ভগবদ্দর্শন লাভ সুদূর পরাহত। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার দেহ মনে মানুষভাব থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ভগবদ্দর্শনের আশা বৃথা।

স্বাধীনতা ধন সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। উহাও ঐরূপে লব্ধ হয়। অর্থাৎ উহাও স্বাধীন হইয়া লাভ করিতে হয়। পরাধীনতার সুদৃঢ় নিগাড়ে আপনাকে অষ্ট-বন্ধনেবাঁধিয়া উহা লাভ করা যায় না। সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিতে হয়। যেমন শিবাজী প্রতাপ সিংহ প্রভৃতি করিয়াছেন। তাঁহারা স্বাধীন হইয়া স্বাধীনতা রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন। পরাধীনে থাকিয়া কিছুই করেন নাই এবং তাহা হয় ও না। ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

সপ্তম—বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা একটা কথাই আছে। সুতরাং তাহা বিনা রক্ত পাতে হয় না। রক্ত দিবার শক্তি। আত্ম বলিদানের ক্ষমতা এখনও তোমাদের হয় নাই। এখনও অনেক বিলম্ব আছে। মুর্খের দল গ্রহের প্রভাব মানে না। কিন্তু গ্রহের প্রভাব ব্যতীত ও কিছু হয় না। রাজ্য প্রদানের অধিকার মঙ্গল গ্রহের। তাঁহার দৃষ্টি পড়িতে এখনও বিলম্ব আছে। এতকাল প্রতীচ্যের দিকেই তাঁহার পূর্ণ দৃষ্টি ছিল। এখন ক্রমশঃ সে দৃষ্টির পরিবর্ত্তন হইতেছে। নেক্-নজরে জাপের দিকে দৃষ্টি পড়ায় জাপ উঠিয়াছে। আবার চীনকে তুলিবার চেষ্টা হইতেছে। তারপর ভারতের পালা। ভারতকে ও উঠাইবেন। কিন্তু তাহার এখনও কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। যদি অসময়ে বৃথা আস্ফালন কর তাহা হইলে কাঁধ বদলান সার হইবে একের জোঁয়াল অন্যের ঘাড়ে উঠিবে। উহা অপেক্ষা যাহা আছে তাহাই ভাল। অতি উত্তম রাজা অতি সুশাসন। বেশ আছি। এমনটী দ্বিতীয় পাইবে না।

অষ্টম—অতএব তোমাদের এখন গুণ সঞ্চয়ের কাল। তোমরা গুণ সঞ্চয় কর, গুণী হও। যুধিষ্ঠিরের ন্যায় মহাধর্ম্মপরায়ণ ও তেজস্বী রাজাকেও আপনার প্রাপ্য পৈতৃক রাজ্য উদ্ধারের নিমিত্ত বহুবিধ তপশ্চরণ করিতে হইয়াছিল মহাভারতের কথা সব জান। অতএব তোমরাও এখন কঠোর তপশ্চরণ কর। হিংসা-দ্বেষ পরিহার কর সংযমীহও, কাল পাহাড়ি বুদ্ধি ত্যাগ কর। স্বধর্ম্ম যেমনটি আছে বিশেষভাবে তাহাই অবলম্বন কর ব্যভিচার বুদ্ধি ত্যাগ কর, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই হিন্দুর বৈশিষ্ট্য তাহা বিধিমতে পালন কর। এইরূপে ধর্ম্মের রীতিমত সেরূপ তপশ্চরণ করিলেই স্বাধীনতা তোমাদের করতল গত হইবে। অন্যথা গৃহ বিবাদ ও অরাজকতায় দেশ উৎপন্ন যাইবে।

তোমরা নিজকে খুব বুদ্ধিমান ভাবিতেছ, যেন অত বুদ্ধি আর কাহারও নাই এইরূপ ধারণা। ইহা সম্পূর্ণ ভুল। আপনাকে যে ঐরূপ বুদ্ধিমান ভাবে সে অতি নির্ব্বোধ। সে জানে না যে বোদ্ধার উপর বোদ্ধা আছে, বাবার উপর বাবা আছে। তুমি অতি বুদ্ধিমান তাই মনে ভাবিয়াছ ইংরেজরাজ পঙ্গু হইয়া সাগরপারে যাইলেই আমরা গিয়া সেই তক্তায় বসিব আর অমনি এইরূপ কলের মত রাজ্য চলিবে, মহাসুখে কাল কাটাইব। উহা

আকাশ কুসুম চিন্তা। উহা শুধু আকাশেই থাকিবে, বাস্তব জগতে কদাচ ও তলা ফুটিবে না। সে আশা করিও না।

অষ্টম—তোমরা কংগ্রেস করিয়াছ; নাম 'অখিল ভারতবর্ষীয় রাষ্ট্রীয় সমিতি।" নামে "অখিল," কার্য্য "খিল" অর্থাৎ অর্গলবদ্ধ। সকল সম্প্রদায়ের প্রবেশ নিষেধ। এমন সমস্ত নিয়ম করিয়াছ যে সকলের অন্ততঃ প্রকৃত নিষ্ঠাবান হিন্দুর তাহাতে প্রবেশাধিকার নাই। ইহা কি ন্যায় সঙ্গত কার্য্য? বোধ হয় না।

তুমি স্বাধীন না হইতেই স্বাধীন বলিয়া মুখে ঘোষণ করিতেছ; রাজ্য না পাইতেই রাজার রাজা মহারাজা উপাধি লইতেছ; রাজশক্তি লাভ না হইতেই আগেই আইন প্রণয়ন করিতেছে এবং সে আইনে হিন্দুর বুকে ছুরী মারিবার ব্যবস্থা করিয়াছ। স্বরাজ লাভ না হইতেই যাহার এত বড় কুবুদ্ধি স্বরাজ প্রাপ্ত হইলে সে কত কি করিতে পারে তাহার সীমা নাই ও তাহা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং তোমার এবম্বিধ স্বরাজের পক্ষপাতী হিন্দুগণ নহে এবং এরূপ স্বরাজ হিন্দুগণ চাহে না। চিরকাল পরাধীন থাকি তাহা ও শতগুণ মঙ্গলজনক তথাপি জাতি কুল ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া ঐরূপ স্বরাজ চাহি না। হিন্দুগণ চাহে না।

তুমি জাতি কুল ধর্ম্ম মাননা। বেশ তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু আমি মানি। দেশ তোমারও, আমারও; উভয়কেই দেশে থাকিতে হইবে। কেমন করিয়া থাকা যায়! ইহার সামঞ্জস্য কিসে হয়! হয় আমি "তুমি' হই, না হয় তুমি "আমি" হও, তাহা হইলে স্বচ্ছন্দে বাস করা চলে, সামঞ্জস্য হয়।

কিন্তু তাহা যদি না হয় তাহা হইলে কেমন করিয়া সামঞ্জস্য হইবে! উভয়ের জাতি কুল ধর্ম্ম বিষয়ে ব্যক্তিগত স্বাধীন মত বজায় রাখিয়া অন্য সাধারণ স্বার্থ বিষয়ে এক মত হইয়া কায করা চলে। আমরা সেই ভাবের পক্ষপাতী এবং তাহাই ন্যায় সঙ্গত সামঞ্জস্য কিন্তু তুমি তাহা মান না। তুমি আমাদের সকলকেই জোর পূর্ব্বক "তুমি" করিয়া লইতে চাহিতেছে। তুমি সবই "একস্য" করিতে চাহিতেছ। ইহা অসম্ভব উহার পরিণাম ফল গৃহ বিবাদ আত্মীয় কলহ, তাঁহার পরিণাম সব পণ্ড ও বিনাশ কিন্তু তোমার এতবড় দুর্ব্বুদ্ধি। যে তুমি কিছুতেই তাহা বুঝিতেছ না।

জাতিভেদে তোমরা বড়ই নারাজ! কেন? এত নারাজ কেন? তোমরা নারাজ যতখানি কিন্তু তাহার কারণ ততটা নাই। শুধু গায়ের জোরে বলিলেই হইবে না। জাতিভেদ রূপান্তরে অল্পবিস্তর সর্ব্বদেশেই ত বর্ত্তমান আছে। আমাদের জন্মগত বলিয়া আমরা দোষী অন্য দেশে জন্মগত নয় বলিয়া নির্দ্দোষ। নইলে জাতিভেদের প্রকারভেদ সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান। বিলাতে একজন লর্ড বংশীয় লোক নীচ জাতীয় মেথর প্রভৃতির সহিত কি এক টেবিলে খানা খায়? না, তাহার হাতে কন্যাই সম্প্রদান করে। কখনও তাহা করে না। লর্ডে লর্ডেই কার্য্য হয়, ঐরূপ জেণ্ট্রী, জেণ্ট্রীতে কার্য্য হয়? কমনে

কমনে কার্য্য হয়, মেথরে মেথরেই বিবাহাদি কার্য্য হয়। ইহাকে কি বলিবে? ইহাও জাতিভেদেরই রূপান্তর এবং ইহা অনিবার্য্য। ইহা না হইয়াই পারে না এরূপ কিছু না থাকিলে সংসার অচল হয়। তোমার স্থূল বুদ্ধিতে উহা ধারণার অতীত বিষয়।

সুতরাং সংসার উত্তমরূপে চলিবার পক্ষে ঐরূপ বস্তুতঃ রূপান্তরের জাতিভেদ ও প্রয়োজন তাই সর্ব্বত্রই তাহা আছে। আমাদের জাতিভেদ অতিউচ্চ বিজ্ঞান সম্মত তাঁহার মর্ম্ম তোমার বুঝিবার শক্তি নাই। সুতরাং তাহা বলাও বিড়ম্বনা। তবে সংক্ষেপে একটু বলা ও দরকার। তাই শাস্ত্রীয় ভাবে নহে, সাধারণ ভাবে সাধারণ জ্ঞানের কথা বলিব।

আমাদের জাতিভেদ স্বাভাবিক বা প্রকৃতিগত বা অকৃত্রিম যে হেতু ইহা ভগবৎ সৃষ্ট। তুমি তাহাই দেখিয়াই নাসিকা কুঞ্চিত করিতেছে যেহেতু তুমি বুদ্ধিমান। বুদ্ধিমান ত সকল গায়, বুদ্ধির মান কচু, তাই যাহা দেখ, কিছুই বুঝ না, বুঝিবার চেষ্টা ও নাই। শক্তিও নাই, তাই তাহাতেই গলা খুস্‌খুসি সার হইতেছে কিন্তু কিছুই তলাইয়া বুঝিবার ক্ষমতা ও নাই।

তুমি আমাদের জাতিভেদ দেখিয়া অবাক হইয়াছ। বেশ! কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময় যে জাতিভেদ রহিয়াছে, তাহা কি তুমি বুঝিতে পার? তাহা বুঝিবার তোমার শক্তি নাই। পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ বৃক্ষ লতা ইত্যাদি সকলের ভিতরেই ত জাতিভেদ আছে। সুতরাং মানুষে থাকিবে না কেন? মানুষেই কি যত দোষ? আর আমরা তাহা বুঝি বলিয়াই কি আমরা দোষী? মন্দ নহে!

একবার দেখা যাক্ ব্যাপার কি, পশু শব্দ কিসের বাচক? অবশ্যই বলিবে জাতি বাচক। অর্থাৎ পশু বলিতে চতুষ্পদ জন্তু মাত্রকেই বুঝাইবে। কিন্তু তাই বলিয়া সকল জন্তুই এক শ্রেণীর জন্তু নহে। তাহার ভিতরে বহু প্রকার আছে। সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তি, মহিষ, গরু, কুকুর, শৃগাল, মুষিক বিড়াল ইত্যাদি শ্রেণীর জন্তুই আছে। ইহা কি পশু জাতির জাতিভেদ নহে! ইহাকে তুমি কি বলিতে চাও? তুমি যাহাই বল, ইহাই পশু জাতীয় জীবের স্বাভাবিক প্রকৃতগত বা ঈশ্বর সৃষ্ট জাতিভেদ জানিব।

এইরূপ পক্ষী শব্দ ও জাতি বাচক শব্দ। সুতরাং পক্ষী বলিলে পৃথিবীর যাবতীয় পক্ষীকেই বুঝায়। কিন্তু তাই বলিয়া সকল পক্ষীই একজাতীয় পক্ষী নহে। উহার ভিতরে ও অনেক প্রকার ভেদ আছে। যথা—ময়না, কাকাতুয়া, কপোত, চড়াই, চীল, বাজ, কাক, শকুনি, গৃধিনী ইত্যাদি। ইহাও পক্ষী জাতীয় জীবের জাতিভেদ জানিবেন।

ঐরূপ বৃক্ষ শব্দ ও জাতি বাচক শব্দ। সুতরাং বৃক্ষ বলিলে সমস্ত বৃক্ষকেই বুঝায়। কিন্তু তাই বলিয়া সকল বৃক্ষই একই বৃক্ষ নহে। উহার ভিতরে নানা শ্রেণী আছে। অশ্বত্থ বট হইতে আরম্ভ করিয়া কলা কচু সবই আছে। সুতরাং উহা ও বৃক্ষ জাতির জাতিভেদ জানিবে।

ঐরূপ কীট পতঙ্গ লতা ইত্যাদি যাবতীয় জীব ও উদ্ভিদের ভিতরেই যে জাতিভেদ আছে তাহা বেশ সুস্পষ্ট অনুমিত হয় ও তাহা পরিষ্কাররূপে দেখান যাইতে পারে। সমস্ত লিখা নিষ্প্রোয়জন, শুধু ইঙ্গিত মাত্র করিয়া যাইলাম।

যেমন অন্যান্য জীব ও বৃক্ষ লতাদি সম্বন্ধে বলা হইল, তেমনি মনুষ্য সম্বন্ধে ও বলা যাইতে পারে। মনুষ্য শব্দ ও অবশ্যই জাতি বাচক শব্দ মনুষ্য বলিতে ও পৃথিবীর যাবতীয় লোককেই বুঝায়। কিন্তু তাই বলিয়া সকল মানুষই এক মানুষ হইবে, তাহার প্রমাণ কি? তাঁহার ভিতর কি ভিন্ন ভিন্ন বা জাতি থাকিতে পারে না? সকল জীবেই আছে, মনুষ্যজীবে থাকিবে না ইহা অসম্ভব। মানুষ ত মানুষ, দেবতাতে আছে। তাই হিন্দুর ঐ জাতিভেদ। তাই হিন্দুর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র ও অন্ত্যজ শঙ্কর জাতি এবং মুসলমান খ্রীষ্টান প্রভৃতি জাতি ইত্যাদি ভাবে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোক পৃথিবীতে বর্ত্তমান আছে। তুমি তাহা মানিবে না কেন? সকল স্থানেই মানিবে কেবল মানুষের বেলায় মানিবে না। ইহা তোমার মন্দ বিচার নহে। তাহা হইলে তুমি একদেশদর্শী। তোমার কথার মূল্য কি? কিছুই নহে। এক দেশদর্শীর কথার মূল্য কিছুই নাই।

জাতিভেদ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞানের কথা যেমন একটি বলা হইল, তেমনি আধ্যাত্মিক ভাবের ও একটী কথা আবশ্যক। জগৎ নির্ম্মান কল্পে শ্রষ্টার সত্ব, রাজ ও তম এই তিনটী গুণের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। তাই জগৎ ত্রিগুণাত্মক বলা হয়। কাজে কাজেই জগতের যাবতীয় পদার্থ ও ত্রিগুণাত্মক। জগতে এমন একটী পদার্থ নাই যাহা এই ত্রিগুণের সমবায় ব্যতীত নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া গুণের সমাবেশ সমভাবে বা তুল্য ভাবে কোন পদার্থেই নাই। তিন গুণই অল্পাধিক পরিমাণ সকল পদার্থেই বর্ত্তমান। কোন পদার্থে সত্বাধিক্য বেশি, কোন পদার্থ রজের আধিক্য বেশি এবং কোন পদার্থ তমের আধিক্য বেশি। সকল গুণই সকল পদার্থেই বর্ত্তমান, কিন্তু ঐ অল্পাধিকভাবে।

এখানে এ কথা বলা বোধ হয় অন্যায় হইবে না যে, এই যে সত্ব রজ তম তিন গুণের কথা উল্লিখিত হইল এতত্ব কথা কেবল হিন্দুগণই জানেন এবং কেবল হিন্দু শাস্ত্রেই এ তত্ব কথা আছে। আর কেহ ইহা জানেন না এবং আর কাহারও শাস্ত্রেও তাহা নাই। বলা বাহুল্য আর কাহারও তাহা জানিবার প্রয়োজন ও হয় নাই। কাজেই তাঁহাদের শাস্ত্রেও তাহা নাই। হিন্দুর প্রয়োজন ছিল, তাই হিন্দুর শাস্ত্রেও তাহা আছে। যেমন কলেজের পাঠ্য স্কুলে থাকে না, এবং স্কুলের পাঠ্য কলেজে নির্দ্ধারিত হয় না, ইহাও তদ্রূপ। ধর্ম্ম জগতে হিন্দু রাজাধিরাজ সম্রাট। কাজে কাজেই তাহার বিদ্যাও তদ্রূপই হওয়া আবশ্যক। তাই তাহার বিদ্যা অধ্যাত্ম বিদ্যা বা ব্রহ্ম বিদ্যা। অধ্যাত্ম বিদ্যা বা ব্রহ্ম বিদ্যাই জগতে সকল বিদ্যার চরম বা সার বিদ্যা, এবং এই বিদ্যাই বিদ্যা বা জ্ঞানরাজ, সকল বিদ্যার সম্রাট। হিন্দু যেমন ধর্ম্ম জগতে অতি উচ্চ অঙ্গের ছাত্র; তাহার পক্ষে সেইরূপ উচ্চ অঙ্গের বিদ্যার

ব্যবস্থাও ভগবান কর্ত্তৃকই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। তাই তাহার বেদাদি শাস্ত্রে এসব তত্ত্ব কথা সন্নিবেশিত আছে এবং বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। অন্য লোক ধর্ম্ম জগতে অনেক নিম্নশ্রেণীর ছাত্র, কাজেই তাহার পাঠ্যপুস্তকও তদনুযায়ী ভগবান কর্ত্তৃকই সৃজিত হইয়াছে। কাজে কাজেই তাহাতে ঐ সব তত্ত্ব কথা নাই। যেদিন যেরূপ প্রয়োজন, ভগবানের সেখানে সেইরূপ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ আছে। ইহাতে "কেন" ও নাই, বাদানুবাদ করিবার ও কিছু নাই। বিধাতার কার্য্য বিধাতা করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন, তাহাতে তোমার আমার বলিবারই বা কি আছে? এবং বলিলে শুনিবে বা কে?

যাহা হউক এসব কথায় আর প্রয়োজন নাই। সে বহু কথা। তাহার ইহা স্থান নহে। এক্ষণে যাহা বলিতেছিলাম—

বলিতেছিলাম সকল গুণই সকল পদার্থেই বর্ত্তমান কিন্তু এই অল্লাধিকভাবে, আবার তিনগুণের ফল বা ক্রিয়াও অবশ্যই বিভিন্ন তিন প্রকারের হইবে। সত্ত্ব আনন্দময়, রজ কর্ম্মময় এবং তম অবসাদময়। সত্ত্বই ধর্ম্মের মূর্ত্তি এবং রজ ও তম অধর্ম্মের মূর্ত্তি। সুতরাং সত্ত্ব গুণই শ্রেষ্ঠ এবং সত্ত্বগুণই সকলের আদরণীয়।

ঐ কথার বিচার বিশ্লেষণে এখানে কোন প্রয়োজন নাই। কথা হইতেছে তিনগুণের অল্লাধিক পরিমাণ লইয়াই জগতের সকল পদার্থ সৃষ্ট। স্থাবর জঙ্গম সকল পদার্থই ঐভাবে সৃষ্ট। তিন গুণ তিন প্রকার ত আছেই, আবার তাহার অল্লাধিক পরিমাণজনিত মিশ্র পদার্থও বহু প্রকার। এইরূপ বৈষম্যই জগতের বৈলক্ষণ্য। সাম্য সাম্য করিয়া চীৎকার করা বিড়ম্বনা। এবং ভগবানকে বিষমদর্শী বলা ও অন্যায় ও পাপ।

স্থাবর জঙ্গম সমস্তই যখন একভাবে সৃষ্ট, সুতরাং মনুষ্যও ঐভাবে সৃষ্ট ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। মনুষ্যের বেলায় নূতন কোন নিয়ম নাই। মনুষ্যও ঐ ত্রিগুণানুসারেই সৃষ্ট। সুতরাং মনুষ্য ও সকলেই একজাতীয় হইবে তাহার কোনই অর্থ নাই। মনুষ্যও সেইজন্যই বিভিন্ন জাতীয়। তাই ভগবানও গীতায় বলিয়াছেন—

চাতুর্ব্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ।

গুণ কর্ম্ম-অর্থ ঐ ত্রিগুণ এবং ত্রিগুণের ক্রিয়া ফল। তোমার স্বকপোল কল্পিত গুণ ও কার্য্য নহে। তোমার কথা হইতেছে আগে কার্য্য তারপর কার্য্যানুসারে গুণ নির্দ্দেশ। উহা হইল মনুষ্যকৃত। কিন্তু আমাদের তাহা নহে। আমাদের হইতেছে আগে গুণ, তারপর গুণানুসারে কর্ম্ম প্রবৃত্তি—ইহা ঈশ্বরকৃত ভগবানের কথার তাৎপর্য্য এবং তাহাই প্রকৃত অর্থ। তাই সত্ত্বাধিকারে ব্রাহ্মণ সৃষ্ট, সত্ত্ব বহুল রাজোধিকারে ক্ষত্রিয় সৃষ্ট; সত্ত্ব ও রজ বহুল রজ ও তমাধিকারে বৈশ্য সৃষ্ট; এবং সত্ত্ব ও রজ যুক্ত তম বহুল তমাধিকারে শূদ্র সৃষ্ট। এইরূপে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র প্রভৃতি সকলেই বিভিন্ন জাতীয় প্রকৃতি বিশিষ্ট বিভিন্ন জাতীয় লোক। ইহা অতি অজ্ঞান বাতুলের প্রলাপোক্তি নহে, ইহা অতি যুক্তিপূর্ণ বিজ্ঞান সম্মত উচ্চজ্ঞানের কথা।

উহাই আমাদের জাতিভেদের মূল। এই মূল নীতি সর্ব্বত্রই প্রযুয্য। জগতের স্থাবর জঙ্গমাত্মক যাবতীয় পদার্থেই এই ত্রিগুণ বর্ত্তমান। এবং কাজে কাজেই স্থাবর জঙ্গমাত্মক সকল পদার্থই ত্রিগুণাত্মক। তাই পৃথিবী ত্রিগুণাত্মিকা। তোমরা ইহা বুঝ না তাই অস্বীকার কর, হিন্দু ইহা বুঝে তাই স্বীকার করে। ইহা বুঝিতে যে শক্তির প্রয়োজন, তোমার তাহা নাই, তাই তুমি বুঝ না। ইহা তোমার Matrial Science এর (বিজ্ঞান) অতীত বিষয়। সুতরাং তুমি কেমন করিয়া বুঝিবে? ইহা বুঝিতে তপঃশুদ্ধ বুদ্ধি, আধ্যাত্মিকতা, অতীন্দ্রিয় শক্তি প্রভৃতির প্রয়োজন। তোমার তাহা নষ্ট তাই তুমি বুঝ না। হিন্দুর তাহা ছিল, তাই হিন্দু তাহা বুঝিয়াছেন ও তদনুসারে সমস্ত নিয়ম বিধি বদ্ধ ও সমাজ গঠিত করিয়াছেন। এখনও বহু হিন্দু ঐরূপ গুণসম্পন্ন আছেন ও তাহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারেন, তাই সজোরে উহা আকড়িয়া ধরিয়া রাখিতে যাইতেছেন, তাঁহারা বরং জীবন প্রদানে ও কুণ্ঠিত হইবেন না, তথাপি তোমার ঐ মিথ্যা প্রথম কার্য্যে ভুলিয়া তাহা ত্যাগ করিবেন না। ইহা সুনিশ্চিত জানিবে। তোমরা এতই মুর্খ ও তোমাদের বুদ্ধি এতই স্থুল যে তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছ না। অতএব এখনও তোমরা সতর্ক হও, বুদ্ধি স্থির করিয়া কার্য্য কর। তোমাদের মতে তোমরা থাক, তাঁহাদের মত তাঁহাদিগকে চলিতে দাও! অতএব এইভাবে মিলে মিশে কার্য্য কর, মঙ্গল হইবে, অন্যথা সব পণ্ড হইবে।

অতএব কি সাধারণ জ্ঞান কি আধ্যাত্মিক জ্ঞান উভয়াবিধ জ্ঞানের দ্বারাই বেশ বুঝা যায় যে, আমাদের এই জন্মগত জাতিভেদ মনুষ্যকৃত নহে, ঈশ্বরকৃত এবং ইহা স্বাভাবিক। এ বিষয়ে এতটুকুও সন্দেহের কারণ দেখা যায় না। বলা বাহুল্য ইহা ঈশ্বরকৃত বলিয়াই স্বাভাবিক বা জন্মগত। নইলে মনুষ্য কল্পনাবলে কিছুই করেন নাই। মনুষ্যকৃত হইলে অন্য দেশের ন্যায়ই সব হইত। কিন্তু ইহা তাহা নহে। তাই ইহা সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ। অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

যাহা ঈশ্বরকৃত তাহা অবশ্যই মঙ্গলজনক। কেননা ভগবান মঙ্গলময়। তিনি অযথা অমঙ্গল জন্য কিছুই নির্ম্মান করেন নাই। সুতরাং আমাদের এ জাতিভেদের উপকারিতাও অবশ্যই আছে। তাহাও সাধারণ জ্ঞানের দ্বারাই বেশ উপলব্ধি হয়।

প্রথমতঃ—যে ব্যক্তি যে ব্যবসা অবলম্বন করে, তাহার সন্তান সন্ততিগণ ও বীর্য্য গুণে সেই জাতীয় সংস্কার জন্ম হইতেই প্রাপ্ত হয়। ইহা এতই যুক্তিপূর্ণ যে, এ সম্বন্ধে কোন আপত্তিই বোধ হয় কাহারও নাই। সুতরাং সেই সব সন্তানগণ সহজাত গুণে পিতৃ ব্যবসা অতি সহজে ও উত্তমরূপে আয়ত্ব করিতে পারে এবং অন্য অপেক্ষা অধিক পারদর্শী হয়। এ বিষয়ে সন্দেহের অবশ্যই কোন কারণ দেখা যায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতে পারি যে, এইজন্যই আমরা দেখিতে পাই, ডাক্তার কবিরাজের ছেলেরা অনেক সময় না পড়িয়াও অল্পাধিক পরিমাণ চিকিৎসা করিতে পারে। কয়েকস্থানে ইহা আমার প্রত্যক্ষ দেখা আছে।

ইহার হেতু কি? ঐ জন্মগত সংস্কার। সংস্কার সহজ জিনিষ নহে। সংস্কারের দ্বারা ঐ বীজটাই বীজরূপে দেহের মধ্যে অবস্থিত থাকে—অথবা সংস্কারই বীজস্বরূপ। কেবল অনুকূল বায়ুর অপেক্ষা মাত্র। অনুকূল চেষ্টা হইতেই ঐ বিদ্যা সহজেই অঙ্কুরিত হইয়া বৃক্ষ ও ফুল ফলে সুশোভিত হয়। ইহা স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত।

ব্যক্তি সম্বন্ধে যেরূপ নিয়ম জাতি সম্বন্ধেও সেইরূপ নিয়ম জানিবে। যাহা জাতিতে তাহা সমষ্টিতেও খাটিবে। সুতরাং যে জাতীয় লোক যে কার্য্য করিবে, তাহার সন্তান সন্ততিগণও সেই কার্য্যে অপর অপেক্ষা অধিক পারদর্শী হইবে। অতএব ব্যবসা বিশেষ জাতি বা সম্প্রদায় বিশেষের হাতে থাকিলে মন্দ হয় না। প্রত্যুত সুফলই ফলে ও ক্রমশঃ উহার উৎকর্ষতা লাভ হয়। আমাদের জাতিভেদ প্রথা দ্বারা তাহাই সংসাধিত হইতেছে। সুতরাং এ হিসাবে জাতিভেদ মন্দ নহে, প্রভুত কল্যাণদায়ক।

দ্বিতীয়তঃ—ঐ প্রকার সম্প্রদায় বিশেষের হাতে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যভার ন্যস্ত থাকিলে সমাজে বেশ একটা শৃঙ্খলতা বর্ত্তমান থাকে। ঠিক যেন কলের মত সামাজিক কার্য্যগুলি সম্পাদিত হয়। আর যাহার যাহা খুসী সে তাহাই করিতে পাইলে ঘোর বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি করে। তাহাতে অত্যন্ত অশান্তির উৎপাদণ করতঃ সমাজ দেহকে নিতান্তই অসুস্থ করিয়া করিয়া ফেলে। তাহা অবশ্যই মঙ্গলজনক নহে। অতএব এ হিসাবেও জাতিভেদ মন্দ নহে।

তৃতীয়তঃ—জাতিভেদে কর্ম্মভেদ; কর্ম্মভেদে বুদ্ধিভেদ; বুদ্ধিভেদে স্বাতন্ত্রতা; স্বাতন্ত্রতায় একনিষ্ঠা; একনিষ্ঠায় সাফল্য বা সিদ্ধিলাভ। এবং ক্রমিক উন্নতিলাভও ইহাতেই। ইহা স্বতঃসিদ্ধ। বস্তুতঃ বুদ্ধির একনিষ্ঠা গতিই উৎকৃষ্ট, বহু বিষয়িণী স্বৈরিণী গতি অতীব নিকর্ম্মা। বলা বাহুল্য উৎকৃষ্ট পথই উন্নতির সাধন, এবং নিকৃষ্ট পথই উন্নতির বাধক বা অবনতির সাধন। ইহা সহজেই উপলব্ধি হয় যে, এক একটী স্বতন্ত্র কার্য্য লইয়া এক একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি নিযুক্ত না থাকিলে তাহার সম্যক আলোচনা হয় না। এবং তাহার উৎকর্ষতা ও লাভ হয় না। একই ব্যক্তিকে যদি ভিন্ন ভিন্ন বহুকার্য্য করিতে হয় তাহা হইলে সে কোন কার্য্যেরই সম্যক উপযুক্ত হয় না। অধিকন্তু মস্তিষ্কের অযথা অতিরিক্ত পরিচালনায়—পরস্পর বিরুদ্ধ বিষয়ক পরিচালনায় হয় ও তাহাতে শীঘ্রই অকাল মৃত্যু আনয়ন করে। উন্নতিও সুদূর পরাহত হয়।

অন্যপক্ষে ঐরূপ নিয়ম না থাকিলে জীবন ধারণই একপ্রকার বিড়ম্বনাময় হয়। কারণ একই ব্যক্তিকে যদি ভিন্ন ভিন্ন বেশ ধারণ করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার জীবন বিড়ম্বনা-জনক নহে কি? যদি একই ব্যক্তিকে কখনও রাজা কখনও প্রজা কখনও পাচক, কখন পূজক কখনও সেব্য, কখনও সেবক, কখনও শিক্ষক, কখনও ছাত্র, কখনও গুরু, কখনও শিষ্য, আবার কখনও কামার, কখনও কুমার, কখনও ধোপা, কখনও নাপিত; কখনও সূত্রধর, কখনও মুচি, মুদ্দফরাশ, হাড়ী, মালী, ডোম, মেথর, ইত্যাদিভাবে কার্য্য করিতে

হয় তাহা হইলে তাহার জীবন বিড়ম্বনাময় নয় কি ? আর ঐভাবে জীবনধারণ কি কখন সম্ভবপরই হয় ? বোধ হয় কখনও তাহা হয় না। সুতরাং এ হিসাবে ঐ জাতিভেদ মন্দ নহে।

চতুর্থতঃ—পূর্ব্বোক্তরূপে যদি সমাজের কার্য্যগুলি বেশ সুশৃঙ্খলতায় সম্পন্ন হয় ও তাহার ক্রমিক উন্নতিবিধানের পথ ও পরিষ্কার হয়, তাহা হইলে সমাজ ক্রমশঃ সুখ ও শান্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এবং সে জাতি ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করে। জগতে সকলেই সুখ, শান্তি ও উন্নতিই কায়মনে প্রার্থনা করে, অন্য কিছু প্রার্থনা করে না; তাহাই যদি উহা দ্বারা লাভ করা যায়, তবে আর কথা কি আছে ?

অতএব জাতিভেদ সর্ব্বথা মঙ্গলেরই নিদান, কদাচ অমঙ্গলকজনক নহে। এবং সে জাতিভেদ জন্মগত হওয়াই অধিকতর শ্রেয়স্কর। আমাদের জাতিভেদ তাহাই।

তাই হিন্দুগণ জাতিভেদ অতীব মঙ্গলজনক বলিয়া আদরে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে সচেষ্ট। তাঁহারা উহা মানবসৃষ্ট বলেন না। উহা ঈশ্বরকৃত স্বাভাবিক বলেন। আমরা উহা মানি ও সেইভাবে চলি। তুমি তাহা মাননা বেশ তাহাতে কোনই ক্ষতি নাই, তোমার না মানায় আমার কোনই আপত্তির কারণ নাই, থাকিতেও পারে না। কিন্তু আমরা মানি বলিয়া তুমি আপত্তি কর কেন ? তুমি আপত্তি করিলেই আমরা ইহা তুলিয়া দিব মনেও ভাবিও না। উহাতে শুধু কলহ, বিবাদের সৃষ্টি করিবে, একতার পরিবর্ত্তে অনৈক্যই হইবে এবং কাজে কাজেই তোমার স্বরাজ প্রাপ্তি ও সুদূর পরাহত হইবে।

জাতিভেদে বা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম হিন্দুগণ কখনও তুলিয়া দিতে পারেন না কারণ উহাই হিন্দুর বৈশিষ্ট্য উহা তুলিলে হিন্দুর হিন্দুত্ব থাকে না, একবারে লোপ পায়। এবং হিন্দু নামটাই জগৎ হইতে উঠিয়া যায়। তোমরা তাহা আদৌ বুঝ না। তোমরা যে বুঝ না তাহা তোমাদের দোষ নহে, তোমাদের শিক্ষায় দোষ। যেরূপ শিক্ষা পাইতেছ। সেইরূপ বুদ্ধি ধরিতেছ। তোমাদের শিক্ষকগণও উহা জানেন না। সুতরাং তোমার শিক্ষক যাহা জানেন না, বুঝেন না, তাহা তুমি কেমন করিয়া শিখিবে ? শিক্ষক যাহা বুঝেন ও জানেন, তুমিও তাহাই শিখিতেছ ও সেইরূপ বুলি বলিতেছ। সুতরাং দোষ তোমার নহে, দোষ তোমার শিক্ষার।

শিক্ষার দোষে তোমার একদম বিপরীত বুদ্ধি জন্মিয়াছে। তাই তুমি সব উল্টা দেখিতেছ এবং বলিতেছ উহা আমাদের কু-সংস্কার তোমরা যেমন আমাদের উহা কু-সংস্কার বলিতেছ। তেমনি আমরা ও তোমাদের ঐ বুদ্ধিকে কু-সংস্কার বলিতেছি। আমরা উহার মর্ম্ম বুঝি, তাই উহা উপাদেয় বলিয়া ধরিয়া রাখিতে চাই। সুতরাং উহা কু-সংস্কার নহে। উহা অতীব সু-সংস্কার। আর তোমরা যে উহার মর্ম্ম বুঝ না, এবং বুঝিবার

ও চেষ্টা কর না, অথচ গুরুমুখে শুনিয়াই উহার নিন্দা কর ও তুলিয়া দিতে চাও। এইরূপ কু-বুদ্ধিই তোমাদের কু-সংস্কার। ইহা প্রকৃতই কু-সংস্কার। কিন্তু আবার মজা এই যে তোমাদের সংস্কার যে প্রকৃতই কু-সংস্কার তাহা তোমরা জান ও না বুঝিতেও পার না। কিন্তু আমরা জানি ও বুঝি। তোমরা যে জাননা ও বুঝ না, তাহা ও তোমরা বুঝ না; কিন্তু আমরা তাহা বুঝি। আবার আমরা যে তাহা বুঝি, তাহা ও তোমরা বুঝ না। ইহাই হইল প্রকৃত অবস্থা।

অতএব দেখা যাইতেছে—আমাদের সংস্কার কু-সংস্কার নহে, তোমাদের সংস্কারই কু-সংস্কার। আমাদের সংস্কার কু-সংস্কারত নহেই, উহা উচ্চ বিজ্ঞান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সু-সংস্কার; পক্ষান্তরে তোমাদের সংস্কারই কু-সংস্কার এবং উহা কুশিক্ষার দ্বারা—কাজে কাজেই অজ্ঞান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কু-সংস্কার। ইহা অসংকোচে ও মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে।

তোমরা এখন ধুয়া ধরিয়াছ জাতিভেদেই ছুঁৎমার্গ বর্ত্তমান, উহাই যত অনিষ্টের মূল। উহার জন্যই একতা স্থাপন হইতেছে না, উহাই একতা স্থাপনের ঘোর অন্তরায় ইত্যাদি। ইহা তোমাদের গুরুতর ভ্রম। একতার সাধক ও বাধক বিষয়ে আদৌ তোমাদের জ্ঞানই নাই। কিসে একতা হয় ও কিসে তৎপক্ষে বাধা জন্মে তাহা তোমরা আদৌ বুঝ না।

একতার মূল সাধক হইল ভালবাসা। ভালবাসা বা গাঢ়প্রেম জন্মিলেই একতা সংস্থাপিত হয় সুতরাং তাহার সঙ্গে জাতিভেদ বা ছুৎমার্গের কোনই সম্পর্ক নাই। আমি একটী অস্পর্শীয় কুকুরকে স্পর্শ না করিয়া বা তাহার উচ্ছিষ্ট ভোজন না করিয়া ও খুব ভাল বাসিতে পারি তাহাতে কোনও বাধা নাই। আবার তাহাকে স্পর্শ করিয়া ও তাহার উচ্ছিষ্ট ভোজনে দ্বিধা বোধ না করিয়া ও তাহাকে ভাল না বাসিতে পারি—তাহাতে ও কোন বাধা নাই। সুতরাং ইহাই সার সত্য যে ভালবাসা জন্মিলেই একতা সম্ভবহয়, অন্যথায় অনৈক্য। সুতরাং একতায় মূল হইল ভালবাসা, অন্য কিছু নহে।

ভালবাসা জিনিষটী হইতেছে ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। তোমরা দিন দিন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অধর্ম্মকে আশ্রয় করিতেছ, কাজে কাজেই ভালবাসা বা প্রেম হৃদয় ক্ষেত্র হইতে উঠিয়া যাইতেছে, তাই তোমরা কাহাকেও প্রাণের সহিত ভালবাসিতে পারিতেছ না, কাজে কাজেই সব অনৈক্য হইতেছে।

নইলে ছুৎমার্গ ত্যাগ করিলেই জাতিভেদ উঠাইয়া দিলেই—সর্ব্ববিষয়ে একাকার হইলেই একতা-সংস্থাপিত হয় তাহা নহে। ইহা তোমাদের সম্পূর্ণ ভুল একটী অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি।

সংসারে স্ত্রীর সহিত যেমন একাকার ভাব এমন আর কাহার সহিত নহে। এখানে জাতিভেদ নাই, স্পৃশ্যাস্পৃশ্য দোষ নাই, সর্ব্বরকমে মিল আছে। আহার বিহারে মিল আছে, মনে মনে মিল আছে, প্রাণে প্রাণে মিল আছে, দেহে দেহে মিল আছে; এক কথায়

একাকারও একেবারে—খাটি একাকার আছে। অধিকন্তু একতার মূল উপাদান ভালবাসা প্রেম ও আছে। সুতরাং এখানে একতার অভাব হইবার কোন ও কারণ নাই, বরং একতা স্থাপনের সর্ব্ববিধ কারণই বর্ত্তমান। ইহা বোধ হয় স্বীকার করিবে।

কিন্তু এবম্বিধ ক্ষেত্রেও সোণার সোহাগা রূপ ক্ষেত্রেও একতার অভাব হইতে দেখিয়াছি। স্বামী স্ত্রীতে কলহ বিবাদ হইয়া স্বতন্ত্র, এমন কি মুখ দেখাদেখি বন্ধ করিয়া ও থাকিতে দেখিয়াছি।

বল দেখি ইহার হেতু কি? কেন এমন হয়? সর্ব্বরকমে একাকার হইয়া ও অতবড় একটা স্বার্থের সম্বন্ধও সুখের সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও কেন এমন অনৈক্য হইল? একতা কেন স্থান পাইল না। ইহার অর্থ কি?

(ক্রমশঃ)

পিতৃযজ্ঞ বাদঃ

লেখক—শ্রীহরেন্দ্র চন্দ্র স্মৃতিতীর্থ

'ভারতবর্ষ' পত্রিকার বিগত অগ্রহায়ণ মাসের সংখ্যায় শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় লিখিত 'পিতৃযজ্ঞ' প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বিস্মিত হইলাম। উক্ত প্রবন্ধে পিতা, পিতামহ প্রভৃতি উদ্দেশে পুত্রগণের অবশ্য করণীয়, শিক্ষিত পরম্পরাপ্রচলিত শ্রাদ্ধকর্ম্মের অনাবশ্যকতা, নানারকমে প্রতিপাদন করিতে তিনি যথেষ্ট প্রয়াস করিয়াছেন। কোন কোন পুরাণে শ্রাদ্ধকর্ম্মের উল্লেখ নাই বলিয়া, শ্রাদ্ধ একটী অর্ব্বাচীন প্রথা। এবং ব্রাহ্মণদিগের অর্থোপার্জ্জনে দুরভিসন্ধি মূলক কল্পনা প্রসূত। এবং ঐতিহাসিক গবেষণায় চীনদেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজকগণের অনুকরণরূপে গৃহীত, ইত্যাদি যুগোপযোগী মুখরোচক যুক্তি, এবং স্বকল্পিত বিষয়ের সমর্থন কল্পে, শাস্ত্রীয় অংশ বিশেষের গ্রহণ এবং প্রয়োজনানুরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা এই ব্যয় সঙ্কোচ আন্দোলনের দিনে অদ্ভুত ও অশ্রুত পূর্ব্ব একটী নূতন তথ্য আবিষ্কার করায় উক্তপ্রবন্ধটী অনেক সমাজেই বিশেষ আদরণীয় হইবে সন্দেহ নাই।

এই সম্বন্ধে কি লিখিব? দুঃখে ঘৃণায় লেখনী রুদ্ধ হইয়া যায়। যে আর্য্যসন্তানগণ, জ্ঞানে গরিমায় পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব ছিলেন। যাঁহাদিগের অতীন্দ্রিয় জ্ঞানশক্তি বলে অতীত ও অনাগত পদার্থ ও করামলকবৎ প্রতীয়মান হইত! যে সময়ে পৃথিবীর অন্যান্য জাতি অপূর্ব্ব জ্ঞান রশ্মিপাত দ্বারা আলোকিত হয় নাই; সেই স্মরণাতীত কল্পে— যে কালের বয়স নিরূপণ করিতে ইতিহাস ও একান্ত অক্ষম; সেইকালেও যাঁহারা ধর্ম্মে কর্ম্মে শিল্পে বাণিজ্যে সর্ব্বপ্রকারে সুসমৃদ্ধ ছিলেন। যাঁহাদিগের দুঃখ দুর্দ্দশা সন্দর্শন করিয়া স্বয়ং ভগবান ও মর্ত্ত্যধামে অবতীর্ণ হইতেন। সেই আর্য্য সন্তানগণ আজ কোন্ অপরাধে এইরূপ সর্ব্বপ্রকারে নিঃস্ব ও বিপর্য্যস্ত হইল? "নহিকল্যাণ কৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত; গচ্ছতি" কল্যাণ কারিতার অভাবেই আমাদিগের সর্ব্বপ্রকারের দুঃখদুর্দ্দশা আসিয়া

উপস্থিত হয় নাই কি? চতুর্দ্দিকে বুভুক্ষিতের আর্ত্তনাদ, দস্যুর উপদ্রব, রোগীর মৃত্যুতালে নর্ত্তন, আত্মকলহ বুদ্ধিভেদ কত কি বলিব? সর্ব্ব বিধ্বংসী যে ভীষণ উচ্ছৃঙ্খল ভাবের বন্যা বহিতেছে। যাহার প্রলয় প্লাবনে শান্তিপূর্ণ স্নিগ্ধ তপোবন নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতেছে, যে দুর্দ্দিনে আলস্যে অনাচারে ও অজ্ঞতায় জাতি মুমূর্ষুপ্রায়। সেই দুর্দ্দিনে অসন, বসন, ঔষধ ও সৎশিক্ষার সুচিন্তিত ফলপ্রসূ উপায় নির্দ্ধারণের পরিবর্ত্তে শক্তিশালী লেখকগণের প্রাণ মাতানো ভাষা ও মুখরোচক যুক্তি দ্বারা আর্য্যজাতির মৃত সঞ্জীবনী, উভয় লোকের মঙ্গল সাধক শ্রাদ্ধকৃত্যের উৎসাদনে কটিবদ্ধতা গভীর দুর্দ্দশারই পরিচায়ক। শ্রাদ্ধের ফলবাদে বর্ণিত হইয়াছে যেখানে শ্রাদ্ধবর্জ্জিত, সেখানে বীর, নীরোগ, দীর্ঘজীবী, পুত্র জন্মগ্রহণ করে না। এবং সেস্থান হইতে সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল অন্তর্হিত হইয়া থাকে। এই ফলবাদের প্রত্যেক অক্ষরার্থ, শ্রাদ্ধ বর্জ্জিতপ্রায়। এই সমাজে দেদীপ্যমান নহে কি?

যুগধর্ম্মপ্রযুক্ত সংশয়ান্দোলিত চিত্তে, এমন মঙ্গলকর শ্রাদ্ধ কর্ম্মের অনাবশ্যকতায় ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়া এই মৃতপ্রায় জাতিকে আরও আলস্যে এবং অনাচারে প্রবর্ত্তিত করা আমাদের পরম দুর্ভাগ্যেরই সূচক।

পিতৃগণ উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ দান করা নিস্ফল কিংবা অনাবশ্যক, এইরূপ ভ্রান্তি উৎপাদন এই মৃতপ্রায় সমাজেও অতিমাত্র উপহাসের বিষয় হইলেও বর্ত্তমানে ইহার প্রতিবাদ না করা সঙ্গত নহে বিবেচনা করিয়া পিষ্টপেষণ ন্যায়ানুসারে শ্রাদ্ধকৃত্যের অবশ্য কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদন করিতে এই অকিঞ্চনের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

লেখক মহোদয় প্রথমেই লিখিয়াছেন—"ভগবান মনু পঞ্চ মহাযজ্ঞের উল্লেখ করিয়াছেন...... এই পাঁচটী যজ্ঞের নাম ঋষিযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ। **ঋষিযজ্ঞের অর্থস্বাধ্যায় অর্থাৎ ঋষিপ্রণীত গ্রন্থপাঠ, ভূতযজ্ঞের অর্থ বলিবৈশ্বদেবকর্ম্ম অর্থাৎ বিশ্বের সমস্ত জীবের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্যপ্রদান।** পিতৃযজ্ঞের অর্থ—তর্পণ অথবা শ্রাদ্ধ। **দেবযজ্ঞের অর্থ যথাবিধি হোমকরা,** এবং নৃযজ্ঞের অর্থ অতিথিকে অন্নদান সুতরাং শ্রাদ্ধস্বরূপ পিতৃযজ্ঞ আর্য্যগণের প্রত্যহ কর্ত্তব্য।'

উপরে লেখক মহাশয় পঞ্চ মহাযজ্ঞের যে বর্ণনা দিয়াছেন বাস্তবিক পঞ্চমহাযজ্ঞ এইরূপ নহে—পঞ্চ মহাযজ্ঞে ঋষিযজ্ঞ নাই, এবং স্বাধ্যায় অর্থে বেদ, ঋষিপ্রণীত গ্রন্থ নহে। গৃহ দেবতা ও বায়সাদি প্রাণীদিগকে অন্ন প্রভৃতি আহার্য্য দ্রব্য প্রদানের নাম বলিকর্ম্ম, এবং ইহারই নামান্তর ভূতযজ্ঞ। বিশ্বদেব প্রভৃতি দেবগণ উদ্দেশ্যে হোমকরার নাম, বৈশ্বদেব হোম। বলিকর্ম্ম ও বৈশ্বদেব হোম। এই দুইটী পৃথক্ কর্ম্ম, এক কর্ম্ম নহে। এই সম্বন্ধে প্রমাণ যথা—

১ ২

ছন্দোগ পরিশিষ্টে— অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।

৩ ৪ ৫

হোমো দৈবো, বলি র্ভৌতো নৃযজ্ঞো তিথি পূজনম্॥

অর্থ এই যে—বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাকে ব্রহ্মযজ্ঞ বলা হয়। তর্পণের নাম পিতৃযজ্ঞ, দেবতা উদ্দেশে হোমকরার নাম (বৈশ্বদেব হোম) দেবযজ্ঞ গৃহদেবতা ও বায়স প্রভৃতি প্রাণীদিগকে অন্নপ্রদানের নাম 'বলিকর্ম্ম' কিংবা ভূতযজ্ঞ। অতিথিকে অন্নপ্রদানের নাম মনুষ্যযজ্ঞ। এই পাঁচটী যজ্ঞকে পঞ্চ মহাযজ্ঞ বলা হয়। তদন্তর্গত ব্রহ্মযজ্ঞ ও পাঁচ প্রকার যথা দক্ষঃ—

বেদস্বীকরণং পূর্ব্বং বিচারো; ভ্যসনং জপঃ।
তদ্দানঞ্চৈব শিষ্যেভ্যো বেদা ভ্যাসো হি পঞ্চধা।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে বেদের অধ্যয়ন, বেদার্থ বিচার ও তাহার অভ্যাস, শ্রুতি মন্ত্রজপ, ও ছাত্রাদিগকে বেদবিদ্যাদান এই পাঁচপ্রকার ব্রহ্মযজ্ঞ। সুতরাং ঋষিপ্রণীত গ্রন্থপাঠ ব্রহ্মযজ্ঞ নহে।

পিতৃযজ্ঞ:—তিন প্রকার—তর্পণ, নিত্যশ্রাদ্ধ ও পিতা পিতামহ প্রভৃতি উদ্দেশে বলিদান। এই তিন প্রকার পিতৃযজ্ঞ করিতে অসমর্থ হইলে শুধু তর্পণরূপ পিতৃযজ্ঞ দ্বারাও অন্য দুইটী পিতৃযজ্ঞের সিদ্ধি হয়।

হোমঃ—গোভিলমতে প্রজাপতি ও 'স্বিষ্টিকৃৎ' উদ্দেশে হোম বিহিত। গৌতম মতে অন্যপ্রকার। এই হোম সাগ্নিক ব্রাহ্মণদিগের কর্ত্তব্য। নিরগ্নি ব্রাহ্মণের পক্ষে 'শাকল' হোম কর্ত্তব্য। বিস্তৃতি ভয়ে শাকল হোমের বিবরণ দেওয়া হইল না।

বলিকর্ম্ম—"বাস্তু পাল ভূতেভ্যো বলিহরণং ভূতযজ্ঞ:" ইতি হারীতঃ। গৃহ দেবতার উদ্দেশে বলিদানের পর বায়স প্রভৃতি প্রাণীদিগকে অন্নদানের নাম বলিকর্ম্ম, কিম্বা ভূতযজ্ঞ।

মনুষ্য যজ্ঞঃ—যে ব্রাহ্মণ একরাত্র বাস করেন তাহার নাম অতিথি, এইরূপ অতিথিকে অন্ন প্রভৃতি আহার্য্য দ্রব্য দানের নাম মনুষ্য যজ্ঞ॥ ইহার পর রায় মহাশয় লিখিয়াছেন "শ্রাদ্ধস্বরূপ পিতৃযজ্ঞ আর্য্যগণের প্রত্যহ কর্ত্তব্য......আমরা কিন্তু মৃত পিতামাতা প্রভৃতির শ্রাদ্ধ বৎসরে একদিন মাত্র করিয়া থাকি প্রতিদিন শ্রাদ্ধ করি না॥"

আমরা সম্বৎসরে যে শ্রাদ্ধ একদিন মাত্র করিয়া থাকি তাহা পিতৃযজ্ঞ নহে। তাহার নাম সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ। এই শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে গোভিল গৃহে উল্লিখিত হইয়াছে "অথ সম্বৎসরে সম্বৎসরে প্রেতায়ান্নং দদ্যাৎ, যস্মিন্নহনি প্রেতঃ স্যাদিতি।" শুক্ল কিংবা কৃষ্ণপক্ষের যে মাসের যে তিথিতে পিতা কিংবা পিতামহ প্রভৃতির মরণ হইবে, প্রতি বৎসর সেই মাসের সেই পক্ষের সেই তিথিতে সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ হইবে। এই সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ, মৃত দিনে করিতে

হয় বলিয়া ইহাকে মৃতাহ শ্রাদ্ধ বলা হয়। এবং সাধারণতঃ কেবল মৃতকের শ্রাদ্ধ করিতে হয় বলিয়া ইহাকে একোদ্দিষ্টও বলা হইয়া থাকে। পিতৃযজ্ঞ কোনও তিথি বিশেষে কর্ত্তব্য নহে। তাহা প্রতিদিনই করিতে হয়। পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ বৃদ্ধ প্রমাতামহ এই ছয়জনের উদ্দেশে পিতৃযজ্ঞ করিতে হয়। এই পিতৃযজ্ঞ দ্বারা গৃহস্থের প্রাত্যহিক হিংসাজনিত পাপের ক্ষয় হইয়া থাকে। পিতার মৃততিথিতে তথাকথিত একদিন মাত্রকর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ করিয়া পুনরায় পিতৃযজ্ঞ করিতে হয়। পৃথক্ পৃথক্ বিধি অনুসারে এই দুইটী শ্রাদ্ধ করিতে হয় বলিয়া একটী শ্রাদ্ধ দ্বারা অন্যটীর সিদ্ধি হয় না। নানাকারণে আমরা ইহ সর্ব্বস্ব হইয়া পড়িয়াছি পারলৌকিক কর্ম্মে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস একেবারেই লোপ পাইতে বসিয়াছে। তাহার ফলেই, প্রাত্যহিক শ্রাদ্ধের আলোচনা অনেকের নিকটই অপরিজ্ঞাত, এমন কি এক দিন মাত্র শ্রাদ্ধ করার নিয়মও উঠিয়া যাইতেছে। এইজাতি বর্ত্তমানে সর্ব্বপ্রকারে দুরবস্থায় উপনীত। মুমূর্ষজাতির আপৎকালীন দুরাচার সন্দর্শনে বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনার বিষয় নহে কি? শিষ্টজনানুমোদিত সদাচারই প্রমাণ। দুচাচার কখনও প্রমাণরূপে গণ্য হইতে পারে না। ইহার পর রায় মহাশয় লিখিয়াছেন—

"আমাদিগের মত মৃতের শ্রাদ্ধ করিয়া প্রাচীনকালে সাধুকর্ম্মীগণ অতীব নিন্দিত কর্ম্ম করিলেন বলিয়া অনুতপ্ত হইতেন এরূপ প্রমাণের অভাব নাই"। তাহার পর মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্ব হইতে—

অকৃতং মুনিভিঃ পূর্ব্বং কিংময়েদমনুষ্ঠিতং।
কথন্তু শাপেন নমাং দহেয়ু ব্রাহ্মনাইতি॥

এই বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন—"পূর্ব্বকালে মুনিগণ যেরূপ কার্য্য করেন নাই, এইরূপ কার্য্য আমি কেন করিলাম।" নিমিরাজার এইরূপ উক্তি হইতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, মৃতকের শ্রাদ্ধ করিয়া তিনি অনুতপ্ত ও ব্রহ্মশাপ ভয়ে ভীত হইয়াছিলেন।" ইত্যাদি—

পাঠকগণ, পূর্ব্বকালে মুনিঋষিগণ শ্রাদ্ধ করিয়া কুকার্য্য করিয়াছি বলিয়া অনুতপ্ত ও লজ্জিত হইতেন এই সংবাদ আপনাদের নিকট অশ্রুতপূর্ব্ব নহে কি? ঋষিশ্রাদ্ধে "বহ্বারম্ভের" প্রবাদ কে না জানেন? অনুশাসন পর্ব্বের যে অধ্যায় হইতে নিমিরাজার এই আক্ষেপোক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে সেই অধ্যায়ের পূর্ব্ব ও পর অংশ উঠাইয়া দেখাই-তেছি প্রকৃত বিষয়ে কিরূপ অন্যথাখ্যান হইয়াছে।

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পর পুণ্যশ্লোক মহারাজ যুধিষ্ঠির শোকার্ত্ত হইয়া, ধর্ম্মজ্ঞ মহামতি ভীষ্মদেবের নিকট গিয়াছিলেন। ভীষ্মদেব নানাভাবে ধর্ম্ম উপদেশ দ্বারা যুধিষ্ঠিরের শোক দূর করিতে ছিলেন। এইরূপ পরস্পর কথোপকথন প্রসঙ্গে (অনুশাসন পর্ব্বের ৯১ অধ্যায়) যুধিষ্ঠির ভীষ্মদেবের নিকট প্রশ্ন করিলেন।

যুধিষ্ঠির উবাচ—

কেন সঙ্কল্পিতং শ্রাদ্ধং কস্মিন্‌কালে কিমাত্মকং
ভৃগ্বঙ্গিরসকে কালে মুনিনা কতরেণবা।
কানি শ্রাদ্ধানি* বর্জ্জ্যানি কানিমূল ফলানি চ
ধান্তজাত্যশ্চ কা বর্জ্জ্যাস্তন্মে ব্রুহি পিতামহ ॥

ভীষ্ম উবাচ

যথাশ্রাদ্ধং সম্প্রবৃত্তং যস্মিন্‌ কালে যদাত্মকং,
যেন সঙ্কল্পিতঞ্চৈব তন্মে শৃণু জনাধিপ।
স্বায়ম্ভুবোঽত্রিঃ কৌরব্যঃ পরমর্ষিঃ প্রতাপবান্‌,
তস্য বংশে মহারাজ! দত্তাত্রেয় ইতি স্মৃতঃ
দত্তাত্রেয়স্য পুত্রোঽভূন্নিমির্ণাম তপোধনঃ
নিমেশ্চাপ্যভবৎ পুত্রঃ 'শ্রীমান্‌' নাম শ্রিয়াবৃতঃ
পূর্ণে বর্ষসহস্রন্তে স কৃত্বা দুষ্করন্তপঃ
কালধর্ম্ম পরীতাত্মা নিধনং সমুপাগতঃ

ইহার অর্থ এই যে যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতামহ! কোন সময়ে কে কিরূপভাবে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন? ভৃগু এবং অঙ্গিরা মুনির অবস্থিতিকালে কোন জন শ্রাদ্ধের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, শ্রাদ্ধে কোন্‌ কোন্‌ ফল মূল ও ধান্য বর্জ্জনীয় তাহা আমাকে বলুন।

ভীষ্ম বলিলেন—ব্রহ্মার পুত্র অত্রি, অত্রিপুত্র দত্তাত্রেয়, দত্তাত্রেয়ের পুত্র নিমি, নিমিরপুত্র শ্রীমান্‌। শ্রীমান্‌ সহস্র বৎসর দুষ্কর তপস্যা করিয়া কালধর্ম্মের অনুসারে নিধন প্রাপ্ত হইলে পর, নিমিরপুত্র শোকে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। শোকের কথঞ্চিৎ উপশম হইলে পুত্রের প্রিয় ভক্ষ্য ফলমূল প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া অমাবস্যা দিনে শ্রাদ্ধের অঙ্গ ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ-পূর্ব্বক মৃত পুত্রের উদ্দেশে পিতৃযজ্ঞ করিলেন। বেদে, পিতা পিতামহ প্রভৃতি উদ্দেশেই পিতৃযজ্ঞ বিহিত হইয়াছে। পূর্ব্বে কেহই পুত্রের উদ্দেশে পিতৃযজ্ঞ করেন নাই। নিমি পুত্রের উদ্দেশে পিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া বেদ বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিয়াছি মনে করতঃ ধর্ম্মভয়ে ভীত হইয়া বলিয়াছিলেন—

তৎকৃত্বা স মুনিশ্রেষ্ঠো ধর্ম্মশঙ্কর মাত্মনঃ
পশ্চাত্তাপেন মহতা তপ্যমানোঽভাচিন্তয়ৎ।
অকৃতং মুনিভিঃ প্রোক্তং কিং ময়েদ মনুষ্ঠিতং
কথন্তু শাপেন ন মাং দহেয়ুর্ব্রাহ্মণাইতি।
ততঃ স চিন্তয়ামাস বংশ কর্ত্তার মাত্মনঃ।

* শ্রাদ্ধানি বর্জ্জ্যানি' 'শ্রাদ্ধেষু বর্জ্জ্যানি' ইতি নীলকণ্ঠঃ।

ধ্যাতমাত্র স্তথা চাত্রি রাজগাম তপোধনঃ
অথাত্রিস্তং তথা দৃষ্টা পুত্রশোকেন কর্ষিতং
ভৃশমাশ্বাসয়ামাস বাগ্‌ভিরিষ্টাভিরব্যয়ঃ
নিমে ! সঙ্কল্পিত স্তেহয়ং পিতৃযজ্ঞ স্তপোধনঃ।
মা তে ভূদ্ভীঃ পূর্ব্বদৃষ্টো ধর্ম্মোহয়ং ব্রহ্মণাস্বয়ং।
সোহয়ং স্বয়ম্ভুবিহিতো ধর্ম্মঃ সঙ্কল্পিতস্ত্বয়া।
ঋতে স্বয়ম্ভুবঃ কোহন্যঃ শ্রাদ্ধেয়ং বিধিমাহরেৎ।
অথাখ্যাস্যামি তে পুত্র ! শ্রাদ্ধেয়ং বিধিমুত্তমং
স্বয়ম্ভুবিহিতং পুত্র ! তৎকুরুষ্ব নিবোধ মে।

"ধর্ম্মশঙ্কর মাত্মনঃ" এই স্থলে টীকাকার নীলকণ্ঠ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—শ্রৌতে পিত্রাদ্যুদ্দেশেন দৃষ্টোধর্ম্মঃ, লোকে পুত্রোদ্দেশেনাপি স্বেচ্ছয়া কল্পিত "ইতিশঙ্করঃ—" তাৎপর্য্য এই যে— বেদে পিতা পিতামহ প্রভৃতি উদ্দেশেই পিতৃযজ্ঞ ধর্ম্মরূপে বিহিত হইয়াছে, লোকে পুত্র উদ্দেশেও কল্পনা করিয়া সেই পিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠান করার নাম "শঙ্কর"। নিমিরাজা বেদবিধি বিরুদ্ধরূপে পিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ধর্ম্মভয়ে ভীত ও অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। এবং তৎকালেও শোকের প্রাবল্য নিবন্ধন কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে অক্ষম হইয়া বলিলেন আমি কি কুকার্য্য করিলাম ইত্যাদি তাহার পর নিমিরাজা তাহার বংশ প্রবর্ত্তক অত্রিমুনিকে স্মরণ করিলেন। স্মরণ করিবামাত্রই অত্রিমুনি তথায় উপস্থিত হইয়া পুত্রশোক ক্লিষ্ট নিমিকে যথোচিত বাক্য দ্বারা আশ্বাসিত করিয়া বলিলেন নিমি, এইরূপে পিতৃযজ্ঞ করার জন্য তুমি ধর্ম্মভয়ে ভীত হইও না। পূর্ব্বে ব্রহ্মাও এইরূপেই পিতৃযজ্ঞ করিয়াছিলেন। তুমি সেই স্বয়ম্ভু আচরিত ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিয়াছ। স্বয়ম্ভু ব্যতীত অন্য কেহ শ্রাদ্ধের বিধান সংগ্রহ করিতে সমর্থ নহে। স্বয়ম্ভু আচরিত সেই শ্রাদ্ধের বিধি তোমাকে বলিতেছি তাহা শুন, এবং সেই বিধি অনুসারে শ্রাদ্ধ কর" এই বলিয়া অত্রিমুনি শ্রাদ্ধের সমস্ত বিধির উপদেশ করতঃ অন্তর্হিত হইলেন এই। পর্য্যন্ত ৯১ অধ্যায়ের শেষ হইয়াছে।

৯২ অধ্যায়ের প্রথমেই—ভীষ্ম উবাচ—

তথা নিমৌ প্রবৃত্তেতু সর্ব্ব এব মহর্ষয়ঃ
পিতৃযজ্ঞান্ কুর্ব্বন্তি বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা। ইত্যাদি

ইহার অর্থ এই যে—ভীষ্ম বলিলেন অত্রিমুনির উপদেশ অনুসারে নিমিরাজা শ্রাদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে পর, নিমিরাজার অনুকরণরূপে অন্যান্য ঋষিগণও শ্রাদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহার পর ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরের নিকট শ্রাদ্ধের অবশ্য কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদন করিলেন। বরাহ পুরাণেও নিমিরাজার উপাখ্যানটি এইরূপই বর্ণিত আছে।

সুধী পাঠকগণ! এখন বিবেচনা করুন, নিমিরাজা শ্রাদ্ধ করিয়া কি ভাবে অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। এবং শ্রাদ্ধের অনাবশ্যকতা বুদ্ধি নিমিরাজার পরে ছিল কি না? পুত্রের

উদ্দেশে পিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া শোক মোহ বশতঃ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে অক্ষম হইয়াছিলেন। পরে ধর্ম্মজ্ঞ পিতামহ অত্রিমুণির নিকট যখন জানিলেন তিনি কোন অকর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান'ত করেন, নাই-ই, পরন্তু স্বয়ম্ভূ আচরিত মহৎকর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং শোকপ্রভাবে আগন্তুক সেই অকর্ত্তব্যতার বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া যথাযথ ভাবে শ্রাদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং সমস্ত ঋষিগণ কর্ত্তৃক এই বিষয়ে অনুকৃতও হইয়াছিলেন। প্রবন্ধ লেখক মহাশয় নিমিরাজার উপাখ্যানের মধ্যভাগ হইতে একটি মাত্র শ্লোক উঠাইয়া শ্রাদ্ধকৃত্যের অনাবশ্যকতা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিলেন কেন? পরবর্ত্তী অংশ গোপন করিবার তাৎপর্য্য কি? পাঠকগণ তাহা বিশেষভাবে বিবেচনা করিবেন।

ক্রমশঃ—

দেশ কাল পাত্র

লেখক—শ্রীকৃষ্ণকিশোর চট্টোপাধ্যায়

আজ কাল একটা রব উঠিয়াছে যে, সাবেক বিধিব্যবস্থা আর বর্ত্তমান যুগে চলিতে পারে না। কারণ তখনকার দিনের দেশ কাল পাত্র আর এখনকার দিনের দেশ কাল পাত্র এক নহে। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে দেশ কাল পাত্র অনুসারে আমাদের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের বিধিব্যবস্থা গুলা ওলট্ পালট্ করা বিশেষ আবশ্যক।

যাঁহারা এই রব তুলিয়াছেন, তাঁহারা পৃথিবীর কোন প্রকার বিধিব্যবস্থা মানিয়া চলেন কি না জানি না, তবে এটুকু বোধ হয় সকলেই স্বীকার করেন যে, কোন কিছুর ওলট্ পালট্ করিতে গেলেই যে অভিযোগের উপর নির্ভর করিয়া তাহা করিতে হয় সেই অভিযোগটাই সত্য কিনা তাহা ধীরভাবে ভাবিয়া দেখা উচিত। সেই বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

পৃথিবীতে যত সামগ্রী আছে তাহাদিগকে আমরা পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকি, যথা—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ। ইহার অধিক শ্রেণী বিভাগ আমরা করিতে পারি না। কারণ এতদ্ভিন্ন অপর সামগ্রী গ্রহণ করিবার অর্থাৎ অনুভব করিবার মত ইন্দ্রিয় আমাদের নাই। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় গুলি (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্) পাঁচটি বলিয়াই আমরা বিষয়ের পাঁচটি অঙ্গ নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। অথবা আর এক রকম করিয়া বলিলে বলা যায়, জগতে পদার্থগুলি পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত বলিয়াই প্রাকৃতিক নিয়মে আমরা পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় লাভ করিয়াছি।

ঠিক এইরূপ নিয়মে কাল সম্বন্ধে ও বিচার করা চলে। কাল যদিও অনন্ত তথাপি তাহার একটা শান্ত মূর্ত্তি যে আমরা অনুভব করি না, এমন নয়। দিন রাত্রি মাস ঋতু, অয়ন বৎসর প্রভৃতি নানা মূর্ত্তিতেই কাল আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হন। কিন্তু এই সকলের মধ্যে তাঁহার সম্বৎসর মূর্ত্তি আমাদের কাছে যেমন পূর্ণ, এমন আর কোনটি নয়। এই জন্য আমরা কালের এই সম্বৎসর মূর্ত্তি ধরিয়াই বিচার করিব।

এইরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সম্বৎসরের কোন অংশ শীত প্রধান, কোন অংশ গ্রীষ্মপ্রধান আবার কোন অংশ রসপ্রধান বা বর্ষাপ্রধান। আরও একটু অগ্রসর হইলে দেখিতে পাই যে, যেমন বিষয়ের পাঁচটি অঙ্গকে গ্রহণ করিবার জন্য আমাদের পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, তেমনি এই কালত্রয়কে একান্ত ভাবে গ্রহণ করিবার জন্যও ধরা পৃষ্ঠে তিন প্রকার কেন্দ্র আছে এবং সেই কেন্দ্রগুলিকেও শীতপ্রধান, গ্রীষ্মপ্রধান ও রসপ্রধান নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। এই যে কাল বিভাগ বা কালানুকুল স্থান-বিভাগ ইহার উপর মানুষের তো কোন হাত নাই, এজন্য ইহাকে নৈসর্গিক ভিন্ন আর কিছুই বলা চলে না। এখন এই নৈসর্গিক কালশক্তি ও দেশ শক্তি, পাত্রের উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করে দেখিলে ক্ষতি কি?

দেশ—শীতপ্রধান, অর্থাৎ শীত ঋতুর স্থিতির পরিমাণ ও শীতের সঙ্কোচ শক্তির পরিমান উভয়ই এখানে অধিক। তাহার ফলে শীতঋতুতে তদ্দেশে আকাশ কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন, বায়ু শীতপ্রবাহ শাল, মেঘসকল তুষারবর্ষী, ভূমি কঙ্করাকীর্ণ ও মন্দফলা। কঠোর পরিশ্রম করিয়া ৩।৪ মাসের ভিতর যে যাহা গৃহজাত করিতে পারে তাহাই তাহার অপর কয় মাসের সম্বল। কিন্তু মন্দফলা ভূমিতে ৩।৪ মাস কালের মধ্যে আর কত শস্য উৎপন্ন হইবে? যাহা হয় তাহাতে প্রায় ঐ ৩।৪ মাসের অধিক কাল চলে না। কিন্তু গৃহে অন্ন না থাকিলেই কি উদর শান্ত থাকিবে? তাহা তো থাকে না। তাই এই ৩।৪ মাসের উপযোগী খাদ্যে সম্বৎসর চালাইতে হইলে অতঃপর খাদ্য তালিকায় মৎস্য অথবা পশুপক্ষীর মাংসের প্রচুর ব্যবস্থা করিতে হয়। আর যেখানে শীতাধিক্যে কৃষি একেবারেই অসম্ভব, সেখানে পশু মাংসই নরের একমাত্র সম্বল।

এইরূপে ক্ষুধার জ্বালা কথঞ্চিৎ নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু শীতের জ্বালা? ইহার জন্য গাত্রাবরণ ও অগ্নির উত্তাপ নিতান্ত আবশ্যক। কাজেই আরণ্য পশুপক্ষির মত আরণ্য কাষ্ঠ, আরণ্য পশুর চর্ম্ম ও লোম শীতপ্রধান দেশে অতিশয় আদরণীয়। পুরুষানুক্রমিক ভাবে বনের পশু ও বনের বৃক্ষ ধ্বংশ করিবার ফলে যখন দেখা যায় যে মাংসদাতা পশু ও কাষ্ঠদাতা বৃক্ষের সংখ্যা এমন ভাবে কমিতেছে যাহাতে অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র দেশটা একটা বিকট প্রান্তরে পরিণত হইতে পারে, তখন সেখানকার হিসাবী লোকেরা নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য একটা দল পাকাইতে বাধ্য হয় ও এইরূপে দলবদ্ধ হইয়া অপর সাধারণকে জানাইয়া দেয়। অমুক অমুক স্থান বা বনের অধিকারী আমরা

আমাদের বিনানুমতিতে যে এখানে পশুহনন করিবে বা বৃক্ষ ছেদন করিবে তাহাকে আমাদের নিকট দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। এইরূপ সংঘবদ্ধ শক্তিমানের কার্য্য পদ্ধতি দেখিয়া সংঘশক্তিহীন দুর্ব্বলের দল প্রমাদ গণিতে থাকে। কিন্তু উপায় নাই—শক্তিমানের নিকট শক্তিহীনকে অবনত হইতেই হইবে। সংঘশক্তিহীন দুর্ব্বলকে সবলের নিপীড়ন সহ্য করিতেই হইবে। কিন্তু সহ্যশক্তিরও তো একটা সীমা থাকে সেই সীমা অতিক্রমের কাল নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিলে দরিদ্র সাধারণও সংঘবদ্ধ হইয়া দুঃখ প্রতিকারের উপায় অনুসন্ধানে লাগিয়া যায়। এইরূপ অনুসন্ধান করিবার ফলে, ক্রমে তাহারা কোন নিকটবর্ত্তী প্রদেশে যাযাবর বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় ও সুবিধা পাইলে সেই স্থানে বসবাসের চেষ্টা দেখে। আর যদি সেরূপ কোন প্রদেশ নিকটে না থাকে, যদি ঐরূপ স্থান কোন বৃহৎ নদী বা সাগর পরিখা বেষ্টিত থাকে বা কোন দুরধিগম্য পর্ব্বতমালায় আবদ্ধ থাকে তবে পেটের জ্বালায় তাহাদিগকে নদী বা সমুদ্রে মৎস্যানুসন্ধানেই নিযুক্ত হইতে হয়। ইহার পর শীত নিবারণের সমস্যা যখন তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে থাকে, যখন নদী পর্ব্বত বা সাগর পরিখাবদ্ধ হতভাগ্য জীব দলে দলে শীতের প্রকোপে ব্যধিগ্রস্ত হয় ও মরিতে থাকে; তখন তাহাদের "মরিয়া" হওয়া ছাড়া আর অন্য উপায় থাকে না। তখন তাহারা অত্যন্ত নিরুপায় হইয়া ইট পাথর মৃত্তিকা যাহা পায় তাহাই জ্বালাইবার চেষ্টা করে। দুঃখের জ্বালায় জীব যখন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া এমনি প্রয়াস করিতে থাকে, তখনি ভগবৎ কৃপা জীবের অগোচরে দুঃখীর উপর ঝরিয়া পড়ে, দুঃখী জীব একটা কূল পায়। তাই এমনি করিয়া নিত্য চেষ্টার ফলে একদেশে এমন এক রকম পাথর তাহারা পাইয়াছিল যাহা অগ্নিসংস্পর্শে অন্যান্য ইন্ধনের মতই জ্বলিয়া উঠে। অতঃপর সোৎসাহে সংঘবদ্ধভাবে মাটি খুঁড়িয়া দরিদ্রের দল শীত নিবারণের ও ভোজ্য পাকের সম্বল সংগ্রহ করিতে থাকে। কিন্তু দরিদ্র নিধি পাইলে কি রাখিতে পারে?—হিসাবী লোকের শ্যেনদৃষ্টি এড়ান তো বড় সহজ নয়? লুব্ধ তাহারা, দলবদ্ধ হইয়া এই দরিদ্রের দলের উপর প্রভুত্ব করিবার লোভ কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারিবে না। কাজেই দরিদ্রকে হয় ইহাদের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া জীবন কাটাইতে হইবে আর না হয় দেশান্তরের সন্ধান দেখিতে হইবে। কেন না জন্মভূমিতে তাহার জন্য কোন সুখেরই সংস্থান নাই। একে শীতের প্রকোপ তাহাতে খাদ্যাভাব, সামুদ্রিক জীবই আহারের প্রধান সামগ্রী। জল নাই. ঝড় নাই, করকা পাত নাই, কুজ্ঝটিকা নাই, শীত নাই—বার মাস এই উত্তাল তরঙ্গমালায় বিপদসঙ্কুল সমুদ্রবক্ষে জল মধ্যগত মৎস্যানুসরণে ছুটিতে হইবে। কিন্তু এই ছুটাছুটিতে কত আত্মীয়, কত বন্ধু, কত প্রিয়জনই যে, চোখের উপর সাগর সলিলে তলাইয়া যায় তাহার সংখ্যা রাখে কে? বিশেষতঃ যাহারা অবশিষ্ট থাকে তাহাদের মধ্যে কে কবে সাগর গর্ভে বিলীন হইবে, তাহাই বা কে বলিতে পারে? তবে এমন দুর্ব্বহ জীবনভার বহনের প্রয়োজন কি?

এমন অবস্থায় দুঃসাহসিক মৎস্য-জীবীর দল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া দেশত্যাগ করিবার জন্য সংঘবদ্ধ হইতে বাধ্য হয়। যদি সমুদ্রের অপর পারে কোন আবাস যোগ্য দেশ থাকে, ও তাহাতে আশ্রয় পাওয়া যায়, ভালই; নচেৎ এই যাত্রাই তাহাদের মহাযাত্রা।

সাগর পরিখাবদ্ধ শীতপ্রধান দেশজাত আর্ত্ত মরণপথের যাত্রীদল এমনি করিয়াই দেশ ছাড়িয়া বাহির হয় এবং এই বিপৎযাত্রায় সকলেই যে কুল পায় এমন নহে; ডুবিয়াও যায় অনেকে। যাহারা কুল পায় তাহারা যদি কুলে উঠিয়া দেখে যে, সেই দেশ তাহার জন্মভূমি অপেক্ষাও শস্য শ্যামল, তৃণ বহুল ও ফল ভার নম্র-বৃক্ষরাজি শোভিত, তাহা হইলে এই চিরবুভুক্ষুর দল কি আর আত্মসম্বরণ করিতে পারে? ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের মত তাহারা তখন এই ফলশস্যের উপর আপতিত হয়। তখন তাহারা একবারও ভাবিতে পারে না যে, উহারা এইরূপে যাহাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে, তাহারা এই শস্য সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইলে স্ত্রীপুত্র পোষ্যবর্গ লইয়া কেমন করিয়া বাঁচিবে? লুণ্ঠননিষ্ঠ দস্যুর হৃদয়ে এ চিন্তা অস্বাভাবিক। তবে যদি কোন প্রবল হস্তের কঠোর দণ্ড তাহাদিগকে এই অপকর্ম্মের জন্য নিগৃহীত করিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা শান্তমূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া শরণাগতরূপে আশ্রয় প্রার্থনা করিতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ যেখানে সুবিধা সেখানে লুণ্ঠন কুশল দস্যুমূর্ত্তি আর যেখানে অসুবিধা সেখা ন শান্তিপ্রিয় দাসমূর্ত্তি। ইহাই হইল দুর্লঙ্ঘ্য আবেষ্টনবদ্ধ শীতপ্রধান দেশের মনুষ্য প্রকৃতির সাধারণ ইতিহাস। প্রকৃতির কোমল হস্তের পুলকস্পর্শের কোন কাহিনী ইহার কোন পৃষ্ঠাতেই লেখা নাই। আর এই করুণ ইতিহাস পাঠ করিয়া আমরা সহজেই বুঝিতে পারি, যাহারা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মবশে এমনি গণ্ডীবদ্ধ শীত প্রধান দেশে জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, তাহারা দেশ ও কালের প্রভাবে স্বতঃই অন্নার্থী, মাংসভুক্, সংঘবদ্ধ, ভবিষ্যৎ-চিন্তাপরায়ণ, সাহসী, শ্রমকুশল, স্বাবলম্বী, অধ্যবসায়শীল, প্রকৃতির গর্ভ অনুসন্ধানকারী, চেষ্টাবাদী, শঠ, যাযাবর, ভোগলুব্ধ, পরস্বলোলুপ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, কর্কশ হৃদয়, ক্রূর, সুবিধা সেবী, ইহলোক সর্ব্বস্ব ও ভগবদ্ বোধ রহিত হইয়া থাকে।

এইরূপে দেশ, যেখানে গ্রীষ্মপ্রধান অর্থাৎ গ্রীষ্ম ঋতুর স্থিতির পরিমাণ ও উত্তাপের প্রসারণ শক্তি যেখানে অত্যন্ত অধিক, সেখানে ও অন্নাভাব বড় অল্প হয় না। চারিদিকেই বালুকাময় বিস্তীর্ণ প্রান্তর, কোথাও বা মরুভূমির উত্তপ্ত বায়ু প্রবাহ উন্মত্ত ভাবে ছুটাছুটি করিতেছে, কোথাও মন্দফলা, সলিল-সম্পদ বড়ই অল্প। কাজেই দুই দশটা খর্জ্জুর বৃক্ষের ফল ও তরমুজ প্রভৃতির মত বালুকাভূমিজাত লতা গুল্মের ফলই সে দেশের সাধারণ অন্ন-সম্পদ। সমুদ্রকূললগ্ন স্থানে বা সংখ্যাবিরল নদীকূলে সামান্য পরিমাণে খাদ্যশস্য উৎপাদিত হইলেও সমগ্র দেশবাসীর সংখ্যানুপাতে তাহা নিতান্তই অপর্য্যাপ্ত। এজন্য অন্নাভাবের দেশে সাধারণতঃ মানুষের যেরূপ স্বভাব হইয়া থাকে এখনকার মনুষ্যগণের ও প্রকৃতি তদ্রূপ হইবেই। অর্থাৎ ইহারাও অন্নার্থী মাংসভুক, সংঘবদ্ধ, সাহসী, ক্রূর, চেষ্টা-

বাদী, স্বাবলম্বী, যাযাবর, পরস্বলোলুপ, ভোগলুব্ধ, সুবিধাসেবী, কর্কশ হৃদয়, শঠ, ইহলোক সর্ব্বস্ব ও ভগবদ্‌বোধ রহিত হইয়া থাকে। তবে এখানে শীতের প্রকোপ না থাকাতে ইহারা প্রকৃতির গর্ভ অনুসন্ধানকারী বা অত্যধিক তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন হইতে পারে না। পরন্তু গ্রীষ্মের অতি প্রকোপ হেতু ইহারা অতিশয় কামস্বভাব হইয়া থাকে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশও কালগত পাত্রের সাধারণ চিত্র এইরূপ।

এইবার রসপ্রধান দেশের কথা বলিব। যে দেশ রসপ্রধান, কাল নাতি শীতোষ্ণ। রসপূর্ণা ধরিত্রী এখানে "সর্ব্বরত্নময়ী দেবী সর্ব্বশস্যপ্রসবিনী"। এখানে নদীর জলেও ফল আর গাছের ফলেও অমৃত। প্রকৃতির অপরিমেয় করুণায় এখানে অল্প শ্রমেই বহু শস্য লাভ হয়, শীতের বা গ্রীষ্মের অতি প্রকোপের অভাবে তাহারা যথাযথরূপেই মনুষ্যগণের আকাঙ্ক্ষা সফল করে। এখানকার আকাশ ও নিত্য কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন বা অগ্নিগর্ভ নয়। তাই এখানে আকাশ সুন্দর, বাতাস সুন্দর, ফল পুষ্প সুন্দর, নদনদী হ্রদ পর্ব্বত সুন্দর, এমন কি পশু পক্ষীও সুন্দর। যে দেশের রসমাধুর্য্যে সবই সুন্দর সে দেশের মানুষ ও এই সৌন্দর্য্য সম্পদ হইতে বঞ্চিত হয় না। তাহারাও হয় সর্ব্ব সুন্দর।

স্বল্পায়াসে প্রাচুর্য্যের অধিকারী হয় বলিয়া এ দেশের মানুষ প্রথমেই বিস্মিত হৃদয়ে এই প্রাচুর্য্যের অভিবর্ষণ কারীর উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতে শিখে এবং তাহার ফলে তাঁহার নিকট হইতে লাভ করে বিমলাপ্রজ্ঞা, অপূর্ব্ব ভাষা, জীবন যজ্ঞের সম্পূর্ণ বিধি ও পরমানন্দের উপদেশ তাই ইহাদের কাছে সেই দাতা শুধুই "ইন্দ্র" নহেন, তিনি "সত্যং শিবং সুন্দরম্" ও বটেন।

কিন্তু এই প্রাচুর্য্য, এই গৃহ-বিত্ত-পশু-প্রজাপূর্ণ ঐশ্বর্য্য সম্পদ, কি শুধুই মানুষকে সুখের অধিকারী করে? হিংস্র স্বভাব দস্যু তস্করকেও কি সেই সঙ্গে তাহার দুয়ারে ডাকিয়া আনে না? আনে বৈ কি? আর এই জন্যই বিত্তবানকে আপন বিত্ত সংরক্ষণের জন্য রীতিমতই ব্যবস্থা করিতে হয়, কালে কালে যে সকল দস্যু এইরূপে প্রাচুর্য্যের স্তূপে আপতিত ওপরে বিতাড়িত হয়, তাহারা যে দেশবাসীর হৃদয়ে শুধুই একটা বেদনার স্মৃতি রাখিয়া যায় এমন নহে, তাহাদের বিচিত্র গতি ও হৃদয়হীন ব্যবহার দেশ বাসীর আচার, ব্যবহার ও নীতির উপরও একটা ছাপ ফেলিয়া যায়। এমনি করিয়া মাত্র এই দেশেই কেবল একটা ঘনিষ্ঠ ও অন্যোন্যাশ্রয়ী উৎকৃষ্ট মানব সমাজ তাহার সতর্ক দৃষ্টি ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রীতি পদ্ধতি লইয়া বিকশিত হইতে পারে। অন্যত্র ইহা আদৌ সম্ভব নয়। ইহাই হইল রসপ্রধান দেশের প্রাকৃতিক ইতিহাস এবং এ ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় দেখিতে পাই, এখানকার মানুষ ভগবৎকৃপায় অভাবমুক্ত হইয়া স্বভাবতঃই ভক্ত, দাতা, পরদুঃখ কাতর, সরল, উদার চেতা, শান্ত, সংযমী, জ্ঞানী, আত্মরক্ষাকুশল, বীর্য্যবান, বহুপালক কিন্তু প্রাচুর্য্যের সঙ্গী আলস্য ও যে ইহাদের মধ্যে অলক্ষ্যে বাস করে, তাহাও আমাদের মনে রাখা চাই।

মানুষের অবস্থা চিরদিন সমান থাকে না। তাই প্রচুর্য্যের অধিকারী হইয়া দীর্ঘকাল শান্তিতে বাস করিবার ফলে .কল্যাণপ্রদ ও জ্ঞানসংযুক্ত আচার ক্রমে ক্রমে উপেক্ষিত হইয়া যায়। যে সকল বিধি ভবিষ্যৎ বিপদ নিবারণের সহায়রূপে অবধারিত হইয়াছিল তাহারা ভবিষ্যৎ বিপদের অসম্ভাবনায় ধীরে ধীরে লজ্জিত হইতে থাকে এবং পরে অসপত্ন প্রাচুর্য্যের জড়তা ক্রমে সতর্কতা ও বহুদর্শিতাকে আবৃত করিয়া ফেলে। ইহার ফলে দেশের ভবিষ্যৎ আকাশের কোলে কোলে দুঃখের কালমেঘ ধীরে ধীরে পুঞ্জীভূত হইতে থাকে, জনসাধারণের দৃষ্টি আর সে দিকে পড়ে না, কেহ চীৎকার করিয়া আকাশের কোলের মেঘের কথা জানাইয়া দিলেও তাহারা সে কথা কানে তুলে না, আপন খেয়ালে কাল কাটাইতে থাকে। কিন্তু তাহার পর যখন ঐ কালমেঘের রাশি কাল .বৈশাখীর ঝড় উঠাইয়া বজ্র ও বর্ষণের সহিত আত্মপ্রকাশ করে, তখন এই সকল মূঢ়বুদ্ধি নীতিত্যাগীর চমক ভাঙ্গে এবং তখন তাহারা আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠে "এমন কি অপরাধ করিয়াছি, যাহাতে এমন বিপদের আবির্ভাব হইল?" প্রাচুর্য্যের দেশের অন্তর্নিহিত অলসতা এমনি করিয়া বুঝাইয়া দেন—তাঁহার উপাসনার ভিতর দিয়া প্রজ্ঞান ঘনমূর্ত্তি নীতিকে পরিত্যাগ করার পরিণাম কি ভয়াবহ। যাহাকে ধরিয়া থকিলে সুখ হয় ও ছাড়িয়া দিলে পরিণাম এমনি কঠোর মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করে, তাহাকে কি শুধুই নীতি বলিব? না তাহা আরও কিছু। এদেশবাসীর নিকট উহা শুধুই নীতি নয় ধর্ম্ম ও বটে। যাহারা এই কল্যাণ ধর্ম্ম বিধির উপাসনা করিবে তাহারা চির দিনই সগৌরবে বাঁচিয়া থাকিবে, আর ইহার বিরুদ্ধাচরণের ফল কি ভীষণ তাহা কি আজিও বলিয়া দিবার প্রয়োজন আছে? যাহা বহু বহু সহস্র বৎসরের ক্রম অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া এদেশবাসীর হৃদয়ে অভিব্যক্ত হইয়াছিল সেই চিরনব পুরাতনকে হঠপূর্ব্বক বিপর্য্যস্ত করিতে গেলে যে ইষ্টের পরিবর্ত্তে মহা অনিষ্ট হয় তাহা আমরা এই জীবনেই বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সুতরাং এই রস প্রধান দেশের মধ্যে পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের ঘাত প্রতিঘাতের ফলে স্বভাব স্ফুর্ত্তিতে অন্যোন্যাশ্রয়ীরূপে যে সকল বিধি ব্যবস্থার কুসুমরাশি কল্যাণ সৌরভ লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাদিগকে বা তাহাদের কোন একটিকে ঋণকৃত বুদ্ধি দ্বারা নির্ব্বিচারে বলপূর্ব্বক আঘাত করিতে গেলে যে .তদাধার পাত্র ও নষ্ট হইয়া যাইবে, ইহা কি পর-প্রত্যয় চালিত ওলট-পালট্ পন্থীর দল একটু ভাবিয়া দেখিবেন?

ইংরাজ প্রতিষ্টার পূর্ব্বেও এদেশে বহু মনুষ্যের রসবাস ছিল, তাহাদের ধনসম্পদও বড় অল্প ছিল না। সেই ধনসম্পদের সুরভিমুগ্ধ হইয়া দেশ বিদেশের বণিক প্রজাপতির দল সুবৃহৎ শ্বেতপক্ষ উড়াইয়া এখানে ছুটিয়া আসিত। তখনও এদেশবাসীর অন্ন বস্ত্রের কোন ক্লেশ ছিল না বা আত্মরক্ষায় ও তাহারা উদাসীন থাকিত না। তখন ও তাহারা নীতি ও সামর্থ্যে অত্যাচারীকে দণ্ড দিতে জানিত ও পারিত। তখনও এদেশের শিল্পীর শিল্প, কলাবিদের পরিকল্পনা, জ্ঞানের উৎকর্ষ, ধর্ম্মকর্ম্মের জয়শ্রী, উৎসবের আনন্দ, অনবদ্য

স্বাস্থ্য ও জীবন যাত্রার সরলতা জগতের লোকের বিস্ময় উৎপাদন করিত। কিন্তু তখন এসব থাকিলেও একটা জিনিষ ছিল না, মানুষ তখন নিজের ধর্ম্ম বা সমাজ সংস্থানের প্রতি বিদ্রোহ করিত না। কেহই কোন দিন বলিত না সাবেক বিধি ব্যবস্থা উল্টাইয়া দিয়া বর্ণাশ্রম ভাঙ্গিয়া একটা একরঙা কোম্পানি তৈয়ার কর। বোধ হয় বেচারিরা কাণ্ড-জ্ঞান হীন মূর্খ ছিল।

কিন্তু তারপর এই মূর্খ পূর্ব্বপুরুষগণের পণ্ডিত বংশধরেরা যে দিন হইতে লুব্ধ আশ্বাসের মোহে ধর্ম্মবিধি সকল দলিত করিয়া অবরেণ্যকে বরণ করিবার জন্য ছুটিলেন, যে দিন হইতে সংসর্গ দোষে চরিত্র গৌরবকে ধনগৌরবের নিকট খর্ব্ব করা হইতে লাগিল, যে দিন হইতে সুলভ বিলাসিতা ও সুবিধাবাদের খড়্গাঘাতে ধর্ম্মনীতির শিরশ্ছেদ করিয়া গর্ব্বানুভব করা হইতে লাগিল; সেই দিন হইতে এই ধর্ম্মপ্রধান দেশের শিল্পীর শিল্প, কলাবিদের পরিকল্পনা, জ্ঞানের উৎকর্ষ, সামাজিকের নিষ্ঠা, অন্নের স্তূপ, অনবদ্য স্বাস্থ্য, উৎসবের আনন্দ ও একান্নবর্ত্তী মিলন সবই অনাবৃত কর্পূরের মত উপিয়া যাইতে লাগিল। এমনি করিয়া ধীরে ধীরে কর্পূরের ভাণ্ড শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বেকার সেই আনন্দমুখর দেশ আজ একান্ত নিঃসার। নিত্য দুর্ভিক্ষ আজ সেখানে পরমানন্দে বিহার করিতেছে। মৃত্যুর উপাসক ব্যাধি নিত্যই আপনার ইষ্টপূজার জন্য অজস্র বলি সংগ্রহ করিতেছে। কি কঠোর কর্ম্মফল!

একদিন যাহারা মোহ ও দম্ভের বশে ধর্ম্মশাস্ত্রের কল্যাণবিধি সকল উপেক্ষা করিয়া এই দেশেই বৈদেশিক শিল্পকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছিল, বৈদেশিকের বাহ্য চাকচিক্যময় জীবন যাত্রার অনুকরণ করিতে যথাসর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়াছিল, আজ তাহারা কোন আশায় বঞ্চিত হইয়া নিজেদের অনুরাগ রোপিত ও সাহায্যপুষ্ট সেই বৈদেশিক শিল্পের বিরুদ্ধে গুমরিয়া উঠিতেছে? বুদ্ধির বিপর্য্যয়ে একদিন যাহাকে পরম বন্ধু বলিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলে আজ তাহার উপর এমন বিরূপ কেন? নিজকৃত ভুল বুঝিয়া? না—বঁধুয়া এক পর্য্যঙ্কে ঠাঁই দিল না বলিয়া? হায় রে, আত্মবঞ্চনা!

আত্ম-প্রকৃতির এই মূঢ় চাঞ্চল্য যাহাদের নিত্য সঙ্গী, শিকার মোহে লোভের তাড়নায় যাহারা হিতাহিত বোধশূন্য, বিচার মূঢ়তা, ঔদ্ধত্য ও হটকারিতা যাহাদের মানস-সম্পদ, আপনার প্রকৃত সম্পদের প্রতি যাহাদের মমতাবোধের স্থলে বিদ্বেষ বোধের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহাদের সরলতা কোথায়? এরূপ অবস্থায় তাহাদের অসঙ্গত কথায় কোন বিচারবান ব্যক্তি আকৃষ্ট হইতে পারেন কি?

তাই বর্ত্তমানের এই অন্তঃসার শূন্য অবস্থায় আত্ম রক্ষার অক্ষয় কবচরূপ ধর্ম্মানুমোদিত বিধি ব্যবস্থার কোন পরিবর্ত্তনই সম্ভব নয়, বাঞ্ছনীয় ও নয়। বরং আমাদের কর্ম্মদোষে আমাদের এই রক্ষাকবচের যে যে অংশ জীর্ণ বা ভগ্ন হইয়াছে সেগুলির পুনর্মার্জ্জন বা পুনঃ সংযোজন এখনকার দিনে অতিশয় আবশ্যক। মনে থাকে যেন, পূর্ব্বকালে বৈদেশিক

অত্যাশক্তির ফলে এই দেশে বৌদ্ধ বিপ্লব নামে যে অদ্ভুত অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল—তাহার প্রখ্যাত পাণ্ডাগণ অহমিকার বশে অনেক কিছু ওলট্ পালট্ করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু এই রসপ্রধান দেশের ভূমিশক্তি ও তাহার অনুগত কালশক্তি সে ওলট্ পালটের উন্মত্ত প্রচেষ্টা বজায় থাকিতে দিল কি? উপরন্তু সেই অপকর্ম্মের ফলে তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণামরূপে যে দুর্ব্বলতা এদেশের রাজন্যবর্গের মধ্যে তথা প্রজাবর্গের মধ্যে বিসর্পিত হইয়া পড়িল— তাহাই না উত্তরকালে মুসলমান আক্রমণের প্রধান সহায়? বাহ্য ভূমির বিশেষ বিকাশে মুগ্ধ হইয়া সুনির্দ্দিষ্ট স্বদেশ শক্তি ও কালশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে পরিণাম এমনি ভয়াবহ হইয়া থাকে এজন্য সাবধানতার অনুরোধে মুক্তকণ্ঠেই বলা যাইতে পারে—যে জাতি যতদিন পর্য্যন্ত আপনার জন্মভূমির অন্তর্নিহিত এই মহাশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার মূঢ়তা হইতে দূরে থাকিবে ততদিনই তাহার কল্যাণ, অন্যথায় তাহার নিশ্চিত বিনাশ কেহই রোধ করিতে পারিবে না। ইতি।

চোরা বালি।*

[শ্রীমুকুন্দলাল সেন গুপ্ত]

সবিনয়ে নিবেদন—

"চোরা বালি" শীর্ষক একটী ধারাবাহিক প্রবন্ধ আমি "ব্রাহ্মণসমাজ" পত্রিকাতে প্রকাশ করিতে চাই। অতএব প্রার্থনা আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক এটীকে যেন স্থান দান করেন। প্রেরিত প্রবন্ধখানি প্রথমাংশ; আরও দুই অংশ আমার বক্তব্য শেষ হ'য়ে যাবে বাকী দু'টী অংশ মিলে আরও ১০ খানি Sheet এর্ বেশী নেবে না।

প্রথমাংশটী প'ড়লে আপনারা আমার বক্তব্যের উদ্দেশ্য বুঝ্‌তে পারবেন ব'লে মনে করি। আমি নিজেও ব্রাহ্মসমাজভুক্ত, কিন্তু আদি ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র এবং "সাধারণ" সমাজের মুখপত্রগুলির হিন্দু-বিদ্বেষ দেখে আমি বড়ই মর্ম্মাহত হ'য়ে পড়াতে এই প্রবন্ধখানি

* এই প্রবন্ধ "ব্রাহ্মণ সমাজে" প্রকাশের অযোগ্য, ধর্ম্মভাব বিনষ্ট হইয়া গেলে মানবের মধ্যে দুর্নীতি অত্যন্ত প্রসার লাভ করে, দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিগণ যদি বুদ্ধি প্রতিভাশালী হয়, তাহা হইলে, বাহিরে দুর্নীতি প্রচ্ছাদন করিয়া চলিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। প্রবঞ্চনা দ্বারা সত্যকে প্রচ্ছন্ন রাখা অসম্ভব। ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতির অবস্থা এইপ্রকার হইয়াছে। আজও অনেক যুবক ইহাদের প্রবঞ্চনাজালে আকৃষ্ট হইয়া ইহকাল পরকাল নষ্ট করিতেছে এই প্রবন্ধ পাঠ করিলে অনেকের চৈতন্য হইতে পারে, লেখকও অনুতপ্ত হৃদয়ে এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন বলিয়া মনে হয়, এইজন্য লেখকের প্রেরিত পত্রের কিয়দংশ সহ প্রবন্ধ প্রকাশ করিলাম।

সম্পাদক।

লিখ্‌তে বাধ্য হ'লাম। আমি সাহিত্যিক নই; তাই সটান্‌ লিখে যাওয়াতে স্থানে স্থানে যোলা সংযোজক শব্দাদিকে সারিকার ওপরে লিখ্‌তে হ'য়েছে। হাতের লেখাও আমার ভাল নয়, ভাষাও তথৈবচ। কিন্তু তাই বলে উদ্দেশ্য অসাধু নয়। সুতরাং আশা করি আপনারা কেবল আমার উদ্দেশ্যটিকেই আধার ক'রে, ব্রাহ্মসমাজকে সমগ্রভাবে ধ'রে, তা'র উক্ত বিদ্বেষকে অপসারিত করবার নিমিত্ত আমাকে সাহায্য ক'রতে পারবেন। আমি পূর্ব্বপুরুষাগত ব্রাহ্ম নই জানবেন এবং বৃদ্ধ।

আমি জানি, এ-রকম প্রবন্ধ থিয়েটার সম্পর্কীয় পত্রপত্রিকায় প্রকাশার্থ পাঠানই আমার উচিত কার্য্য হ'ত; কিন্তু বলা বাহুল্য যে থিয়েটার সম্পর্কীয় কোন পত্রপত্রিকাই থিয়েটার বিরুদ্ধ মতবাদকে ছাপাতে পারেন না; এবং সাহিত্যে অশ্লীলতা ও নীতিহীনতাকে আক্রমণ ক'রতে হ'লে, সর্ব্ব প্রথম থিয়েটারকেই আক্রমণ ক'রতে হবে। "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"ও তাই ক'রেছেন, আর আমার "চোরা বালি" "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার" "চোরা বালি"র এক রকম পাল্টা জবাব, আমার প্রেরিত লেখা প'ড়লেই বুঝ্‌তে পারবেন। আমি আপনাদের পত্রিকাখানি নিয়মিত ভাবেই "রামমোহন লাইব্রেরী"তে আগা-গোড়া প'ড়ি। নেহাত যে তা'তে সমালোচনা থাকে না, - এ কথা বলা যায় না; সুতরাং আমার "চোরা বালি" শীর্ষক সমালোচনাটী যে মোটের মাথায় নেহাত আপনাদের মণ্ডলের বাইরে, - এ কথাও বলা চলে না। ভরসা করি আমার এ যুক্তিকে আপনারা দয়া ক'রে স্থির মস্তিষ্কে বিচার ক'রে দেখ্‌তে পারবেন। কথাটি এ জন্য ব'ল্লাম যে, আমি ব্রাহ্মসমাজী হ'য়েও হিন্দুসমাজকে প্রগাঢ় ভক্তির চক্ষে সর্ব্বদাই দেখি। আমার কৈফিয়ৎটীকে প'ড়ে আশা করি আপনারা তৃপ্ত হ'তে পারবেন, আর স্থান দিতে আনন্দের সহিত স্বীকৃত হ'বেন। নেহাত যদি না হন্, তবে কৃপা ক'রে পাঠাতে **অবিলম্বেই** ফেরৎ পাঠাবেন; সে জন্য অর্দ্ধ আমার ডাক টিকিট পাঠাচ্ছি।

আদি-ব্রাহ্ম-সমাজের প্রখ্যাতসদস্য মাননীয় ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় রচিত "চোরা বালি" শীর্ষক সর্ব্বসাধারণের পক্ষে একটী বেশ হিতকর ও ইষ্টজনক প্রবন্ধ তাঁ'রই সম্পাদিত "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"র গত আষাঢ় সংখ্যায় বেরিয়েছে। আমরাও তাঁ'র মনোনয়ন অনুযায়ী আমাদেরও এ প্রবন্ধের মস্তক-প্রদান ক'রলাম "চোরাবালি" ব'লে। প্রবন্ধটী আমাদের বর্ত্তমান বাঙলা সাহিত্যের নীতিবিগর্হিতত্ব ও অশ্লীলতা সম্বন্ধে লেখা। প্রবন্ধে এক জায়গায় লেখা আছে,—"সেদিন এক মাসিক-পত্রে প্রকাশিত একটি গল্পের এক সমালোচনায় দেখিলাম যে, মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের দোহাই দিয়া সেই গল্পের অন্যতর নায়ক নানা যুক্তি তর্কের দ্বারা তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে কুপথে চলিবার জন্য উৎসাহ দিতেছে। ইহা অপেক্ষা পশুত্ব আর কত নীচে নামিতে পারে জানি না। তেমন লেখককেও ধিক্, এবং তেমন মাসিক-সম্পাদককেও ধিক্, যিনি উহা প্রকাশ করেন!"

এ-হেন অবস্থায় ব্যবহৃত "ধিক্" শব্দটী বড়ই তল্‌তলে দল্‌দলে! জানি না ভ্রাতুষ্পুত্রীটী পাশ্চাত্য পুরাণোক্ত কিন্নরীবিশেষ কি না। যদি না হন্, আর বাস্তবিক যদি তিনি শরীরিণী-মূর্ত্তিধারিণী হন্, তবে তাঁ'র প্রধান কর্ত্তব্য হ'চ্চে তথাকথিত realistic artএর প্রশ্রয়দাতা ও "উৎসাহ দাতা"কে আচ্ছা ক'রে বেত্রাঘাত করা; অবশ্য যদি "নায়ক"ও অশরীরী ভূত না হন্! প্রবন্ধে আর এক জায়গায় লেখা আছেঃ—"কেবল একজন বীর হৃদয় সাহিত্যিক ঐ প্রকার উপন্যাস প্রকাশের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন।" ঠিক কথা! আজকাল দুতী "দৈনিক বসুতীর" ভাষায়, শ্রেণী বিশেষের বঙ্গ-সাহিত্য যে সুধাবর্ষী মোহন মদিরাময় গীতি নাট্যে পোরা, প্রেমতরঙ্গের শারদ জ্যোৎস্নায় প্লাবিত, প্রমোদ-পিয়াসার অনন্ত তৃষায় তৃষিত, মানসী-প্রতিমার সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য সুষমায় আত্মহারা, 'চল সখি কুঞ্জং স-তিমির পুঞ্জং শীলয় নীল নিচোলং' প্রভৃতি বৃন্দাবন বিলাস রসে মশ্‌গুল! তা'তে যে প্রেমের পুলক হিল্লোলীয় মধুর উজ্জ্বল লীলা মাধুরী তরঙ্গায়িত; তা'তে যে **নব নব নব নব** সৌন্দর্য্যের বিচিত্র বিকাশ; তা'তে যে **নবনবনবনব** পুলকের মদনোৎসব চলিছে অভিসারে! বলি "ঠাকুর" মশাই! ঐ বীর-হৃদয় সাহিত্যিক ব্যাচারীর যোড়া আপনি পাবেন কোথা থেকে? ঠিক বলেছেন আপনি! প্রবন্ধে আর-ও এক জায়গায় লেখা আছে: "বর্ত্তমান কালে আমাদের দেশে দুর্নীতি প্রসারের দুইটি প্রধান কারণ ও উপায় হইতেছে **বারাঙ্গনা পরিপুষ্ট** অভিনয়শালা এবং বায়স্কোপ * * * * কাদা ঘাঁটিলে সহস্র চেষ্টা করিলেও গায়ে কাদা কিছু-না-কিছু লাগা বন্ধ হইতে পারে না। সেইরূপ **বারাঙ্গনা পুষ্ট** অভিনয়শালায় গেলে যত-বড়ই সাধু হৌন না-কেন, তাঁহার মনে যে এতটুকু দাগ লাগিবে না, কামুকতা উদ্রিক্ত হইবে না, ইহা শপথ করিয়া বলিলেও আমরা বিশ্বাস করি'ত প্রস্তুত নহি।" Auite So! ঠিক কথা! আমরাও সরল ও অকপট চিত্তে এ কথাটিকে সমর্থন করি।

কিন্তু! একটা প্রকাণ্ড "**কিন্তু!**" এই প্রকাণ্ড "**কিন্তু**" টা নির্দ্দেশ ক'রে দিচ্চে "দলাদলি". নামক আর-একটা যেন দুর্নীতি পরায়ণ দফাকে (item কে)। এই যে "**দলাদলি**" নামক একটা স্বতন্ত্র দফা, সেটা কেনো দুর্নীতি পরায়ণ, তা'র একটী উদাহরণ দিতে হবে। আপনারা হয়-ত গত ১৯শে শ্রাবণের "ভোটরঙ্গের" ৪র্থ পৃষ্ঠার তৃতীয় স্তম্ভটী প'ড়েছেন; তবুও কেবল আপনাদেরই পত্রিকাখানি যাঁরা পাঠ করেন তাঁ'দের জ্ঞাপনার্থ খানিকটা অংশ ঐ তৃতীয় স্তম্ভ হ'তে এখানে উদ্ধৃত করা যাক্, যথাঃ—

(১)

"গত নির্ব্বাচনে ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায় এবং মিঃ শরৎ সি বসু বোধ হয় দুই জনেই বুঝিয়াছিলেন—দেশবাসীর নিকট তাঁহাদের কদর কতদূর। কাজেই সুভাষচন্দ্রের

উপনির্ব্বাচনে যাহাতে পূর্ব্ব হইতেই দর্শকদের গ্যালারী নিজেদের পেটোয়া লোকে পূর্ণ থাকে এইজন্য গোপনে ১৭৫ খানা কার্ড বা প্রবেশপত্র শনিবারের বারবেলায় কর্পোরেশনের ছাপাখানায় ছাপাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

(২)

"বিধান-শরৎ কোম্পানী দেখিতেছি এইবার বেজায় হুঁসিয়ার হইয়াছেন। গতবারে মেয়র-নির্ব্বাচনে তাঁহারা যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহা নিশ্চয়ই তাঁহারা এত শীঘ্র ভুলেন নাই। সেবারে তাঁহাদের মান ত গিয়াছিলই, এমন কি প্রাণ বাঁচানও দায় হইয়াছিল। সেই জন্যই বোধ হয় এবারে সভা-গৃহে প্রবেশের জন্য টিকিট ছাপানো হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের চালবাজি যে ধরা পড়িয়া যাইবে এবং চিচিং ফাঁক হইতে বিলম্ব হইবে না—তাহা টিকিট ছাপানোর সূত্রপাতেই প্রমাণিত হইয়াছে। জানা গেল, মাত্র ১৭৫ খানি কার্ড ছাপা হইয়াছে। এই ১৭৫ খানি কার্ড নাকি চুপিসারে বি-পি-সি-সির লোকদিগকে পূর্ব্বেই বিলিকরা হইবে। তার পর মঙ্গলবারে যাঁহারা সভা-গৃহে প্রবেশের জন্য কার্ড পাইবার আবেদন করিবেন, তাঁহাদিগকে নাকি জানাইয়া দেওয়া হইবে যে সমস্ত কার্ড বিলি হইয়া গিয়াছে।"

এই ব্যাপারটা যদি প্রকৃত ব্যাপার হয় তবে এ ব্যাপারের তলায় আছে ঐ **"দলাদলি!"** আমাদের এই উপসংহারে আসাটা সমর্থিত হ'য়েছে দেখুন গত ২২শে শ্রাবণ সংখ্যার "অবতারের" প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত কবিতার দ্বারা, যথা:—

"মেয়রের পদ আজি হইয়াছে খালি,
দুই দলে খেয়োখেয়ি—করে গালাগালি।"

এ পর্য্যন্ত পাঠ ক'রলেই বুঝতে পারা যা'বে যে, ঐ প্রকাণ্ড **"কিন্তু"** টা **"দলাদলি"** নামক বস্তুকে নির্দ্দেশ করে দিচ্চে কি না। তারপর 'চুপিসারে' কার্ড ছাপানোর কাজ, আর যাঁ'রা সভা-গৃহে প্রবেশের জন্য কার্ড পাবার আবেদন ক'রবেন তাঁদের জানিয়ে দেবার কাজ যে, সমস্ত কার্ড বিলি হ'য়ে গেছে; এ-দুটো কাজকে একত্রে ধ'রে (অবশ্য কাজ-দুটোর সম্বন্ধে সংবাদটা যদি সত্য হয় তবেই) "দুরভিসন্ধিতে প্রচ্ছন্ন দলবন্ধন" বলা চলে না কি? যদি বলা চলে, তবে "দুরভিসন্ধিতে প্রচ্ছন্ন দলবন্ধন" হ'ল সাধুতা বিরুদ্ধ কাজ! অর্থাৎ এও দেখতে পাওয়া গেল যে **"দলাদলি"** হ'ল নীতিবিগর্হিত কাজ! এতক্ষণ পরে লক্ষ্যের (point এর্) কাছে আসা যাক্। ঐ-যে-ঐ উপরোক্ত "কারণের" ও গৃহীত "উপায়ের (যদি উক্ত সংবাদটী সত্য হয়) কর্ণধার কে, আর তিনি কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত? স্পষ্টই দেখা যাচ্চে যে কর্ণধার হ'চ্চেন ডাক্তার বাবুটী, আর জানা কথা যে তিনি হ'চ্চেন "ব্রাহ্ম" সম্প্রদায়ের। তিন খণ্ডকে ভিত্তি ক'রে, তা'র অমুক খণ্ডের অমুক খণ্ডের অমুক সদস্য অমুক কাজ ক'রেছেন ব'লে যদি কোনো দোষকে এড়াবার কৌশল পাতা যায়, তবে

সে কৌশল টিক্‌তে পারে না; কারণ 'নববিধান' খণ্ডের উৎস 'আদি' হ'তে আর 'সাধারণ' খণ্ডের উৎস 'নববিধান' খণ্ড হ তে। অতএব যৎসামান্য আনুষ্ঠানিক-ক্রিয়াদি বাদে 'আদি' + 'নববিধান' + 'সাধারণ' = 'ব্রাহ্ম' সম্প্রদায়। এখানে আমাদের point হ'চ্চে 'ব্রাহ্ম'-সম্প্রদায়, আর 'সম্প্রদায়ের' একার্থবাচক শব্দ হ'চ্চে '**দল**।' কেনো 'ব্রাহ্ম' সম্প্রদায়কে এ প্রবন্ধে টেনে আনা হ'ল, সে কথা পরবর্ত্তী অনুচ্ছেদে তোলা যা'বে; উপস্থিত এখানেই উক্ত ডাক্তার বাবুটীকে সশ্রদ্ধ "ফেয়ারওয়েল্‌" জানিয়ে দেওয়া যাক্‌। পাঠক পাঠিকারাও যেন 'এ্যঙ্কোর্‌' দেন্‌!

আমরা প্রবন্ধটীর প্রারম্ভিক ৬৩ পৃষ্ঠা হ'তে শেষ ৬৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত প'ড়ে দেখলাম অশ্লীলতা ও দুর্নীতিকে খাড়া করা হ'য়েছে কেবল কতকগুল উপন্যাস নাটকাদির বায়স্কোপের আর বিশেষতঃ **বারাঙ্গনা-পরিপুষ্ট** অভিনয়শালাগুলির ভিত্তির ওপর। প্রবন্ধখানির ধ্বনির প্রকৃতি (Tone) হ'তে যদিও স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে নি, ঠারেঠোরে কিন্তু ফুটে উঠেছে, যেন এমন একটা ভাব, যা'র দ্বারা অনুমান না ক'রে থাক্‌তে পারা যায় না যে, অশ্লীল ও দুর্নীতিমূলক উপন্যাস নাটিকাদির প্রণেতারা হ'চ্চেন 'হিন্দু' সম্প্রদায়ভুক্ত, আর **বারাঙ্গনা পরিপুষ্ট** অভিনয় শালাগুলও যেন হ'চ্চে নিছক 'হিন্দু' সম্প্রদায় দ্বারা স্থাপিত ও পরিচালিত! এখানে বলা দরকার যে হিন্দু সম্প্রদায়ের 'ব্রীফ্‌' নিয়ে আমরা হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষে ওকালতি চালাতে ব'সি নি; যদিচ 'আদি' ব্রাহ্ম-সমাজের উৎস হিন্দু সমাজ হ'তে, আর অন্যত্র ব'লেছি যে বাকী দু'টী ব্রাহ্ম-সমাজের খণ্ডের উৎস প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে 'আদি' সমাজ হ তে; সুতরাং সহজ-বুদ্ধি ও আইনানুযায়ী সমগ্রভাবে ব্রাহ্ম-সমাজও হিন্দু সমাজের মেলা ফেঁক্‌ড়ি প্রশাখাদির মধ্যে একটী প্ররোহ মাত্র। আমরাও আমাদিগকে ব্রাহ্ম-সমাজী ব'লে মানি; **কিন্তু** আমরা ব্রাহ্ম-সমাজান্তর্গত খণ্ডত্রয়ের মধ্যে প্রত্যেক খণ্ডের প্রচণ্ড **দলাদলি**-ভাবটাকে ঘৃণা ক'রি।

মোটের মাথায় ঔপন্যাসিক ও রাঙ্গালয়িক 'কুহক' সম কথা এই যে, 'সাম্প্রদায়িকতাকে মোটেই প্রশ্রয় দেওয়া হয় না' ব'লে প্রত্যেক খণ্ডই তার-স্বরে নিজনিজ মুখপত্রে ও সারমানাদিতে ঘোষণা ক'রে যান্‌। যাক্‌, উক্ত ছ'পৃষ্ঠা ব্যাপী প্রবন্ধে কোথায়ই শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সম্বন্ধে 'টুঁ' শব্দটা পর্য্যন্ত ও খুঁজে পাওয়া গেল না। কেন,—ইনি কি আদপেই **বারাঙ্গনা**-পরিপুষ্ট কোন অভিনয়শালার সহিত প্রকারান্তরে সংশ্লিষ্ট নন্‌? আমরা গত ১৯শে আষাঢ়ের 'বাঙলা' নামক সাপ্তাহিক পত্রে জানিয়েছি যে, দীপালী, আর 'নাচঘরের' মধ্যে French duel চ'লেছিল, বারাঙ্গনা-পরিপুষ্ট অভিনয়শালার নটী নিহারবালা কবীন্দ্র রবীন্দ্র-গীতি গাইতে শীর্ষস্থানীয়া ও অতুলনীয়া না নটী কঙ্কাবতী শীর্ষস্থানীয়া ও অতুলনীয়া প্রশ্নটিকে আধার ক'রে। 'নাচঘর' প্রচার ক'রে ছিলেন নিহারবালার পক্ষ নিয়ে যে, রবীন্দ্র-গীতিতে এই নটীটি

অতুলনীয়া। কারণ দেখিয়েছিলেন এই যে, যেহেতু রবীন্দ্র-গীতিতে **নিহার বালার গুরু** শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে স্বীকার ক'রতে হ'য়েছিল, রঙ্গালয়ের বাইরেও তাঁর শিষ্যাদের ভেতরে নিহার বালা হ'চ্ছেন দ্বিতীয় স্থানীয়া, সেহেতু রঙ্গালয়ে নিহার রবীন্দ্র-গীতিতে শীর্ষস্থানীয়া। 'দীপালী' কঙ্কাবতীর পক্ষ নিয়ে প্রচার ক'রেছেন যে, যেহেতু কঙ্কাবতীর বয়স যখন নয় (৯), অপার সাকুলার রোডে স্থাপিত ব্রাহ্ম-গার্লস্-হাই স্কুলের ছাত্রী মাত্র, তখন তিনি স্কুলের বাৎসরিক পরিতোষিক-বীতরণী-সভাতে রবীন্দ্র-গীতি গেয়ে সমবেত সকলের অজস্র প্রশংসা লাভ ক'রতেন, সে হেতু রঙ্গালয়ে কঙ্কা রবীন্দ্র-গীতিতে শীর্ষস্থানীয়া। বলা বাহুল্য যে কঙ্কাবতী সাহু উক্ত স্কুলে ম্যাট্রিক্ পরীক্ষা পাস্ করে, পরে ব্রাহ্ম-ছাত্রী বহুল বেথুন্ কলেজ হ'তে 'বি-এ পর্য্যন্ত পাস্ করাণান্তর **বারাঙ্গনা**-পরিপুষ্ট অভিনয় শালাতে যোগ দিয়েছিলেন। এখন উক্ত French duel গোছ্ বিবরণী প'ড়ে সহজেই ধ'রতে পারা যায় যে, যখন দিনু বাবু নিহার বালার **গুরু** তখন দিনু বাবু **বারাঙ্গনা**-পরিপুষ্ট অভিনয়শালার সহিত প্রকারান্তরে সম্বন্ধসূত্রে বদ্ধ। আর "দিনুবাবু" ব্রাহ্মসমাজীদের নিজেদেরই ঘোষণানুযায়ী "হিন্দু" নন্। তাঁরা তখনই নিজেদের 'হিন্দু' ব'লে প্রতিপন্ন ক'রতে অগ্রসর হন যখন আদালতের স্থাবর সম্পত্তির মোকদ্দমা বাধে। আমরা অন্যত্র জানিয়েছি যে প্রবন্ধে এক জায়গায় লেখা আছে: কেবল একজন বীর-হৃদয় সাহিত্যিক ঐ প্রকার উপন্যাস প্রকাশের তীব্র প্রদিবাদ করিয়াছেন।" কেন? দিনু বাবুকে ও প্রবন্ধান্তর্গত ক'রে, আলোচনাধীন প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় নিজ হৃদয়েও 'বীর হৃদয়'কে রঙ্গাবতরণ করিয়ে, তাঁর নিজের হার্দিক-বীরত্বের অভিনয়কে নিজেই একবারটী উপভোগ ক'রে নিতে পারলেন না কেন? "Laugh and Live" শীর্ষক প্রবন্ধের এক জায়গায় Douglas Fairbanks সাহেব লিখিয়াছেন: " A man is different From his brother"; তাই বুঝি? French duel এর্ কথা ছাড়া, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ত ভদ্রনারী-নৃত্যগীতাভিনয়ানুরাগিনী "সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা" নাম-বহন-কারিণী মাসিক পত্রিকাখানির 'বোর্ড অফ্ ডিরেক্টার্সে'র' সদস্য। তখন নিশ্চয়ই তিনি পত্রিকাখানির গত বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত "গুণী দিনেন্দ্রনাথ" শীর্ষক অগ্রগামী বার্ত্তাবহ' সম প্রবন্ধটি প'ড়ে থাকবেন। তাতে কি লেখা নেই: "দিনেন্দ্রনাথ একধারে বিজ্ঞ সঙ্গীতজ্ঞ, মরমী কবি, সুদক্ষ সমালোচক ও দক্ষ অভিনেতা?" দক্ষ অভিনেতা মনে রাখবেন ক্ষিতী বাবু! আরও কি তথায় লেখা নেই: "সাহিত্য শিল্পকলা সম্পর্কীয় এমন কম ক্ষেত্র আছে, যেখানে দিনেন্দ্রনাথের গুণী-প্রতিভা রবির আওতায় থেকে চন্দ্রের মত নীরব নিশীথের যবনিকা অন্তরালে সুরের ইন্দ্রজাল রচনা করে নি।" সাহিত্য-শিল্পকলা (art), 'চন্দ্র' 'নীরব নিশীথ', 'যবনিকার অন্তরাল' (গ্রীণ-রুম বুঝি ?), 'সুরের ইন্দ্রজাল' শব্দগুলি নেহাত যদি 'রতিপতি' নামক রোগেই সুরের আলো না-ও জ্বলিয়ে দেয়, অন্ততঃ

নট-রূপ রাগ শিখাকেও জ্বালিয়ে দিতে পারে না কি? পাঠক পাঠিকারা এ প্রশ্নটীর প্রাক্‌টিক্যাল্‌' দিক্‌টাকেই বিবেচনা করে দেখুন; চন্দ্র-জ্যোৎস্নাস্নাত রাজ্যে বিচরণ শীল কবি ও সাহিত্যকদের অসাধ্য ও অসম্ভাব্য দিক্‌টার বিবেচনা করা আর বায়ুমণ্ডলে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করা সমান। যাক্‌ এ referenceটীও প্রমাণ ক'রে দিচ্চে যে তিনি ভদ্রনারী-নৃত্যগীতাভিনয়ের সহিত এবং **বারাঙ্গনা**-পরিপুষ্ট গীত নৃত্যাভিনয়ের সহিত সংগ্রথিত। অতএব ক্ষিতীন্দ্রনাথ বাবু এখন ব'লতে পারেন না যে, যেহেতু তিনি থিয়েটারের সহিত সম্বন্ধসূত্রে বদ্ধ পত্রপত্রিকাগুলিকে অপাঠ্য ব'লেই মানেন সেহেতু তিনি উক্ত French duel এর্‌ কথা জানতেন না; আর তাই দিনু বাবুকেও প্রবন্ধান্তর্গত করা হয় নি! জ্ঞাপন করা বাহুল্য যে দিনুবাবু পূর্ব্বপুরুষাগত আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মসমাজী; আদি-ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত। তবে কি ভদ্রনারী নৃত্যগীতাভিনয় সম্পর্কীয় প্রকাশ্য রঙ্গালয়ের কিংবা বারাঙ্গনা-পরিপুষ্ট প্রকাশ্য প্রেক্ষালয়ের ত্রিসীমানাও না-মাড়ানো সম্বন্ধে যে ব্রাহ্ম সমাজের সত্য ব'লে অবলম্বিত মত নীতি বা বিশ্বাস, আছে, সে tenet বা doctrine টি যাতে আরও প্রকাশ পেয়ে ব্রাহ্মব্রাহ্মিকাদের সূক্ষ্ম-আলোচনাধীন না ক'রে ফেলতে পারে, সেই উদ্দেশ্যটিকে নিয়ে দিনু বাবু-হেন দর্শনাকর্ষক প্রখ্যাত ব্যক্তিটীকে প্রবন্ধান্তর্গত করা হয় নি? আভ্যন্তরিক উদ্দেশ্যটি কি, তা আমরা জানি না, ঠিক ঠিক বল্‌তেও পারা গেল না। তবে এটুকু সহজেই অনুভবনীয় যে অন্তর্গত না করায় কাজটী "**দলাদলি**"র দিকে তর্জ্জনীকে প্রসারিত ক'রে দিচ্চে।

এইবার আদৎ **নটরাজ** মহোদয়ের সহিত একটু আলাপচারী করা যাক্‌! বলা বাহুল্য রৈবতমদনিকা, কর্পূরমঞ্জরী, নর্ম্মবতী, বিলাসবতী, কামদত্তা, স্বর্ব্বেশ্যা ওরফে উর্ব্বসী প্রভৃতি দিকচক্রবাল বিচরণকারিণী দিকবীরা জানেন; স্বর্গের অপ্সরী, কিন্নরী, বিদ্যাধরী, প্রভৃতি বিলাসগুণসম্পন্না নর্ত্তকীরাও জানেন, পিশাচিনী, সয়তানী কুহকিনী, ডাকিনী প্রভৃতি নিরয়বাসিনী মায়াময়ীরাও জানেন; অম্বরের দিবাকর, শশিকর নীহার, গ্রহ, নক্ষত্র, তারা-দল, মেঘ, নির্ম্মল উর্দ্ধ বায়ু (ether) প্রভৃতি জানেন; মর্ত্ত্য-ভূমির বিষাদ-প্রতিমারা, চিরানন্দময়ীরা, লোকালয়-বাসী, দার্শনিকরা, মনোবিজ্ঞানবেত্তারা, ঔপন্যাসিকরা, নাটক-কাররা, প্রহসন-লেখকরা, সুখান্ত মিলনান্ত শোকান্ত বিরহান্ত কত-কি-না-আন্ত ভাবাত্মক বিদ্যায় নৈপুণ্য-প্রদর্শক নটনটীরা, ধার্ম্মিকরা, অধার্ম্মিকরা, ভগবদ্‌-ভক্ত অভক্তরা, পাপীরা, পুণ্যাত্মারা, নীতিনিষ্ঠরা, নীতিহীন আর্টিষ্টরা, বনের তাপস-তাপসীরা, আর স্ফূর্ত্তি-ল্যাণ্ডের বসন্ত সেনা ও মলয়াবতীরা ত জানেনই, এমন-কি বিস্তীর্ণ ধানের ক্ষেত্র, তরুবর, কুসুম-কানন, গহন-বন, তমসা, আলো, সলিল, বিহঙ্গবর, তটিনী, বন-প্রবাহিনী-নদী, পুরবাহিনী-নদী, হ্রদ, সাগর, মরুস্থল, প্রভাত, সন্ধ্যা, নিশীথিনী, উষা, শৈলরাজি, হেমন্ত, বসন্ত, নিদাঘ প্রভৃতি এই বিপুলা বসুধায় যা-কিছু আছে সকলেই জানে; এবং পাতালের স্বর্ণ, রৌপ্য, নীলকান্তমণি, নানাপ্রকার রত্ন ও মণিমাণিক্য, আর মহাসমুদ্রের নিম্নতম অংশের মুক্তা

প্রভৃতিরাও জানে যে, মাননীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হ'চ্ছেন প্রেম-ভালবাসা-মূলক Tragedy; Comedy, Opera, Ballet, Barletta, Melo-drama, Farce ইত্যাদি সম্বন্ধীয় বাংলা পুস্তক লেখক ; এবং কি ভদ্রনারী নৃত্যগীতাভিনয় সম্পর্কীয় প্রেক্ষালয়াদির জন্য আর কি **বারাঙ্গনা**-পরিপুষ্ট অভিন.শালাদির জন্য নৃত্য, গীত, অভিনয়স্বরূপ খোরাকের যোগানদার ! সুতরাং ইনি হ'চ্ছেন—Alexander the-Great of Greece এর মতন **নটরাজ** The great of বিশ্বভারতী ; ইনিও তাঁর "গীত-কর্ণধার" শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মতন পূর্ব্বপুরুষাগত আদি ব্রাহ্মণসমাজভুক্ত আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মসমাজী। তাই বুঝি ক্ষিতীন্দ্রনাথবাবু এমন ভদ্রনারী নৃত্যগীতাভিনয় সম্পর্কীয় প্রেক্ষালয়াদির ও **বারাঙ্গনা**-পরিপুষ্ট অভিনয়শালাদির মধ্যে মহামহিম প্রভাবসম্পন্ন প্রখ্যাত **নটরাজ**কে নিজের প্রবন্ধান্তর্গত করেন নি ? শেষোক্ত অভিনয়শালাতে না হয় এর প্রত্যক্ষ সংস্রব নেই ; তা'তে কিই-ব এমন এসে যায় যখন তা'র সহিত পরোক্ষ সংস্রবটা Settled fact ! তবে কি দিনুবাবু সম্বন্ধে Brahmo tenet বা doctrine বিশেষের যে ইতঃপূর্ব্বে উল্লেখ করা হ'য়েছে, সেটা যা তে আরও না ছড়িয়ে পড়ে, এই উদ্দেশ্যটা নিয়েই অহিন্দু অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত "নটরাজ" মহোদয়কেও প্রবন্ধখানির সীমার মধ্যে আনা হয় নি ? না—অন্য কোনো কারণ আছে ? ১৩৩৬ সালের ২৬শে আষাঢ় সংখ্যার 'বঙ্গবাণী"তে "ঋষি-কবি ও যৌবন-পূজারী রবীন্দ্রনাথ" শীর্ষক একটী সংবাদে দেখা যায় লেখা আছে "সান্-ফ্রান্সিসস্কো হ'তে বিদায় গ্রহণকালে রবীন্দ্রনাথ (তথাকার) তরুণতরুণীদের উদ্দেশ্যে যে বিদায়-বাণী দিয়ে এসেছেন তা' এইরূপঃ 'মার্কিন তরুণতরুণী, বিশেষ করিয়া ছাত্রদের সঙ্গে দেখা করার আমার বড় সাধ ছিল। তরুণতরুণীদের হৃদয়ের পরিচয় তথা সখ্যলাভ করা ছিল আমার অন্তরের অন্যতম বাসনা। তরুণতরুণীরা ! তোমরা যেন জল-কমল ! প্রতিষ্ঠা তোমাদের স্বদেশে ; কিন্তু পুষ্পের সমস্ত সম্পদ তোমাদের, সারা পৃথিবীর সকলের উপভোগ্য !" এই বিদায়-বাণীর অন্তরালে কি প্রবন্ধ লেখক মহাশয় সাহিত্যের নীতি-বিরুদ্ধতায় ও অশ্লীলতার দর্শন পেয়েছিলেন ? যদি পেয়ে থাকেন তবে আমরা বলি তা' শৃঙ্খলার বাইরে, কেন-না রবীন্দ্র -স্তাবকরা তখন গর্জ্জন করে হয়-ত ব'লতে পারেন—"এত বড় স্পর্দ্ধা আপনার ! জানেন না বুঝি ও বিদায়-বাণীটা হ'চ্চে বীনার তারে ঝঙ্কৃত philosophical বাণী !" আর তখন হয়-ত প্রবন্ধ লেখক মহাশয়কে তাঁ'দের সম্মুখে বিনীত ভাবে একটা প্রাচীন ফার্সি গজলের সারিকবি শেষটা, অর্থাৎ "খামোস্ কুন্ আয়য়ারা ! তুঁ গোয়া শায়রাঁ রা" কিংবা "নীরব ক'রে দাও হে তোমার মুখর কবি রে" বাংলা গানের সারিকা বিশেষটা গেয়ে শোনাতে হবে ! যাক্, যদি এই বিদায় বাণীটি রবীন্দ্রনাথকে প্রবন্ধান্তর্গত না করবার কারণ না হয়, তবে কি অন্যই একটা কারণ আছে ? তিনি কি তা হ'লে রবীন্দ্রনাথের "Stray Birds" লেখাটিতে "Woman, with the grace of your fingers you touched my things and order came out like music !"—

বাক্যাংশটী প'ড়ে বিরক্ত হ'য়ে রবীন্দ্রনাথকে প্রবন্ধান্তর্গত করেন নি? বিরক্ত হ'বার 'কারণ মহাশয়' কি প্রবন্ধকার মহাশয়কে এ বাক্যাংশটিতে 'সাহিত্যে নীতিবিরুদ্ধতা বা অশ্লীলতার' সহিত সাক্ষাৎ পাওয়াকে সূচিত ক'রে দিয়েছেন? আমাদের ত মনে হয় না যে, প্রবন্ধকার মহাশয়ের এ-রকমভাবে উপসংহারে আসাও রবীন্দ্র-স্তাবকদের দ্বারা সমর্থিত হ'তে পারবে! তাঁরা হয়-ত ব'লে ব'সবেন—"মাননীয় শ্রীরসিকেন্দ্র মহাশয়ের বাণী সাধারণ অসাধারণ মানবের কর্ণাকাশ বিদীর্ণ ক'রে মরমে পশিতে পারে না; ভূতাকাশ বিদীর্ণ ক'রেই পরঃব্যোমে গিয়ে তথাকার 'চৌকস' সাহিত্য-শিল্পীদেরই মরমে পশিতে পারে।" তখন? আমাদের মোটা বুদ্ধিতে বলে যে এ-সব বাজে কথা! আদৎ কথা এই যে, ইতঃপূর্ব্বে উদ্ধৃত 'A man is different from his brother' বাক্যানুযায়ী রবীন্দ্রনাথকে ও.প্রবন্ধান্তর্গত করা সম্বন্ধে প্রবন্ধকার মহাশয়ের বীর-হৃদয়-সমর্থনকারী বীর-হৃদয়খানি সায় দিতে পারে নি? এবং এটুকুত সহজেই অনুভবনীয় যে অন্তর্গত না করার কাজটী তা'র তর্জ্জনীকে **দলাদলির'** দিকে প্রসারিত ক'রে দিচ্চে! যাক্, এই 'অদ্ভুত রকমের দিল-দরিয়া' ব্রাহ্মসমাজীদ্বয়ের কথাকে গ্রীণ-রূপে বিরাম লভিতে দেওয়াই সূক্ষ্ম রসানুভূতির বিধানানুযায়ী কাজ; আসক্তি-দ্যোতক জ্ঞান বিস্তারকারী কবি-প্রাণে সাড়া জাগাবার অনুপ্রেরণার বিধানানুযায়ী কাজ; দার্শনিক তুলির পোঁচে নীতিহীন মনের গোপন কোণের অদৃশ্য-কল্পনাকে সুদৃশ্য ক'রে তোলবার মত কাজ; **'বাঙলা'** ও **'দাপালী'** **'ভগ্নদূত'** ও **'নাচঘর'** প্রভৃতি কাম-প্রণোদক নাট্যিক কলা-রসিক ও রসবেত্তা সাপ্তাহিক পত্রদের চিত্তাদিকে অভূতপূর্ব্ব আনন্দরস আস্বাদন করাবার মত কাজ; 'অজয়' নদের সিকতাবৎ তটে 'শান্তি-নিকেতন" নামক উপনিবেশের মুখপত্র **'বিচিত্রা'**র মধুময় তুলিকা নিঃসৃত স্বপ্নলোকের সৃষ্টি সম সৃষ্টি ক'রে নারী-নৃত্যগীতাভিনয় সম্পর্কীয় পদবিক্ষেপ অঙ্গসঞ্চালন প্রভৃতির পরিকল্পনা ও বিকাশ-ভঙ্গী ইত্যাদিকে কবিত্ব-সুষমায় সমৃদ্ধ করার মত কাজ; বর্ত্তমান ভাদ্র সংখ্যার **'প্রবাসী'**র ৭২৪।৭ ৫ পৃষ্ঠার মধ্যে 'আনমনা' কালচার্ড ছবি যেমন ভদ্রনারী-নৃত্যগীতাভিনয়ের নটীদের প্রাণে বিরহিনীর মহলা দেবার ঈপ্সা জাগায়, **'ভারতবর্ষের'** বর্ত্তমান ভাদ্র সংখ্যার ৪১৬।৪১৭ পৃষ্ঠার মধ্যে বিহরিত 'তুমি আছ পার্শ্বে মোর যতক্ষণ প্রিয়া, রাজার ঐশ্বর্য্যে নাহি লুব্ধ হবে হিয়া'—মার্জ্জিত ছবিখানি যেমন বৈতরনী তীরে আগুয়ান বৃদ্ধদের হৃদয়ে গত প্রণয়ঘটিত লীলার স্মৃতি জাগায়, **'সচিত্র মাসিক বসুমতীর'** গত শ্রাবণ সংখ্যার ৬২০।৬২১ পৃষ্ঠার মধ্যে শোভিত 'বিননিয়া বিনোদিনী বেণীর শোভায়'—কৃষ্ট প্রদ্ অকৃষ্ট ছবিখানি যেমন কিশোর, তরুণ, সবুজদের মানসক্ষেত্রে প্রণয়-প্রবলতা জাগায়, ঠিক তেমনই ১নং, ২নং ৩নং প্রবণতাদি জাগাবার মত প্রবণতা জাগাবার কাজ। তা ছাড়া, প্রবন্ধকার মহাশয় হয়-ত আমাদেরও অপরাধী ব'লে ধ'রে নিতে পারেন, আমাদের বিরুদ্ধে অতি—Conventionalists হবার charge গঠন ক'রে;—হয়-ত স্বদলস্থ উক্ত ব্রাহ্মসমাজী 'দিল দরিয়া' মহোদয়েদের খাতিরে!

প্রকাশ থাকে যে, আমরা জাতীয় বা সাম্প্রদায়িক পার্থক্য-সাধনার্থ উত্তেজ। সৃষ্ট করবার ঘোর বিপক্ষবাদী। কাউকেও মনোবেদনা দেবার সঙ্কল্প বা প্রবণতা আমরা আদৌ রাখি না। কাউকে ও অপমানাস্পদ করবার অভিপ্রায়কেও আমরা আন্তরিক ঘৃণা করি। আমাদের একমাত্র আন্তরিক ইচ্ছা public cause এর হিতার্থে অপক্ষপাতীত্বকেই আদর্শ স্বরূপ ধ'রে, বঙ্গ সাহিত্যের শ্রেণীবিশেষ হ'তে যতটুকু সাধ্য দুর্নীতি ও অশ্লীলতাকে অপসারিত করবার চেষ্টা করা। মাত্র এটুকু আমাদের অন্য কোনই অভিপ্রায় (motive) বা intention) নেই।

(ক্রমশঃ)

একখানি পত্র

কস্যচিৎ তত্ত্বদর্শিনঃ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিশুদ্ধ ভালবাসা অতি উৎকৃষ্ট পবিত্র ও স্বর্গীয় পদার্থ। তাহার অন্তর বিচ্ছেদ অসম্ভব হইলে তাহার ফলে পরস্পরের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তাহার বহু দৃষ্টান্ত পুরাণ ইতিহাসে আছে।

সুতরাং বিশুদ্ধ ভালবাসা জন্মে নাই; পাশবিক ভালবাসা জন্মিয়াছিল, তাই ভাঙ্গিয়া গেল। বিশুদ্ধ ভালবাসা জন্মিলে কিছুতেই তাহা ভাঙ্গিবেনা মরণ পর্য্যন্ত একত্র থাকিবে এমন কি মরণের পরে ও থাকিবে। ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

কিন্তু তোমার একাকারত সর্ব্বথাই একাকার হইয়াছিল। তথাপি তাহা ভাঙ্গিল কেন। ভাঙ্গিল— যেহেতু একাকারই একতার মূল নিদান নহে। তাই ভাঙ্গিয়া গেল।

সুতরাং জাতিভেদ বা ছুৎমার্গ একতার অন্তরায় নহে। একবার অন্তরায় ভালবাসার অভাব, ধর্ম্মের অভাব। ধর্ম্মকে আশ্রয় করিলেই হৃদয় সরস হইবে, ভালবাসার মন্দাকিনী প্রবাহিত হইবে। সেই প্রেমে সব মুগ্ধ হইবে ও একতাবদ্ধ হইবে। তখন দেখিবে যে জাতিভেদজ ছুৎমার্গ একতার অন্তরায় নহে।

উহাই ইহল হিন্দুর জ্ঞান এবং উহা অতি সত্য কথা। তাহা সত্য যুগ হইতে একাল পর্য্যন্ত জাতিভেদ বা ছুৎমার্গ কোন প্রকার একতার অভাব উৎপাদন করে নাই। আজ তোমাদের মত কতকগুলি জাতিভ্রষ্ট, কুলভ্রষ্ট, ধর্ম্মভ্রষ্ট কুলাঙ্গার জুটিয়া অনৈক্য হইয়াছে ও অনৈক্যের সৃজন করিতেছে। আর যত দোষ জাতিভেদ ও ছুৎমার্গের উপর চাপাইতেছে। আমরা দিব্যচক্ষে তাহা সব দেখিতেছি ও বুঝিতেছি। তোমরা কচিৎ কেহ বুঝিয়া অবুঝ, অধিকাংশ না বুঝিয়া অবুঝ সাজিয়া তারস্বরে উহার বিরুদ্ধে চীৎকার করিতেছে ও উহা — [illegible] চেষ্টা করিতেছে ক্রিয়াকর্ম্মায়তঃপরম।

তোমরা ঐ ছুৎমার্গেই বড় চটা! বলিতেছ—"এ সব কি? সকলেই এক ব্রহ্মের সন্তান; তাহার ভিতর আবার একজন অপরকে স্পর্শ করিলেই সব নষ্ট হইবে—ইহা অতি বর্ব্বরের কথা',—ইত্যাদি।

ঠিক কথা। ইহার অধিক আর কি বলিবে? যে কিছু বুঝে না তাহার উক্তি এই রূপই। নিরেট বর্ব্বর না হইলে কখনও এইরূপ বলিতে পারে না। তুমি বর্ব্বরাদপি বর্ব্বর তাই এইরূপ বলিতেছে।

বলি বর্ব্বর কাহাকে বলে? বর্ব্বরতার লক্ষণ কি? তোমার কি সে বিষয়ে জ্ঞান আছে? তাহা নাই। থাকিলে কখনও ঐরূপ বলিতে পার না, তোমাদের গুরুমুখেই শ্রুত আছি আমাদের সনাতন বেদ নাকি খৃঃ পূর্ব্ব ৮০০০ হাজার বৎসর হইল রচিত হইয়াছে। আমাদের কথা আর বলিতে চাহি না। কেননা আমাদের জ্ঞান উহা অনাদি অনন্তকাল হইতেই আছে। বেদ আপ্ত বাক্য। অথবা ভগবানেরই—'স্বরূপ' সুতরাং সে কথা তোমাদের নিকট বলিবার কোনই প্রয়োজন নাই। তোমাদের গুরুর কথাই বলিব। তাঁহারাই বলে খৃষ্টের ৮০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে বেদ রচিত। সে সময় তোমার গুরুগণ কোথায় ছিলেন; তখন কি তাঁহাদের অস্তিত্ব বর্ত্তমান ছিল; বোধ হয় না। গুরু গুরুর গুরু উপগুরু কাহারই বোধ হয় অস্তিত্ব ছিল না। সুতরাং হিন্দুগণ যে অতি প্রাচীনতম জাতি, সর্ব্বাগ্র জাতি অতি জ্ঞানীও উচ্চ সজ্জায় সভ্য জাতি তদ্বিষয়ে বোধ হয় এতটুকুও সন্দেহ নাই। ইহাত গায়ের জোরের কথা নহে, ইহা শুধু সত্য বর্ণন মাত্র। তবে আজকালকার তথা কথিত পণ্ডিতাভিমানী, শিক্ষিতাভিমানী, সভ্যতাভিমানী, ব্যক্তিগণ হয়ত উহা স্বীকার করিবেন না। কিন্তু সেটুকু তাঁহাদের গায়ের জোরের কথা বলিতে পারি। অতএব যাঁহার গায়ের জোর আছে তিনি গায়ের জোরে যাহা খুসি তাহা বলিতে পারেন কিন্তু তাই বলিয়া সত্য কখনও মিথ্যা হইবে না এবং মিথ্যা কখনও সত্য হইবে না। সত্য চিরকালই সত্য, মিথ্যা চিরকালই মিথ্যা। সময়ে অবশ্যই স্বরূপ প্রকাশিত হইবে—সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্রও নাই।

তারপর, বেদের মত একখানি গভীর জ্ঞানপূর্ণ গ্রন্থ জগতে কেহ কখন রচনা করিতে পারিয়াছেন কি? রচনাত বহু দূরে, কৈ উহার মর্ম্মার্থই কি কোন দেশের কোন পণ্ডিতের বুঝিবার ক্ষমতা আছে। অন্য কোন দেশের কথাত দূরের কথা, স্বদেশেই কি আজকাল এমন কোন মহাত্মা পণ্ডিত আছেন যিনি আপনাকে প্রকৃত বেদজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন? শুধু বেদের মন্ত্র গুলি পাখীর মত আওড়াইয়া যাইলেই বেদজ্ঞ হয় না। প্রকৃত বেদজ্ঞ হইতে অনেক মশলার দরকার। অনেক তপস্যা চাই, অনেক সাধনা চাই, কঠোর ব্রহ্মচর্য্য চাই। সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় হওয়া চাই তবে বেদের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম হয়। বেদ কৃপা করিয়া হৃদয়ে প্রতিভাত হন। তখন তিনি বেদজ্ঞ হন—ব্রহ্মজ্ঞ হন—মুক্তপুরুষ

হন—সবই হন। তখন তাঁহার নিকট আর কিছুই অজ্ঞাত থাকে না। ইহাই হইল বেদ ও 'বেদের' পরিচয়।

এ হেন অমূল্য গ্রন্থ যাঁহাদের মস্তিষ্কের প্রতিভাত হইয়াছে ভগবৎ কৃপায় যাঁহাদের মুখ হইতে নিসৃত হইয়াছে এবং যাহারা তাহাই রাত্রিদিন আলোচনা করিয়া ধন্য হইয়াছেন তাঁহারাই তোমাদের নিকট বর্ব্বর বলিয়া অভিহিত হইলেন। আর যাহারা উহা বুঝেন না, জানেন না এবং বুঝিবার জানিবার উপযুক্ত মস্তিষ্ক শক্তি সামর্থ্য তপস্যা ইত্যাদি কিছুই নাই তাঁহারাই হইলেন পণ্ডিত! অহো কি দুর্দ্দৈব! প্রকৃত পণ্ডিত হইলেন মুর্খ ও বর্ব্বর, আর মুর্খাদপি মুর্খ, বর্ব্বরাদপি বর্ব্বর হইল পণ্ডিত। কালস্য কুটিলাগতিঃ। জীবিনাং অপরং বা কিং ভবিষ্যতি।

এক ব্রহ্মের সন্তান সকলেই ইহা হিন্দু যেমন জানেন ও বুঝেন, বোধ হয় জগতের আর কেহ তাহা তেমন বুঝেন না ও জানেন না। তাঁহারা যে শুধু জানেন না ও বুঝেন না তাহা নহে। তাঁহাদের তাহা জানিবার ও বুঝিবার শক্তি সামর্থ্যও নাই। কাজে কাজেই তাঁহাদের তাহা জানিবার ও বুঝিবার চেষ্টাও নাই। অথবা সে চেষ্টা হওয়াও অসম্ভব। ইহা বোধ হয় খুব জোরের সহিতই বলা যায়। ব্রহ্মজ্ঞানে হিন্দুর একচেটিয়া অধিকার। ব্রহ্মজ্ঞানই হিন্দুর গৌরবের বিশেষ সম্পত্তি।

কিন্তু হিন্দুগণ, অর্থাৎ ঐরূপ উচ্চ ব্রহ্মজ্ঞান থাকা সত্ত্বেও উহা অর্থাৎ ঐ জাতিভেদ ও ছুৎমার্গ অতিশয় কল্যাণদায়ক বলিয়াই নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য আত্মোন্নতি করেই। আত্মোন্নতি ব্যাপার যে হিন্দুগণেরই এবং হিন্দুগণই এ বিষয়ে কথা বলিবার পক্ষে খুব expart বা বিশেষজ্ঞ। একথা অসংকোচে বলা যাইতে পারে। সুতরাং এ বিষয়ে তাঁহারা যাহা বলিবেন তাহাই অভ্রান্ত সত্য বলিয়া জানিবে। সে সম্বন্ধে আর কাহারও তাঁহাদের উপরে কথা বলা চলে না। বলিলে তাহা অনধিকার চর্চ্চা হইবে। সুতরাং তাহা মানিতে প্রস্তুত নহি।

যাহা হউক হিন্দুগণ জাতিভেদ বা ছুৎমার্গ অতীব কল্যাণদায়ক বলিয়াই নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। উহা যে প্রকৃতই কল্যাণদায়ক তাহা একটু প্রনিধান করিলে সাধারণ জ্ঞানের দ্বারাই বেশ সুস্পষ্ট বুঝা যায়। কেননা উহা অতি সূক্ষ্ম বিষয় নহে, একরূপ কতকটা স্থূল বিষয়ই বটে। উহা আত্মরক্ষার অত্যুৎকৃষ্ট ধর্ম্ম বিশেষ।

চক্ষে অঙ্গলি প্রদানপূর্ব্বক দেখাইয়া দিলে অবশ্যই দেখিতে পাইবে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি অবশ্যই দেখিবে, অন্ধের কথা স্বতন্ত্র।

ভাল, বল দেখি তোমাকে কোন এক কুষ্ট ব্যাধিগ্রস্ত লোক যদি তাহার সেই গলিত পুঁজ মাখা হইতে তোমার আহার্য্য সামগ্রী আনিয়া দেয় তাহা হইলে কি তুমি তাহা আহার কর? বোধ হয় করিবে না।

আবার তুমি কোন ভীষণ বসন্ত রোগাক্রান্ত রোগীর পার্শ্বে বসিয়া কি তাহার সেবা শুশ্রূষা করিতে প্রস্তুত আছ ; একবারে অকুতোভয়ে বোধ হয় না।

তুমি কি কোন কলেরা রোগীর পার্শ্বে স্বচ্ছন্দে শয়ন করিয়া থাকিতে সাহসী হও? বোধ হয় না

ভাল, বল দেখি কোন রোগাক্রান্ত রোগীকেই কি Segregation campএ না দিয়া ঘরে রাখিতে পার। বোধ হয় না।

কেন ঐরূপ কর কেন পার না। কেন সাহস হয় না? উত্তরে বলিবে উহা ভীষণ সংক্রামক রোগ। অতএব উহাকে যত সতর্কতা অবলম্বন করা যায়, ততই মঙ্গল।

বেশ কথা! অতি উত্তম কথা! আমিও তাহা স্বীকার করি এবং ঘাড় হেঁট করিয়া অতি আগ্রহ সহকারে ঐ সব নিয়ম প্রতিপালন করি। আমি বেশ বুঝিতে পারি যে উহা বস্তুতই কল্যাণ দায়ক, কাজে কাজেই প্রতিপালন করিতেও সততই প্রস্তুত।

কিন্তু তুমি আমাদের কথা বুঝ না। তাই ঐ সব নিয়ম কল্যাণ দায়ক হইলে ও তুমি তাহা প্রতিপালন করিতে চাই না। আমাদের ঐ সব নিয়ম অর্থাৎ জাতি ভেদ বা ছুঁৎমার্গ প্রভৃতিও এক প্রকার ভীষণ রোগের Preventive স্বরূপ জানিবে। কেমন করিয়া তাহা বুঝাইতেছি।

রোগ প্রধানতঃ দ্বিবিধ। শারীরিক ও মানসিক। ইহা বোধ হয় স্বীকার করিবে। শারীরিক রোগের ভোগ শরীরেই মুখ্য রূপে, মনেও গৌণরূপে ; এবং মানসিক রোগের ভোগ মনেই মুখ্যরূপে এবং শরীরে ও গৌণরূপে ইহাও বোধ হয় স্বীকার করিবে। শরীরের রোগ স্থূল, মনের রোগ সুক্ষ্ম। স্থূল পদার্থ মনুষ্যের চর্ম্মচক্ষের দৃষ্টি গোচর হয়, কিন্তু সূক্ষ্ম পদার্থ মনুষ্যের চর্ম্ম চক্ষের দৃষ্টি গোচর হয় না। কোন কোন স্থূল পদার্থ ও এত সূক্ষ্ম যে তাহাও চর্ম্ম চক্ষের দৃষ্টি গোচর হয় না। কিন্তু অনুবীক্ষণ যন্ত্রাদি দ্বারা দৃষ্টি গোচর হয়। কিন্তু প্রকৃত সূক্ষ্ম পদার্থ যাহা তাহা আদৌ চর্ম্ম চক্ষের দৃষ্টি গোচর হয় না। যাহা চর্ম্ম চক্ষে দেখা যায় না তাহা নাই বলাও চলে না। যেমন পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে অনেক জিনিষ এই চক্ষে দেখা যায় না বটে, কিন্তু অনুবীক্ষণাদি যন্ত্র সাহায্যে দেখা যায়।

সুতরাং যাহা এই চক্ষে দেখা যায় না। তাইতেই তাহা যে একবারেই নাই একথা বলা চলে না। খাঁটি সূক্ষ্ম যাহা তাহাত কোন প্রকারেই চর্ম্ম চক্ষের বিষয়ী ভূত পদার্থই নহে। সুতরাং তাহাত চর্ম্ম চক্ষের দৃষ্টি গোচর হইবেই না। তাহা মনের দ্বারা অনুভব করা যায় এবং জ্ঞান চক্ষুর দ্বারা দৃষ্টি গোচর হয়।

স্থূল বিষয় জড় বিজ্ঞানের অধীন ; সূক্ষ্ম বিষয় সূক্ষ্ম বিজ্ঞান বা আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের অধীন। যে স্থূল বা জড় বিজ্ঞানের আলোচনা করে, সে স্থূল বিষয়ই মাত্র বুঝে, আর কিছু বুঝে না। কিন্তু যে সূক্ষ্ম বা আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের আলোচনা করে, সে সূক্ষ্ম বিষয় ও

বুঝেই, স্থূল বিষয় ও তাহার অজ্ঞাত থাকে না। হিন্দুগণ সেই অত্যুচ্চ মহান্ সূক্ষ্ম বিজ্ঞানের আলোচনায় জন্ম সিদ্ধ, এবং তদ্বারা এই সব অলৌলিক তত্ব অধিকার করিয়াছেন, এবং ইহা অভ্রান্ত সত্য।

শারীরিক রোগের বিষয় কিছুই বলিবার প্রয়োজন নাই। কেন না তাহা এখানকার বিষয় নহে। বিশেষ শারীরিক রোগ সকলেই চোখে দেখিতেছেন, ভুগিতেছেন ও চিকিৎসাও হইতেছে। সুতরাং সে সম্বন্ধে কিছুই বলিবার নাই সকলেই তাহা জানেন ও বুঝেন এবং তাহার প্রতিকারও হইতেছে।

মানসিক রোগের কথাই এখানকার বিষয়ীভূত এবং সেই সম্বন্ধেই কিছু বলিবার ও প্রয়োজন আছে তাহাই বলা যাইতেছে।

মানসিক রোগ কি? এবং তাহার ফলই বা কি? উহাই হইল প্রধান জিজ্ঞাস্য। মানসিক রোগ হইতেছে কু চিন্তা বা পাপ চিন্তা, কু-ভাব। কুদৃশ্য দর্শন, কুকথা শ্রবণ, কুবাক্য কথন, কু-স্থানে বাস, কু-সংসর্গ, অধর্ম্মাচরণ বা পাপানুষ্ঠান অ-সংযম, ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রতা ব্যসনাশক্তি, নির্দ্দয়তা, মিথ্যাবাদিতা, বিশ্বাসঘাতকতা প্রতারণা ইত্যাদি যাবতীয় পাপানুষ্ঠান বা অধর্ম্মাচরণই হইতেছে মানসিক রোগের নিদান। সব উল্লেখ বাহুল্য, তাই ইঙ্গিত মাত্র করিলাম। উহা দ্বারাই সব বুঝিবেন।

ঐ জাতীয় ব্যাপার মানসিক রোগ এবং উহার অবশ্যম্ভাবী ফল হইতেছে আধ্যাত্মিক অবনতি। আধ্যাত্মিক উন্নতি অবনতিই হইতেছে মনুষ্যত্বের হ্রাস বৃদ্ধির নিদান। যে ব্যক্তি যে পরিমাণ আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধান করিতে পারেন, তিনি সেই পরিমাণ মনুষ্যত্বের অধিকারী বা প্রকৃত মানুষ; এবং যিনি যে পরিমাণ আধ্যাত্মিক বিষয়ে অবনত, তিনি আবার সেই পরিমাণ মনুষ্যত্ব হইতে দূরে অবস্থিত। একথা পূর্ব্বেও একবার উক্ত হইয়াছে। সুতরাং আধ্যাত্মিক উন্নতি দ্বারা ক্রমশঃ দেবত্ব লাভ হয়, এবং উহার অবনতি দ্বারা ক্রমশঃ পশুত্বে নীত হয়। ইহা একবারে স্বতঃসিদ্ধ।

অতএব মানসিক রোগ সহজ রোগ নহে। অতি ভয়ঙ্কর রোগ। শারীরিক রোগ অপেক্ষা ও ঐ সব মানসিক রোগ গুরুতর। শারীরিক রোগ দেহকে যাতনা দিয়াই ক্ষান্ত হয়, কিন্তু ঐ সব মানসিক রোগ দেহের মূল উপাদান গুলিকে একবারে আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া দেয়। সুতরাং উহা অতি সাংঘাতিক রোগ। দুঃখের বিষয় লোকে তাহা বুঝে না। লোকে শারীরিক রোগের মাত্র গুরুত্ব বুঝে ও তাহার প্রতি বিধানে যত্নবান হয়, কিন্তু মানসিক রোগের গুরুত্ব আদৌ বুঝে না। কাজে কাজেই তাহার প্রতিকারের উপায় বিধান করিবার আবশ্যকতা ও বুঝে না বা স্বীকার করে না। ফলতঃ মানসিক রোগই অতি ভয়ঙ্কর এবং তাহার প্রতিবিধানে যত্ন করা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য।

হিন্দুগণ তাহা বিশেষ ভাবে বুঝিয়াছেন, এবং তজ্জন্য জীবের কল্যাণার্থ ঐ সমস্ত কঠোর নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সর্ব্বদা পাপানুষ্ঠানে রত লোকের পৃষ্ট জিনিষ

আহার করিলে সেই সব পাপ রোগ দেহে প্রবেশ লাভ করে ও ঐ সমস্ত পাপে লিপ্ত হইবার খুব আশঙ্কা থাকে। এই জন্য শাস্ত্রে কুলটা, লম্পট, মিথ্যাবাদী, প্রতারক, বিশ্বাস ঘাতক, নিষ্ঠুর, ঘোর বিষয়ী. ঘোর ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র, চোর ডাকাত, খুনে, বদমায়েস—ইত্যাদি লোকের পৃষ্ট জিনিষ খাইতে নিষেধ করিয়াছেন, তারপর গুরুজনে ও দেব দ্বিজে ভক্তি শ্রদ্ধা বিহীন অবাধ্য, উশৃঙ্খল, ব্যসনা শক্ত নেশার বশীভূত, ঘোর মাংসাশী, অখাদ্য ভোজন প্রিয় ইত্যাদি লোকের পূর্ব্ব অন্ন খাইতে নাই; তারপর সন্ধ্যাহ্নিক বিহীন পূজার্চ্চনা বর্জ্জিত, গায়ত্রী বিহীন, যথেচ্ছাচারী প্রভৃতি লোকের পৃষ্ট অন্ন আহার করিতে নাই—এইরূপ আরও বহুপ্রকার আছে। সমস্ত উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যাহা লিখিত হইল উহা দ্বারাই সব বুঝিয়া লওয়া যাইতে পারে।

উহাই হইল মানসিক কুৎসিৎ রোগ। দুষ্ট লোকের দুষ্ট ভাবই হইল মা রোগ বিশেষ এবং ঐ ছুৎমার্গ ইহার প্রধান Preventin (প্রতিষেধক)। দেহের electicity (বৈদ্যুতিক শক্তি) অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা অন্ন—পানীয়ে দ্রুত প্রবেশ করে, তাই ঐ সমস্ত কুৎসিৎ ভাব যুক্ত বা কুৎসিৎ রোগ গ্রস্ত লোকের পৃষ্ট অন্ন পানীয় আহার করা নিষেধ পৃষ্টান্ন পানীয় আহার করাত দূষনীয়ই বটে, এমন কি উহাদের সহবাসে ঐ সব কুৎসিৎ ভাব হৃদয়ে জাগ্রত হয়। পরস্পরের দেহের electicity পরস্পরের দেহে প্রবেশ লাভ করে। ইহা অতীব বিজ্ঞান সঙ্গত কথা। এইজন্যই কথা আছে—"সং সঙ্গে স্বর্গবাস অসংসঙ্গে সর্ব্বনাশ বা নরকে বাস।" আবার "চন্দনের নিকট চন্দনের হাওয়া, সেওড়ার নিকট সেওড়ার হাওয়া লাগে" অর্থাৎ কালে ঐ গুণ প্রাপ্ত হয়। কথা মিথ্যা নহে, উহা অতি খাঁটি কথা। বিজ্ঞান সঙ্গত কথা। এবং ঐ সব রোগ হইতে যথা সম্ভব মুক্ত থাকিবার নিমিত্ত যত সব কঠোর বিধি ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ আছে।

বলা বাহুল্য ঐ কারণেই আমাদের স্বপাক খাইবার ব্যবস্থা আছে, আহারের সময় কোন নিকৃষ্ট লোক বা জীবের মুখ দর্শন নিষেধ আছে, অনুপনীত পুত্রের হাতে আহার নিষেধ অসংস্কৃত বা অবিবাহিত কন্যার হাতে খাওয়া নিষেধ, আহারের সময় কেহ এমন কি আপনার পুত্র কন্যা স্পর্শ করিলেও খাওয়া নষ্ট হইবার বিধি আছে—ইত্যাদি কত কঠোর বিধি ব্যবস্থা আছে সব উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

তুমি হয় ত উাহর মধ্যে ও বিদ্বেষ দেখিবে, ঘৃণা দেখিবে। কিন্তু পুত্রকন্যার ন্যায় স্নেহের পাত্র জগতে নাই ইহা একেবারে খাঁটি সত্যের উপরে খাঁটি সত্য কথা সুতরাং তুমি বিষ দুষ্ট চক্ষে ঘৃণা বিদ্বেষ দেখিলেই চলিবে না, ঘৃণা বিদ্বেষ স্থান পাইবে না, ঘৃণা বিদ্বেষ থাকা অসম্ভব। সুতরাং তোমরা যাহা ভাব, তাহা নহে, উহা অতীব কল্যাণদায়ক উহা আত্মরক্ষার বর্ম্ম বিশেষ। বলা বাহুল্য যতক্ষণ রোগ, ততক্ষণই উহার প্রয়োজন, রোগ সারিলে, অর্থাৎ আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে আর উহার প্রয়োজন নাই। কিন্তু তৎপূর্ব্বে খুবই প্রয়োজন আছে এবং সকলের পক্ষেই আছে। যেহেতু সকলেই মানসিক

কোন না কোন রোগে অল্পবিস্তর রোগী আছি। সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্রও নাই ইহা ধ্রুব সত্য।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য ব্যাপার তোমরা আপনাকে নিজে নিজেই নীরোগ ভাব অর্থাৎ তোমরা যেন সকলেই ব্রহ্মজ্ঞানী বা স্বয়ং ব্রহ্ম হইয়াছ ভাব ইহা তোমাদের কতদুর মূর্খতা ও ধৃষ্টতা তাহা তোমরাই বুঝিয়া দেখ। আবার এই মূঢ় জ্ঞানে উন্মত্ত হইয়া আমাদের ঐ উৎকৃষ্ট নিয়মগুলিকে কুৎসিত ভাব ও উহার ভিতর বিদ্বেষ ও ঘৃণা দেখ। শুধু কি ভাবা আর দেখা? তাহা নহে। উহার বিরুদ্ধে তারস্বরে উচ্চ চীৎকার করিয়া নানাপ্রকার মিথ্যা নিন্দাবাদ প্রচার করিতেছ, এবং বক্তৃতাদির দ্বারা উহা ব্রাহ্মণগণের স্বার্থপরতার ফল এইরূপ চারিদিকে ঘোষণা করিতেছ। এইরূপে বিদ্বেষ বহ্নি দেশময় প্রজ্জ্বলিত করিয়া শান্তিময় সমাজে ঘোর অশান্তির সৃজন করিতেছ। বলা বাহুল্য ইহার বিষময় ফল ভোগ তোমাকে ও করিতে হইবে। কারণ বিষের ক্রিয়া সর্ব্বত্রই সমভাবে হইবে—এবং সকলকেই সমভাবে ভোগ ও করিতে হইবে—ইহা সুনিশ্চিত। আগুন প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিয়া সুখে থাকিবার উপায় নাই। তাহা মনে ও ভাবিত না। তোমাকে ও ঐ আগুনে পুড়িয়া মরিতে হইবে। তোমাদের অপার কৃপায় চারিদিকে civil war এর অভিনয় ও হইতে পারে বা তোমরা বাধ্য করিয়া করাইতে পার বলিয়া মনে হইতেছে। অতএব তোমাদিগকে এখনও সানুনয়ে বলিতেছি তোমরা এখন ও ক্ষান্ত হও, বেশি বাড়াবাড়ি করিও না। স্থির চিত্তে ধীরভাবে সকল দিক বিশেষরূপে চিন্তা করতঃ যথা কর্ত্তব্য মীমাংসা করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইবে।

যাহা হউক এ সব কথায় আর প্রয়োজন নাই। উহার এক কথায় বহু কথা উঠে—যেন অসংখ্য, অফুরন্ত। সুতরাং সব কথা বিস্তারিতরূপে বলিবার ইহা স্থান নহে। তথাপি ধীরে ধীরে বহুদুর অগ্রসর হওয়া গিয়াছে। এক্ষণে আর নহে।

তবে মোটের উপর কথা এই জাতিভেদ ব্রাহ্মণগণের স্বকপোল কল্পিত স্বার্থপরতা মূলক কিছু নহে। উহা ঈশ্বরকৃত ও জন্মগত এবং অতীব কল্যাণ দায়ক। ছুঁৎমার্গ ও ব্রাহ্মণগণের স্বার্থপরতার ফল নহে, উহা শাস্ত্র বিহিত ও কল্যাণ দায়ক। যেহেতু উহা মানসিক রোগের উৎকৃষ্ট Prevention বা প্রতিষেধক। তোমরা না বুঝিয়া কেবলই উহার নিন্দা করিতেছ, ও দেশময় হৈ-চৈ করিয়া ঘোর অশান্তির সৃজন করিতেছ, তোমরা এতদূরই কু-লোক। আবার মজা এই তোমরা যে, "কু" তাহা ও আবার তোমরা বুঝ না, পরন্তু "সু" বলিয়াই জ্ঞান কর। ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে।

ব্রাহ্মণগণ কোন কালেই স্বার্থপর নহেন। পরন্তু চিরকাল বিষয়বিরূপী ও ঘোর ত্যাগী। তাহা না হইলে রাজ্যৈশ্বর্য্য, ধন-ধ্যানাদি অতুল বিভব সম্পত্তিকে কখনও পরকে বিলাইয়া দিয়া নিজের কাঁধে ভিক্ষার ঝুলির ব্যবস্থা করিতেন না। ব্যবস্থার হাত ত তাঁহাদেরই ছিল, বাধা দিবার ক্ষমতা কাহারও ছিল না। কিন্তু তথাপি তাহা করেন নাই

কেন করিবেন? ভগবানের পাদপদ্ম যাঁহার লক্ষ্য, তীব্র বৈরাগ্য যাহার সাধক, তিনি কেন বিষয়ে জড়িত হইবেন! তাই অম্লান চিত্তে তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং পরকে তাহা বিলাইয়া দিয়া সামান্য নেংটী পরিধান করতঃ হিংস্রজন্তু সমাকুল বিজন অরণ্যে বৃক্ষমূলে বসিয়া ভগবৎ আরাধনায় নিযুক্ত রহিতেন আবার ঐ অবস্থায় থাকিয়া ও জগজ্জীবের কল্যাণার্থ গভীর গবেষণা পূর্ণ সর্ব্ববিচারিণী তত্ত্বকথা যুক্ত অমূল্য গ্রন্থসমূহ রচনা করিতেন। তথাপি তাঁহারাই স্বার্থপর! হায়রে কলি! তোমার প্রভাবে ইহা ও শুনিতে হইল। না জানি আরও কত কি শুনিতে হইবে। যাহা হউক যাঁহারা ঐরূপ বলেন—তাঁহাদের মত নিমকহারাম, স্বার্থান্ধ্য মিথ্যাবাদী ও নিন্দক জগতে নাই।

তাই বলিতেছিলাম জাতিভেদ ও ছুৎমার্গ ব্রাহ্মণগণের স্বকপোল কল্পিত কিছু নহে। উহা বিধাতা কর্ত্তৃক সৃষ্ট ও শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট। তোমরা উহার ভাল-মন্দ কিছু বুঝ না তাই উহা উঠাইয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিতেছ। ইহা তোমাদের গুরুতর ভ্রম। তোমরা বুঝ না, মান না, বেশ! তাহাতে আমাদের কোনই আপত্তি নাই; কিন্তু আমরা বুঝি ও মানি বলিয়া তুমি আপত্তি কর কেন? উহা কি বুদ্ধিমানের কার্য্য? বা, ন্যায় সঙ্গত আর তোমরা আপত্তি করিলেই আমরা উহা তুলিয়া দিব—ইহা মনেও ভাবিও না। উহাতে কেবল কলহ বিবাদ হইবে, একতার পরিবর্ত্তে অনৈক্য হইবে। তোমার স্বরাজ প্রাপ্তিও সুদূর পরাহত হইবে।

দেশে জাতিভেদ সম্প্রদায় বা দল বিশেষ থাকিলেই কোন ক্ষতি হয় না। রাষ্ট্রীয় ব্যাপার সাধারণ স্বার্থ জড়িত। সুতরাং স্বার্থ বিষয়ে সকলেই এক মত হইলে কোন ও বাধা নাই। বিলাতে ও ঐপ্রকার বহুদল আছে; যথা—Consurvative, Liberal, labour party socialist hihilist Protestant Roman Cuthalic—ইত্যাদি একপ্রকার মতভেদ আছে তাহার সীমা নাই। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সকলেই একমত, রাজকার্য্যও কলের মত চলিতেছে।

তোমরা কি তাহা পার না? তাহা না পারিলেও তোমাদের আশা ও কখনও পূরণ হইবে না।

আজ হিন্দুদিগের বর্ণাশ্রম-স্বরাজ সংঘ সৃষ্টি হইল কেন? ইহার কারণ কি? তোমাদের বুদ্ধির ত্রুটী। আবার তোমারই বা অখিল ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণ মহা সম্মেলনের পশ্চাতে বসিয়া সকল জাতির সমবায়ে এক অদ্ভুত "হিন্দুসভা" নাম দিয়া সভা করিয়া "কুহু কুহু" রব করিলে কেন? সম্মুখ সমরে কুণ্ঠিত হইলে কেন? ইহার কারণ কি? ইহাও তোমাদের বুদ্ধির ত্রুটি বা কুবুদ্ধি।

তোমাদের অতিশয় দুর্ব্বুদ্ধি তাই ঐরূপ হইতেছে। তোমাদের সামঞ্জস্য করিবার বুদ্ধিও নাই, শক্তিও নাই। পরন্তু জবরদস্তি করিয়া সব একসা করিবার কু-মতলবটী খুব আছে। ইহাতে তোমাদের স্বরাজ লাভ সুদূর পরাহত হইবে নিশ্চিত জানিবে।

তোমরা উন্নতির ধুয়া ধরিয়া এই সব করিতেছ। বলি, উন্নতি কাহাকে বলে? সে জ্ঞান আছে কি? যাহাকে উন্নতি বলিতেছ তাহা প্রকৃত বা পূর্ণাঙ্গ উন্নতি নহে। দেহ মন বা স্থূল সূক্ষ্মের সামঞ্জস্য করা উন্নতি নহে। উহা এক দেশী বা শুধু দেহের বা স্থূলের বা ভিত্তিহীন উন্নতি। সুতরাং উহার পক্ষাঘাত রোগ বিশেষ। সুতরাং একাঙ্গের উন্নতি ভিত্তিহীন উন্নতি, অপরাঙ্গের শোচনীয় অবনতি বিধান করতঃ কালে পক্ষাঘাত রোগের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গের অবনতি সাধন করিবে ও পরিশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। ভিত্তিহীন অট্টালিকা যেমন থাকে না ঐ উন্নতির দশা ও তদ্রূপ—যেহেতু উহা ভিত্তিহীন উন্নতি। উহা মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত সুতরাং মিথ্যাই হইবে, দু'দিন পরেই উড়িয়া যাইবে।

কারণ সূক্ষ্মোন্নতিই প্রকৃত উন্নতি এবং উহাই স্থূলের ভিত্তি স্বরূপ। অতএব সূক্ষ্মকে ভিত্তি করিয়া ভিত্তি স্থূলোন্নতি হয় ও তাহা টেঁকসই হয়। অন্যথা অর্থাৎ সূক্ষ্মকে বাদ দিয়া শুধুই স্থূলোন্নতির চেষ্টা করিলে দিন কয়েক একটু চেক্‌নাই দেখাইয়া পরে পক্ষাঘাত রোগের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ আক্রমণ করতঃ বিনাশ উৎপাদন করিবে ইহা সুনিশ্চিত!

তুমি মুখে শুধু "কেন তাহা হইবে," "কেন তাহা হইবে" বলিলেই রাসায়নিক ক্রিয়া কখনই বন্ধ হইবে না। চূণের সহিত হলুদ মিশাইলেই রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে উহা গাঢ় রক্তবর্ণ হইবে। ঐরূপ সোডার সহিত য়্যাসিড মিশাইলেই উথলিয়া উঠিবে। তাহাতে "কেন হইবে" বলা ও চলিবে না এবং কেমন করিয়া সংঘটিত হইলে তাহা ও বুঝিবে না। অথচ কার্য্যটি হইবে ইহা ধ্রুব সত্য কথা।

তোমরা চক্ষে না দেখিলে যখন মানিবে না। উপদেশে, যখন কিছুই বুঝিবে না। যাহা তাহা করিবে, তখন কৃতকর্ম্মের কুফল অবশ্যই একদিন চক্ষে দেখিতে পাইবে এবং মৃত্যুমুখে ও অবশ্যই পতিত হইবে। বিষে মানুষ মার তাহা কেহই খাইয়া বুঝে না, উপদেশেই বুঝে। তোমরা খাইয়া বুঝিতে চাহিতেছ, তোমাদের সবই উল্টা, সুতরাং তোমাদের ফল ও মৃত্যু অবধারিত।

দশম—খ্রীষ্টান—মুশলমানগণের অনুকরণে গ্রামে গ্রামে ভজনালয় নির্ম্মান করিবার প্রস্তাব করিতেছ। ইহা কোন উন্নতি শীল বা উন্নতিকামী জঙ্গলী বর্ব্বর জাতির পক্ষে অতি উত্তম প্রস্তাব সন্দেহ নাই, কিন্তু অতি প্রাচীন ও অতি সুসভ্য হিন্দুজাতির পক্ষে নহে। হিন্দুর ঘরে ঘরে ভজনালয় বর্ত্তমান। এবং তাহাতে নিত্য ত্রিসন্ধ্যা ভজন হয়,—সন্ধ্যাহ্নিক জপ-তপ-পূজা-অর্চনা-প্রতিনিয়ম—ইত্যাদি কত অনুষ্ঠান নিত্য অনুষ্ঠিত হয়। এ বিষয়ে ত ভারতের হিন্দুগণ জগতে সকলের শীর্ষস্থানেই এখন ও বর্ত্তমান আছে। তাহা ও কি চক্ষে দেখিতে পাওনা? এতই কি অন্ধ হইয়াছ? হায় রে! কুশিক্ষার মোহজাল! কুক্ষণে ভারতে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাই তাহার ফলে ভারতের নিজস্ব সকল জ্ঞানই লুপ্ত হইল। যাহার স্পর্দ্ধা ভারতের হিন্দুগণ চিরকাল সমভাবে সকলের উপর করিতে পারে, সেই পরম পবিত্র ধর্ম্ম ভাব ও আজ বিলুপ্ত হইল। তাহারই

স্থলে অতি অপবিত্র, অতি হেয় ম্লেচ্ছ যাবনিক ভাব সকল ধর্ম্ম ভাবের ভান করিয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিল! হায় রে! কলি! অতঃপর আর কি ভাব দেখাইবে! আরও যে কি দুর্দ্দিন ভবিষ্যত্যের গর্ভে নিহিত আছে তাহা ভগবানই জানে না।

একাদশ—বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়া-প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলের একস্থানে ঐভাবে নাচা গাওয়ার ফল কদাচিৎ শুভ নহে, অতিশয় অশুভ উহা সংযমের সম্ভ কারী কুৎসিৎ নিয়ম। উহা কখনও প্রবর্ত্তিত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। কঠোর নিয়মের প্রকার বজ্রসম কঠিন বন্ধনেই যেখানে সংযম রক্ষা হওয়া অতীব কঠিন হয়, সেই স্থানে উচ্ছৃঙ্খলতার পরাকাষ্ঠা করিয়া দিলে সংযম কতদূর থাকিতে পারে ইহা সহজেই অনুমেয়। যাহা সহজ সাধারণ বুদ্ধিতেই বুঝা যায়। বড় বেশি গভীর গবেষণার প্রয়োজন হয় না, দুঃখের বিষয় ইহাঁরা তাহাও বুঝিতে পারেন না। ইহাঁরা ঠেকিয়া শিক্ষা লাভ করিবারই অধিক পক্ষপাতী দেখিতেছি। উহা অবশ্যই বুদ্ধিমানের লক্ষণ নহে, অতি নির্ব্বোধের শিখিতে শিখিতে যদি ওয়াক্কাই- পাইলে, তবে শিখিবে কবে? আর শিখিবেই বা কি ছাই মাথা মুণ্ড, আর সে শিক্ষার লাভ বা কি?

দুর্ব্বুদ্ধি অনেকের হয় বটে, কিন্তু এমন দুর্ব্বুদ্ধি কদাপি কোথায়ও দেখি নাই। মরণ-কালে বিপরীত বুদ্ধি" একটা কথা আছে ইহাদের ও এখন সেই সময় উপস্থিত। নইলে কেন আজ অহিতে হিত বুদ্ধি, "কু"তে "সু" বুদ্ধি, গরলে অমৃত বুদ্ধি, পাপে পুণ্য বুদ্ধি, অধর্ম্মে ধর্ম্ম বুদ্ধি, অন্যায়ে ন্যায় বুদ্ধি; এইরূপ আশ্চর্য্য কার্য্য, অবনতিতে উন্নতি, অনাত্মীয়ে আত্মীয়, পরে আপন, শত্রুতে মিত্র এক কথায় মরণে জীবন-প্রাপ্তি-বুদ্ধি হইবে? ইহা অতিশয় দুর্ব্বুদ্ধি। এবং ইহাকেই বিপরীত বুদ্ধি বলে। উহা সম্পূর্ণরূপে বিনাশ প্রাপ্ত হইবার পূর্ব লক্ষণ। আবার বিশেষত্ব এইটুকু যে লোকে না বুঝিয়া বিপাকে পড়ে, কিন্তু ইহারা বুঝিয়া-পড়িয়া বিপাকে পড়িতেছে, অথচ না বুঝিলে ও বুঝ মানিতেছে না বিপাকে পড়িতেছে। ইহাকেই বলে 'আর লিখে কপালে, মরণ লিখে পায়? যেখানে মরিবে বান্দা পায় হেঁটে যায়।" ইহারা ও মৃত্যু মুখে দ্রুত দৌড়াইয়া যাইতেছে। কুমতি সুমতি দেন ঈশ্বর সবায়। জানিনা ভগবান কেন ইহাদিগকে এমন দুর্ম্মতি দিতেছেন। সকলই তাঁহার ইচ্ছা। জানিনা তাঁহার কি ইচ্ছা? কিন্তু ভাবিতে শিহরিয়া উঠি। তথাপি তাঁহার ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হইবে। সে ইচ্ছার গতিরোধ করিবার শক্তি কাহার ও নাই।

দ্বাদশ বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী সকলে একত্রিত হইয়া মাল কোঁচা মারিয়া মল্লযুদ্ধ করিবে, লাঠি-বাজি করিবে, ছোরা বাজি করিবে, অথচ সংযম ভঙ্গ হইবে না— ইহা অতীব অস্বাভাবিক কথা! গালের ভিতর রসভরা রসগোল্লাটী দিয়া যদি বলা যায়, "খবরদার উহার রস কিন্তু এতটুকুও খাইতে পারিবে না। রস খাইলেই রসভঙ্গ হইবে" ইত্যাদি তাহা হইলে কেমন হয়? অতি উত্তম! অতি চমৎকার! ক্যাবাৎ! ক্যাবাৎ!! এমন না হইলে কি যুগের প্রধান হওয়া যায়? না, যুগোপযোগী ধর্ম্মই ব্যাখা করা চলে? না, 'আদর্শ সমাজ গড়া যায়? না একতা লাভ করতঃ স্বরাজ লাভই হয়? না, স্বাধীনতার ধ্বজা উড়ান চলে।

বলিহারী যাই পণ্ডিত মহাশয়কে যে তিনি প্রকৃত সদ্বংশ জাত ব্রাহ্মণ কুলে উৎপন্ন হইয়া, স্বয়ং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হইয়া ও ঐ সব অতি দুর্দ্দান্ত দানবরূপী দেবগণের দূত সাজিয়া ঐ সব কু কথা দেশময় ছড়াইতেছেন এবং ঐরূপ ছড়াইয়া স্বয়ং ধন্য হইতেছেন ও অপরকে ধন্য করিতেছেন। হায়রে! কলি! তোমার অপার মহিমা !!!

উহাই হইল অধমের নীতি বাক্য বা হিতোপদেশ, উহাতে কর্ণপাত করিবে কি? বোধ হয় করিবে না। কেন করিবে? দুঃসময়ে দুর্ব্বুদ্ধি হয়, মরণকালে বুদ্ধির বিপর্য্যয় ঘটে। তখন সংকথা অসৎ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, ভাল কথা মন্দ বলিয়া অনুমিত হয়। সুতরাং আমার এ নীতি কথাই বা কেন ভাল লাগিবে? পিপিলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে'। তোমাদের ও সেই দশা উপস্থিত। তোমাদের মৃত্যু মুখে পতিত হওয়াই উদ্দেশ্য এবং তাহাই হইতেছ ও হইবে। সুতরাং নীতিকথা কেন শুনিবে? তাহা না শুন ক্ষতি নাই, মরিতে চাহ, মর, তাহাতেও আপত্তি নাই। কিন্তু অপরাধ তাহার সাথী করিবার জন্য এত প্রয়াস কেন? আপনার কপাল লইয়া আপনি মর, কাহাকে ও বলপূর্ব্বক সাথী করিবার চেষ্টা করিও না। মিথ্যা আশায় ভুলাইও না। উহা মহাপাপ, ফল—সদ্য মৃত্যু।

উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, পণ্ডিতকুলে উৎপন্ন হইয়া, স্বয়ং জাঁদ্রেল পণ্ডিত সাজিয়া ও পবিত্র গুরুকুল অলঙ্কৃত করিয়া ও পণ্ডিত মহাশয়ের এমন মতিবিভ্রম, এমন বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটিল কেন? ইহা অবশ্যই ভাবিবার বিষয়। কেন এমন হইল উত্তর জন্ম নক্ষত্রের দোষ। উহার মত ভাবের শোচনীয় পরিবর্ত্তন আরও অনেকের হইয়াছে। ঐরূপ কুলাঙ্গারের দৃষ্টান্ত আরও অনেক আছে। নাম করিয়া লাভ নাই, তথাপি দুটী একটী বলাও আবশ্যক যথা—শিবনাথ শাস্ত্রী, মদনমোহন তর্কালঙ্কার যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি অনেক আছে। স্বনাম ধন্য পুরুষ বিদ্যাসাগর মহাশয় এ বিষয়ে কম নহেন। তবে তাঁহারা ইহার মত অত মন্দ লোক নহেন। যেহেতু তাঁহারা স্বদল পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিন্ন দলে ছিলেন স্বতন্ত্রভাবে ছিলেন মাত্র। সুতরাং তাহা মন্দের ভাল।

কিন্তু ইনি এতই মন্দ যে, যে দলেই থাকিবেন, কিন্তু দলের কোন ধার ধারিবেন না, দলের নিয়ম মানিবেন না। পরন্তু দলের বুকে ছুরী মারিবে। কি সাঙ্ঘাতিক লোক! কি ভীষণ প্রকৃতি! এ সকল লোক পত্র পাঠ দূরতঃ পরিবর্জ্জায়ৎ। কোন সংশ্রবে রাখা কর্ত্তব্য নহে।

যাহা হউক এরূপ প্রকৃতির বিপর্য্যয় অবশ্য জন্মান্তরের দোষেই হয় সন্দেহ নাই। বারিষ্টার প্রবর W, C, Bànurjee উচ্চ ব্রাহ্মণ কুলের বন্দ্যোবংশে জন্মিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতির এতদূর বিপর্য্যয় হইয়াছিল যে তিনি আপনাকে "Banurjee" বলিয়া পরিচয় দিতেও কুণ্ঠিত হইতেন। তাই "Banurjee' না বলিয়া সাহেবী অনুকরণে "Bonur" বলিতেন! তারপর লোকে নীচকুল হইতে কন্যাই গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু কন্যা কখনও সম্প্রদান করে নাই। কিন্তু তিনি তাহা ও করিয়াছেন, আপনার কন্যাকে সাহেবের করে অর্পণ করিয়া কৃতার্থন্মন্য হইয়াছেন। তাঁহার প্রকৃতির এতই রিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল।

ঐরূপ হইবার কারণ কি সমস্তই জন্মের দোষ বটে। ঋতুমতী রমণী প্রথম ঋতুস্নানের (অর্থাৎ চতুর্থ দিন) স্নানান্তে যেরূপ লোকের মুখ-দর্শন করে, সেইরূপ প্রকৃতি বিশিষ্ট পুত্র